একাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৫

৪০২ সংখ্যা

শক ১৮০৬

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ শনিবার, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৫।

প্রাতঃকাল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঋক্‌বেদের কএকটী মন্ত্র ব্যাখ্যার সহিত পাঠ করিলেন।

নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো
নোব্যোমা পরোযৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমা-
সীদ্গহনং গভীরং॥ ১॥

'তদানীং' সেই সময়ে সেই সৃষ্টির পূর্ব্বে 'ন অসৎ আসীৎ' অসৎ ছিল না 'নো সৎ আসীৎ' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যে সৎ তাহাও ছিল না। 'ন আসীৎ রজঃ' এক কণা রেণুও ছিল না। 'নো ব্যোমা' ঐ মহান্ আকাশও ছিল না। নাপি 'পরঃ যৎ' উপরে যে দ্যু-লোক তাহাও ছিল না। 'কিং আবরীবঃ' যেমন আকাশকে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র এখন আবরণ করিয়া রহিয়াছে, যখন আকাশও ছিল না তখন আকাশের এই সকল আবরণই বা কোথায়? 'কুহ কস্য শর্ম্মন্' কোথায় বা কাহার এই সকল ভোগ্য বস্তু। 'অম্ভঃ কিং আসীৎ গহনং গভীরং' এই যে গহন গভীর সমুদ্র, তাহাও কি তখন ছিল? ১

সেই সময়ে সেই সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যে সৎ তাহাও ছিল না। এক কণা রেণুও ছিল না, এই মহান্ আকাশও ছিল না। উপরে যে দ্যুলোক তাহাও ছিল না। যেমন আ-কাশকে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র এখন আবরণ করিয়া রহিয়াছে, যখন আকাশও ছিল না তখন আকাশের এই সকল আবরণই বা কোথায়? কোথায় বা কাহার এই সকল ভোগ্য বস্তু? এই যে গহন গভীর সমুদ্র তাহাও কি তখন্ ছিল? ১

মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন
আসীৎ প্রকেতঃ
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন
পরঃ কিংচ নাস॥ ২॥

'মৃত্যুঃ আসীৎ অমৃতং ন তর্হি' মৃত্যু অমৃত তখন কিছুই ছিল না। 'ন রাত্র্যা অহ্নঃ আসীৎ' রাত্রির সহিত দিনও ছিল না, ন 'প্রকেতঃ' প্রজ্ঞানও ছিল না। 'আনীৎ অবাতং স্বধয়া তৎ একং' তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাত-প্রাণিত সেই এক ব্রহ্মই জাগ্রৎ ছিলেন। 'তস্মাৎ হ অন্যৎ ন কিঞ্চন আস' তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। 'ন পরঃ' এই বর্ত্তমান জগৎও ছিল না। ২

মৃত্যু অমৃত তখন কিছুই ছিল না। রাত্রির

সহিত দিনও ছিল না, প্রজ্ঞানও ছিল না। তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাত-প্রাণিত সেই এক ব্রহ্মই জাগ্রৎ ছিলেন। তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, এই বর্ত্তমান জগৎও ছিল না। ২

তম আসীত্তমসাগূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং স-
লিলং সর্ব্বমাইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্ম-
হিনাজাযতৈকং ॥ ৩॥

'তমঃ আসীৎ তমসা গূঢ়ং অগ্রে' অগ্রে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। 'অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বং আঃ ইদং' এই সমুদয় অপ্রজ্ঞাত জ্যোতিহীন মহাশূন্য-সমুদ্র ছিল। 'তুচ্ছ্যেন আভু অপিহিতং যৎ আসীৎ' 'একং' তুচ্ছ অজ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত যে এক বিশ্বকার্য্যের বীজ ছিল 'তৎ' 'তপসঃ মহিনা অজায়ত' তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনার মাহাত্ম্যে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল। ৩

অগ্রে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই সমুদয় অপ্রজ্ঞাত জ্যোতিহীন মহাশূন্য-সমুদ্র ছিল। তুচ্ছ অজ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত যে এক বিশ্বকার্য্যের বীজ ছিল, তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনার মাহাত্ম্যে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল। ৩

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ
প্রথমং যদাসীত।
সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌হৃদি প্রতীষ্যা
কবযোমনীষা ॥ ৪

'মনসঃ প্রথমং রেতঃ যৎ আসীৎ' মনের প্রথম বীর্য্য যাহা ছিল 'কামঃ' সেই যে প্রেম 'তৎ অগ্রে অধিসমবর্ত্তত' তাহা সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হইল। 'সতঃ অসতি' সতের সহিত অকৃত কারণের 'বন্ধুং' যে বন্ধন, সেই প্রেম-বন্ধন; সেই প্রেম বন্ধনকে 'কবযঃ' কবিরা 'হৃদি' হৃদয়ে 'মনীষা' বুদ্ধির দ্বারা 'প্রতীষ্যা' প্রতীষ্য বিচার করিয়া 'নিরবিন্দন্‌' জানিলেন। ৪

মনের প্রথম বীর্য্য যাহা ছিল, সেই যে প্রেম, তাহা সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হইল। সতের সহিত অকৃত কারণের যে বন্ধন সেই প্রেম-বন্ধন; সেই প্রেম-বন্ধনকে কবিরা, হৃদয়ে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া জানিলেন। ৪

তাৎপর্য্য।

১। এই সূক্তের ঋষি প্রজাপতি সৃষ্টির পূর্ব্ব সময়ের আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই মহান্ আকাশ ও দ্যুলোক কোথায়, এক কণা রেণুও ছিল না। কোথায় বা এই সকল জীব জন্তু, কোথায় বা তাহারদের ক্রিয়া কলাপ, কোথায় বা তাঁহারদের সুখ সৌভাগ্য— তখন্ ইহার কিছুই ছিল না। অগণন নক্ষত্রপুঞ্জ যে এই আকাশকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাও তখন ছিল না। গভীর সমুদ্র ছিল না, এক বিন্দু জলও ছিল না। এই সকল যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সৎবস্তু, তাহা কিছুই ছিল না। তবে কি তখন্ অসৎ ছিল? অসৎও ছিল না। যদি অসৎ থাকিত, তবে কোথা হইতে এই সতের উৎপত্তি হইত? 'কথমসতঃ সজ্জায়েত' অতএব সতের কারন, সত্যের সত্য, অকৃত অমৃত একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্ম ছিলেন।

২। সেই পরব্রহ্মই অবাত নিঃশ্বাসে প্রাণিত ছিলেন। যখন্ মৃত্যু ছিল না, মর্ত্ত্য জীবও ছিল না; যখন্ অমৃত ছিল না, অমরণধর্ম্মা দেবতারাও ছিলেন না; কোন প্রকার প্রজ্ঞানও ছিল না; যখন রাত্রি দিন ঋতু সম্বৎসর কালের কোন অবয়ব ছিল না তখন কালের কাল সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই জীবিত ছিলেন। সকল অভাবের মধ্যে সেই মহাপ্রাণই স্পন্দিত হইতেছিল। তিনি সেই আশ্চর্য্য-শক্তি-সমন্বিত ছিলেন, যাহা হইতে এই বর্ত্তমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

৩। তখনকার সেই আদিম অন্ধকারের মধ্যে, অপ্রজ্ঞাত অনির্দ্দেশ্য জ্যোতিহীন শূন্যের গর্ভে পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরেতে এই জগৎ-কার্য্যের যে একটি বীজ নিহিত ছিল, তাহা তাঁহার জ্ঞান-আলোচনাতে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল।

৪। পরমেশ্বরের হৃদয়ে প্রেম উদ্দীপ্ত হইল আর এই বিশ্বসংসার প্রকাশ পাইল। প্রথমে প্রেমের আবির্ভাব, পরে জ্ঞানের আলোচনা, তাহার পরে দেশ-কাল-সূত্রে এই জগৎ অনুস্যূত হইল। প্রেমই মনের বীর্য্য, সেই প্রেমেরই প্রভাবে প্রভাকর প্রভা পাইল, সুধাকর শোভার আধার হইল, এই বিশ্বসংসার এক প্রেমের সংসার হইয়া উঠিল। যখন পুরাতন ঋষিদের মনে প্রেমের ছায়া পড়িল, তখন তাঁহারা আলোচনা করিয়া জানিলেন, জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের যে বন্ধন সে কেবল প্রেমের বন্ধন। এখনকার কবিরাও প্রেম-রসে আর্দ্র হইয়া গান করিতেছেন "যে দিকে আজি ফিরাই আঁখি, প্রেমরূপ নিরখি তোমারি।"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

আজ নব বৎসরের প্রথম দিন, নবীন সূর্য্যের প্রথম অভ্যুদয়। এক্ষণে ব্রহ্মের মহিমা নবতর কল্যাণতর রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তবে আমরা এই মঙ্গল মুহূর্ত্তে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিয়াছি! কি আশা ছিল যে আমরা আর এক বৎসর এই মর্ত্ত্য পৃথিবীতে থাকিব। কিন্তু যাঁহার শাসনে দিন দিন সূর্য্যের উদয় হইতেছে যাঁহার, শাসনে পক্ষ মাস ঋতু সম্বৎসর পরিধাবিত হইতেছে, তাঁহারি অমোঘ সাহায্য পাইয়া আবার আমরা পূর্ব্ব বৎসরকে অতিক্রম করিয়া এই নূতন বৎসরে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি। আমাদের যাহা কিছু শক্তি ও সিদ্ধি, তাহা কেবল সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের করুণা, একমাত্র তাঁহারি ধ্রুব মঙ্গল ইচ্ছার ফল! মৃত্যুর মধ্যেও যিনি অমৃত রক্ষা করেন, দুঃখ বিপদেও যিনি শান্তি বর্ষণ করেন এবং পাপ মলিনতার মধ্যেও যিনি পুণ্য ও পবিত্রতার জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া অনুতপ্ত আত্মাকে সংশোধন করেন, সেই দেবতার দেবতা দয়াময় ঈশ্বর ধন্য।

৫৪ ব্রাহ্ম সম্বৎ তো আমাদের জীবনের আর এক পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ করিয়া চির দিনের জন্য চলিয়া গেল। এখন যদি আমরা একবার সেই জীবন-পত্রের প্রতি দৃষ্টি করি; তাহার প্রত্যেক ঘটনায়, প্রতি ছত্রে কেবল ঈশ্বরেরই হস্ত দেখিতে পাইব এবং আমাদের প্রতি তাঁহার যে কত করুণা তাহা ভাবিয়া আকুল হইব। যখন পীড়ার যন্ত্রণায় গভীর আর্ত্তনাদ করিতেছিলাম তখন তিনি স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছেন। যখন অনশনের শুষ্কতায় শীর্ণ হইতেছিলাম, তখন সেই দারিদ্র্য-দুঃখ হইতে তিনি পরিত্রাণ করিয়াছেন। দ্বন্দ্ব বিবাদ হৃদয়ে উত্থিত হইয়া তাঁহারই শাসনে অমনি নির্ব্বাণ পাইয়াছে। কত শত্রু আমাদের বিনাশের অবসর খুজিতেছিল, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে সে অবসর দেন নাই। কি মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের আলোক কি রজনীর গভীর অন্ধকার সকল সময়েই তাঁহার দৃষ্টি আমাদের উপরে নিপতিত ছিল। ঐ দেখ এখনো তাঁহার কোমল স্নেহ-দৃষ্টি আমাদিগের উপর পতিত হইয়া সুধা বর্ষণ করিতেছে। এবং আমাদিগের রিপুকুলের উপর তাঁহার রুদ্র দৃষ্টি নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে। মনে হয়, কতবার কল্যাণপ্রদ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া আমরা অধ-

র্দ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগকে অমনি অমৃতের আস্বাদ দেখাইয়া তাঁহার মঙ্গল-পথে আনয়ন করিয়াছেন। ধন্য সেই পিতা, ধন্য তাঁর করুণা। তিনি পাপীকেও পরিত্যাগ করেন না। তিনি যেমন সাধুকে পুরস্কার দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেন, তেমনি পাপীকেও দণ্ড-বিধান করিয়া পাপ হইতে পুণ্যের পথে ফিরাইয়া আনেন। সেই নিত্য সত্য পুরুষ যদিও আমাদিগকে এই অনিত্য সংসার-বক্ষে বিচরণ করিতে দিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহার বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে, আমাদিগকে বিনষ্ট করেন না। তিনি এই চঞ্চল অস্থির ঘটনার মধ্যে রাখিয়া আমাদিগকে অমর করিয়াছেন। এই সংসারের বিপদ সম্পদ উভয়ই আমাদের মঙ্গলের কারণ। সম্পদে তাঁহার করুণা আমরা দেখিতে পাই, বিপদেও তাঁহার করুণা আমরা দেখিতে পাই। অতএব তাঁহার এই অসীম করুণার জন্য আইস আমরা গুরু-শিষ্যে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, বন্ধু বান্ধবে, তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম করি এবং কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহারই চরণে আমারদের মন প্রাণ সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া আমারদের দুর্ব্বল আত্মাকে সবল করিয়া তুলি।

তিনি আমারদের পিতার ন্যায় পিতা এবং মাতার ন্যায় মাতা। আমরা শিশুর ন্যায় চারিদিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বলিতে থাকি হে পিত! যখন তুমি আমাদের প্রাণের প্রাণ হইয়া আমাদের পরমায়ু বৃদ্ধি করিতেছ, আত্মার আত্মা হইয়া তাহার সদ্গতি বিধান করিতেছ, তোমাকে না দেখিলে যখন চক্ষু দৃষ্টিহারা হয়, কর্ণ শ্রবণ-শক্তি বিহীন হয় এবং সকল ইন্দ্রিয় নিবৃত্ত হয়, সকল প্রবৃত্তি কলুষিত হয়, তখন তোমাকেই আমাদের শরীর, মন, আত্মা ও সুখ সম্পত্তি সকল অর্পণ করিয়া শরীর, মন, আত্মার ও সুখ সম্পত্তি সকলের সত্তাকে উজ্জ্বল ও দৃঢ় করিয়া তুলি।

হে পরমাত্মন্! যে নূতন বৎসরের উদয় কাল দেখিবার জন্য আমরা এত আশা করিতেছিলাম, সে দিন আমরা পাইলাম। তুমি এই নূতন উষাকালকে কি অমৃতময়, কি শোভাময় করিয়া দিয়াছ। সূর্য্যের সেই প্রথম উদয় দিনে অসংখ্য নক্ষত্রেরা চারিদিক হইতে যেমন উলুরবে প্রেম ও আনন্দ ঘোষণা করিয়াছিল তেমনি আজ এই বৎসরের নূতন প্রাতঃকালে এই পৃথিবীতে সমস্ত প্রকৃতি তোমারি জয় ঘোষণা করিবার জন্য জাগ্রৎ হইয়াছে। এখন বিহঙ্গ পশু তোমারি জয় ঘোষণা করিতেছে। নদী তড়াগ তোমারি জয়, অগ্নিবায়ু তোমারি জয়, এই মধুঋতুর মধু সমীরণ তোমারি জয় এবং নব প্রস্ফুটিত এই কুসুমগুলি তোমারি জয় ঘোষণা করিতেছে! এখন মহাসমুদ্র তরঙ্গে তরঙ্গে তোমার জয় ঘোষণা করিতেছে। উত্তুঙ্গ হিমাচল সহস্র মস্তক উত্তোলিত করিয়া ফুল পল্লবে, সমীর পরিমলে তোমার জয় ঘোষণা করিতেছে এবং আমরাও এই ক্ষুদ্র প্রাণে, ক্ষুদ্র কণ্ঠে তোমারি জয় ঘোষণা করিতে একত্রিত হইয়াছি। তুমি একবার দয়া করিয়া আমাদের হৃদয়ের ভাব ও ভক্তি গ্রহণ কর। তুমি আমাদের আত্মায় এমন বল প্রেরণ কর যেন আমাদের আত্মার দৃষ্টি এই সুখদুঃখময় সংসারের মধ্যেও তোমার প্রতি স্থির থাকে। বৎসরের এই প্রথম প্রাতে আমরা যেমন তোমার জয় ঘোষণা করিতেছি, এইরূপ প্রতিদিনই যেন তোমারি জয় ঘোষণা করিতে করিতে অনন্তকাল বিচরণ করিতে পারি

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

যিনি আমাদের অন্তরের অন্তরতম পরমাত্মা—যিনি আমাদের সর্ব্বকালের আশ্রয়—বৎসরের এই মুখ্য সময়টি আইস আমরা তাঁহার পূজার উৎসর্গ করিয়া সম্বৎসরের সমস্ত শুভ কার্য্যের মূল প্রতিষ্ঠা করি।

হে পরমাত্মন্। অদ্য এই বৎসরের প্রথম দিবসে আমরা আমাদের হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তোমার মুখ-জ্যোতির প্রতীক্ষা করিতেছি তুমি আমাদিগকে দর্শন দেও। আজ আমরা নূতন বৎসরে প্রবেশ করিতেছি তোমার বিঘ্ন-বিনাশন আশ্রয় পাইলে কত না বল পাই—তোমার প্রেম-মুখ নিরীক্ষণ করিলে কত না প্রাণ পাই! নব সূর্য্য যেমন পৃথিবীর অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া পূর্ব্বদিকে আবির্ভূত হইয়াছে—তুমি সেইরূপ আমাদের মোহান্ধকার অপসারিত করিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তরে আবির্ভূত হও। হে নাথ! এই মঙ্গল দিবসে তুমি তোমার মঙ্গল জ্যোতি আমাদের মস্তকে বিকীর্ণ কর, আমরা তোমাকে প্রণাম করিয়া হৃদয়কে পবিত্র করি ও জীবনকে সার্থক করি। তুমি সাক্ষাৎ সত্য—আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছ—তুমি আমাদের জ্ঞানের জ্ঞান—আমাদের সকল গুরুর পরম গুরু—তোমাকে আমরা প্রণাম করি। তুমি সৌন্দর্য্যের সুবিমল আদর্শ,—যাহার পিপাসায় নরনারী হা হা করিতেছে—তুমিই তাহা স্বয়ং, তোমাকে আমরা প্রণাম করি; তুমি অপরাজিত মঙ্গল—তোমার মঙ্গল ইচ্ছা জীবের প্রাণ—মৃত্যুর সংহর্ত্তা, আত্মার মুক্তি-দাতা—তোমাকে আমরা প্রণাম করি। হে পরমাত্মন! তুমি আমাদের চিরকালের পিতা মাতা, চিরকালের বন্ধু, চিরকালের আশ্রয়; সকল কালেই যেন আমরা তোমাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, জগতের চক্ষু সূর্য্য যেন প্রতি দিন তোমাকে আমাদের চক্ষের সমক্ষে আনয়ন করে, জগতের প্রাণ সমীরণ যেন প্রতি হিল্লোলে তোমার প্রেম-সুধা আমাদের হৃদয়ে বণ্টন করে। রোগে শোকে আক্রান্ত হইলে আমরা যেন তোমার ক্রোড়ে শয়ন করিতে পাই—সংসারারণ্যে পথহারা হইলে যেন তোমার বিমল মুখ-জ্যোতির দর্শন পাই, দীপ্তশিরা হইলে যেন তোমার মঙ্গল ছায়াতে বিশ্রাম করিতে পাই,—তুমি আমাদের হৃদয়-মন্দিরের জাগ্রত দেবতা হইয়া বৎসর বৎসর আমাদিগকে তোমার মঙ্গল পথে রক্ষা কর—যেন মোহ-অন্ধকারে আবৃত হইয়া তোমা হইতে আমরা দূরে না পড়ি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের এই মনস্কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী বিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।

রজনী পোহাইল, চলেছে যাত্রীদল
আকাশ পূরিল কলরবে,
সবাই যেতেছে মহোৎসবে।
কুসুম ফুটেছে বনে, গাহিছে পাখীগণে,
এমন প্রভাত কি আর হবে!
নিদ্রা আর নাই চোখে, বিমল অরুণালোকে
জাগিয়া উঠেছে আজি সবে।
চল গো পিতার ঘরে সারাবৎসরের তরে
প্রসাদ-অমৃত ভিক্ষা লবে।
ওই হের তাঁর দ্বার, জগতের পরিবার
হোথায় মিলেছে আজি সবে।
ভাই বন্ধু সবে মিলি, করিতেছে কোলাকুলি
মাতিয়াছে প্রেমের উৎসবে।
যত চায় তত পায়, হৃদয় পূরিয়া যায়
গৃহে ফিরে জয় জয় রবে,

সবার মিটেছে সাধ, লভিয়াছে আশীর্ব্বাদ
সম্বৎসর আনন্দে কাটিবে।

রাগিনী মিশ্র —তাল ঝাঁপতাল।

এ কি সুগন্ধ-হিল্লোল বহিল
আজি প্রভাতে, জগত মাতিল তায়।
হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি
পাগল প্রায়!
বরণ বরণ পুষ্প রাজি, হৃদয় খুলিয়াছে আজি, সেই সুরভি-সুধা করিছে পান, পূরিয়া প্রাণ, সে সুধা করিছে দান, সে সুধা অনিলে উথলি যায়।

রাগিনী টোড়ি—তাল ঝাঁপতাল।

আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্ব্বাদ
প্রভাত কিরণে।
পবিত্র কর-পরশ পেয়ে ধরণী লুটিছে
তাঁহারি চরণে।
আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা
কুসুম ফোটাইছে শত বরণে।
আশা উল্লাসে চরাচর হাসে
কি ভয় কি ভয় দুখ তাপ মরণে।

রাগিনী আশা ভৈরবী—তাল ঠুংরি

বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্দ্ধমুখে নরনারী।
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ,
না থাকে শোক পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্,
বিঘ্ন দাও অপসারি।
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান অভিমান!
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে
জয় জয় হোক্ তোমারি।

ঈশ্বর চিন্ত্য এবং অচিন্ত্য।

পূর্ব্বকালে বিদেহপতি রাজর্ষি জনক বহু-দক্ষিণ নামক একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই মহাযজ্ঞে কুরু ও পাঞ্চাল দেশ হইতে অনেকানেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া আইসেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বহু তর্ক ও বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। এই অবসরে উষস্তশ্চাক্রায়ণ নামক একজন ঋষি তেজস্বী যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্ন করেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য! যেমন এই অশ্ব, এই গো, বলিয়া প্রত্যক্ষ গো-অশ্বকে জানা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া উপদেশ কর। ইহার উত্তরে সেই প্রশান্ত যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিলেন যে—'ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ' দৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা তাঁহাকে দর্শন করা যায় না। 'ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াৎ' শ্রুতির যিনি শ্রোতা তাঁহাকে শুনা যায় না। 'ন মতের্ম্মন্তারং মন্বীথা' মনের যিনি মননকর্ত্তা তাঁহাকে মনন করা যায় না। 'ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ' বিজ্ঞানের যিনি বিজ্ঞাতা তাঁহাকে জানা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য ঈশ্বরকে প্রথমে এইরূপে দুর্দ্দর্শ ও দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন 'এষত আত্মা সর্ব্বান্তরোহতোহন্যদার্ত্তং' এই তোমার আত্মার আত্মা সকলের অন্তরে গূঢ়-রূপে রহিয়াছেন; তাঁহা ছাড়া আর সকলেই শোক-দুঃখে প্রপীড়িত।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর অতি সরল ও স্বাভাবিক। সর্ব্বান্তর ব্রহ্ম আমারদের চক্ষু-কর্ণের, বাক্য-মনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই অগম্য হউন, আমাদের ধ্যান ও চিন্তার অতল প্রদেশে যতই লুক্কায়িত থাকুন, আমরা যদি তাঁহাকে সহজ জ্ঞানে সহজ চিন্তায় না পাইতাম, আমারদের জন্মদাতা পিতার ন্যায় সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করিতাম তবে কি আমার-

দের এই মনুষ্য-জীবন ধারণ করা সহজ হইত? অসুখ অশান্তির গভীর গাঢ় বিষাদে কোথায় ডুবিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস-বিহীন হইয়া মরিয়া রহিতাম। কিন্তু ধন্য। যে সেই প্রাণের প্রাণ আপনি আপনাকে দান করিয়া আমাদের সকল অভাব মোচন করিয়াছেন। সকল দানের অপেক্ষা এই তাঁহার প্রধান দান।

ঈশ্বর এই জগতের স্রষ্টা, তিনি সকলের মূলাধার, তিনি তাহার মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া বাস করিতেছেন এবং তাঁহার অনুপম জ্যোতি ও সৌন্দর্য্য এই বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক অণু পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই সত্যটি আমারদের প্রতিজনের মজ্জায় মজ্জায় এবং এই স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়ের বলেই আমরা তাঁহার অচিন্ত্য মহিমাকেও চিন্তাতে ধারণা করিতে পারি। একবার ঊর্দ্ধনেত্রে ঐ বিতত দ্যুলোকের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে তাঁহার মহিমার জ্বলন্ত চিহ্ন সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, এই পৃথিবীর উপরেই তাঁহার জ্ঞান শক্তির কত অগণ্য পরিচয় রহিয়াছে! মনুষ্য-সৃষ্টির আরম্ভ হইতে, মনুষ্য-হৃদয়ে জ্ঞান বুদ্ধির ও বিশ্বাসের উপক্রম হইতে, সকল দেশের সকল জাতীয় লোকই তাঁহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে। ঈশ্বর-জ্ঞান মনুষ্য-হৃদয়ে সহজ ও সরল। অতএব ঈশ্বর আপনিই আসিয়া আমারদের নিকট আপনাকে প্রকাশ করেন—আমারদের জ্ঞান চিন্তায় আবির্ভূত হন। উপনিষদে ঈশ্বরের তিনটি হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী বিশেষণ আছে—'আবিঃ' তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশমান। 'সন্নিহিতং' তিনি আমাদের অতি নিকটে সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। 'গুহাচরম্' তিনি আমারদের হৃদয়ের গুহার মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। এই গুলি সরল-বিশ্বাস-প্রণোদিত অতি সত্য কথা। ঈশ্বরকে যখন আমরা এই প্রকারে সাক্ষাৎ দর্শন করি, তাঁহার সর্ব্বত্র প্রকাশ উপলব্ধি করি, তখন তাঁহার মহান্ ভাব আমরা বুঝিতে পারি এবং সংসারকর্ত্তার সহিত সাংসারিক জীবের যে সম্বন্ধ তাহা স্থাপিত হয়। মনুষ্যের সহিত তাঁহার যতটুকু সম্পর্ক তাহা এই। তাই বলিয়া এই জগতের সঙ্গেই যে তাঁহার সকল সম্বন্ধ আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে। তিনি যেমন এই জগতের কারণ, জগতের পাতা, ধাতা বিধাতা; তেমনি তিনি আবার স্বতন্ত্র নিরবদ্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত এবং আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার বাহিরে যেমন এই এক জগৎ-রাজ্য, তেমনি তাঁহার অন্তরে তাঁহার নিজের সেই এক স্বতন্ত্র রাজ্য। এখানে যেমন তিনি এই জগতের মঙ্গল করিতেছেন সেখানে তেমনি তিনি নিজানন্দে আপনার মঙ্গল ভাবে পূর্ণ রহিয়াছেন। আমরা সৃষ্ট পরিমিত জীব, এবং পরিমিত ভাবেই আমারদের সকল প্রকার চিন্তার অবসান! তবে তাঁহার সেই অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ মঙ্গলকে আমরা কি প্রকারে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি? চিন্তা-স্রোতে ভাসিয়া কি প্রকারে তাহার পারে যাইতে পারি? সেখানে তিনি আমাদের অচিন্ত্য—সেখানে তিনি আমাদিগের নিকট হইতে আপনাকে লুকাইয়া রাখেন। তাঁহার সেখানকার অনন্ত ভাব আমরা কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারি না। 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনঃ'। সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন যায় না। কিন্তু এখানে তিনি আমারদিগের সর্ব্বস্ব। এখানে, 'সনোবন্ধুর্জ্জনিতা সবিধাতা'—তিনি আমারদের বন্ধু, পিতা এবং বিধাতা। আমরা জগৎপিতার শিশু সন্তান। আমরা তাঁহাকে পিতা মাতা বন্ধু বলিয়া জানি। এবং আমাদের সকল অবস্থাতে

তাঁহাকে সঙ্গের সঙ্গীরূপে অনুভব করিয়া চরিতার্থ হই। অতএব ঈশ্বরকে যেমন আমরা দীপ্যমান্ পিতা মাতা বলিয়া জানি, তেমনি আবার তাঁহার দেশ-কালাতীত গূঢ় গভীর ভাব আমরা জানি না—সেখানে তিনি আমাদের অগম্য অপার। তিনি যেমন আমারদের নিকট, তেমনি দূরে। তিনি যেমন আমারদের চিন্ত্য, তেমনি অচিন্ত্য। তিনি যে আমারদের অচিন্ত্য, তাহা আমারদের এই মনুষ্য-জীবনের অধিকার ছাড়াইয়া। আর তাঁহাকে যে আমরা জানি, তিনি যে আমারদের নিকটে এবং আমারদের চিন্ত্য তাহা এই আমারদের মনুষ্য-জীবনের অধিকারের মধ্যে। পরে আমরা এই পৃথিবী লোক হইতে উঠিয়া যত দেবলোক হইতে দেবলোকে যাইতে থাকিব, তত আমারদের জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবের আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে; ততই আমরা অধিক পরিমাণে তাঁহার জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবের পরিচয় পাইতে থাকিব। কিন্তু কখনো তাঁহার অনন্ত স্বরূপ জানার শেষ হইবে না। অনন্তই অনন্তকে জানেন। 'স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা' তিনি সকল বেদ্য বস্তুকে জানেন কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই। 'সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।'

স্থান-মান*।

ভূমিকা।

ইউক্লিডের জ্যামিতি কেবল যে, আমাদিগকে সত্য শিক্ষা দেয় তাহা নহে, কিন্তু সত্যকে কিরূপে উপার্জ্জন করিতে হয় তাহার পথ প্রদর্শন করে; শেষোক্ত প্রকার কার্য্যই প্রকৃত গুরুর কার্য্য। যিনি ধন দান করেন, তাঁহা-অপেক্ষা, যিনি ধনোপার্জ্জনের ক্ষমতা দান করেন তিনি বেশী কৃতজ্ঞতার পাত্র; তেমনি, যিনি জ্ঞান দান করেন, তাঁহা অপেক্ষা, যিনি জ্ঞানোপার্জ্জনের ক্ষমতা দান করেন তিনি আমাদের পূজ্যতর গুরু—ইউক্লিড্‌কে আমরা সেই রূপ গুরু বলিয়া মান্য করি। কোন কোন গুরু চাহেন যে, শিষ্য সত্যের প্রতি যত না শ্রদ্ধা অর্পণ করুক্—তাঁহার নিজের প্রতি তাহা অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধা অর্পণ করিবে; কোন কোন গুরু চাহেন যে, শিষ্য তাঁহার প্রতি যতই কেন শ্রদ্ধা সমর্পণ করুক্ না—সত্যের প্রতি তাহা অপেক্ষাও অধিকতর শ্রদ্ধা সমর্পণ করিবে;—ইউক্লিড্ শেষোক্ত শ্রেণীর গুরু। ইউক্লিডের শিক্ষার ফলেই আমরা সত্যকে পূজ্যতম গুরু বলিয়া মান্য করি;—ইউক্লিড্‌কে আমরা অনেকের অপেক্ষা পূজ্যতর গুরু বলিয়া মান্য করি, আর, ইউক্লিড্ এবং আর আর সমস্ত গুরু অপেক্ষা সত্যকে আমরা পূজ্যতম গুরু বলিয়া মান্য করি। অতএব সত্যের অনুরোধে আমরা যদি* চির-প্রচলিত ইউক্লিডের প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হই, তবে কেহ যেন এরূপ না বোঝেন যে, ইউক্লিডের প্রতি আমাদের ভক্তির কিছু ন্যূনতা আছে;—পিতৃ-পুরুষের কীর্ত্তি-স্তম্ভের কোন স্থান কিছু কম-মজবুত থাকিলে সন্তান-সন্ততিরা যদি তাহা শোধরাইবার চেষ্টা করে, তবে লোকে তাঁহাদের ভক্তিমত্তারই প্রশংসা করিয়া থাকে—উল্টা ভাবিয়া কেহ তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করে না। অতএব আমরা ইউক্লিডের গ্রন্থের গোটা কত দোষ সংশোধন করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলে লোকে আমাদের প্রতি আর আর

---

* ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশ হইবে না। কিন্তু স্থান-মান প্রস্তাবটী প্রকাশ হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমরা আপাতত ভারতীতে যতটুকু প্রকাশ হইয়াছিল তাহা এই স্থলে গ্রহণ করিলাম।

নানা প্রকার দোষ আরোপ করিতে পারেন—অক্ষমতা-দোষ আরোপ করিতে পারেন—বৃথা-চেষ্টার দোষ আরোপ করিতে পারেন—(অবশ্য তাহা করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান প্রস্তাবের আদ্যন্ত সমস্ত পাঠ করা চাই) কিন্তু গুরু-ভক্তির ন্যূনতা-দোষে আমাদিগকে কোন প্রকারেই দোষী করিতে পারেন না।

ইউক্লিড্ শুদ্ধ কেবল শূন্য আকাশ-খণ্ডকেই আপনার আলোচনা-ক্ষেত্রে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু আমরা শূন্য আকাশ-খণ্ডের অধিষ্ঠাতা দৃঢ়-বস্তুকেও সঙ্গে সঙ্গে ধরিব;—আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, তাহা না করিলে, ইউক্লিডের গ্রন্থের কতকগুলি গোড়ার দোষ—যাহা অনেকবার অনেকের চক্ষে পড়িয়াছে—তাহার সংশোধনের পথ পাওয়া যায় না। যদি দৃঢ়-বস্তুর বিনা-সাহায্যে সে দোষ-গুলির সংশোধনের পথ কেহ আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারেন, তবে আমরা অনঙ্কুচিত চিত্তে সেই পথের অনুগামী হইব,—নচেৎ তিনি সহস্র মহোপাধ্যায় ব্যক্তি হইলেও তাঁহার বারণ আমরা শুনিব না—কেন না আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; যুক্তির বলে কেহ যদি আমাদিগকে ফিরাইতে পারেন তবে আমরা আহ্লাদের সহিত ফিরিব; নচেৎ কেবল যদি নামের বলে, বা চিরন্তন প্রথার বলে, বা পদ-গৌরবের বলে, বা উপহাসের বলে, কেহ আমাদিগকে ফিরাইতে চেষ্টা করেন, তবে সে বিষয়ে ক্ষান্ত হওয়াই তাঁহার পক্ষে ভাল। পরীক্ষা দ্বারা আমরা দেখিতেছি যে, এক বিষয়ে একজন অসাধারণ পারদর্শী হইতে পারেন অথচ আর এক বিষয়ে তিনি বালক অপেক্ষাও অনভিজ্ঞ। আমাদের দেশে বিদ্বজ্জনের সংখ্যা যে কিছু অল্প, তাহা নহে,—কিন্তু হইলে হইবে কি—তাঁহাদের নিজের চক্ষু তাঁহাদের নিজের নহে—ইংরাজী গ্রন্থকারের লেখনীই তাঁহাদের একমাত্র জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা;—ইংরাজী পুস্তকের বাঁধা রাস্তার একটু এদিক্ ওদিকে যাইতে হইলেই তাঁহাদের বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজী কোন গ্রন্থকার আমাদের এ-পথের পথিক হ'ন নাই, দৃঢ় বস্তুকে জ্যামিতির মধ্যে স্থান দিবার আবশ্যকতা তাঁহাদের কাহারো হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, নচেৎ তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে দুই একটি বচন উদ্ধৃত করিতে পারিলেই আমি নিরপরাধে নিষ্কৃতি পাইতে পারিতাম।

অনেক উরোপীয় গ্রন্থকার ইউক্লিডের দোষ ধরিয়াছেন—কিন্তু তাহার সংশোধনে কেহই কৃতকার্য্য হয়েন নাই; এবিষয়ে সুবিখ্যাত লার্ডনর কিরূপ বলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আপাততঃ ক্ষান্ত হওয়া যাইতেছে;—

"The theory of parallel lines has always been considered as the reproach of Geometry. The beautiful chain of reasoning by which the truths of this science are connected here wants a link, and we are reluctantly compelled to assume as an axiom what ought to be matter of demonstration. The most eminent geometers, ancient and modern, have attempted without success to remove this defect; and after the labours of the learned for 2000 years have failed to improve or supercede it, Euclid's theory of parallels maintains its superiority."

যদি দৃঢ়-বস্তুর অবতারণা জ্যামিতি-ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হয় তবে লার্ডনরের এ-কথাটি চিরকালই অকাট্য থাকিবে; কিন্তু আমরা সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করিব যে, ইউক্লিড্ নিজেই তাঁহার জ্যামিতিতে প্রকারান্তরে দৃঢ়-বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন—সুতরাং কেহ যে, বলিবেন যে, দৃঢ়-বস্তুর অবতারণা জ্যামিতিক্ষেত্রে নিষিদ্ধ, তাহার জো নাই। দৃঢ়-বস্তুর

অবতারণা-গুণে আমরা লার্ডনরের প্রদর্শিত ইউক্লিডের ঐ দোষটি সমূলে উন্মূলন করিতে সমর্থ হইয়াছি—ইহা পাঠকের নিকট অবিলম্বে জলের ন্যায় স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

স্থান-মান শব্দের অর্থ—স্থানের পরিমাণ কার্য্য। স্থান কি? না আকাশ-খণ্ড। আকাশ বলিতে দুই রূপ বুঝায়,—এক বুঝায় অসীম আকাশ যাহার পরিমাণ সম্ভবে না—ইহাকে বলে মহাকাশ, আর বুঝায় সীমাবদ্ধ আকাশ যাহার পরিমাণ সম্ভবে—ইহাকে বলে খণ্ডাকাশ বা আকাশ-খণ্ড। মহাকাশ অপরিমিত এবং নিরাকার, খণ্ডাকাশ পরিমিত এবং সাকার। মহাকাশ নিরাকার—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; কিন্তু খণ্ড-আকাশ সাকার—এ কথা পুঁথিতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না,—এ জন্য এ কথাটির সমুদায় মর্ম্ম সুস্পষ্ট রূপে খুলিয়া বলা আবশ্যক।

ক, গ, চ, খ, ঘ

মনে কর একটি ঋজু লৌহ-শলাকা, কখ, কখ-স্থান (অর্থাৎ কখ-আকাশ-খণ্ড) অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; ঐ ঋজু-শলাকাটিকে বাঁকাইয়া যদি তাহাকে গ-চ-ঘ-রূপী বক্র শলাকায় পরিণত করা যায়, তাহা হইলে তাহার আয়তন কমেও না, বাড়েও না, কেবল তাহার-আকার-পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। সুতরাং গচঘ-রূপী বক্র-স্থানটিও যতখানি আয়ত, কখ-রূপী ঋজু-স্থানটিও ঠিক্ ততখানি আয়ত, এ বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না; এখন জিজ্ঞাসা করি যে, কখ-স্থানের (বা কখ-আকাশ-খণ্ডের) আয়তন যেমন গচঘ-স্থানের আয়তনের সহিত সমান—উভয়ের আকারও কি তেমনি সমান? কখনই না;—কখ-শলাকার আকার যেমন ঋজু, তাহার অধিকৃত কখ-স্থানও তেমনি ঋজু, এবং গচঘ-শলাকা যেমন বক্র—তাহার অধিকৃত গচঘ-স্থানও তেমনি বক্র; অতএব কখ এবং গচঘ এ দুই স্থান যদিও সমায়ত বা সমদীর্ঘ, তথাপি উভয়ে সমাকৃতি বলিয়া উক্ত হইতে পারে না। যদি কখ স্থান ঋজু-আকার পরিত্যাগ করিয়া গচঘ-স্থানের অনুরূপ বক্র আকার ধারণ করিতে পারিত, তবে গচঘ-রূপী বক্র বস্তুও কখ-স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইত; কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কোথায়? ঋজু স্থান তো আর বেত্রযষ্টি নহে যে, তাহাকে বল-পূর্ব্বক নোয়াইয়া বক্র করা যাইবে; গোলাকৃতি স্থান তো আর ময়দা নহে যে, তাহাকে পিশিয়া চিপীটাকৃতি (চ্যাপ্টা) করা যাইবে, ষট্-কোণাকৃতি স্থান তো আর স্বর্ণ-রৌপ্য নহে যে, তাহাকে গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া চতুষ্কোণাকৃতি করা যাইবে; অতএব ইহা একটি অকাট্য সিদ্ধান্ত যে, আকাশ-খণ্ড-মাত্রেরই যেমন নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ আয়তন আছে, তেমনি তাহার নির্দ্দিষ্ট-প্রকার আকৃতি আছে,—সে আয়তনেরও পরিবর্ত্তন সম্ভবে না—সে আকৃতিরও পরিবর্ত্তন সম্ভবে না।

আকাশ-খণ্ডের আকার এবং আয়তন উভয়ই অপরিবর্ত্তনীয়—এ বিষয়ে এখন-আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না। এখন বক্তব্য এই যে, স্থান (অর্থাৎ শূন্য আকাশ-খণ্ড) মাপিতে হইলেই স্থুল বস্তুর সাহায্য আবশ্যক হয়;—শূন্য স্থান দিয়া কিছু-আর শূন্য স্থান মাপা যাইতে পারে না—স্থুল-বস্তু দ্বারাই শূন্য স্থানের পরিমাণ-কার্য্য সম্ভবে;

এক-গজ-পরিমাণ স্থান মাপিতে হইলে—এক গজ-পরিমাণ মান-দণ্ড দ্বারা সেই শূন্য স্থান-টিকে পূরণ করিতে হয়;—গ্রহাদির পরিধির আয়তন নিরূপণ করিতে হইলেও স্থূল যন্ত্রাদির সাহায্য আবশ্যক হয়। এজন্য স্থান-মানের আলোচনা-ক্ষেত্রে, শূন্য-স্থানের যেমন প্রবেশাধিকার আছে, বস্তুরও তেমনি প্রবেশাধিকার আছে,—বস্তুই শূন্য-স্থানের পূরণকর্ত্তা—বস্তুই শূন্য-স্থানের পরিমাপক।

বস্তু-শব্দের উৎপত্তি বস-ধাতু হইতে,—সে ধাতুর অর্থ—বাস করা; বাস করা বলিলেই বুঝায় কোন-না-কোন স্থানে বাস করা;—স্থান কি? না পরিমিত আকাশ-খণ্ড; এতদনুসারে পাওয়া যাইতেছে যে, যাহা পরিমিত আকাশ-খণ্ডের অধিবাসী তাহাই বস্তু-শব্দের বাচ্য।

'বাহ্য-বস্তুই তবে বস্তু—আত্মা তবে বস্তু নহে? ইহার উত্তর এই যে আত্মা এক হিসাবে শরীরে বাস করে, আর এক হিসাবে আকাশের অতীত; যে হিসাবে আত্মা শরীরে বাস করে, সেই হিসাবে আত্মা বস্তু-শব্দের বাচ্য, আর, যে হিসাবে আত্মা আকাশের অতীত সে হিসাবে আত্মা পুরুষ শব্দের বাচ্য। দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান প্রস্তাবের অধিকার-বহির্ভূত এজন্য তাহাতে ক্ষান্ত হওয়াই বিধেয়। আমরা যে অর্থে বস্তু-শব্দ ব্যবহার করিব—তাহা বলিলাম,—যাহা পরিমিত আকাশ-খণ্ডের অধিবাসী তাহাই বস্তু,—বস্তু-শব্দের আর কোন অর্থ থাকে থাকুক্—না থাকে না থাকুক্—আমাদের এখানকার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

নানা বস্তুর নানা লক্ষণ—তাহার মধ্যে যে-লক্ষণ-গুলি স্থান-মানের উপযোগী তাহাই এখানকার আলোচনা-ক্ষেত্রে স্থান পাইতে পারে;—সে-গুলিকে আধিষ্ঠানিক লক্ষণ (geometrical properties) বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাউক্;—আধিষ্ঠানিক শব্দের অর্থ কি? মনুষ্যের আধ্যাত্মিক লক্ষণ বলিতে যেমন তাহার আত্মা-সম্বন্ধীয় লক্ষণ বুঝায়, মনুষ্যের আধিভৌতিক লক্ষণ বলিতে যেমন তাহার শরীর-সম্বন্ধীয় লক্ষণ বুঝায়, তেমনি—বস্তুর আধিষ্ঠানিক লক্ষণ বলিতে তাহার স্থান-সম্বন্ধীয় লক্ষণ বুঝায়—অন্য কোন প্রকার লক্ষণ বুঝায় না।

এখন জিজ্ঞাসা এই যে আধিষ্ঠানিক লক্ষণের নিদর্শন কি? অর্থাৎ কোন বস্তুর কোন-একটি লক্ষণ দেখিলে তাহা আধিষ্ঠানিক কি আধিষ্ঠানিক নহে ইহা স্থির করিবার সহজ উপায় কি? তাহার সহজ উপায় এইটির প্রতি দৃষ্টি করা,—যে কোন বস্তুর যে যে লক্ষণ এরূপ যে, সেই সেই লক্ষণ যেমন সেই বস্তুতে আরোপিত হইতে পারে তেমনি সেই বস্তুর অধিকৃত স্থানেতেও আরোপিত হইতে পারে, সেই বস্তুর সেই-সেই লক্ষণই আধিষ্ঠানিক শব্দের বাচ্য। মনে কর একটা মান-দণ্ড (কাপড় মাপিবার গজ) লৌহ-নির্ম্মিত, তাহা হইলে সেই মান-দণ্ডের গুরুত্ব-লক্ষণ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ লক্ষণ সেই মান-দণ্ডেতেই আরোপিত হইতে পারে—তাহার অধিকৃত স্থানে (অর্থাৎ আকাশ-খণ্ডে) আরোপিত হইতে পারে না;—কেন না উক্ত মান-দণ্ড নিজেই ভারি—নিজেই কৃষ্ণবর্ণ,—তাহার অধিকৃত স্থান—যাহা আকাশ-খণ্ড বই নয়—তাহা ভারিও নহে কৃষ্ণবর্ণও নহে; কিন্তু আর একদিকে দেখা যায় যে, মান-দণ্ড নিজে যেমন এক-গজ-পরিমাণ দীর্ঘ, তাহার অধিকৃত স্থানও সেইরূপ এক-গজ-পরিমাণ দীর্ঘ, তাহা নিজে যেমন অবক্র তাহার অধিকৃত স্থানও সেইরূপ অবক্র, এজন্য একগজ-পরিমাণ দৈর্ঘ্য ও অবক্র আকৃতি দুইই উক্ত মান-দণ্ডের আধিষ্ঠানিক

লক্ষণ বলিয়া অবধার্য্য হইতে পারে; কিন্তু তাহার কৃষ্ণবর্ণ লক্ষণ বা গুরুত্ব লক্ষণ কোন প্রকারেই আধিষ্ঠানিক-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। সাধারণতঃ বস্তু-মাত্রেরই আকার এবং আয়তন উভয়ই আধিষ্ঠানিক শব্দের বাচ্য।

এখন মনে কর, ঐ মান-দণ্ডটিকে গলাইয়া একটা গোলা নির্ম্মাণ করা হইল; তাহা হইলে হয় এই যে, পূর্ব্বে তাহার আধিষ্ঠানিক লক্ষণ ছিল—লম্বাকৃতি, তাহার পরিবর্ত্তে এক্ষণে তাহার আধিষ্ঠানিক লক্ষণ হইল—গোলাকৃতি; এইরূপ বস্তু-বিশেষের এক-সময়কার আধিষ্ঠানিক লক্ষণ সময়ান্তরে পরিবর্ত্তিত হইলেও হইতে পারে। যদি কোন মান-দণ্ডের আধিষ্ঠানিক লক্ষণ ঐরূপ সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে তদ্দ্বারা সহজে স্থান-মাপা কার্য্য চলিতে পারে না; শীত-কালে যে লৌহদণ্ড এক গজ পরিমাণ দীর্ঘ থাকে, গ্রীষ্ম-কালে তাহার আয়তন কিছু না কিছু বর্দ্ধিত হয়-ই-হয়, এজন্য কাষ্ঠ নির্ম্মিত মান-দণ্ড যেমন কার্য্যোপযোগী—লৌহ নির্ম্মিত মান-দণ্ড সেরূপ হইতে পারে না। যে বস্তুর আধিষ্ঠানিক লক্ষণের পরিবর্ত্তন যত দুর্ঘট—সেই বস্তু পরিমাণ-কার্য্যের তত উপযোগী; এবং সেই বস্তু তত দৃঢ় শব্দের বাচ্য। যদি এরূপ কোন বস্তু পাওয়া যায় যে, তাহার কোন আধিষ্ঠানিক লক্ষণেরই পরিবর্ত্তন সম্ভবে না—তাহার আকার এবং আয়তন দুই-ই অপরিবর্ত্তনীয়, তবে তাহাই পরাকাষ্ঠা দৃঢ়বস্তু ও সেইরূপ দৃঢ়বস্তুই পরিমাণ-কার্য্যের পরাকাষ্ঠা উপযোগী। এখানে দৃঢ়-বস্তু বলিতে ঐরূপ পরাকাষ্ঠা দৃঢ়-বস্তু বুঝিতে হইবে—যাহার কোন আধিষ্ঠানিক লক্ষণেরই পরিবর্ত্তন সম্ভবে না তাহাই এখানে দৃঢ়-বস্তু-শব্দের বাচ্য। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, ওরূপ দৃঢ়বস্তু পাওয়া যায় কই? বাহিরে কোথাও পাওয়া যায় না ইহা আমি স্বীকার করি,—কিন্তু মনোরাজ্যে তো পাওয়া যায়? তাহাই এখানকার পক্ষে যথেষ্ট। যদিও একটা লৌহ-দণ্ডের আকার পরিবর্ত্তন করিলেই করা যাইতে পারে তথাপি তাহাকে আমরা দৃঢ়বস্তু বলিয়া কল্পনা করিতে কিছু মাত্র বাধা অনুভব করি না,—মনে করিলেই হইল যে, কোন প্রকারেই তাহার আকার পরিবর্ত্তন সম্ভবে না;—এরূপ মনঃকল্পনা এখানকার পক্ষে অবৈধ হওয়া দূরে থাকুক—এখানকার কার্য্যই ঐ; সংজ্ঞিত-বিষয়কে সংজ্ঞা-অনুসারে কল্পনা করিয়া তাহাকে মনশ্চক্ষে দেখাই এখানকার একমাত্র কার্য্য—তাহাকে চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতে চাওয়া বাড়া'র ভাগ;—তবে সংজ্ঞিত বিষয় যদি এরূপ হয় যে, তাহা মনশ্চক্ষেরও অগোচর, তাহা হইলেই তাহা দোষের হয়;—এই একটি সংজ্ঞা ধর—"যে চতুষ্কোণ বস্তু গোলাকার তাহা গোল চতুষ্কোণ বলিয়া উক্ত হয়" এ সংজ্ঞার লক্ষ্য বিষয় শুধু যে বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায় না—তাহা নহে—তাহা মনশ্চক্ষেরও অগোচর, এই জন্যই এ সংজ্ঞা সংজ্ঞাই নহে; আর একটি সংজ্ঞা ধর—"যাহার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ নাই তাহাই রেখা বলিয়া উক্ত হয়" এ সংজ্ঞাটিও তদ্বৎ; গোল চতুষ্কোণ যেমন কল্পনার অতীত—প্রস্থ-বিহীন দৈর্ঘ্য ও তেমনি কল্পনার অতীত,—দৈর্ঘ্য কল্পনা করিতে গেলেই তাহার সঙ্গে একটু-না-একটু প্রস্থ কল্পনা করা চাই-ই-চাই; তবে এখানে এই একটি কথা বলিবার আছে যে, দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থকে যত দূর ইচ্ছা কম মনে করা যাইতে পারে—এত কম মনে করা যাইতে পারে যে, দৈর্ঘ্য যেখানে শত-ক্রোশ পরিমাণ—প্রস্থ' সেখানে এক তিলের কোটি অংশের এক অংশ-ও নয়; অতএব "প্রস্থ নাই" এ কথার অর্থ যদি এরূপ

করা যায় যে, প্রস্থ যথেষ্ট অল্প, তাহা হইলে উক্ত রেখা-সংজ্ঞা অসঙ্গতি-দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারে;—মানিলাম যে, প্রস্থ-বিহীন রেখা-সংজ্ঞার বাক্যাবরণ ভেদ করিলে তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম মনশ্চক্ষের গোচর হইতে পারে; কিন্তু কিরূপে? প্রথমে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের পরিমাপক দুইটী ঋজুরেখা মনশ্চক্ষে উপস্থিত করিলে পর, তবে ত মনে করিব যে, প্রস্থের পরিমাপক ঋজু-রেখাটি যথেষ্ট পরিমাণে অল্প; কিন্তু রেখা কাহাকে বলে তাহা যখন আমরা বুঝিতে চাহিতেছি, তখন ঋজু-রেখা কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে এখনো বিলম্ব আছে, এ অবস্থায় দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাপক দুইটি ঋজু-রেখা আনিয়া উপস্থিত করিলে এক দোষ এড়াইতে গিয়া তাহারই ন্যায় গুরুতর আর-এক দোষে লিপ্ত হইতে হয়, অসঙ্গতি-দোষ এড়াইতে গিয়া অনবস্থা-দোষের কবলে প্রবিষ্ট হইতে হয়,—ইংরাজী প্রবাদ-অনুসারে রোগ-অপেক্ষা ঔষধ অধম হইয়া উঠে; কেন না, রেখা কাহাকে বলে তাহা আমাকে বুঝিতে হইলে অগ্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থের পরিমাপক ঋজু-রেখা কাহাকে বলে তাহা আমাকে বুঝিতে হইবে, এদিকে ঋজু-রেখা কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইলে রেখা কাহাকে বলে তাহা অগ্রে না বুঝিলে চলে না; এখন অগ্রে কি বুঝিব? অগ্রে রেখা বুঝিব না অগ্রে ঋজু রেখা বুঝিব? এই ভাবিয়াই সারা হইতে হয়—রেখা-ও বোঝা হয় না, ঋজু-রেখাও বোঝা হয় না। দৃঢ়বস্তুও বহির্জ্জগতে নাই—প্রস্থবিহীন রেখা-ও বহির্জ্জগতে নাই,—সে বিষয়ে উভয়েই সমান,—সে জন্য উভয়ের কাহাকেও দোষ দিই না; প্রস্থ-বিহীন রেখা-সংজ্ঞার দোষ এই যে, তাহা শুধু যে বহির্জ্জগতে পাওয়া যায় না তাহা নহে, সেরূপ রেখা মনে কল্পনা করাও মনুষ্যের সাধ্যাতীত; পরাকাষ্ঠা দৃঢ়বস্তু বহির্জ্জগতে কোথাও পাওয়া যায় না বটে কিন্তু তাহা অনায়াসে কল্পনা করিতে পারা যায়। পরাকাষ্ঠা দৃঢ়বস্তুর যেমন আকার পরিবর্ত্তন সম্ভবে না—শূন্য আকাশ-খণ্ডেরও সেইরূপ আকার পরিবর্ত্তন সম্ভবে না;—শূন্য আকাশ খণ্ড ভাবিবার বেলা ইহা তো ভাবিতেই হয় যে, তাহার আকার অপরিবর্ত্তনীয়; যে আকাশ-খণ্ড একটা গোলা-দ্বারা একবার অধিকৃত হয়, সে আকাশ-খণ্ড কোন কালেই গোলেতর বস্তু-দ্বারা অধিকৃত হইতে পারে না, সে আকাশ-খণ্ড চিরকালই গোলাকৃতি আছে এবং চিরকালই গোলাকৃতি থাকিবে—ইহা নিঃসংশয়; তবেই হইল যে, আকারের অপরিবর্ত্তনীয়তা আমাদের ভাবনার অতীত হওয়া দূরে থাকুক—স্থলবিশেষে (যেমন আকাশখণ্ডের বেলায়) সেরূপ ভাবনা নিবারণ করাই আমাদের সাধ্যাতীত; কিন্তু দৈর্ঘ্য-বিহীন প্রস্থ বা প্রস্থ-বিহীন দৈর্ঘ্য প্রকৃত পক্ষেই ধ্যানের অগোচর। শীত-প্রধান দেশে শীতের আতিশয্যে কখন কখন পুষ্করিণীর জল জমিয়া তুষার হইয়া যায়,-মনে কর সেইরূপ ঘটিয়াছে; তাহা হইলে সেই তুষার-খণ্ডের উপরি-ভাগ ত সমতল বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? কিন্তু ধরিতে গেলে—পৃথিবী গোলাকার বলিয়া উক্ত তুষার-তলও অল্প-পরিমাণে বক্র,—নিখুঁত সমতল হয় তো জগতের কোন স্থানেই নাই,—থাকিলেও তাহা যে, কোন অংশেই বক্র নহে তাহা প্রমাণ করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে;—সে জন্য সমতলের সংজ্ঞা এক-বিন্দুও দোষের ভাগী হইতে পারে না। উপরি-উক্ত তুষার তল ঠিক্ সমতল না হইলেও তাহাকে যেমন আমরা সমতলের দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করি, অর্থাৎ মনশ্চক্ষে যেমন তাহাকে আমরা সমতল দেখি, তেমনি একটা লৌহ-দণ্ড পরাকাষ্ঠা

দৃঢ়বস্তু না হইলেও তাহাকে আমরা পরা-কাষ্ঠা দৃঢ়-বস্তুর দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তাহার যে কিছু আকার-পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা অগ্রাহ্য করিলেই হইল, মনে করিলেই হইল, যে মূলেই তাহার আকার পরিবর্ত্তন সম্ভবে না। প্রচলিত জ্যামিতিতেও—এই প্রণালী-অনুসারে যেমন-তেমন একটা কসি রেখার দৃষ্টান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

এখন বক্তব্য এই যে, বস্তুর মধ্যে কেবল দৃঢ়-বস্তুই এখানকার আলোচ্য বিষয়, এবং লক্ষণের মধ্যে কেবল আধিষ্ঠানিক লক্ষণই এখানকার আলোচ্য বিষয়;—আধিষ্ঠানিক লক্ষণ বলি কাহাকে? না—কোন একটি বস্তু এবং তাহার কোন একটি সময়ের অধিকৃত স্থান উভয়েই যে যে লক্ষণ বিশিষ্ট, উক্ত বস্তুর সেই সেই লক্ষণই আধিষ্ঠানিক শব্দের বাচ্য। দৃঢ় বস্তু বলি কাহাকে? না—যে বস্তুর এক সময়কার আধিষ্ঠানিক লক্ষণ সময়ান্তরে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না তাহাই দৃঢ়বস্তু শব্দের বাচ্য।

দৃঢ় বস্তুর কিরূপ লক্ষণ এখানকার আলোচ্য বিষয় তাহা ত স্থিরীকৃত হইল,—এখন তাহার কিরূপ কার্য্য এখানকার আলোচ্য বিষয় তাহা স্থির করা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি "স্থান-মান" শব্দের অর্থ স্থানের পরিমাণ-কার্য্য; তবেই হইতেছে যে, স্থান-মাপা যে রূপ ক্রিয়া-সাপেক্ষ—দৃঢ় বস্তুর সেই রূপ ক্রিয়াই এখানকার আলোচ্য; সেরূপ ক্রিয়াকে অন্যান্য প্রকার ক্রিয়া হইতে পৃথক্‌রূপে অবধারণ করিবার জন্য তাহার নাম দেওয়া যাইতেছে—অধিক্রিয়া, অর্থাৎ স্থান অধিকার করা—কি না শূন্য স্থান পূরণ করা।

স্থান মাপিতে হইলে দৃঢ়বস্তু দ্বারা শূন্য স্থান পূরণ করা আবশ্যক হয়-ই হয়। এজন্য দৃঢ়বস্তু এবং শূন্য স্থান উভয়-ই এখানে এক সঙ্গে আলোচ্য। নানা দৃঢ়-বস্তুর নানা লক্ষণ এবং নানা ক্রিয়া; সে সমস্ত লক্ষণের মধ্যে কেবল আধিষ্ঠানিক লক্ষণ (geometrical property,) এবং সে সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে কেবল অধিক্রিয়া (occupation of space) এখানকার আলোচ্য বিষয়; দৃঢ়বস্তুর অন্য কোন প্রকার লক্ষণ বা ক্রিয়ার সহিত এখানকার কোন সম্পর্ক নাই। অধি-ক্রিয়া তিনটি-অবয়বে বিভক্ত,—(১) স্থিতি, (২) সংস্থিতি (৩) প্রস্থিতি। স্থিতি কিরূপ? না কোন একটা দৃঢ়বস্তু যখন কোন একটি শূন্য স্থান পূরণ করে তখন সেই বস্তু সেই স্থানে স্থিত বলিয়া উক্ত হয়। সংস্থিতি কিরূপ? না একাধিক বস্তু এক-সঙ্গে মিলিয়া যখন একটি কোন স্থান পূরণ করে, তখন সেই একাধিক বস্তু সেই স্থানে সংস্থিত বলিয়া উক্ত হয়; ইহাতেই দাঁড়াইতেছে যে, একটি কোন বস্তু যেখানে স্থিতি করে সে বস্তুর সম্পূরক অংশাবলী (component parts) সেই স্থানে সংস্থিতি করে। প্রস্থিতি কিরূপ? না কোন একটি বস্তু একস্থান ছাড়িয়া যদি অন্য স্থান অধিকার করে তাহা হইলে তাহা পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে শেষোক্ত স্থানে প্রস্থিত বলিয়া উক্ত হয়।

কেহ বলিতে পারেন যে, স্থিতি, এই যে একটি লক্ষণ, ইহাও ত স্থান-ঘটিত, ইহাকে আধিষ্ঠানিক লক্ষণ না বলি কেন? ইহার উত্তর এই যে, কি প্রকার লক্ষণকে আমরা আধিষ্ঠানিক লক্ষণ বলি তাহা আমরা যার পর নাই স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি, যথা,—যে কোন বস্তুর লক্ষণ এরূপ যে, সে লক্ষণ যেমন সেই বস্তুতে আরোপিত হইতে পারে, তেমনি সেই বস্তুর অধিকৃত স্থানেতেও আরোপিত হইতে পারে, সেই লক্ষণই

আধিষ্ঠানিক শব্দের বাচ্য; আকার এবং আয়তন এ-দুটি লক্ষণ বস্তু এবং স্থান উভয়েতেই আরোপিত হইতে পারে, এই জন্যই উপরি-উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে ও-দুটি লক্ষণ আধিষ্ঠানিক শব্দের বাচ্য; কিন্তু স্থিতি-ক্রিয়া সেরূপ নহে—বস্তুই স্থানে স্থিতি করে—স্থান কিছু আর স্থানে স্থিতি করে না, সুতরাং স্থিতি কেবল বস্তুরই ধর্ম্ম—স্থানের ধর্ম্ম নহে, এজন্য উপরিউক্ত সংজ্ঞা-অনুসারে স্থিতি-ক্রিয়া আধিষ্ঠানিক লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইতে পারে না। যে বস্তু যে শূন্যস্থান পূরণ করে বা অধিকার করে, সেই বস্তু সেই স্থানে স্থিত বলিয়া উক্ত হয়;—স্থিতি-ক্রিয়া বস্তুরই ক্রিয়া—শূন্য-স্থানের ক্রিয়া নহে, শূন্য স্থান একেবারেই ক্রিয়া-বর্জ্জিত। এখানকার অধিক্রিয়ার কর্ত্তা-কারক হ'চ্চে দৃঢ়বস্তু এবং কর্ম্ম কারক হ'চ্চে শূন্য স্থান—দৃঢ় বস্তু শূন্য স্থানকে অধিকার করে। শূন্যস্থান কাহাকে বলে? না যে স্থানের কোন অংশই কোন বস্তুর কোন অংশ-দ্বারা অধিকৃত নহে। শূন্যস্থান বাস্তবিক কোথাও আছে কি না এ প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক; মনে কর, একস্থানের একটা পুস্তককে দূরে সরাইয়া রাখা গেল—তাহা হইলে সে স্থান তখন বায়ু-দ্বারা অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু সে অবস্থায় সে স্থানকে শূন্য স্থান বলিয়া কল্পনা করিতে কিছুমাত্র বাধা অনুভুত হয় না—তাহা হইলেই হইল;—কেন না মনঃকল্পিত দৃঢ়বস্তুই এখানকার দৃঢ়বস্তু, মনঃকল্পিত শূন্য স্থানই এখানকার শূন্য স্থান।

কর্ত্তা—দৃঢ়বস্তু
উপাদান—প্রস্থিতি
কর্ম্ম—শূন্যস্থান
ক্রিয়া—অধিক্রিয়া সম্বন্ধ—সংস্থিতি
কার্য্য—স্থানমান
অধিকরণ—স্থিতি

ব্যাকরণের সাতটি কারক ধরিয়া এখানকার আলোচ্য বিষয়ের সাতটি অবয়ব উপরে নির্দ্ধারিত হইল। করণ এবং সম্প্রদান এই দুই কারকের স্থলে ক্রিয়া এবং কার্য্য নূতন বসানো হইয়াছে;—ক্রিয়া দ্বারাই কার্য্য ফলিত হয়, এবং কার্য্যের জন্যই ক্রিয়া আরদ্ধ হয়,—এ জন্য ক্রিয়া করণ-কারকের উপযোগী, ও কার্য্য সম্প্রদান-কারকের উপযোগী। আর যাহা—তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে; যথা,—

অধিক্রিয়া তিন রূপ;—

(১) স্থান-বিশেষ হইতে প্রস্থিতি—

(২) স্থানের অংশাবলীতে একত্র সংস্থিতি—

(৩) এবং স্থানে স্থিতি—

এই তিনটি ক্রিয়া—উপাদন সম্বন্ধ এবং অধিকরণ—এই তিনটি কারককে অপেক্ষা করে। এখন বক্তব্য এই যে, স্থিতি প্রস্থিতি এবং সংস্থিতি, এই তিন প্রকার অধিক্রিয়া-দ্বারা দৃঢ়বস্তু কর্ত্তৃক শূন্য স্থানের পূরণ—স্থানমানের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। দৃঢ়বস্তুর স্থিতি দ্বারাই হউক, প্রস্থিতি দ্বারাই হউক, সংস্থিতি দ্বারাই হউক, কোন-না-কোন একটি প্রকরণ দ্বারা কোন-না-কোন স্থান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মাপা না থাকিলে—শুদ্ধ কেবল বিদ্যার বলে স্থান-মাপা অসম্ভব; যদি আর কোন স্থান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মাপিবার প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলেও নিদেনপক্ষে যন্ত্র-বিশেষের স্থান-বিশেষ দৃঢ়বস্তুদ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মাপা আবশ্যক হয়। বায়ুমান যন্ত্রের সাহায্যে পর্ব্বতের উচ্চতা'র পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা করিতে হইলে পারদের প্রস্থিতি-দ্বারা উক্ত যন্ত্রের নল-রন্ধ্র-স্থান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মাপা আবশ্যক হয়; পারদ দৃঢ়-বস্তু নহে বটে—কিন্তু তন্নিবন্ধন গণনাতে যে-কিছু দোষ ঘটে তাহা পরে

সংশোধন করিয়া লওয়া হয়—এবং সেই সংশোধনের প্রসাদাৎ—পারদ বাস্তবিক দৃঢ়-বস্তু না হইলেও ফলে তাহা দৃঢ়বস্তুই দাঁড়ায়। সূত্র যদিও দৃঢ়বস্তু নহে তথাপ তাহা-দ্বারা স্থান মাপিতে হইলে তাহাকে টানিয়া দৃঢ় করিয়া তোলা হয়; তরল বস্তু-দ্বারা স্থান মাপিতে হইলে, তাহাকে চোঙে পুরিয়া চাপিয়া-চুপিয়া দৃঢ় করিয়া তোলা হয়; অদৃঢ় বস্তু দ্বারা স্থান মাপিতে হইলে তাহাকে কৃত্রিম রূপে দৃঢ় করিয়া তোলা হয়—সুতরাং তখন তাহা দৃঢ়বস্তুরই সামিল। স্থিতি প্রস্থিতি এবং সংস্থিতি এই তিনটি প্রকরণ দ্বারা কিরূপে স্থানের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় তাহা অতঃপর প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ স্থিতি-দ্বারা আমরা স্থির করি-যে, এক দৃঢ়-বস্তু যেখানে ছিল আর-এক দৃঢ়বস্তু যদি ঠিক্ সেই স্থানে অবস্থিতি করে তবে সে-দুই দৃঢ়-বস্তুর আকার এবং আয়তন ঠিক সমান; মনে কর একটা তলোয়ার তাহার খাপের অভ্যন্তর-স্থান সম্পূর্ণ রূপে পূরণ করিয়া স্থিতি করিতেছে, তাহা হইলে সে তলোয়ারের পরিবর্ত্তে যদি আর একটা তলোয়ার সেই খাপের মধ্যে সেইরূপে স্থিতি করে, তবে দুই তলোয়ারেরই আকার এবং আয়তন সমান—এ বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ প্রস্থিতি দ্বারা আমরা স্থির করি যে, যে স্থানের যত গুলি সন্নিহিত অংশাবলী যে দৃঢ়বস্তু কর্ত্তৃক উত্তরোত্তর-ক্রমে অধিকৃত হয়, সেই স্থানটির আয়তন সেই দৃঢ়বস্তু অপেক্ষা তত গুণ বেশী। কাপড় মাপিবার একটি গজ সাত গজ কাপড়ের সাতটি উত্তরোত্তর-বর্ত্তী সন্নিহিত অংশ উত্তরোত্তর-ক্রমে অধিকার করিলে, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সেই কাপড়ের দৈর্ঘ্য এক গজ অপেক্ষা সাত গুণ বেশী।

তৃতীয়তঃ সংস্থিতি দ্বারা আমরা স্থির করি যে, কতকগুলি দৃঢ়বস্তু এক সঙ্গে মিলিয়া যদি কোন-একটি স্থান পূরণ করে, তবে সেই দৃঢ়বস্তুগুলির সমষ্টির আয়তন এবং স্থানটির আয়তন উভয়ই সমান।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, স্থিতি সংস্থিতি এবং প্রস্থিতি এই তিন রূপ প্রকরণ দ্বারা স্থান-মাপা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে; বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা তিনটি প্রকরণকেই সমান-দৃষ্টিতে দেখিব—এবং যেটি যে-স্থলের বিশেষ উপযোগী সেইটিকে সেই স্থলে খাটাইব। প্রচলিত জ্যামিতির সঙ্গে আমাদের সঙ্গে এই বিষয়ে মেলে না। প্রচলিত জ্যামিতিতে দৃঢ়বস্তুর প্রবেশ নিষেধ; সুতরাং সেখানে স্থিতি, প্রস্থিতি, সংস্থিতি, এরূপ কোন ক রই উত্থাপন হইতে পারে না,—কেননা দৃঢ়বস্তু যেমন স্থিতি প্রভৃতি ক্রিয়ার আশ্রয়, শূন্য-স্থান সেরূপ নহে। কিন্তু আর-এক দিকে দেখা যায় যে, দৃঢ়বস্তু দ্বারাই স্থান মাপা কার্য্য সম্ভবে, শূন্য স্থান-দ্বারা স্থান মাপা অসম্ভব; সুতরাং স্পষ্টতঃ যাঁহারা দৃঢ়বস্তুকে জ্যামিতির মধ্যে অধিকার দেন না, তাঁহারা পাকে-প্রকারে তাহা করিতে বাধ্য হ'ন। ইউক্লিড্ তাঁহার প্রথম সর্গের চতুর্থ সিদ্ধান্তে, দুইটি ত্রিকোণের সমতা প্রদর্শন করিবার জন্য একটিকে আর-একটির স্থানে স্থাপন করিতে কহেন; এখন, জিজ্ঞাস্য এই যে পূর্ব্বোক্ত ত্রিকোণ কি শূন্য আকাশ-খণ্ড না তাহা দৃঢ়বস্তু? যদি তাহা শূন্য আকাশ-খণ্ড হয় তবে তাহাকে এক-স্থান হইতে আর এক স্থানে নড়ানো অসম্ভব; তবেই হইল যে, তাহা দৃঢ়বস্তু; এ বিষয়ে আমাদের মত এই যে, জ্যামিতির আলোচনা-ক্ষেত্রে দৃঢ়বস্তুকে যদি অধিকার দিতেই হইল তবে স্পষ্টরূপে দেওয়াই ভাল; লুকাচুরিতে ফল কি? তা-

হাতে কার্য্যের অসুবিধা ভিন্ন সুবিধা কিছুই হয় না।

জ্যামিতি-ক্ষেত্রে দৃঢ় বস্তুকে অবতারণা করাতে আমাদের বিশেষ এই এক সুবিধা হইয়াছে যে, স্থান মাপিবার জন্য আমরা যদি কোন-একটা দৃঢ়বস্তুকে একস্থান-হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করি—স্বচ্ছন্দে আমরা তাহা করিব, আমাদের তাহাতে সঙ্কুচিত হইবার কোন কারণ নাই। ইউক্লিডের দ্বাদশ মূলতত্ত্ব অনেকের মতে মূলতত্ত্ব পদবীর অনুপযুক্ত, আমাদেরও তাহাই বিশ্বাস। ত্রিকোণের কোণ-ত্রয়ের সমষ্টি দুই ঋজুকোণের সমান, এটি প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে প্রমাণ করিতে হইলে ঐ মূলতত্ত্বটির সাহায্য গ্রহণ না করিলে চলে না; কিন্তু দৃঢ়-বস্তুর অবতারণা-প্রসাদে আমরা ঐ কৃত্রিম-মূলতত্ত্বটিকে অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি; শুদ্ধ কেবল প্রস্থিতি-প্রবর্ত্তন-দ্বারা আমরা প্রমাণ করিতে পারিয়াছি যে, ত্রিকোণের কোণ-ত্রয়ের সমষ্টি দুই ঋজুকোণের সমান।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মোহ-নিদ্রা হইতে উত্থান কর।

যিনি ব্যাকুল হৃদয়ে সেই অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি কি কখন অসাড় হইয়া মোহ নিদ্রায়—অজ্ঞান-নিদ্রায় অভিভূত থাকিতে পারেন? তিনি সর্ব্বদা জাগ্রত সতর্ক ও সাবধান থাকেন। পাপালাপ, পাপচিন্তা, পাপানুষ্ঠান এ তিন হইতেই তিনি প্রাণপণে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। পাছে কোন সূত্রে পাপশত্রু হৃদয়কে অধিকার করে, তাহার জন্য তিনি অতি সুচতুর প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করিতে থাকেন। তিনি অনবরত আত্ম-চিন্তা করেন, সকল অবস্থায় সকল সময়—এমন কি ঘোর বিষয়-কোলাহলের মধ্যেও তিনি আত্মানুসন্ধান করেন। পাছে তাঁহার মুখ হইতে অশ্লীল বাক্য নির্গত হয়—নিষ্ঠুর কথা বহির্গত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকের কোমল হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে—স্পষ্ট বা প্রকারান্তরে বা ভঙ্গিক্রমে পরনিন্দা প্রকাশ পায়—বিগর্হিত আত্ম-প্রশংসা মুখ হইতে বাহির হয়—পাপ-চিন্তা হৃদয়কে অন্ধকারাবৃত করে ও পাপানুষ্ঠান রূপ মহাব্যাধি আত্মাকে [illegible] করে—ইহার জন্য তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া [illegible] রূপ অসি হস্তে করিয়া জাগ্রত [illegible] কারণ তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে বিন্দু মাত্র ছিদ্র দ্বারা অতি বৃহৎ অর্ণবযানও জলমগ্ন হইয়া থাকে। পাপকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিলে কালে তাহার সহিত সংগ্রাম করা অতিশয় সুকঠিন কর্ম্ম। যে গৃহে অশ্বত্থ বৃক্ষ একবার বদ্ধমূল হয় তাহাকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করা কি ঘোর আয়াস-সাধ্য ব্যাপার। তিনি পাপকে এত ভয় করেন—যে পাপের নাম শ্রবণ মাত্রেই তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বিনীত [illegible] [illegible] ই এইরূপ সাবধান থাকা [illegible] [illegible] অমঙ্গল নিবারণের জন্য তিনি যেমন সাবধান—ভূতকালে কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে কি কি দোষ ঘটিয়াছে—ভবিষ্যতে যাহা তেমন না হয় [illegible] যত্নবান [illegible]। নিরভিমান হইয়া তিনি [illegible] তন্ন [illegible] নিজ আত্মার পরীক্ষা করেন। [illegible] তাহাতে পক্ষপাত করেন না। তিনি নিজ মহত্ত্ব দর্শন লালসায় আত্মপরীক্ষা করেন না, যে তিনি পক্ষপাত করিবেন, স্বীয় ত্রুটি দোষ ও পাপ হৃদয়ে কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে—তাহাই জানিবার জন্য তাঁহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান। যেমন সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসক ক্ষত-স্থান পরীক্ষার জন্য প্রথমে

উঁহাকে শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দেখেন—কতদূর রক্তমাংস দূষিত হইয়াছে, তিনিও তেমনি আপনার আন্তর রোগের আপনি চিকিৎসক হইয়া—গভীর রূপে নিজ অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এমন কি অতি সামান্য ত্রুটি ও পাপের অবধি পরিচয় লইয়া থাকেন। সত্য বটে ইহাতে আপাততঃ ক্লেশ বোধ হয়—যেমন অতীত বিষয় কীর্ত্তনের সময় তাহাকে প্রত্যক্ষানুভূতের ন্যায় বোধ হয়, তেমনি স্বীয় কৃত পাপ সকলের আলোচনার সময় অবশ্যই তাহাদের বিকট মূর্ত্তি মনোমধ্যে দেখিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ হইতে হয়—কিন্তু সেই অনলেই—সেই অনুতাপানলেই আত্মা বিশুদ্ধ হয়। কে না দেখিয়াছেন যে মলিন স্বর্ণ দগ্ধ হইয়া কেমন উজ্জ্বলরূপ ধারণ করে। হা। সে কি মনোহর শোভা! আত্মা যখন পাপ হইতে মুক্ত হইতে থাকে, তখন মেঘ-মুক্ত চন্দ্রমার শোভাও তাহার নিকট পরাজিত হয়। কি সুখী সেই মনুষ্য, সেই নিরভিমান মনুষ্য, যিনি সকল সময়ে আপনাকে এইরূপ সংশোধন করিতেছেন। তিনি নিমিষে নিমিষে নূতন বল প্রাপ্ত হন। নূতন নূতন প্রসাদ ও আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহার শুভ্র আত্মাতে সেই চন্দ্রমার জ্যোতি কেমন প্রতিফলিত হয়। পুণ্য কি নিমিত্ত যে প্রাণদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে—তাহার অর্থ তিনি স্বীয় জীবন-পুস্তকে পাঠ করিতে থাকেন। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পান যে অন্তরতম পরমেশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে পাপ ভিন্ন আর কোন ব্যবধানই হইতে পারে না। পাপই মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। মনুষ্য যত পবিত্র হয় সে তত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হয়। দিন দিন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া যে কি সুখ—জানি না কি বাক্যে তাহা ব্যক্ত করিব। দূরস্থিত কুসুম-কাননের মনোহর সুগন্ধ—বা হৃদয়-প্রফুল্লকর সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া পথিক যতই তাহাদের নিকটবর্ত্তী হয় ততই তাহার মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, সেই প্রকার যিনি প্রতিদিন স্বীয় পাপরাশিকে নিজ সত্ত্ব ও ঈশ্বরের প্রসাদরূপ বারি দ্বারা প্রক্ষালিত করিয়া পবিত্র ঈশ্বরের অভিমুখে গমন করেন, তাঁহার আনন্দ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হায়! সে আনন্দের তুলনা কোথায়।

কি অসুখী সেই আত্মা যিনি মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া—অভিমানের দাস হইয়া আপনার ত্রুটি দোষ ও পাপের পরিচয় লন না—যিনি আপনাকে সংশোধন করিতে চান না। যিনি আমোদ প্রমোদের আবরণে পাপের অগ্নিকে আবরণ করিতে যান, বিলাস রূপ ঘৃত দ্বারা স্বকৃত পাপ-হুতাশনকে নির্ব্বাণ করিতে প্রবৃত্ত—হা কি ভ্রান্তি! হা! তাহার অবস্থা কি শোচনীয়। যে সুশীতল জলে এ অনল নির্ব্বাণ হইব, তাহাকে সে বিষবৎ পরিত্যাগ করিল। হে করুণাময় পরমেশ্বর! তুমি অনুকূল হইয়া তাহার মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দেও, তোমার পবিত্র কার্য্যে তাহার মনকে নিয়োগ কর।

হে অনাথশরণ পতিতপাবন! তুমি আমাদের একমাত্র পরিত্রাতা। তোমার নিকট আমরা ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাদের দুষ্প্রবৃত্তি সকল দমন কর। পাপকে সমূলে বিনষ্ট কর, আত্ম-প্রসাদে মনকে প্রফুল্ল কর, হৃদয়কে তোমার দুর্লভ প্রীতি-রসে নিমগ্ন কর—তোমাকে যেন দিনে নিশীথে হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিতে পারি—তুমি ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। হে অগতির গতি। তুমি আমাদিগকে ক্ষণ-মাত্রও পরিত্যাগ কর নাই—আমরাও যেন নিমেষের জন্য তোমাকে পরিত্যাগ না করি।

ঋষি-উপাখ্যান।

পূর্ব্ব পশ্চিমের দুইটি কন্দরে
যমুনা জাহ্নবী ঘুমাইয়া ঝরে।
অকম্পিত বায়ু, স্তব্ধ চারিদিক্,
নহেক কিছুই যেন নৈসর্গিক।
বন বনস্পতি তুলির লিখন,
নাহিও জীবন নাহিও মরণ।
আধার হইতে বিচ্যুত হইয়া
আছে বর্ণ শুধু আকাশে ঝাঁপিয়া।
নাহি একটিও বিহঙ্গের রব
মৃত্যুতে ডুবিয়া আছে যেন সব।
পাষাণ করিয়া বাহু প্রসারণ
প্রকৃতির গতি করিছে বারণ।
দিগন্ত ছাড়ায়ে গিয়া দিগন্তরে
অম্বর ফুটিয়া রয়েছে অম্বরে।
সে হিমাদ্রি চূড়ে নিবিড় দুর্গম
কেবল একটি তাপস আশ্রম।
এক শিষ্য তার দ্বার আগুলিয়া
মূর্ত্তি সম আছে দাঁড়াইয়া।
আশ্রমের মাঝে কৃত্তির আসনে
মহর্ষি দেবল বসিয়া ধেয়ানে।
তুষার ধবল কুন্তল মাথায়
শ্বেত শ্মশ্রু কোলে পড়িয়া লুঠায়।
আছে প্রাণ-বায়ু বহে না নিশ্বাস
মুখে ব্রহ্ম-তেজে আনন্দের ভাস।
করি' সমুন্নত বক্ষ গ্রীবা শির
আসনে অচল স্থাপিয়া শরীর
সকল ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া
দেশ কাল দূর পশ্চাতে ফেলিয়া
গিয়াছেন চলি' সমাধি-প্রবীণ
ব্রহ্মের উদ্দেশে আজি কয় দিন।
আজি কয় দিন অবসান প্রায়,
অন্তরীক্ষে ভানু অস্ত যায় যায়
এমন সময়ে, সমাধি ভাঙ্গিয়া
অটল তাপস উঠিলা জাগিয়া।

উঠিল জাগিয়া চকিতে পবন
ঘুম ঘোরে ভীত শিশুর মতন।
ইঙ্গিতে অমনি ক্রমের শরীরে
জীবন ফিরিয়া এ'লো ধীরে ধীরে।
অচেতন পাখী পাইল চেতন,
নিদ্রা ত্যজি' উঠি' এ'লো জাগরণ।
আঁখি নাহি মেলিতে মেলিতে ঋষি
কহিলেন ধীরে আসনেই বসি,'
"কোথা বৎস গেলি ওরে বিপ্রসদ,
আশ্রম ধর্ম্মের দেখি যে বিপদ।"
শুনে বিপ্রসদ বুঝিল হৃদয়ে
উঠিলেন গুরু সমাধি করিয়ে।
দীন সম তবে তাঁহার সদন
আসিয়া বন্দিল যুগল চরণ।
'আদেশ! "আদেশ!" দুইবার বলি'
দাঁড়া'লো সম্মুখে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।
ঋষির ললাট ব্রহ্মতেজে ভরা,
আগুন জ্বলিছে নয়নের তারা।
মুহূর্ত্তে হেরিয়া শিষ্যের আনন
করিলেন আঁখি ঊর্দ্ধে উত্তোলন,
কি যেন স্মরিয়া কি যেন বচন
বলি' করিলেন ওষ্ঠ বিকম্পন।
গুণাধার ঋষি কহিলেন ধীরে,
প্রত্যাখ্যান করিয়াছ অতিথিরে!
এসেছিল দ্বারে অতিথি তোমার
কর নাই কিছু তাহার সৎকার,
দাঁড়াইয়া দ্বারে ছিলে অন্যমনা
ভুলিয়া জগৎ ভুলিয়া আপনা।
শনৈঃ আসিয়া শনৈঃ চলিয়া
গিয়াছে অতিথি স্বধর্ম্ম রক্ষিয়া।
বৎস! অগ্নিসম অতিথি দুর্জ্জয়
যাহার আশ্রমে প্রত্যাখ্যাত হয়,
রহে না তাহার ইষ্টাপূর্ত্ত ফল,
ভবিষ্যের আশা বিনষ্ট সকল।
সত্য আচরণে যত পুণ্য হয়
ফিরিলে অতিথি তাও হয় ক্ষয়।

অতিথি ফিরায়ে সাধে আপনার
অনিষ্ট যে জন, অল্প বুদ্ধি তার।
যাও বৎস। লও সন্ধান বিশেষ
বুভুক্ষিত পথি নাহি পায় ক্লেশ।
দুর্গম পর্ব্বত সঙ্কট এ ঠাঁই
অতিথির হেথা আবসথ নাই,
যত্নেতে তাহারে আন ফিরাইয়া
কর অভিষেক অন্ন জল দিয়া।
ধ্যান যোগে আমি করেছি দর্শন
আছে কিছু তার হেথা প্রয়োজন
ঋষির বচনে বিস্ময় অন্তরে
গেল বিপ্রসদ কুটীর বাহিরে,
দেখিল অদূরে দেবদারু তলে
শিলা খণ্ড যথা, পড়িয়া বিরলে
সাধু একজন, বয়সে প্রবীণ,
কি জানি কি ভেবে বদন মলিন।
কেশ হীন রুক্ষ মুণ্ডিত মাথায়,
গৈরিকে আবৃত অঙ্গ সমুদায়।
দক্ষিণ কপোলে কর নিক্ষেপিয়া
আকাশ পাতাল ভাবিছে বসিয়া।
গুরুর আদেশ অতিথির ক্রোধ,
পাপের বিজয় ধর্ম্মের বিরোধ—
এই চিন্তা ভয়ে বিকম্পিত প্রাণ
শিষ্য বিপ্রসদ ধীর মতিমান
বহু স্তুতিবাদে তুষি' অতিথিরে
পাদ্য অর্ঘ্য আনি দিল ধীরে ধীরে,
নির্ঝরের বারি অরণ্যের ফল
দিল ভক্ষ্য পেয় আরণ্য-সম্বল।
সম্ভ্রমের সহ আনিয়া কুটীরে
ঋষির সম্মুখে বসাইল ধীরে
কহিলেন ঋষি হস্ত প্রকম্পিয়া
'কুশল ধর্ম্মের? কিসের লাগিয়া,
কহ গো অতিথি, মান্যতম তুমি
আইলে লঙ্ঘিয়া এ দুর্জ্জয় ভূমি?
কি নাম কোথায় বসতি তোমার
জন্ম কোন্ কুলে, কহ সমাচার?"

ক্রমশঃ

কার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত কএকখণ্ড পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

"কৃষক বালা" মূল্য ॥০ আনা।

"বেদিয়া বালিকা" শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংকলিত। মূল্য দুই আনা।

"সঙ্ক্ষিপ্ত ভারত" শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

"A collection of Relegious Tracts in Gurmukhi characters", by Lala Bihari Lal. Secretary Sat Sobha Lahore.

"An English Version of Sree Tondonmaun's Bhoonithi" From Madras. Price 8 annes only.

"সংস্কৃত পুস্তক" প্রথম ভাগ (দেবনাগর অক্ষরে) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নিত্যানন্দ মিশ্র প্রণীত।

বিজ্ঞাপন।

সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৮৫। ১ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

একাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
৪৯১ সংখ্যা আষাঢ় ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৫ শক ১৮০৭

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৬ জ্যৈষ্ঠ রবিবার।

আচার্য্যের উপদেশ।

মনুষ্য অতি এক সূক্ষ্ম অদৃশ্য মায়া-বন্ধন লইয়া জন্ম গ্রহণ করে—সে বন্ধন লূতা-তন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম কিন্তু পর্ব্বত অপেক্ষাও গুরুতর। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে ধাত্রী নাড়ীচ্ছেদ করে—কিন্তু সে নাড়ী একটা নির্ম্মোক মাত্র—আসল যে নাড়ী তাহা তাহার ভিতরে;—ছিন্ন নাড়ী ছিন্ন মৃণাল-খণ্ড-সদৃশ, কিন্তু অচ্ছেদ্য নাড়ী সেই মৃণালের সূত্রসদৃশ,—সে সূত্র জীবনের সঙ্গী,——সে সূত্রের আকর্ষণ অতীব সুগভীর—সে আকর্ষণ অনেক জলের তলে চাপা থাকিতে পারে—কিন্তু তাহা যায় না।

সূর্য্য হইতে পৃথিবী প্রসূত হইয়াছে—ইহা শুধু আজিকের কালের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নহে; সূর্য্যের অস্তাচলসংশ্রিত ভূখণ্ডে এখনো এ কথা অতি অল্প লোকেই জানে যে সূর্য্যের উদয়-প্রমুখ আমাদের এই ভারতবর্ষে ও-সিদ্ধান্ত একটুকুও নূতন নহে;—আমাদের ঋষিরা সূর্য্যকে সবিতা বলিয়া জানিতেন—“সবিতা” কিনা পৃথিব্যাদির প্রসবিতা। পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে যে আকর্ষণ তাহাও এক অদৃশ্য নাড়ীর আকর্ষণ;—পৃথিবীর প্রসব-দিনে তাহার স্থূল নাড়ীই ছিন্ন হইয়াছিল—কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম নাড়ী একবারেই অবিচ্ছেদ্য, আজিও সেই সূক্ষ্ম নাড়ীর এক প্রান্ত পৃথিবীর নাভি-কেন্দ্রে আর এক প্রান্ত সূর্য্যের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রোথিত রহিয়াছে,—সেই নাড়ীর মধ্য দিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পৃথিবীর সংবাদ সূর্য্যের নিকট—সূর্য্যের সংবাদ পৃথিবীর নিকট—যাতায়াত করিতেছে; পৃথিবী প্রাণ চাহিতেছে—সূর্য্য সেই বৈদ্যুতিক পথের মধ্য-দিয়া রাশি রাশি প্রাণ প্রেরণ করিতেছে;—পৃথিবী সূর্য্যকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবী নাকি আমাদের—তাই আমরা অগ্রে পৃথিবীর কথা উল্লেখ করিতেছি,—কিন্তু একা পৃথিবী কেবল নয়, পৃথিবী এবং তাহার আট সহোদর সকলেই এক সূর্য্যের অঞ্চল ধরিয়া ধরিয়া আকাশ-মণ্ডলে ফিরিতেছে,—সূর্য্য অপ্রতিহত স্নেহ সহকারে সকলকেই জ্যোতি প্রাণ দীপ্তি কান্তি প্রত্যহ নিয়মিত রূপে বণ্টন করিয়া দিতেছে।

সূর্য্য হইতে যেমন পৃথিবী প্রসূত হইয়াছে—সেইরূপ সনাতন আদি সূর্য্য হইতে—জ্ঞান-সূর্য্য প্রেম-সূর্য্য হইতে—আমাদের আত্মা প্রসূত হইয়াছে; সমস্ত সৌর জগতের মধ্যে পৃথিবী নাকি আমাদের নিকটতম বাসস্থান—তাই উপরে পৃথিবীর কথা উল্লেখ করিয়াছি।—তেমনি সমস্ত ভালবাসার বস্তুর মধ্যে আত্মা নাকি আমাদের নিকটতম বস্তু, তাই অগ্রে আমরা আত্মার কথা উল্লেখ করিতেছি; সমস্ত জগৎই পরমাত্মা হইতে প্রসূত,—কিন্তু আমাদের আত্মা আমাদের নিকট সমস্ত জগৎ অপেক্ষা আদরের বস্তু, তাই তাহারই প্রতি আমরা বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিতেছি। আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে কি যে আশ্চর্য্য অদৃশ্য সম্বন্ধ-সূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা অনির্ব্বচনীয়:—পৃথিবীতে এত দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু কেহই সেই সম্বন্ধ-সূত্রের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বুদ্ধিতে আনিতে পারে না—অসীমের সহিত সসীমের সম্বন্ধ যে কিরূপে সম্ভবে ইহা কোন দর্শনে বলিতে পারে না—অথচ "সম্বন্ধ আছে" ইহা কোন দর্শনেই অস্বীকার করিতে পারে না; কিন্তু আমাদের পবিত্র ঋষিরা সে সম্বন্ধ ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ' যিনি আমাদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার সহিত আমাদের কি নিকট সম্বন্ধ একবার ভাবিয়া দেখ; বুদ্ধি-বৃত্তি কি সামগ্রী তাহা ভাবিয়া দেখ,ও কিরূপে তিনি তাহা আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া দেখ। কোন বন্ধু যদি বাহক-দ্বারা কোন একটি দান-সামগ্রী প্রেরণ করেন, তবে সে সামগ্রীতে আমরা তাঁহার হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখি,—যদি তিনি আপন হস্তে সেই দান-সামগ্রী প্রদান করেন, তবে তাঁহার হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি নহে কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের নিজ মূর্ত্তি আমরা আমাদের চক্ষের সমক্ষে জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাই; কিন্তু মাতা যখন শিশুকে দুগ্ধ দান করেন—তখন মাতা আপন হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তিও নহে স্বমূর্ত্তিও নহে—কিন্তু সাক্ষাৎ হৃদয়—যাহার মূর্ত্তি নাই যাহা অমূর্ত্ত সেই মর্ম্মগত হৃদয়—প্রদান করেন, এজন্য শিশু তাহা চক্ষে দেখিতে পায় না—কিন্তু মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে—তাহাতে শিশুর প্রতি রোম-কূপে প্রাণের সঞ্চার হয়। পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে যে, বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিতেছেন, তাহা তিনি দূরস্থ বন্ধুর ন্যায় বাহক দ্বারা প্রেরণ করিতেছেন না—অভ্যাগত বন্ধুর ন্যায় হস্ত দ্বারাও প্রেরণ করিতেছেন না।—মাতার ন্যায় হৃদয়ের বহিরুচ্ছ্বাস দ্বারাও প্রেরণ করিতেছেন না, কিন্তু তিনি স্বয়ং আপনি আমাদের আত্মাতে অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন। আমাদের আত্মার নিভৃত স্থানে যেখানে তিনি বাস করিতেছেন—সেই খানে তাঁহাকে দর্শন করিয়া পুরাতন ঋষিরা বলিয়াছেন "হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিকলং তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদোবিদুঃ" যিনি তাঁহাকে আপন আত্মার সেই নিভৃত স্থানে অন্বেষণ করেন তাঁহার যত্ন কখন বিফল হয় না; সে নিভৃত স্থান কোথায়? সে মর্ম্ম-স্থান কোথায়?

মনুষ্য মাত্রেরই একটি অতি গভীর মর্ম্ম-স্থান আছে; সেটি কি?—বিষয়ী লোককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন—সেটি স্বার্থ; শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে—মাতা; যুবাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন—প্রেয়সী; যোদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন—যশ। কাহার যে কি মর্ম্ম-স্থান—তাহা সে-ই জানে, অনেক সময়ে সে-ও তাহা জানে না; শিশু যখন মাতৃক্রোড়ে থাকে তখন শিশু জানে না যে, মাতাই

তাহার প্রাণ ; মাতার আসিতে যদি দণ্ড দুই বিলম্ব হয়, তখন সে তাহা অনুভব করে, এবং তাহার ক্রন্দন শুনিয়া অপর লোকেরাও তাহা অনুভব করে ; মর্ম্মে আঘাত লাগিলেই মর্ম্মস্থান ধরা পড়ে। মনুষ্যের মর্ম্মস্থানকেই বলা যাইতে পারে—মনুষ্যের সজীব প্রদেশ,—এবং যাহার যে-প্রদেশ তাহা হইতে যত দূরে, তাহা ততই নির্জ্জীব বা মৃত-শব্দের বাচ্য।

যে ভক্ত এরূপ যে, তাঁহার উপাস্য দেবতা তাঁহার মর্ম্মস্থান—তিনিই প্রকৃত ভক্ত ; তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমী। আর এক দিকে দেখা যায় যে, ঈশ্বর কাহার না মর্ম্ম-স্থান ? কোন্ শিশুর মর্ম্মস্থান তাহার মাতা নহে ? যে শিশু—মাতার ক্রোড় কি—তাহা জানে না—তাহার কথা সতন্ত্র ; কিন্তু যে শিশু মাতৃস্তনের একবার আস্বাদ পাইয়াছে—মাতাতেই তাহার প্রাণ গঠিত হইয়াছে,—মাতার প্রাণই তাহার প্রাণ এবং তাহার প্রাণং মাতার প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন্ আত্মা ।রমাত্মার ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে না—কোন্ আত্মা তাঁহার 'প্রেমামৃত পান করিতেছে না—পরমাত্মা হইতে দূরে পড়িলে কোন্ আত্মা স্বচ্ছন্দে থাকে—আরামে থাকে—কুশলে থাকে—আনন্দে থাকে ?—ঈশ্বর-প্রেমী এবং ঈশ্বর-বিচ্যুত দুই ব্যক্তির মুখ দেখিলেই ধরা পড়ে—কোন্ শিশুর মাতা বর্ত্তমান আছে এবং কোন্ শিশুর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে—তাহা মুখ দেখিলেই জানা যায় ; যে শিশুর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে—সে যে আদবেই হাসে না বা খেলে না তাহা নহে—তাহার যে কি গুরুতর বিপদ হইয়াছে তাহার কিছুই হয়ত সে জানে না—সে তাহা জানে না কিন্তু তাহার মর্ম্ম তাহা জানে,—তাহার হাসির মধ্য হইতেও—তাহার খেলার মধ্য হইতেও তাহার মর্ম্মের ক্রন্দন কোন না কোন আকারে বাহির হইতে থাকে। ঈশ্বর-বিচ্যুত ব্যক্তিরও সেইরূপ দশা—তিনি যে হাসেন না তাহা নহে—খেলেন না তাহা নহে—তিনি হাসেন কিন্তু তাহার মর্ম্ম হাসে না—তিনি চলেন বলেন—কিন্তু তাঁহার মর্ম্ম মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকে—ক্রন্দন করে, পৃথিবীকে শ্মশান দেখে। মাতৃ-বিযুক্ত শিশু যখন মাতার জন্য ক্রন্দন করে, তখন তাহার ধাত্রী তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পরাভব মানে,—হা! তাহার সে ক্রন্দন নিষ্ফল। কিন্তু ঈশ্বর-বিযুক্ত আত্মার অন্তর্বাষ্প ঘনীভূত হইয়া যখন তাহাকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে, তখন তাহার অশ্রুবারি মরুভূমিতে পতিত হয় না,—কেন না যাঁহার জন্য তাহার প্রাণ ভিতরে ভিতরে ক্রন্দন করিতেছে তিনি তাহার নিকট হইতেও নিকটতম ;—তবে কেন আত্মা তাহার অন্তরাত্মাকে না ডাকিবে ? মোহ-যবনিকা কেন না অপসারিত করিয়া প্রাণের প্রাণকে অবলম্বন করিবে ? মাতা এবং শিশুর মধ্যে—প্রিয়তম এবং প্রিয়তমের মধ্যে—প্রাণ এবং প্রাণের মধ্যে কেন একটা প্রাচীর থাকিবে ? প্রেমের কি এত বল নাই যে, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারে—মোহের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে।—অতএব ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত হইয়াছ বলিয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিও না—মর্ম্মের ক্রন্দন-দ্বারা মোহ-যবনিকা উদ্ঘাটন কর—তাঁহাকে দেখিতে পাইবে—প্রাণের প্রাণকে পাইয়া জীবন পাইবে—দুঃখ শোক জরা মৃত্যু অতিক্রম করিবে—তাহা হইলে মঙ্গল পৃথিবীতে—মঙ্গল আকাশে—মঙ্গল ইহলোকে—মঙ্গল পরলোকে ; চতুর্দ্দিক হইতেই মঙ্গল আসিয়া তোমার হৃদয়কে শান্তি-সলিলে অভিষিক্ত করিবে—ও সমস্ত পাপ-তাপ দূরে পলায়ন করিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আর্য্য-ধর্ম্ম।

আর্য্য-ধর্ম্ম যে কি তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যাঁহারা ইহার অঙ্গ-বিশেষকে আর্য্য-ধর্ম্ম বলিয়া অবধারিত করিতে যান, তাঁহারাই প্রতারিত হওয়াতে থাকেন। যে ধর্ম্ম হিমালয়-সমান প্রাচীন, আকাশের ন্যায় উচ্চ, সমুদ্র-সদৃশ গভীর, বায়ুর ন্যায় প্রশস্ত ও মুক্তভাবাপন্ন, তাহার গূঢ় গম্ভীর ভাব অনায়াসে বুদ্ধির আয়ত্ত করা সম্ভবপর নহে।

আদিম বাষ্পময় জ্বলন্ত দ্রব-ধাতু-পিণ্ড স্বাভাবিক নিয়মক্রমে শীতল হইয়া যেমন স্তরে স্তরে এই পৃথ্বীধাম বিরচিত হইয়া মনুষ্যের বাস-যোগ্য হইয়াছে, আর্য্য-ধর্ম্মও তেমনি মনুষ্য-সমাজের প্রাচীনতম অনির্দ্দেশ্য কাল হইতে ঐশ্বরিক উত্তেজনায় ঋষিগণের সরল কোমল হৃদয় হইতে যে উদ্গীরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ক্রমে পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি স্তর সমূহ তদুপরি বিনির্ম্মিত হইয়া বিশাল বিস্তৃত আকার ধারণ করত অসংখ্য অগণ্য মনুষ্যের হৃদয় মন আত্মাকে পালন ও পোষণ করিতেছে। প্রাকৃতিক বিপ্লবে—ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা যেমন ধরাপৃষ্ঠে পর্ব্বত প্রান্তর প্রভৃতি সমুৎপন্ন হইয়াছে, তেমনি আর্য্য-ধর্ম্মের সংঘর্ষণ ও সমালোচন-প্রভাবে ভূমণ্ডলে অপরাপর ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে। পৃথিবীর কোন স্থান খনন করিতে গেলে যেমন ইহার আভ্যন্তরিক স্তর-সমূহের বিপর্য্যস্ত বা ভগ্ন অংশ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি ভূমণ্ডলের যে কোন ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করা যায়, তাহাতেই আর্য্য-ধর্ম্মের সত্য ও নীতি-রত্ন-সকল প্রচ্ছন্ন বা পরিস্ফুট ভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহাই জাজ্জ্বল্যতর রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা আর্য্য-ধর্ম্মে নাই, তাহা আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ইহার দ্বারাই আর্য্য-ধর্ম্মের প্রাচীনত্বের ও সারত্বের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

পৃথিবীর কোন স্তর-বিশেষকে যেমন পৃথিবী বলা যায় না, তেমনি আর্য্য-ধর্ম্মের অঙ্গ বা শাখা-বিশেষও সম্পূর্ণ আর্য্য-ধর্ম্ম রূপে অভিহিত হইতে পারে না। শুষ্ক অঙ্গার বা চূর্ণ স্তর যেমন কোন উদ্ভিদ বা জীব-শ্রেণীকে পোষণ করিতে পারে না, তেমনি ইহার শাখা-বিশেষেও চির-উন্নতিশীল মানব-আত্মার ধর্ম্ম ও সংসার-ঘটিত পূর্ণ পরিজ্ঞেয় তত্ত্ব সকল বিশদ আকারে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই জন্যই যিনি ইহার অঙ্গ-বিশেষ বা স্তর-বিশেষকে সম্পূর্ণ আর্য্য-ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে যান, তাঁহাকেই প্রতারিত হইতে হয়।

বেদ-উপনিষৎ ভারত পুরাণ এবং তন্ত্র প্রভৃতি সাধারণতঃ আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রতিপাদক বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। পৃথিবীর আদিম-স্তর যেমন অপরাপর স্তরের আধার ও উৎপত্তির কারণ, বীজ যেমন বৃক্ষের কাণ্ড-শাখা পুষ্প-ফল সমুৎপাদনের হেতু, বেদ-উপনিষৎ তেমনি আর্য্য-ধর্ম্মের আধার-ভূমি এবং ইহার শাখা প্রশাখাদি সমুদ্গমের একমাত্র উপাদান। ভূগর্ভ-নিহিত বৃক্ষ-মূলের আকৃষ্ট রস যেমন তাহার প্রত্যেক অঙ্গে, পত্র-পুষ্প-ফলের প্রতিশিরায় প্রবাহিত হইতেছে; তেমনি বেদ-উপনিষদের নিগূঢ় সরল সত্য সকল, ভারত পুরাণ ও তন্ত্রাদির মধ্যে কোথায় বা প্রচ্ছন্ন কুত্রাপি বা পরিস্ফুটভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্তরগত ও তৎসমূহের গুণগত প্রভেদ-পার্থক্য প্রত্যক্ষ দেখিলেও যেমন তাহারদিগের মধ্যে একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য যোগ উপলব্ধি করেন, উদ্ভিদ-তত্ত্ববিৎ

পণ্ডিত যেমন বৃক্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির আকারগত ও কার্য্যগত নানা প্রভেদ সন্দর্শন করিলেও মূল হইতে বৃক্ষের ফলাগ্রভাগ পর্য্যন্ত একটী বিচিত্র শৃঙ্খলা দেখিতে পান, তেমনি সূক্ষ্মদর্শী ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি উদার-গতি সুধীর সজ্জন সকল আর্য্য-ধর্ম্মের মূল কাণ্ড শাখা প্রভৃতির আকারগত কার্য্যগত ব্যবহার ও বিধি-পদ্ধতি-গত ইতর-বিশেষ অবলোকন করিলেও তাহারদিগের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্য সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া থাকেন।

পৃথিবী যেমন অন্তর-নিহিত অত্যুষ্ণ দ্রব-ধাতু-সাগরের স্বাভাবিক প্রকম্পন ও উৎক্ষেপণ দ্বারা নদী গিরি সাগরসহ এই অপূর্ব্ব শোভা-সৌন্দর্য্য ধারণ করত কালেতে অসংখ্য উদ্ভিদ ও অগণ্য জীবজন্তুর আবাস-ভূমি হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি আর্য্য ধর্ম্মও ঐশ্বরিক নির্দ্দেশে—ধর্ম্মোপাসক ঋষিগণের জ্বলন্ত ঈশ্বরানুরাগ-প্রভাবে—হৃদয়ের অনিবার্য্য উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাস-গুণেই সরল স্বাভাবিক নিয়মে সমুৎপাদিত হইয়া ধর্ম্ম-রাজ্যের অসম্ভাবিত কল্যাণ সাধন করিয়াছে। বেদ উপনিষদের ঋক সূক্ত এবং শ্লোকে রচয়িতার নামাদির উল্লেখ থাকিলেও বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া আর্য্য-সমাজে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঋষিগণ যত্ন-চেষ্টা করিয়া আপনারদিগের কোনরূপ ইষ্ট সাধন করিবার উদ্দেশে তাহা রচনা করেন নাই, তাঁহারদিগের সরল কোমল হৃদয়ের স্বাভাবিক ঈশ্বরানুরাগ হইতে যখন যে-সকল সত্য যে সকল ভাব স্বতঃ বিনির্গত হইয়াছে, তাহাই তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা যেন যন্ত্র, ধর্ম্ম-বুদ্ধি ও শুভ-বুদ্ধি এবং ব্রহ্মানুরাগই যন্ত্রীরূপে তাঁহারদের হৃদয় হইতে যে সকল সত্য, যে সকল ভাব নিঃসারণ করিয়াছে, তাহাই বেদ।

বেদেতে বরুণ ইন্দ্র বায়ু বহ্নি সূর্য্য প্রভৃতির নানা স্তুতিবাদাদি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তৎসমুহই স্ফুট বা অপরিস্ফুট ভাবে ব্রহ্মের উদ্দেশেই কথিত হইয়াছে। যথা

যস্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতঙ্কং।
দ্বৌ সংনিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্বেদ বরুণস্তৃতীয়ঃ।
উতেয়ং ভূমির্ব্বরুণস্য রাজ্ঞ উতাসৌ দ্যৌর্বৃহতী দূরেঅন্তা।
উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ।

'যস্তিষ্ঠতি' যিনি এক স্থানে থাকেন, চরতি, চলিয়া বেড়ান, 'যশ্চ বঞ্চতি' যিনি বিশ্রাম করেন, 'যো নিলায়ং চরতি' যিনি তিমিরাবৃত গুহার অন্ধকার মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন, 'যঃ প্রতঙ্কং চরতি' যিনি জন-শূন্য গুপ্ত গহ্বরে প্রবেশ করেন; বরুণ রাজা তাহা সকলই জানিতেছেন। যে একস্থানে থাকে, যে চলিয়া বেড়ায়, যে বিশ্রাম করে; যে অন্ধকার গৃহে লুক্কায়িত থাকে, যে কোন নির্জ্জন গহ্বরে প্রবেশ করে; সকলই সেই বরুণ রাজা জানেন। 'দ্বৌ সংনিষদ্য' দুই জনে বিরলে বসিয়া 'যন্মন্ত্রয়েতে' যাহা কিছু মন্ত্রণা করে, সেই দুই জনের মধ্যে তৃতীয় বরুণ রাজা থাকিয়া সমস্ত জানেন। 'রাজা তদ্বেদ বরুণস্তৃতীয়ঃ' তাঁহার নিকটে কিছুই গুপ্ত থাকে না, তাঁহার নিকট হইতে কেহই লুক্কায়িত থাকিতে পারে না। 'ইয়ং ভূমির্ব্বরুণস্য রাজ্ঞঃ' এই ভূমি সেই বরুণ রাজার। এই সমুদায় পৃথিবী সেই বরুণ রাজার। তিনি যে কেবল এই পৃথিবীর রাজা, তাহা নহে। 'অসৌ দ্যৌর্বৃহতী' এই যে বৃহৎ দ্যুলোক 'দূরে অন্তা' যাহার অন্ত পরস্পর দূরে রহিয়াছে, যাহার অন্ত পাওয়া যায় না, তাহারও তিনি রাজা। তিনি এই প্রকাণ্ড ভূলোক ও অসীম দ্যুলোকের রাজা। 'উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী, আর এই যে দুই সমুদ্র—জলের ও বায়ুর—উভয়ই বরুণের উদরের মধ্যে রহিয়াছে। উভয় সমুদ্র তাঁহারই আশ্রয়ে

রহিয়াছে। তিনি যে কেবল গভীর সমুদ্রে আছেন, তাহা নহে, তিনি অল্প জল-বিন্দুতেও আছেন। 'অস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ।"

বরুণ শব্দের অর্থ যাহাই হউক, এখানে সেই পূর্ণজ্ঞান পূর্ণপ্রেম পূর্ণশক্তি পর ব্রহ্মই প্রতিপন্ন হইতেছেন! বরুণ-ঘটিত প্রাগুক্ত বাক্যে দেখ সেই পরব্রহ্মের কি মহান্ ভাব, কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি এবং মানব-আত্মার সহিত কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে। শিশু সন্তানের বাক্য স্ফুট হইবার সময় যেমন হৃদয়ের উত্তেজনায় প্রকৃত বস্তু বা ব্যক্তিকে অন্য শব্দে উল্লেখ করে, কিন্তু তাহার অন্তরের ভাব সেরূপ নহে, কেবল তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি বা শব্দ-শক্তির অভাবই তাহার কারণ, তেমনি প্রাচীনতম ঋষিগণও বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতিতে ঈশ্বরের সত্তা-শক্তি জ্ঞান-প্রেম জ্বলন্মান দেখিয়া হৃদয়ের উত্তেজনায় এবং আন্তরিক প্রীতি-অনুরাগ-বশে ব্রহ্ম-বোধে তাহারদিগের পূজার্চ্চনা স্তুতি-বন্দনা ও মহিমা ঘোষণা করিয়া ভূমণ্ডলে ধর্ম্মের প্রথম সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। শিশুর ন্যায় তাঁহারদিগের সেই সকল উক্তিতে কেবলই সরলতা ও স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগিতাই প্রকাশ পাইতেছে।

অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা বেদ-উপনিষদের পর কালক্রমে প্রচারিত হইয়াছে, তৎ-সমুহের উদ্দেশ্য অভিসন্ধি অন্যরূপ। সে সকল জন-সাধারণ কর্ত্তৃক সভয়ে সাদরে পরিগৃহীত হইবে বলিয়া ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বা প্রচারক-গণ আপনারদিগকে ঈশ্বর-অবতার বা সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া লোক-সমাজে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারদিগের বাক্য বা গ্রন্থ সকলকে ঈশ্বরের কথিত বা ঈশ্বর-দত্ত অভ্রান্ত অপরিবর্ত্তনীয় সত্য-মূলক বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তথায় তাঁহারা ঈশ্বরের অশরীর অতীন্দ্রিয় মহান্ ভাবের খর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে শরীর-মন-ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন উদ্যান বা পর্ব্বত-বিহারি মানবাকৃতি ও মানব-স্বভাব-বিশিষ্ট বক্তা উপদেষ্টা এবং ধর্ম্ম-গ্রন্থ-প্রণেতা বলিয়া প্রচার করত আপনাদের মহত্ত্ব সাধুত্ব অলৌকিকত্ব এবং গ্রন্থের অভ্রান্তত্ব প্রচার করিয়াছেন। বেদ অপৌরুষেয় নিত্য ও ব্রহ্মসম্ভূত বলিয়া আর্য্যসমাজে ব্যবহৃত হইলেও ইহার কোন-স্থলে প্রাগুক্তরূপে ঈশ্বরের মহান্ ভাবের খর্ব্ব করা হয় নাই। এবং কোন ঋষিই উল্লিখিতরূপে উন্নতিশীল আত্মার জ্ঞান-ধর্ম্মের বিচার-তর্কের সোপান চির-রুদ্ধ করিয়া আপনাকে ঈশ্বর-অবতার বা তাঁহার বিশেষ অনুগৃহীত পাত্র বলিয়া লোক-সাধারণের সন্নিধানে আপনার মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়া পূজার্চ্চনা গ্রহণ করেন নাই। বরং বেদকে অপৌরুষেয় ও ব্রহ্ম-সম্ভূত বলিয়াও জ্ঞান ধর্ম্ম-সাধন-বিষয়ে মানব-আত্মার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া কেমন উদার-ভাবে এই মহাবাক্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,

"অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ
শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যথা তদক্ষরমধিগম্যতে।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

তাৎপর্য্য। পরমেশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় বিষয়ক জ্ঞান লাভ মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে সেই পরম প্রার্থনীয় জ্ঞান-রত্ন লাভ করা যায় তাহাই প্রকৃত বিদ্যা—তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা;

আর আর সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। .এ কারণ ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ; এ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতির যে যে ভাগ এবং অন্যান্য যে সকল বিদ্যা ব্রহ্ম-বিষয়ক যথার্থ তত্ত্বের উপদেশ করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা তাহা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষণীয়।"

আর্য্য ঋষিগণ পৃথ্বীগুরুরূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত ও প্রপূজিত হইলেও তাঁহারা আপনাদিগকে মানব-জাতির অভ্রান্ত আদর্শ এবং পূর্ণ ও নির্দ্দোষ-স্বভাব বলিয়া প্রচার করেন নাই। আপনাদিগের সকল কার্য্য ও সকল আচরণকে একান্ত অনুকরণীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান নাই, নিম্ন-উদ্ধৃত বাক্যগুলিই তাহার সাক্ষ্যস্থল। যথা

"যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি।

কল্যাণকর যে সকল কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, অকল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না।

তাৎপর্য্য। সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের শুভাভিপ্রায়কে লক্ষ্য করিয়া শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক, অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না।"

"যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।

আমরা যে সকল সদাচার করিয়া থাকি, তুমি তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান কর; তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না।

যে সকল ধর্ম্ম গ্রন্থ ঈশ্বর-প্রণীত বা আপ্ত বাক্য বলিয়া ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কোন গ্রন্থেই প্রচারক বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের এরূপ সরলতা উদারতা ও সত্য-প্রিয়তা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না ইত্যাদি নানা কারণেই আর্য্য-ধর্ম্ম পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।

আর্য্যধর্ম্ম যে কি, তাহা জানিতে হইলে কি প্রত্যেক মনুষ্যকে বেদ-বেদান্ত পুরাণ-তন্ত্র প্রভৃতি পর্ব্বত-সমান গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে হইবে? পৃথিবীর প্রত্যেক নদ, নদী, সাগর, হ্রদ, উৎস, সরোবর, পর্ব্বত, কানন, প্রান্তর এবং প্রদেশ দেশ গ্রাম নগরাদি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে যেমন মনুষ্যের আয়ু নিঃশেষিত হইয়া যায়, তেমনি আর্য্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থের সংখ্যা এত অধিক এবং তাহার আকার আয়তন এত বৃহৎ ও তাহাতে উপাখ্যান অলঙ্কার এবং রূপক বর্ণনার এত প্রাচুর্য্য, যে তৎসমূহ অধ্যয়ন করত মর্ম্মভেদ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-শিখরে উপনীত হইতে গেলে মনুষ্যের জীবন-কাল কোনরূপেই সঙ্কুলন হয় না। একটী বিশুদ্ধ ভূ-চিত্র সন্দর্শন করিলেই যেমন সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রতিকৃতি সহজেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি প্রকৃত আর্য্যধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব একাধারে দেখিতে হইলে, এক উন্নত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা সহজে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। বেদ-বেদান্ত ভারত-তন্ত্র প্রভৃতির একীভূত নিগূঢ় সত্য সকল একস্থানে নিরীক্ষণ করিতে গেলে, শ্রুতি স্মৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব একাধারে, আর্য্য ঋষিগণের গভীর চিন্তার কঠোর তপস্যার ফল, সমুন্নত ব্রহ্মজ্ঞান সারতম ধর্ম্মনীতি-রত্নরাজি একত্রে অবলোকন করিতে হইলে, ভারতের স্পর্দ্ধাস্থল ও গৌরব-নিধি এবং পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান-ধর্ম্ম-গিরি নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ ভিন্ন আর্য্যধর্ম্মের যথার্থ প্রতিকৃতি এবং প্রকৃত আদর্শ গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। এই পবিত্র গ্রন্থের প্রতিবর্ণ প্রতিশব্দ প্রত্যেক শ্লোক নিরবচ্ছিন্ন আর্য্য-জাতির গভীর ও উন্নত

ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহার প্রত্যেক উপদেশই সেই পৃথ্বীগুরু আর্য্য ঋষিগণের প্রত্যক্ষ-অনুভূত পরীক্ষা-সিদ্ধ সত্যের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। ইহাতে বিজাতীয় শিক্ষার বিজাতীয় ভাবের লেশ মাত্রও বর্ত্তমান নাই। ইহাই উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভাবের অদ্বিতীয় উচ্চ আদর্শ। ইহাই নিরবচ্ছিন্ন আর্য্য ঋষিগণের সাধন ও তপস্যালব্ধ রত্ন-রাজির সমষ্টি ইহাই আর্য্য জাতির অশেষ-ধর্ম্ম-শাস্ত্র-সিন্ধু-মন্থন-সমুদ্ভূত অমূল্য উজ্জ্বল নিধি। ইহাই ভারতবাসীদিগের সম্মিলন-স্থল—ইহাই সমগ্র মনুষ্য জাতির ঐক্য-ভূমি। ইহাই সমুদায় মানব কুলের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও যোগ-সাধনের পথ-প্রদর্শক। ইহাই মুক্তি-লাভের অদ্বিতীয় সোপান। ইহাই আর্য্যধর্ম্ম। ইহাই আর্য্যধর্ম্ম।

সদুপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্ত।

সদুপদেশ অমূল্য রত্ন। ইহা আমাদের জীবন-পথে প্রধান সহায়। ইহা অন্ধকারে আলোক। যাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া অনেক শিখিয়াছেন, অনেক জ্ঞাত হইয়াছেন, মঙ্গল ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা জীবন-পথের দুর্গম সংকট পথে কি প্রকারে চলিতে হয়, সে বিষয়ে যাহা উপদেশ দেন, তাহা কখন পরিত্যজ্য নহে। তাহা সম্যক রূপে পালনীয়। এই এক সদুপদেশের প্রভাবে কত অবিনয়ীর অবিনয়, শোকার্ত্তের শোক, বিপন্নের বিপদ তিরোহিত হইয়াছে। কত শত ব্যক্তি ইহারি সাহায্যে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে। অবস্থা বিশেষে সময় বিশেষে একটি কথা—একটি সদুপদেশ কত লোকের জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছে। সদুপদেশ মনুষ্যের মুখ হইতে বহির্গত হউক, পুস্তকেই লিখিত বা প্রস্তরেই অঙ্কিত থাকুক, ইহা আমাদের উপকার ভিন্ন অপকার করে না। যে ব্যক্তি ঘোর অভিমানী, যে আত্মহিতে অনবহিত সেই সদুপদেশ গ্রহণ করে না। যাহার হৃদয় আছে, আত্মোন্নতি করিবার স্পৃহা আছে, তিনি সদুপদেশকে প্রিয় বন্ধু অপেক্ষাও ভাল বাসেন। বাস্তবিক সদুপদেশ গৃহে বা শ্মশানে, কর্ম্মক্ষেত্রে বা উপাসনালয়ে, সম্পদে বা বিপদে, সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় আমাদের নেতা হইয়া কার্য্য করে। এবং আমাদিগকে সম্যক রূপে রক্ষা করে। সুতরাং সংসারে সদুপদেশ অপেক্ষা উজ্জ্বল রত্ন আর কি আছে? কিন্তু সদুপদেশ সকলে সমান রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। একই বীজ বিভিন্ন প্রকৃতির মৃত্তিকায় পতিত হইয়া ভিন্ন আকারের বৃক্ষে পরিণত হয়, এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল ধারণ করিয়া থাকে।

আবার এই সদুপদেশ যখন সদ্দৃষ্টান্তের সহিত মিলিত হয়, তখন ইহার জ্যোতি কি অসামান্য রূপে বর্দ্ধিত হয়। সুবর্ণের সঙ্গে যেমন হীরক—সদুপদেশের সঙ্গে তেমনি সদ্দৃষ্টান্ত। সে উপদেশের এক বলই স্বতন্ত্র, যাহা প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণের মুখ হইতে বহির্গত হয়।

যাহা হৃদয় হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হৃদয়ের উপর আপন প্রভাব নিশ্চয়ই বিস্তার করিবে——তাহা নিশ্চয়ই হৃদয়ের উপর ইন্দ্রজালের ন্যায় কার্য্য করিবে। সে উপদেশ সদ্য-প্রস্ফুটিত সুরভি কুসুমের ন্যায়, শুষ্ক কুসুমের ন্যায় নহে। এই রূপ উপদেশ সমধিক আদরণীয় ও ফলোপধায়ক। সদ্দৃষ্টান্ত উপদেশ হইতে পৃথক্ থাকিলেও ইহার বল প্রভূত বলিয়া বোধ হয়। কোন আড়ম্বর না করিয়া নীরবে ইহা শিক্ষা দান করে। উত্তম আদর্শ লোক-শিক্ষার এক

প্রধান বিদ্যালয়। কিন্তু আদর্শ যতই উৎকৃষ্ট ও উন্নত হউক, সকলে সমান রূপে তাহার অনুকরণ করিতে পারে না। যদি অনুকরণকারীর হৃদয় ও প্রকৃতি আদর্শের অনুরূপ হয়, তবে তিনি চেষ্টা করিলে আদর্শের সন্নিকৃষ্ট হইতে পারেন। হোমরের কাব্যে একেলিসের বীরত্ব অনেকেই পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু কয় জন আলেকজাণ্ডারের ন্যায় তাঁহার অনুকরণ করিয়াছেন? ফল কথা এই, অনুকরণকারীর হৃদয় মন ও প্রকৃতির গুণ অনুসারেই তিনি তাঁহার আদর্শের অনুকরণ করিতে পারেন।

উত্তম আদর্শ—উত্তম দৃষ্টান্তের গুণ বর্ণনাতীত। প্রকৃত সাধু ও ধার্ম্মিকের গম্ভীর অথচ প্রফুল্ল মূর্ত্তিই কত লোকের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করিয়াছে। তাঁহার আড়ম্বরশূন্য পরিশুদ্ধ কর্ম্ম কত লোককে সৎপথে যাইতে ও সাধু কর্ম্ম করিতে নিঃশব্দে শিক্ষা দিয়া থাকে। সাধু দৃষ্টান্তের ফল জগৎ হইতে কখন অন্তর্হিত হয় না। সুগন্ধি কুসুম নষ্ট হইলেও তাহার সার ভাগ যে গন্ধ, তাহা মনুষ্য কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। একটি দীপালোক হইতে প্রদীপ-পরম্পরা যেমন প্রজ্বলিত হয়, তেমনি একটি সাধু দৃষ্টান্ত হইতে শত শত সাধু দৃষ্টান্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সাধু দৃষ্টান্ত-সকল শৃঙ্খলের ন্যায় পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া অনন্ত কাল বিস্তৃত হইবে। কবে রামচন্দ্র অযোধ্যা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, অদ্যাপিও লোকে তাঁহার পিতৃভক্তি ও প্রজারঞ্জন-প্রবৃত্তির অনুকরণ করিয়া থাকে। সেই অলোকসামান্যা সতী সীতার অতুল স্বামিভক্তি ও সতীত্ব অদ্যাপিও নারীকুলের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। যুধিষ্ঠিরের সেই ক্রোধহীন শান্ত স্বভাব আজও লোকের মানস-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার সেই ন্যায়ানুগত ব্যবহার আজও লোককে ন্যায়ের পথ—ধর্ম্মের পথে আকর্ষণ করিতেছে—এবং চির দিনই এইরূপ করিবে। অতএব সাধু কর্ম্মের ফল কখন বিনষ্ট হয় না। ধন্য তিনি, যিনি ধীরে ধীরে ঈশ্বরের আদিষ্ট কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিয়া সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবন সমাপন করেন। ধন্য তিনি যিনি সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপন কথার সহিত আপন কার্য্যের মিল রক্ষা করেন। ঈশ্বর করুন এ প্রকার দৃষ্টান্তস্থল সাধু সজ্জন দ্বারা পৃথিবীর মুখ উজ্জ্বল হইক।

ঋষি-উপাখ্যান

ধরিয়া অতিথি মহর্ষির পদ দুটি
পড়িল ভক্তির সহ ভূমে শির লুটি'।
বাক্য পরে কহিল এমনি মৃদু স্বরে
ক্ষীণ-তোয় নদী যেন মৃদু মন্দ ঝরে।
"নাহি কুল নাহি গোত্র নাহি মম নাম
নাহি পুত্র নাহি পিতা নাহি কোন ধাম।
আছিল সংসারে যাহা জন্মের বন্ধন
অতি বাল্যকালে তাহা করেছি খণ্ডন
কাশীতে দণ্ডীর কাছে লয়েছি সন্ন্যাস
দণ্ডী দিয়াছেন নাম "অরণ্য প্রবাস"
সেই হতে তীর্থে তীর্থে বেড়িয়া বেড়াই
কেহ বা সন্ন্যাসী বলে কেহ বা গোঁসাই।
কত কৃচ্ছ্র সাধিয়াছি ওগো তপোধন
কতই সঙ্কট তীর্থে করেছি ভ্রমণ।
রাখিয়াছি শিরে জটা দীর্ঘ নখাঙ্গুলে
হইয়াছি ঊর্দ্ধ বাহু ঊর্দ্ধে বাহু তুলে।
তুষার গলিত স্রোতে হইয়া মগন
মাঘের যামিনী কত করেছি যাপন।
নিদাঘে মধ্যাহ্ন রবি প্রচণ্ড যখন
বসিয়াছি তার মাঝে জ্বালি' হুতাশন।
বসনের প্রয়োজন সেধেছি বল্কলে,
ক্ষুধায় খেয়েছি পত্র পড়েছে যা গ'লে

কণ্ঠেতে, করিয়া শালগ্রামে কণ্ঠহার,
দেশে দেশে বহিয়াছি পাষাণের ভার,
জ্বেলেছি যজ্ঞের অগ্নি ছুঁয়া'য়ে অম্বর।
ঢেলেছি তাহাতে হবি কতেক বৎসর।
ডেকেছি বরুণে মন্ত্র করি উচ্চারণ,
অর্চ্চিয়াছি ইন্দ্র যম অর্য্যমা পবন।
কিন্তু প্রভু ঘুচিল না মনের শূন্যতা
কিছু না হইল ক্ষয় অজ্ঞান অন্ধতা।
ব্রহ্মজ্ঞান বিনা দেব শুনিবারে পাই
জীবের মুক্তির আর অন্য পথ নাই।
অতএব এই শোকে জ্বলে প্রাণ মন
আপনি শোকের মম করুন মোচন।
ইহা শুনি কহিলেন মহর্ষি তাপস
নৈশ অর্চনা হতে দ্বারে দিন দশ,
যথারীতি উপনীত করি' তার পরে
ব্রহ্মজ্ঞান কথা আমি বলিব তোমারে।
ইহা বলি মহাঋষি মুদিলা নয়ন
সন্ন্যাসী আসিয়া দ্বারে পাতিলা আসন।

চলি' গেল দশ দিন পোহা'ল শর্ব্বরী
শুভ্র উষা এ'লো পূর্ব্বদিক্ আলো করি'।
নিত্য জাগরূকা উষা নিত্য আসে যায়
হরিয়া মর্ত্ত্যের আয়ু জীর্ণ করে তায়,
এই রূপে প্রতিদিবা আপনি জাগিয়া
ঘুমন্ত বিশ্বের নিদ্রা দিতেছে ভাঙ্গিয়া।
প্রভাতের উপাসনা ঋষি সাঙ্গ করি'
'অগ্নে নয় সুপথা'—বলিয়া তান ধরি'
গাইলেন বেদ মন্ত্র কাঁপায়ে মেদিনী
কন্দরে কন্দরে সাড়া দিল প্রতিধ্বনি।
অরণ্য-প্রবাস তবে শিষ্যের মতন
ঋষির সমীপে গিয়া বন্দিল চরণ।
উপনীত করি' তারে মহর্ষি দেবল
কহিলেন আত্মকথা পবিত্র নির্ম্মল।

দুই বিদ্যা মানবের বেদিতব্য হয়,
একে পরা অপরে অপরা বিদ্যা কয়।
ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব্ব বেদ আদি
সকলি অপরা বিদ্যা ক'ন ব্রহ্মবাদী।
অপরা এ সব হ'তে অপর যে হয়
পরা বিদ্যা তাই যাহে ব্রহ্মের নিশ্চয়।
ইহাই জানিতে হবে ইহাই জানিতে
অরণ্য-প্রবাস শুন অবহিত চিতে।
শুনা নাহি যায় যাঁরে দেখা নাহি যায়
স্বরূপ বর্ণন যাঁর না হয় কথায়,
বর্ণহীন গোত্রহীন ইন্দ্রিয় অতীত,
পাণিপাদ নাই কিন্তু হন সর্ব্বগত।
হেন সূক্ষ্ম সনাতন অব্যয় ঈশ্বরে
ধীর ঋষি ধ্যানযোগে দেখেন অন্তরে।
উপলব্ধি হইবে সহজে ব্রহ্মজ্ঞান
অতএব শুন বলি প্রাচীন আখ্যান।
পূর্ব্বকালে প্রজাপতি সকলের হিতে
করিয়াছিলেন ব্যক্ত ত্রিলোক মাঝেতে।
"পরিশুদ্ধ যেই আত্মা অপহত পাপ
নাই যাঁর জরা মৃত্যু নাই শোক তাপ,
সত্য যার সংকল্প যিনি সত্যকাম
ক্ষুধা তৃষ্ণাহীন নিজে তৃষিত-আরাম।
তাঁরে সদা অন্বেষণ করিতে হইবে,
জিজ্ঞাসিবে তার তথ্য আত্মজ্ঞ মানবে।
অন্বেষণ করি' তাঁরে জানে সেই জন
সকল কামনা তার সিদ্ধ অনুক্ষণ।
অমর লোকেতে ইহা শুনিল অমর
শুনিল অসুর নর মর্ত্ত্যের উপর।
অতঃপর আত্মজ্ঞান লভিবার তরে
দেবাসুর উভে ইচ্ছা করিল অন্তরে।
দেবপ্রতিনিধি ইন্দ্র গেলেন শিখিতে
গেল পুরোচন অসুরের পক্ষ হতে।
দুই জনে সমিত করিয়া আহরণ
গেলেন চলিয়া প্রজাপতির ভবন।
দুয়ারে বসিয়া তাঁর অসুর অমর
সাধিলেন ব্রহ্মচর্য্য বত্রিশ বৎসর।
অতঃপর প্রজাপতি মনে হয়ে প্রীত
তাহাদের সম্মুখে হলেন উপস্থিত।

কহিলেন প্রয়োজন কহ মঘবন্
তোমারি বা পুরোচন কিবা প্রয়োজন?
উত্তরে কহিল তারা হয়ে যুগ্মপাণি
হইয়াছে ব্যক্ত দেব এই তব বাণী
"পরিশুদ্ধ যেই আত্মা অপহত পাপ
নাই যাঁর জরা মৃত্যু নাই শোক তাপ,
সত্য যাঁর সঙ্কল্প যিনি সত্যকাম
ক্ষুধা তৃষ্ণাহীন নিজে তৃষিত-আরাম,
তাঁরে সদা অন্বেষণ করিতে হইবে,
জিজ্ঞাসিবে তাঁর তথ্য আত্মজ্ঞ মানবে।
অন্বেষণ করি' তাঁরে জানে যেই জন
সকল কামনা তার সিদ্ধ অনুক্ষণ।"
অতএব এই আত্মজ্ঞান শিখিবারে
এসেছি আমরা দেব আপনার দ্বারে।
শুনি' প্রজাপতি হৃষ্ট হইয়া প্রচুর
হাসিলেন দেখি কার বুদ্ধি কত দূর।

সাধুর পবিত্র অতৃপ্তি।

(কোন মহিলাপ্রণীত "নীহারিকা"
অবলম্বন করিয়া লিখিত)

"জনম অবধি হামরূপ নিহারিণু নয়ন না তরপিত ে ।"

হে সৌন্দর্য্যের একমাত্র আধার পরমেশ !
বর্ষ বর্ষ ধরিয়া তোমার অরূপ রূপমাধুরী (-
খিলাম তথাপি অন্তর অতৃপ্ত। আ র
পিপাসা অনন্ত, অনুদিন তোমার নির য
শোভা পান করিয়া সাধ পূরিল না। ত
দেখি না কেন তথাপি হৃদয় অস্থির; অ রা
স্পষ্টরূপে আরো উজ্জ্বলরূপে দেখিতে ছা
করে। নব অনুরাগে তোমাকে সদা দে য়া
দেখিয়া তোমার প্রেমানন আমার প্র ার
ভিতর নিরন্তর জাগিতেছে। আমার নয় ার
সম্মুখে আনন্দভরে তোমার সুন্দর মুখ প্র শ
পাইতেছে। যেই দিকে নেত্রপাত রি
সেই দিকে তোমার বদন দেখিতে পাই
তথাপি আশা পূরিতেছে না। প্রতিবার
প্রিয়দর্শনে মনে নূতন প্রেমোচ্ছ্বাস ও ধম-
নীতে উষ্ণ শোণিতের প্রবাহ বহিতে থাকে।
তব দর্শনে আমার চিত্ত বিহ্বল হইয়াছে;
দিবস রজনী তোমার মূর্ত্তি আমার চিন্তার
সঙ্গে মিশ্রিত রহিয়াছে। হে প্রিয়! তুমি
বিশ্বময়। আমার চঞ্চল নেত্রদ্বয় কিবা
নীলাম্বরে কিবা ধরাতলে চাহিয়া চাহিয়া
থাকে এবং তোমাকে দৃষ্টির সীমায় রাখিতে
চেষ্টা করে কিন্তু তুমি প্রতি পলকের সঙ্গে
মিশাইয়া যাও; আবার আবার তোমাকে
অতৃপ্ত হইয়া দেখি। অরুণ কিরণে তোমার
আনন্দ-জনন সুন্দর আনন সম্মুখে হাসিয়া
ভাসিয়া যায়। প্রতি রশ্মিকণাভরে নূতন
জ্যোতি ধরিয়া তুমি আমার নয়নসম্মুখে
প্রদীপ্ত হও। তোমাকে আনন্দে ধরিতে
যাই কিন্তু তুমি এই আছ, এই নাই! তুমি
কোমল প্রেমচ্ছবিরূপে আমার হৃদয়ের অন্তরে
আছ; তাহারই প্রতিচ্ছায়া জগতে ভাসি-
তেছে। নিশীথ সময়ে যখন সংসার নিস্তব্ধ
ও নিদ্রিত তখন নীল আকাশের তলে যখন
নীরবে বসিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখি তখন
যদি সুদূর হইতে দূর সমীর সঙ্গে সঙ্গীতে
তান মধুরে মধুরে আসিয়া হাসিয়া হৃদয়ে প্র-
বেশ করে তখন সেই সুধাস্বর শ্রবণ করিয়া
চারিধার চাহিয়া দেখি, কারণ তুমি যে আমার
অশরীরী সঙ্গীত তোমাকে সেই সঙ্গীত স্মরণ
করাইয়া দেয়। নীলিম সাগরে যখন প্রযুত
তারকা মাঝে পূর্ণ শশধর দীপ্তি পায় এবং
শ্রাবণের ধারা মত যত রজতকৌমুদী নিশীথ
সময়ে বসুধায় ঝরিয়া পড়ে তখন সৌন্দর্য্য-
বিমুগ্ধ প্রাণে সে শোভা পানে চাহিয়া শত-
বার তাহাতে তোমার বদন দেখি তথাপি
সে দর্শনে চিত্ত কখন স্থির হয় না। নিদাঘ
গগনে যখন সচল সৌদামিনী নবীন জলদের
অঙ্গে নাচিতে থাকে এবং তাহার শোভাময়
হাসির অতুল মাধুরী-রাশি দেখিয়া বিশ

চর মুগ্ধ হয় তখন যখন চক্ষু শূন্যেতে তুলিয়া এবং সংসারের অস্তিত্ব ভুলিয়া আমি ও অবনী অম্বরে পুলকে চাহিয়া দেখি তখন দূরে ও অসীম শূন্যে তোমারই স্নন্দর ছবি প্রকাশিত দেখি। নবপল্লবিতা কুসুম কোমলা বসন্ত-প্রকৃতির রাজত্ব সময়ে যখন সুরভিচুম্বিত বায়ু সৌরভ ঢালিয়া চলিয়া যায় এবং মোহময় পিককণ্ঠ হইতে সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস নির্গত হইতে থাকে এবং সেই চারু ললিত তানে আনন্দ-প্রবাহ প্রাণে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন পুলকিত হইয়া বসন্ত-প্রকৃতিতে তোমারই প্রেমানন বিশেষরূপে বিরাজমান দেখি তথাপি নয়ন অতৃপ্ত থাকে। হৃদয়-অন্তরে এবং কবিত্বময় বাহ্য জগতে জড়প্রকৃতির মনে তুমি সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান আছ দিব্যজ্ঞানে ইহা অনুভব করিয়া সুদূর সীমায় তোমার মুখ সর্ব্বদা দেখি এবং অসীম আকাশ তোমার মধুর সত্তায় পরিপূর্ণ দেখিয়া চাহিয়া চাহিয়া হাসি তথাপি আমার হৃদয় তৃষাকুল থাকে, আমার অনন্ত পিপাসা পূর্ণ হয় না। এ জীবনে তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া আশা পূরিবে না। তোমার চিন্তা জীবনের শত সুখ বর্দ্ধিত করে। সত্যময় সুকল্পনা দ্বারা হৃদয় প্লাবিত করিয়া এবং অন্তর প্রীতির উচ্ছ্বাস-স্বপ্নে ঢালিয়া তোমার প্রিয়মুখ ভাবি। হে জীবন-সম্বল! অবনী ও অম্বর সকলই তোমার বদনের ছায়া। তোমাতে চিত্ত মুগ্ধ অথচ তোমার আরো স্পষ্টতর দর্শন-লালসায় তাহা সতত চঞ্চল। গভীর নিশাতে নিদ্রার আবেশে যখন এ বিশ্বসংসার ভুলিয়া থাকি তখনও আমার মানস সরোবরে তুমি প্রীতি-জ্যোতিতে ভাসিতে থাক। আমি সুখের স্বপ্নে নিত্য তোমায় দেখিয়া জাগ্রত হইয়া আমার শূন্য গৃহের দিকে চাই। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকে তুমি আঁধারের কিরণের ন্যায় দীপ্তি পাও; তোমার বদন কম্পিত প্রাণে দর্শন করি। যখন প্রবাসে চিত্রিত আকাশতলে প্রকৃতির চারু ছবি সায়াহ্ন-রক্তিম সূর্য্য অস্ত যায় তখন নীরবে বসিয়া তুমি সান্ধ্য শোভার সঙ্গে মিশাইয়া রহিয়াছ এইরূপ ভাবি। তখন প্রকৃতিকে তুমিময় দেখি,তথাপি অন্তরে ক্ষণেকের তরে তৃপ্তি হয় না। এইরূপ তোমায় দেখিয়া অনন্ত বাসনা আমার চিত্তে রহিবে তব দর্শনের কি মৃতসঞ্জীবনী শক্তি! জাহ্নবী-সৈকতস্থিত শ্মশান-ভূমির ন্যায় যদি কোন আত্মা শ্মশানে পরিণত হয় কিন্তু তুমি যদি তাহার উপর দিয়া কভু চলিয়া যাও তাহা হইলে সেই শ্মশান-ভূমির দগ্ধ পরমাণু সকল তোমার চরণস্পর্শে নব জীবন লাভ করিয়া আনন্দে কাঁপিতে থাকে এবং প্রতি পরমাণু-কণা আবার তখন অধীর হইয়া তোমার চরণ চুম্বন করে। হৃদয় নয়ন দ্বারা আজীবন তোমাকে দেখিবে কিন্তু তথাপি সাধ পূরিবে না, তাহা সতত অস্থির থাকিবে। অন্তিমে তোমার মুখ দর্শন করিয়া মরণ-সময়ে অসীম সুখ লাভ করিব কিন্তু চির অতৃপ্তি এমনি করিয়া নিত্য জীবনের সঙ্গে মিশিয়া থাকিবে। পরকালের রাজ্যে যাইলেও আত্মায় তোমার দর্শন-তৃষা রহিবে। অমরতার জ্যোতিতে তোমার ঐ সুন্দর বদন আরো উজ্জ্বলতর দেখিব কিন্তু যতই হেরিব সাধ পূরিবে না। নিত্যকাল এইরূপে যাইবে।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি।

ঈশ্বর অগম্য অপার। কেহই তাঁহাকে সম্যক রূপে জানিতে পারে না। যাহা কিছু সম্যকরূপে জানা যায় তাহা কখন ঈশ্বর হইতে পারে না। তাহা বলিয়া আমরা কি তাঁহার কিছুই জানিতে পারি না? আমরা সহজ জ্ঞানে বুঝিতেছি তিনি জগতের মূল কারণ—তিনি সত্য স্বরূপ ও অনন্ত জ্ঞান

স্বরূপ। সেই জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে। যাহা কিছু সকলই তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। "কোহোবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ" কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি এই আকাশে এই আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। তিনি প্রাণের প্রাণ। আমরা সকলে তাঁহা হইতে প্রাণ পাইয়াছি। তিনি আমাদের পিতা মাতা। তাঁহার সকল স্বরূপ আমরা নাই বুঝিতে পারি তাহাতে আমাদের নিরাশ হইবার কিছু নাই, তাঁহাকে ত আমরা আমাদের পিতা মাতা বলিয়া বুঝিয়াছি, ইহাতেই আমাদের জ্ঞান চরিতার্থ হইয়াছে। কিন্তু কেবল মাত্র তাঁহাকে পিতা মাতা বলিয়া জানিলে কি হইতে পারে? যদি অনুগত সৎ পুত্রের ন্যায় তাঁহার আদেশ পালন করিয়া তাঁহার মুখের প্রসাদ অনুভব করিতে না পারি, যদি তাঁহার পিতৃভাব মাতৃভাব অনুভব করিয়া তাঁহার সহবাস-জনিত আনন্দ ভোগ না করিতে পারি, তবে তাঁহাকে জানা আর না জানা সমান। তাঁহাকে ভোগ করিয়া যে বিশেষ তৃপ্তি, তাহাই যদি জীবনে না ঘটিল, তবে জীবন ধারণের কোন অর্থই বুঝিতে পারা যায় না। মন যেমন চক্ষু ও আলোকের সাহায্যে জগতের সুন্দর বস্তু ভোগ করে—আত্মা তেমনি একমাত্র ভক্তির সাহায্যে সুন্দর পরমাত্মাকে সম্ভোগ করে। তাঁহার স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। ভক্তি আত্মায় বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্য করে। ইহা নিমেষ মধ্যে আত্মাকে পরমাত্মার সহবাস-সুখে সুখী করে। যখন ভক্তি-যোগে আমরা তাঁহাকে ডাকিতে থাকি, যখন বলি, পিতা দেখা দেও—অখিল-জননী—আমি তোমায় দীন হীন সন্তান, আমাকে দেখা দেও—আমি তোমার ক্রোড়ে যাইয়া ক্রীড়া করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, তোমার মুখের স্নেহময় মধুর হাস্য সম্ভোগের জন্য পিপাসু হইয়াছি—তখন তিনি কখনই স্থির থাকিতে পারেন না। তখন হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে মধুর স্বরে নিনাদিত হইতে থাকে "ভক্তি যোগে ডাক্‌লে পরে থাক্‌তে পারি কৈ"। হা! সে কি মধুর স্বর—ইহা একেবারেই আমাদের প্রাণ মন হরণ করে। সে স্বরের তুলনা কোথায়! সে ভাষাহীন ভাষা। তাহা হৃদয় বুঝিতে পারে, কিন্তু ব্যক্ত করিতে পারে না।

যত আমরা তাঁহার মধুর স্বর শুনিতে পাই উৎসাহের সহিত তত আমরা আরো তাঁর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকি। তাঁহার মধুর স্বর পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টতর ও মধুরতর রূপে ধ্বনিত হইতে থাকে। এই ভক্তির আলোকে ভক্তির দীপালোকে যখন আমরা তাঁর আরতি করি, তখন তাঁহার প্রেম-মুখ আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে কেমন প্রস্ফুটিত হয়! সে প্রফুল্ল মুখের স্নিগ্ধ জ্যোতি যাহার আত্মায় না পড়িল, সে আর কোথায় গিয়া শীতল হইবে? কোথায় গিয়া শান্তি-সুখ অনুভব করিবে? এই ভক্তি-যোগে যখন তাঁর প্রেম-মুখ হৃদয়-মন্দিরে নিরীক্ষণ করিতে থাকি, তখনকার অবস্থা কে প্রকাশ করিতে পারে? সে এক সময়। তখন যত প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে দেখি দেখিবার ইচ্ছা তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। "নয়ন না ফেরে আর কোথায়" তখন চক্ষুরূপ নির্ঝর হইতে প্রেমাশ্রু নির্গত হইয়া আমাদের দগ্ধ হৃদয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। সে শান্তি হৃদয় আর কখন বিস্মৃত হইতে পারে না। তখন আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই বলিয়া উঠি—"যায় শোক যায় তাপ

যায় হৃদয়-ভার সর্ব্ব সম্পৎ তাহে মিলে যখন থাকি তব সাথ” তাঁহাকে সাক্ষাৎ পিতা মাতা ও প্রেমদাতা রূপে হৃদয়ে দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিব বলিয়াই তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ভক্তিই সে দর্শন লাভের—সে তৃপ্তি লাভের একমাত্র কারণ—ভক্তিই ব্রহ্মপূজার একমাত্র সুরভি কুসুম। এই কুসুম যেন পাপ তাপে ও সংসার-সন্তাপে শুষ্ক ও দগ্ধ না হয়। একই সূর্য্য হইতে যেমন সহস্র রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া অন্যান্য গ্রহকে আলোকিত করে, তেমনি একই ঈশ্বর ভক্তি হইতে পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি গুরুভক্তি দাম্পত্য প্রেম, অপত্য-স্নেহ বন্ধুর প্রতি ভালবাসা ও স্বদেশ-প্রেম এবং দীন দুঃখীর প্রতি দয়া প্রভৃতি রশ্মি বিনির্গত হইয়া পিতা মাতা গুরু স্ত্রী, পুত্র কন্যা, বন্ধু স্বদেশ এবং দীন দুঃখীদিগকে আনন্দিত ও আলোকিত করে।

ভক্তি! তুমি যার হৃদয়ে বাস কর তার সৌভাগ্যের সীমা কোথায়? আমরা যেন ভক্তি-বিরহিত হইয়া এমন দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে বিফলে যাইতে না দিই।

আর্য্যজাতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল পণ্ডিত-প্রবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ভারতনিবাসী আর্য্যদিগের “উৎপত্তি স্থান” শীর্ষক যে এক সন্দর্ভ “কল্পদ্রুম” পত্রে প্রকাশ করেন, তাহার অধিকাংশই আমাদের মত-পোষণোপযোগী বিধায় আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলেন—“বিধাতা যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রকৃতি ভিন্ন, জলবায়ু ভিন্ন, জীব জন্তু ভিন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন ভারতের মনুষ্য ভারতে সৃষ্ট না হইয়া অন্যত্র সৃষ্ট হইয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে, এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা কিরূপে সঙ্গত হয়? ভারতের বন জঙ্গলে যে পশুপক্ষী আছে, ভারতের নদ নদী ও সরোবর প্রভৃতি জলাশয়ে যে মৎস্য আছে তাহারা কি ভারত-জাত নয়? তাহারা কি অন্য দেশ হইতে আসিয়া বাস করিয়াছে? অন্য দেশের কথা দূরে থাকুক, এই বাঙ্গালা দেশেরই এক অংশের পশু পক্ষী ও মৎস্য প্রভৃতি অপর অংশে দৃষ্ট হয় না। ২৪ পরগনায় লোণা খালের ভেট্‌কী পার্‌শে প্রভৃতি বর্দ্ধমানে জন্মায় না। সুন্দরবন-জাত ব্যাঘ্রের সহিত অন্য বনজাত ব্যাঘ্রের বহু বৈলক্ষণ্য আছে। এই মাত্র নয়, ইয়োরোপে যতপ্রকার পশুপক্ষী আছে, বাঙ্গালায় তাহার সমুদয় নাই। আবার বঙ্গদেশ-জাত পশু পক্ষীর অধিকাংশ ইয়োরোপে দৃষ্ট হয় না। অধিক কি, তরু লতা গুল্মাদিরও বহুল বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে যখন সিংহ শার্দ্দুল নাগ কাকোলূক দংশমশকাদি ভিন্ন ভিন্ন জীব জন্তু জন্মিবার ব্যবস্থা হইল, তখন ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন মনুষ্য না জন্মিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

দ্বিতীয়, যদি ভিন্ন দেশ হইতে মনুষ্য ভারতে আসিয়া বাস করিবার প্রবাদটী সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ইয়োরোপীয় ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা সেই প্রবাদের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেটী প্রকৃত নহে। কারণ, পৃথিবী এককালে মনুষ্যের বাসযোগ্য হয় না। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, প্রথমে মৎস্য, তৎপর সরীসৃপ তাহার পর মনুষ্য ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে জন্মিয়াছে। যে রীতিক্রমে মানব সৃষ্টি হউক, সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই যে মনুষ্য এককালে সমতল ভূমিতে বাস করিয়াছে;

এরূপ বোধ হয় না। পর্ব্বতেই মনুষ্যের প্রথম জন্ম। প্রবাদ আছে মানুষ আদিম অবস্থায় পর্ব্বতগুহায় বাস ও নির্ঝর-জল পান এবং মৃগবা মৃগের মাংস ভোজন ও ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। তৎপর যখন পৃথিবী সাগর-সলিল হইতে উত্থিত হইয়া কৃষিকার্য্যের যোগ্য হইল তখন মানুষ পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া উপত্যকায়, উপত্যকা হইতে সমতল ভূমিতে বাস করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিল। তাহার পর যখন বংশবিস্তার হয়, প্রথম বসতিস্থানে বাস-সমাবেশ দুরূহ হইয়া উঠে, তখন তাহারা বাসোপযোগী সুখকর স্থান অন্বেষণ করিতে থাকে। যে দিকে শস্য-সম্পত্তির সুবিধা দৃষ্ট হয় সেই দিকেই ধাবমান হয়। ভারতীয়েরা এই রীতিক্রমে হিমালয়ের বাসযোগ্য অংশে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে দক্ষিণে ও পূর্ব্বে গমন করেন। বাঙ্গালা দেশে ক্রমে এইরূপে বসতি হইয়াছে। হিমালয়ের বাসযোগ্য অংশে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়া যেমন পঞ্জাবাদি বলবীর্য্যকর শস্য-ভূয়িষ্ঠ উৎকৃষ্ট প্রদেশে বাস করিয়াছিল, তেমনি বিন্ধ্য পর্ব্বতশ্রেণীতেও প্রথম মনুষ্য উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণাপথের সমতল ভূমিতে বাস করে। পঞ্জাবাদি শস্যপূর্ণ স্বাস্থ্যকর প্রদেশে যাহারা বাস করে, তাহারা দক্ষিণাপথবাসীদিগের অপেক্ষা অধিকতর বলিষ্ঠ হয়। ঐ বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা ক্রমে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণাপথবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের অধিকৃত স্থান অধিকার করিয়া তাহাদিগকে আপনাদিগের অধীনস্থ করিয়া লয়। ইহাই ভারতীয় আর্য্যদিগের ভারতের বহির্ভাগ হইতে ভারতে আসিবার প্রবাদ প্রচলিত হইবার কারণ। বাস্তবিক, ভারতীয় আর্য্যেরা ভারতেরই লোক, ভারতই ইহাদিগের জন্মভূমি, ইহাঁরা অন্যত্র হইতে আসিয়া ভারতে বাস করেন নাই। ইটালিক, গ্রীক্, জর্ম্মাণ প্রভৃতির যে বীজ পুরুষ ইহাদিগের সে বীজ পুরুষ নহে।

তৃতীয় ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, এক সময়ে এক স্থানে আর্য্য নামে এক জাতির বাস ছিল। তাহারই বংশধরেরা গ্রীশ, ইটালি, পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিয়াছে, একথা কোন ক্রমেই সমূলক বলিয়া আদৃত ও পরিগৃহীত হইতে পারে না। কারণ অমরসিংহ আর্য্য শব্দের সৎকুলোদ্ভব অর্থ করিয়াছেন। অন্য অন্য আভিধানিকেরা বলেন, আর্য্য শব্দের অর্থ পূজ্য। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা যে জাতির সন্তান-সন্ততিগণের যে সময়ে নানা স্থানে গমনের কথা বলেন, সে সময়ে সে জাতি আর্য্য নামের যোগ্য হয় নাই। তখন সে জাতির আদিম অতি অসভ্য অবস্থা। তখন সে জাতির সমাজ-বন্ধন ও কুলের সৃষ্টি হইয়া কুলীন মৌলিক বংশজ এ বন্ধনও হয় নাই, সুতরাং তাহাদিগের সৎকুলোদ্ভব ও পূজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার অভিমান জন্মে নাই।"

আপাতত আমরা আর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কোন কথা উদ্ধৃত করিব না। তিনি ভাষা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন সে বিষয় পশ্চাৎ বিবেচনা করা যাইবে।

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ ও রামায়ণ ও মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে উত্তর-কুরুর উল্লেখ থাকায়, ঐ উত্তর কুরু কাসগারের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়া কোন কোন লেখক সেই উত্তরকুরু আর্য্যজাতির উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। যাস্ক-ঋষি স্বপ্রণীত নিরুক্তের একস্থানে কাম্বোজ দেশে 'শবতি' ক্রিয়া গত্যর্থে প্রচলিত থাকার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সেই দেশে আর্য্য-বসতি ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই কাম্বোজ দেশ আধুনিক বোখরার সন্নিহিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু

আমরা দেখিতেছি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এমনি পক্ষপাতান্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে, হিমালয়ের প্রান্তবর্ত্তী যে দুই একটী দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লেখ আছে তাঁহারা কোন মতে স্বীয় মত সমর্থন জন্য টানিয়া বুনিয়া সে গুলিকে কাস্পিয়ান হ্রদের নিকটে লইয়া যাইতেছেন। কালিদাস রঘুবংশের রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে যাহা লিখিয়াছেন, তৎপরে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ দেবপাল দেবের শাসনপত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে সেই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বোধ হইতেছে প্রাচীন কাম্বোজ দেশ আধুনিক পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী। এমন কি কাবুলের কিয়দংশ হইলেও হইতে পারে। এই কাম্বোজ দেশ বোখরার নিকটবর্ত্তী স্থান, এইরূপ নির্ণয় করা আমাদের নিকট বাতুলতা বলিয়া বোধ হয়। যদি গান্ধার দেশ অদ্যাপি কান্দাহার নামে পরিচিত না থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় ইহাকেও কোন মতে টানিয়া বুনিয়া কাস্পিয়ান হ্রদের এক পার্শ্বে নেওয়ার চেষ্টা করা হইত।

আবার বেদের কোন একস্থানে একটী লতার উল্লেখ আছে। সেই লতাটী হিমালয়ের উত্তর দিক হইতে আনীত হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে আর্য্যগণ হিমালয়ের উত্তর দিকের খবর রাখিতেন। তবে ত নিশ্চয়ই আর্য্যগণ হিমালয়ের উত্তর দিকে বাস করিতেন। কি আশ্চর্য্য, ভূমণ্ডলে সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা মহর্ষিগণ এমনি অপদার্থ ছিলেন, যে তাঁহাদের নিবাসভূমির পার্শ্ববর্ত্তী দেশেরও তাঁহারা কোন খবর রাখিতেন না। যাহা হউক এবম্প্রকার প্রলাপ-বাক্য সমূহের প্রতিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। এইক্ষণে আমরা দেখাইব আর্য্যগণ তাঁহাদের নিবাস-ভূমির কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ভগবান মনু মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে বলিয়াছেন "গর্ভাধানাদি অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত যে বর্ণের সংস্কার বিধি মন্ত্র দ্বারা কথিত হইয়াছে, এই শাস্ত্রে তাহারই অধিকার, অন্য কাহার নয়।" ইহার পরে সেই বর্ণের নিবাসভূমি বা ধর্ম্মের অনুষ্ঠানযোগ্য দেশের কথা বলিতেছেন।

সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। ১৭॥
তস্মিন দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে। ১৮॥
(দ্বিতীয় অধ্যায়।)

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী দেবনির্ম্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলা হয়। ঐ দেশে বর্ণ সমূহের পুরুষপরম্পরাগত যে আচার, তাহাকে সদাচার বলিয়া থাকে।

হিন্দুকুশ বা হিমালয় যে স্থানই আর্য্যজাতির সূতিকাগৃহ হউক না কেন, তাহা স্থির করিয়া কেহ বলিতে পারেন না। যে সময়ে ইতিহাস দূরে থাকুক তাহার পিতামহী ভাষাও জন্মগ্রহণ করেন নাই সেই সময়ের কথা স্থির রূপে বলিতে যাওয়া বাতুলের প্রলাপ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে *।

* প্রায় ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি ভবানীপুরে ছিলাম, সেই সময় একদা কয়েক জন বন্ধুর সহিত আর্য্যজাতির উৎপত্তি-স্থান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের প্রকাশিত মত লইয়া গল্প করিতেছিলাম। ঐ সময় তথায় একজন গ্রন্থকার ছিলেন। কিছু কাল পরে গ্রন্থকার মহাশয়ের প্রণীত "ভারতীয় গ্রন্থাবলী" প্রকাশিত হইলে দেখিলাম যে, গল্প কালে আমি যে সকল কথা বলিয়াছিলাম তাহার কিয়দংশ বিকৃত অবস্থায় সেই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি:—"আমার মতে হিন্দুকুশের উত্তর "ইন্দারালয়" বা "ইন্দ্রালয়" প্রাচীন আর্য্যের আদি বাসস্থান। (See jhonston's large wall map of Asia.) সর্ব্ব প্রথম উহারা এই স্থান হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রালয় শব্দের অর্থ ইন্দ্রের আলয়; অর্থাৎ ইন্দ্রত্ব (ঐশ্বর্য্য শ্রেষ্ঠত্ব) প্রাপ্ত প্রাচীন আর্য্য সন্তানের বাসভূমি। ঐ নগর অদ্যাপি লক্ষিত হয়। আধুনিক ইন্দ্রালয় যে স্থান তাহার আনুমানিক দুই শত ক্রোশ উত্তরে প্রাচীন ইন্দ্রালয় ছিল।" এই কথা গুলি যদি কেবল ভরতীয় গ্রন্থাবলীতেই আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে এক্ষণে আমরা তৎ সম্বন্ধে কোন কথাই

যাহা হউক এই ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশেই যে আর্য্য-জাতির মনুষ্যত্বের প্রথম সূচনা হয় বোধ হয় ইহা নিতান্ত পক্ষপাতান্ধ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহই অস্বীকার করিবেন না।

তৎপরে মনু বলিতেছেন ঃ—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ। ১৯॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।২০॥
দ্বিতীয় অধ্যায়।

ক্রমে আর্য্যদিগের উন্নতির সহিত বংশ-বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অগত্যা কুরুক্ষেত্র মৎস্য কান্যকুব্জ ও মথুরা প্রভৃতি প্রদেশ গুলি যে দেশের মধ্যগত তাহাকে ব্রহ্মর্ষি আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক আর্য্য ঋষিগণ তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের শৈশব-দোলা ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে ইহাকে কিছু হীন রাখা হইল। ইহা স্বভাবত হইয়া থাকে। তত্রাচ বলা হইল যে "পৃথিবীর সমুদয় মানব ব্রহ্মর্ষি-দেশ-জাত ব্রাহ্মণের নিকটে স্ব স্ব আচার শিক্ষা করিবে।

তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে মনু বলিলেন যে "উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত, পূর্ব্বে প্রয়াগ, পশ্চিমে বিনশন ইহার মধ্যবর্ত্তী দেশকে মধ্যদেশ বলা যায়।"

ক্রমে আর্য্যদিগের প্রবল উন্নতির সহিত বংশবৃদ্ধি হইয়াছে, এক্ষণে মধ্য দেশেও তাঁহাদের স্থান সঙ্কুলন হয় না। বৃহৎ দেশের প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ড অধিকার করিলেন, সেই ভূভাগ তাঁহাদের গৌরবাত্মক আখ্যার অংশ লাভ করিল।

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ২২॥
(দ্বিতীয় অধ্যায়)

পূর্ব্ব পশ্চিমে দুই সমুদ্র। এক দিকে পশ্চিম সমুদ্র বা আরব সাগর, অন্য দিকে পূর্ব্ব সমুদ্র বা বঙ্গীয় অখাত। উত্তর দক্ষিণে দুই বৃহৎ পর্ব্বতশ্রেণী। ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকেই বুধগুলা আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যে সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত-নিবাসী আর্য্যগণ জ্ঞান লাভ করিয়া আর্য্য-আখ্যা ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন সেই সময় সমস্ত জগত অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন। ফরাসী জর্ম্মাণ ইংরাজ প্রভৃতি জাতীয় মানবগণ ত সে দিন মনুষ্য-নামে পরিচিত হইয়াছেন। গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতি সমূহের পিতৃপুরুষগণও তখন জ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতাচারে অবস্থান পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্য বর্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা কিরূপে আর্য্য আখ্যার অংশভাগী হইবেন।

বলিতাম না। ক্রমে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। আমাদিগের গল্পের পরিণাম যে এরূপ হইবে ইহা আমরা কখনও চিন্তা করি নাই। ইতিহাসের জন্মের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ঘটনার স্থান স্থির রূপে নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া আমরা কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া বোধ করি না। যাহা হউক এই আশ্চর্য্য ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ভাবন বা ইয়োরোপীয় অগ্রগামী কল্পনা-অশ্বের শ্রাদ্ধকাণ্ডের মূলমন্ত্র এস্থলে আমরা প্রকাশ করিব। সুবিখ্যাত রেনেল সাহেব তাঁহার Memoir of a map of Hindoostan or the Mogal Empire গ্রন্থে "সিন্ধু নদের উৎপত্তি স্থান হইতে কাস্পিয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত" ভূখণ্ডের একখানি স্বতন্ত্র মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ মানচিত্রে হিরাট নদীর একটী উপস্রোতস্বতার তীরে, ও আটকনদীর উৎপত্তিস্থান হইতে দশ ক্রোশ, ও কাবুল নগরী হইতে সমসূত্র রেখায় চল্লিশ ক্রোশ উত্তরে ও সিন্ধুনদের তীর হইতে একশত ক্রোশ ও কাশ্মীর নগরী হইতে সমসূত্র রেখায় প্রায় ১৫০ ক্রোশ পশ্চিম উত্তর কোণে "ইন্দিরাব (Inderab) নামে একটী নগরী চিত্রিত রহিয়াছে। ক্রমে পরবর্ত্তী পাশ্চাত্য চিত্রকরগণের দ্বারা এই "ইন্দিরাব," "ইন্দিরাল" হইয়া তাহাদের মানচিত্রে প্রকাশ হইয়াছে। এই ইন্দিরাব কাস্পিয়ান হ্রদ হইতে প্রায় চারি শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সুতরাং তাহার দ্বারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতলব হাসিল হইতে পারে না। অতএব টানিয়া বুনিয়া ইন্দিরাবকে ইন্দ্রালয় করিয়া আরও দুই শত ক্রোশ উত্তরে নেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইন্দিরাব আর্য্য-জাতির উৎপত্তিস্থান হইলেও তদ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি নাই, কারণ ইন্দিরাব পঞ্চনদ প্রদেশের প্রান্তবর্ত্তী স্থান। প্রাচীন কালে ইন্দিরাবের আরও পশ্চিমেও হিন্দুদিগের বাস ছিল এরূপ আমাদের বিশ্বাস। উত্তর কালে ঐ স্থান গ্রীকদিগের অধিকৃত বক্ত্রিয়া রাজ্যের অধীন হয়। কিন্তু ইন্দিরাবই হউক আর ইন্দিরালয় হউক উহা তত প্রাচীন নহে। আমার বিবেচনায় "ইন্দিরা" (পাৎকুয়া) ও "আব" (জল) এই দুইটী শব্দ হইতে "ইন্দিরাব" নামের উৎপত্তি। ইন্দিরাব যে প্রাচীন কালে "ইন্দিরালয়" নামে পরিচিত থাকিয়া আরও দুইশত ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ছিল তাহার উপযুক্ত প্রমাণ কেহ উপস্থিত করিতে পারিবেন কি? প্রবন্ধ লেখক।

এই আর্য্যাবর্ত্তে জগতের সর্ব্বপ্রধান ভাষা যাহার কোন না কোন রূপ সাদৃশ্য জগতের সমস্ত ভাষায় দেখা যায় সেই সংস্কৃতের উৎপত্তি। এই আর্য্যাবর্ত্তে ভগবান মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। যে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে মিসর, গ্রীশ, রোম প্রভৃতি দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র জীবন লাভ করিয়াছে, যাহার নকলের নকল ইংরাজ জর্ম্মাণ প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল, এই আর্য্যাবর্ত্তজাত ঋষির লেখনী হইতে সেই সর্ব্বমূল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রসূত।

এই আর্য্যাবর্ত্তে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম ও কবিত্ব বিষয়ক গাথার উৎপত্তি। জগতের যে জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু নির্ব্বিবাদে গ্রহণ-যোগ্য তাহা এই আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী আর্য্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যদিগের দর্শন শাস্ত্র লক্ষ্য করিয়া জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়া গিয়াছেন "ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস ভূমণ্ডলের সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।"

প্রাচীন জগতের শিক্ষক এই আর্য্যাবর্ত্ত হইতে জগতবাসী মানবগণ সাহিত্য, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া মনুষ্য নামে পরিচিত হইয়াছেন!

যখন সমস্ত জগত মূর্খতা-তিমিরে আচ্ছন্ন সে সময় এই আর্য্যগণের মুখ হইতে জগতের সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ বেদের উৎপত্তি। যখন জগতবাসী মানবগণ পূর্ব্ব পশ্চিম জানিত না তখন এই আর্য্যজাতি গ্রহগণের গতি-বিধি নির্ণয় করিয়াছিলেন। যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব চিন্তা করিবার ক্ষমতা সমস্ত জগতবাসী মানবগণের জন্মে নাই, তখন এই আর্য্যজাতির দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি। সেই স্মরণাতীত কালে প্রকৃত আচারে অবস্থান পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং অকর্ত্তব্য বর্জ্জন করিয়া জ্ঞান লাভ দ্বারা আমাদের পিতৃপুরুষগণ যে গৌরবাত্মক "আর্য্য" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তোমরা ইক্রুস্ পিক্রুস্ অদ্যাপি শৌচ কর্ম্ম শিক্ষা করিলে না, অদ্যাপি বিবাহে বিধি-নিষেধ বিচার করিতে শিখিলে না, তোমরা কিরূপে সেই আর্য্য আখ্যার অংশভাগী হইবে। তোমরা বাইবেলের শিষ্য, চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্যসৃষ্টি ও ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জগৎসৃষ্টি স্বীকার করিতে বাধ্য, না হইলে তোমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ মারা যায়, তোমরা কি রূপে সেই স্মরণাতীত কালের সময়াবধারণ করিবে।

যে ব্যক্তি এই আর্য্য জাতি ও আর্য্যাবর্ত্তের মহিমা বুঝিবেন তিনিই জকোলিয়টের ন্যায় বলিবেন ঃ—

Soil of ancient India, cradle of humanity, Hail! Hail, venerable and efficient nurse, whom centuries of brutal invasions have not yet buried under the dust of oblivion! Hail, father land of faith, of love; poetry and of science! May we hail a revival of thy past in our western future.

ক্রমশঃ।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

পঞ্চদশ ব্যাখ্যান।

তিনি এ ভুবন, করেন ধারণ, পাছে ইহা ভাঙ্গি যায়।
পাছে বা তপন, গ্রহ তারাগণ, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ধায়॥

কাহার শাসনে চলে অখিল ভুবন?
সেতু সম কেবা এরে করেন ধারণ?
জীব জন্তু চরাচর,
গ্রহ তারা বিভাকর,
কাহার নিয়ম বশে থাকে অনুক্ষণ?

নাহি ওহে ভ্রান্ত নর! করিও মনন,
সৃজন করিয়া বিশ্ব সৃজন-কারণ,
নিয়মে প্রহরী করি,
নিজ সৃষ্টি পরিহরি,
র'য়েছেন কোথা নাহি জানে কোন জন।

মানবের মত তাঁর হয় কি বিধান?
মানব করিয়া কোন যন্ত্রের নির্ম্মাণ,
হয় ত তাহারে আর,
নাহি দেখে পুনর্ব্বার,
কিরূপে চলিছে তাহা না লয় সন্ধান।

তাঁহার বিধান হয় বিভিন্ন প্রকার,
তাঁহার পালনী রীতি হয় চমৎকার,
থাকিয়া সৃষ্টির সনে,
মাতা সম সঙ্গোপনে,
করিছেন সদা তার মঙ্গল অপার।

সবাকার সাক্ষী তিনি সদা বিদ্যমান,
যন্ত্রী রূপে ইথে তাঁর হয় অধিষ্ঠান,
যে কিছু ঘটনা চয়,
তাঁহারি প্রেরণা হয়,
সকলে চলিছে তিনি যে দিকে চালান।

তিনিই প্রাণের প্রাণ, জীবন-জীবন
তিনি অন্ন প্রাণ সবে করেন যোজন॥
কত যে করুণা তাঁর বলা নাহি যায়।
যতনে জীবেরে দেন ভোগ সমুদায়॥
দিতেছেন তিনি যেবা শোক দুঃখচয়।
মঙ্গল করেন তাহে হয়ত নিশ্চয়॥
আপন ইচ্ছায় তিনি করিয়া সৃজন।
আপন ইচ্ছায় সৃষ্টি করেন রক্ষণ॥
সে ইচ্ছা বিরাম হলে লোক সমুদায়।
এখনি নিমগ্ন হবে প্রলয় দশায়॥
তাঁহার ইচ্ছায় আমি পাইয়া জীবন।
কহিতেছি কথা করি নিশ্বাস গ্রহণ॥
দি'ছেন জীবন যিনি মোরে প্রতিক্ষণ।
দেখ তিনি সজীবন আমা হ'তে হন॥
সকল জীবের তিনি প্রাণের আধার।
জীবন আলোক তিনি হন সবাকার॥

গ্রহ তারা রবি শশী নিঃশব্দে চলিছে।
কেহ কারো গায়ে কভু টলি না পড়িছে॥
কে তাদের উচ্ছৃঙ্খল নাহি দেন হ'তে।
এক মাত্র পিতা যিনি সকল জগতে॥

কোথায় অঙ্গুলি তাঁর নাহি দেখা যায়?
দেখ তাহা জগতের প্রত্যেক শোভায়॥
শরতের রাকা শশী কিবা শোভা ধরে।
এক মেঘ হতে যবে যায় মেঘান্তরে॥
মেঘ মুক্ত হয়ে আসি সুনীল গগনে।
পৃথিবী রঞ্জিত করে আপন কিরণে॥
কিবা তার শোভা তবে জগৎ মোহন।
কে করিল হেন শোভা জুড়াতে নয়ন।
যাঁহা হ'তে কোটি কোটি লোক ভ্রাম্যমান।
বিশ্বের সুন্দর ছবি তাঁহারি বিধান।

সাধু যবে সুখ ভোগ করিতে করিতে।
হঠাৎ পতিত হয় ঘোর বিপত্তিতে॥
কে তাঁরে তখন সেই দুঃখের সাগরে,
কতই সান্ত্বনা দেন পশিয়া অন্তরে?
কে তাঁরে বলিয়া দেন—বিপদ—সম্পদ।
যদি তাহে পাওয়া যায় তাঁহার শ্রীপদ॥
সাধুর বিপত্তি দুঃখ যবে কাটি যায়।
সম্পদের মুখ পুনঃ দেখিবারে পায়॥
সম্পদ দাতারে তবে করে নমস্কার।
বলে "নাথ তুমি হও সম্পদ আমার॥
সম্পদ ভোগিব আমি থাকি তব সনে।
সম্পদ বিপদ সম তোমার বিহনে॥"
সম্পদ বিপদ কেবা করিয়া প্রেরণ।
তাঁর প্রতি—ধর্ম্ম প্রতি দেন দৃঢ় মন॥
সুখে দুঃখে শীত উষ্ণে দিবস রজনী॥
তাঁর নাম লও পাবে সংসার তরণী॥

আত্মা যবে পাপে মগ্ন বিষাদে মলিন।
মোহের আগারে পড়ি অতি দীন হীন॥
অনুতাপ অশ্রু বারি কেবা করি দান,
করেন সন্তাপ হ'তে তারে পরিত্রাণ?
আত্মা যবে পাপ তরে করিয়া ক্রন্দন।
প্রেয় পথ সযতনে করিয়া বর্জ্জন।
ধর্ম্মের সোপানে করে ক্রমে আরোহণ
কাহার হস্তের চিহ্ন তাহাতে তখন?
যাঁহার ইচ্ছায় বৃষ্টি হয়ে বরিষণ
তৃষিত ধরায় শান্তি করে বিতরণ॥
যিনি সকলের হন পাপ তাপহারী।
চাহিলে পাপিরে যিনি দেন কৃপাবারি,
আত্মা যে তাঁহার হয় যতনের ধন।
তাই তারে সদা তিনি করেন রক্ষণ॥
যদি মোরা তাঁর কথা না শুনিয়া কানে।
প্রবৃত্তির স্রোতে চলি ক্রমিক এখানে।
পাপের উপরে পাপ করিয়া সঞ্চয়।
আত্মারে করিয়া ফেলি সমান নিরয়,
আমাদের পানে তিনি নাহি চাহিবেন?
যত ইচ্ছা পাপ তিনি করিতে দিবেন?
জীবন পুস্তক নর! দেখ উলটিয়া।
যবে পাপে জর জর হয় তব হিয়া॥
তবে তিনি হৃদি বলি অমিয় বচন।
মোহের বিভোর তব ভাঙ্গেন কেমন॥
আলস্য বিপথে মোরা হইলে পতিত।
বৃথামোদ জল্পনায় হইলে জড়িত॥

কত বিঘ্ন বাধা তিনি কাটি বার বার।
সংসারের পথ হ'তে করেন উদ্ধার॥
তাঁহার তপন কিবা হইয়া উদয়।
যেমন বিনাশ করে তম সমুদয়॥
তেমনি উদিয়া তিনি আত্মার গগনে।
নাশেন কু-আশা মোহ পাপ-মতিগণে॥

হে জীব! তাঁহারে তুমি করহ সন্ধান।
দেখিবে তিনি যে যথা তথা বিদ্যমান॥
সমুদ্রের ফেণময় তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে।
নদীর লহরী কিম্বা ফুলের সুবাসে॥
বজ্রের নির্ঘোষ কিম্বা মৃদুল পবনে।
তৃণ রাজি লতা কিম্বা বন উপবনে॥
মধ্যাহ্ন সময় কিম্বা তামসী নিশায়।
তাঁহার মহিমা মাঝে দেখিবে তাঁহায়॥
শোভার আকর তিনি সৌন্দর্য্য সাগর।
তাঁহার প্রভাবে কর দেয় প্রভাকর॥
সুধাংশু বিতরে কর নয়ন রঞ্জন।
মধুরে ললিত গায় তাঁর পাখী
না দেখিলে তাঁরে যদি রবির কিরণে।
সচন্দ্র নক্ষত্র চারু সুনীল গগনে॥
তবে রবি শশী তারা সব শূন্য হয়।
তিনি বিনা এ জগৎ অন্ধকার ময়॥
জ্ঞান নেত্রে দেখ সেই অপার মঙ্গলে।
বিরাজিত যিনি সদা সূর্য্যের মণ্ডলে॥
সুদূর তারকে কিম্বা সাগর ভিতরে।
বিরাজিত যিনি সদা আত্মার কন্দরে॥
আলো করি রয়েছেন সকল সংসার।
তিনি বিনা শূন্য তাহা—নাহি শোভা তার॥
তাঁতে যদি পূর্ণ নহে হৃদয় আমার।
তাঁর দয়া নাহি যদি চিন্তি বার বার॥
তাঁহার আদেশ হৃদি ধরিয়া যতনে
প্রাণ পণ নাহি করি তাহার পালনে॥
কি করিব লয়ে আমি সে হৃদয় ভার।
বিষাদ কেবলি তাহে ঘন অন্ধকার॥
জগৎ মন্দিরে যদি তাঁরে না দেখিলে।
হৃদয়ে আসন তাঁরে যদি নাহি দিলে॥
তাঁহাকে জীবন পথে না করিলে সার।
জনম কি যাবে তব লইয়া অসার?

এস তবে সবে করি তাঁর আরাধনা।
হৃদয় সহিত করি তাঁহার সাধনা॥
তা হলে এ লোকে পাবে স্বরগ আভাস।
যথায় দেবতাগণ নিত্য করি বাস॥
পূজিছেন যিনি হেন বিভু সনাতন।
যাঁহার মহিমা গায় অখিল ভুবন॥
স্বরগে পূজিবে তাঁরে দেবতার সনে।
কিবা অধিকার তব ভেবে দেখ মনে॥
পৃথিবী আত্মার হয় প্রথম সোপান।
কতই সোপান পরে আছে বিদ্যমান॥
এক এক সোপানে আত্মা ক্রমশঃ উঠিবে
তাঁহারে লভিয়া শেষে কৃতার্থ হইবে।

প্রার্থনা।

ও হে নাথ! তুমি হও শোভার আকর।
তুমিই সুন্দর নাথ! তুমিই সুন্দর॥
বিদ্যুৎ তপন শশী তারকা সকল।
তোমার জ্যোতিতে হয় তাহারা উজ্জ্বল॥
তুমি আলো করি আছ সকল সংসার।
নয়নের তুমি আলো হও হে আমার॥
তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি হৃদয়-রঞ্জন।
তোমার সৌন্দর্য্য পান করে সাধু জন॥
নয়ন হৃদয়ে তুমি হও হে প্রকাশ।
দেখিব তোমায় সদা জগতে বিকাশ॥
তোমারে না দেখি যবে—রবি শশী তারা।
আমার নিকট হয় প্রভাহীন তারা।
ও হে নাথ! তুমি হও অধম তারণ।
উদ্ধার করিবে যদি এই পাপী জন॥
তোমার সুমতি শীঘ্র করহ প্রেরণা।
আর নাহি সয় আর সংসার যাতনা,
ধন মান আমি নাই চাহি তব ঠাঁই,
কেবল তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই,
হৃদয়ে আসিয়া মম হইয়া উদয়।
লয়ে যাও যেই দিকে তব পথ হয়॥
তোমার মঙ্গল কায করি সাধ্য মতে।
তব অনুচর হয়ে থাকি এ জগতে॥
ইতি পঞ্চদশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় রবিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।

একাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

৪৯২ সংখ্যা   শ্রাবণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৫   শক ১৮০৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

২ আষাঢ় রবিবার ৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।

সংসার-সমুদ্রে তরঙ্গের এক মুহূর্ত্তও বিরাম নাই—সকলই চঞ্চল—সকলই অস্থির—দ্বন্দ্ব-কোলাহল চারি দিকেই,—মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের সঙ্গে—সুখের সঙ্গে দুঃখের সঙ্গে—ভ্রম-প্রমাদ মোহের সঙ্গে জ্ঞান ধর্ম্মের সঙ্গে সংগ্রামের আর অবধি নাই। আমরা জীবনকে প্রাণপণে অবলম্বন করিয়া থাকি—কোন মতেই ছাড়িতে চাহি না—মৃত্যু বলপূর্ব্বক জীবন কাড়িয়া লয়; আমরা সুখের ভেলায় ভাসমান হই—দুঃখ আসিয়া তাহাকে অশ্রুজলে ডুবাইয়া দেয়; আমরা জ্ঞান ধর্ম্মের কূলে পৌঁছিবার জন্য স্রোতের প্রতিকূলে কায়ক্লেশে নৌকা চালনা করি—ভ্রম-প্রমাদ-মোহের ঝঞ্ঝা উত্থিত হইয়া আমাদিগকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দেয়; মনুষ্যত্ব যখন মস্তক উত্তোলন করে নীচু হইতে তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে আঘাতের উপর আঘাত করিতে থাকে। মনুষ্যের এরূপ অবস্থা কেন? পশু পক্ষীরা নিকৃষ্ট জীব কিন্তু প্রকৃতি-মাতা তাহাদিগকে অতি যত্নের সহিত লালন-পালন করেন, কিছুরই জন্য তাহাদিগকে ভাবিতে হয় না; মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব অথচ মনুষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অসহায়;—ইহার অর্থ কি? নিকৃষ্ট জীবেরা প্রকৃতি-মাতার ক্রোড়ের শিশু—তাই তাহাদিগকে তিনি ক্রোড়ে রাখিয়া স্তন্য পান করান; মনুষ্য প্রকৃতি-মাতার তরুণ-বয়স্ক কর্ম্মক্ষম পুত্র, মনুষ্যের জন্য প্রকৃতি-মাতা যাহা করিবার তাহা করিয়াছেন—আর অধিক কিছু করিবেন সে ক্ষমতা তাঁহার নাই—বরং তিনিই মনুষ্যের নিকট সাহায্য পাইবার অভিলাষী। প্রকৃতি মানুষ করিয়াছে তাই আমরা মানুষ হইয়াছি,—প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ করা মানুষেরই কার্য্য। প্রকৃতির ভক্তিমান্ এবং কৃত-কর্ম্মা পুত্রেরা মাতার ঋণ পরিশোধ করিতে কত না চেষ্টা করিতেছেন;—তাঁহাদের যত্নে মরুভূমি উদ্যান অট্টালিকায় সজ্জিত হইতেছে; দুর্গম অরণ্য-পর্ব্বতে যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত হইতেছে; সম্বৎসরের সাধ্যাতীত কার্য্য নিমেষ-মুহূর্ত্ত দ্বারা সুনিষ্পন্ন হইতেছে; অজ্ঞানের অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্ঞানালোক বিকীর্ণ

হইতেছে; মোহের কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিয়া ধর্ম্মের বিমল প্রভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে।

মনুষ্যের চতুর্দ্দিকেই বিঘ্ন-বিপত্তি—কেহই তাহার সহায় নাই। প্রকৃতি মনুষ্যের জন্য অধিক কি করিবেন—তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট—মনুষ্যকেই প্রকৃতির সাহায্যের ভারগ্রহণ করিতে হইবে;—মনুষ্যের ইহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মনুষ্যের যখন জ্ঞানের উন্মেষ হইল—যখন দেখিল যে, মাতার ক্রোড়ে শয়ান থাকিলে আর চলে না—তখন সে এক প্রবল অস্ত্র হস্তে করিয়া বিঘ্ন বিপত্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল;—তাহার সে অস্ত্র অমোঘ অস্ত্র—তাহার নাম—

সাধন মনুষ্যেরই ধর্ম্ম! ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—সকলই সাধন-সাপেক্ষ। সাধন পশু পক্ষীদের জন্য নহে—পশু পক্ষীরা বিনা-সাধনেই সিদ্ধ। গায়ক পক্ষী কোন গুরুর নিকট গান শিক্ষা করে না, মধুমক্ষিকা কোন বিদ্যালয়ে জ্যামিতি শিক্ষা করে না; সিংহ ব্যাঘ্র কোন ভীমার্জ্জুনের নিকট ব্যায়াম শিক্ষা বা অস্ত্র শিক্ষা করে না, অথচ স্বকার্য্যে সকলেই পারদর্শী; কিন্তু এমন এক জন মনুষ্য কোথায়—যিনি মনুষ্যোচিত কার্য্যে পারদর্শী?

মনুষ্যের মহত্তম সিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন "মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে"—সহস্রের মধ্যে যদি এক জন সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করেন,—কিন্তু আর-এক দিকে দেখা যায় যে, সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন না করিলে মনুষ্য কখনই সুস্থ হইতে পারে না;—মনুষ্য যদি সাধন-ব্যতিরেকে কুশলে কালযাপন করিতে পারিত—তবে তাহার হস্তে আর কোন কার্য্য থাকিত না—তাহার ইচ্ছার কোন প্রতিবন্ধক থাকিত না—সুখ-ভোগই তাহার একমাত্র কার্য্য হইত—ভোগেই মনুষ্যের জীবন অবসান হইত; কিন্তু এরূপ অবস্থায় মনুষ্যের মন তৃপ্তি-লাভ করিতে পারে না,—ভোগ কথাটাই মনুষ্যের শ্রবণ-কটু; মনুষ্যের দৃষ্টি এমনি দূর-দৃষ্টি—মনুষ্যের আশা এমনি দুরারোহী—মনুষ্যের হৃদয় এমনি প্রশস্ত যে, কোন ভোগই সে দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হয় না—কোন ভোগই সে আশাকে হাত বাড়াইয়া পায় না—কোন ভোগই সে হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না। মনুষ্য যে ভোগ চায় সে ভোগ জগতের কোথাও পাওয়া যায় না;—জগতে যাহা যত স্থায়ী হউক্ না কেন—তাহাই অস্থায়ী, যাহা যত উৎকৃষ্ট হউক্ না কেন তাহাই দোষযুক্ত, যাহা যত বড় হউক্ না কেন তাহাই ছোটো,—আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিরা বলিয়াছেন,

"যোবৈ ভূমা তৎসুখং—নাল্পে সুখমস্তি—
ভূমৈব সুখং—ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥"

"যিনি মহান্ তিনি সুখস্বরূপ—অল্প কিছুতে সুখ নাই—মহান্ই সুখ—মহান্কেই জানিতে ইচ্ছা কর;" মনুষ্যের লক্ষ্য এইরূপ উচ্চ হওয়াতে—তাহার ভোগ সুদূর ভবিষ্যতে পড়িয়া গিয়াছে—ও সাধনই তাহার বর্ত্তমানের উপজীবিকা হইয়াছে;—পশুদিগের ন্যায় মনুষ্য উপস্থিত ভোগকেই পরাকাষ্ঠা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না,—মনুষ্য উচ্চ হইতে উচ্চতর—মহৎ হইতে মহত্তর—স্থায়ী হইতে স্থায়িত [illegible]-ভোগে উত্থান করিবার জন্য সাধনকে [illegible]র কর্ণধার নিযুক্ত করেন।

অতএব ভোগে নিশ্চিন্ত না থাকিয়া আমাদের সকলেরই উচিত—সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া। মনুষ্যের সাধন দুইরূপ স্বার্থ-সাধন এবং পরমার্থ-সাধন। মনুষ্যমাত্রই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে আপন আপন স্বার্থ সাধন করিয়া থাকে—কাহাকেও বলিতে হয় না যে

তুমি স্বার্থের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিও। কোন ব্যক্তিকে যদি এরূপ দেখা যায় যে, তিনি তাঁহার স্বার্থ-সাধনে নিশ্চেষ্ট, সে কেবল তাঁহার শক্তির অভাবে—ইচ্ছার অভাবে নহে। তাঁহার শরীর-মন হয় ত দুর্ব্বল—তাঁহার সাংসারিক অবস্থা হয় ত প্রতিকূল—তাঁহার আশানুরূপ ফল হয় ত সুদুর্লভ—এই জন্যই তিনি নিশ্চেষ্ট; স্বার্থের প্রতি তাঁহার যে বিরাগ হইয়াছে, তাহা নহে। আপনার ভোগের দিকেই স্বার্থের লক্ষ্য;—কাহারো বা ভোগের আয়তন বিস্তৃত, কাহারো বা ভোগের আয়তন সঙ্কুচিত;—বিতস্তি-পরিমাণ ভূমি লাভ হইলেই হয় ত এক জন কৃষকের স্বার্থ সিদ্ধ হইতে পারে—যোজন-পরিমাণ ভূমি লাভ হইলেও হয় ত একজন রাজার স্বার্থ-সিদ্ধির কিছুই হয় না। যিনি যে পদের মনুষ্য, তাঁহার স্বার্থের আয়তন তাঁহার সেই পদেরই অনুরূপ,—যিনি যে পদে দাঁড়াইয়া আছেন সেই পদ রক্ষা করা এবং সেই পদ বৃদ্ধি করাই তাঁহার স্বার্থ।

কিন্তু সভ্য-সমাজে এমন মনুষ্য অতীব বিরল যাঁহার স্বার্থ কেবল-মাত্র স্বার্থ—নিঃস্বার্থ ভাবের চিহ্নমাত্রও যাহাতে নাই। সভ্য-সমাজে মনুষ্য মাত্রই গৃহী, গৃহি-জনের স্বার্থ পরস্পরের স্বার্থের উপর নির্ভর করে—ইহা সকলেই জানিতেছেন;—প্রতি-জনেরই স্বার্থ আর পাঁচ-জনের স্বার্থের সহিত জড়িত,—প্রতি-জনেরই স্বার্থের সহিত নিঃস্বার্থ ভাব কিয়ৎপরিমাণে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এই স্বার্থসাধন হইতে পরমার্থ-সাধন সিদ্ধিলাভের উন্নত সোপান। মনুষ্য একদিকে যেমন গৃহবাসী—আর একদিকে তেমনি জগৎবাসী,—যেমন স্ত্রী পুত্রের স্বার্থের সহিত মনুষ্যের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে;—তেমনি জগতের স্বার্থের সহিত মনুষ্যের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে—গৃহবাসী মনুষ্যের যেমন পিতা—জগৎবাসী মনুষ্যের সেইরূপ পরমেশ্বর; গৃহবাসী মনুষ্যের ভ্রাতা—সহোদর, জগৎবাসী মনুষ্যের ভ্রাতা—মনুষ্য; গৃহবাসী মনুষ্যের যেমন সৎপুত্র—জগৎবাসী মনুষ্যের সেইরূপ—অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম; গৃহবাসী মনুষ্যের যেমন দম্পতি-প্রেম—জগৎবাসী মনুষ্যের তেমনি বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেম; গৃহবাসী মনুষ্যের যেমন স্বার্থ—জগৎবাসী মনুষ্যের তেমনি পরমার্থ। ঈশ্বরকে পিতা জানিয়া—সমস্ত মনুষ্যকে ভ্রাতা জানিয়া—সকলের স্বার্থকে আপনার স্বার্থ মনে করিয়া কার্য্য করাকে পরমার্থ-সাধন কহা যায়; এক কথায়—ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার অনুগত হইয়া কার্য্য করাকে পরমার্থ-সাধন কহা যায়। পরমার্থ-সাধনেই মনুষ্যের পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, তাহাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাই প্রকৃতির সর্ব্বস্ব,—প্রকৃতি আমাদের সকলেরই মঙ্গলের জন্য অহোরাত্র নিযুক্ত রহিয়াছে,—প্রকৃতির মঙ্গল-কার্য্যের যদি আমরা প্রাণপণে সহায়তা করি তবে আমরা আপনাদেরই মঙ্গলের মূল পত্তন করি; মনুষ্যেরা ভ্রাতৃসৌহার্দ্দে মিলিত হইয়া প্রকৃতিকে সাহায্য করিবে—মঙ্গলের সাহায্যে এবং অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবে—ইহাই মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ; কিন্তু তাহা না করিয়া মনুষ্য যখন পরস্পরের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, অমঙ্গলের সাহায্যে এবং মঙ্গলের বিরুদ্ধে কোন চেষ্টারই ত্রুটি করে না—তখন মনুষ্য বিকার-দশা প্রাপ্ত হয়। মনে করিও না যে আমরা উপদেষ্টার পদবীতে স্পর্দ্ধার সহিত দণ্ডায়মান হইলেই আমাদের পরমার্থ সিদ্ধ হইল; স্পর্দ্ধা, গর্ব্ব, যশোলিপ্সা,—এ সমস্ত পরমার্থ হইতে শত-কোটি যোজন দূরে অবস্থিতি করে। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ভক্তি ও জগ-

তের প্রতি প্রেম—ইহাই পরমার্থের মূল। যিনি মনের সহিত বলিতে পারেন,

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব,মঙ্গল্য বিভো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।"

"হে লোকের অধিপতি, চৈতন্যময় অধিদেব, হে মঙ্গলময় সর্ব্বময় বিভো, লোকের হিতের জন্য এবং তোমার প্রিয় অভিপ্রায় সাধনের জন্য আমি সংসার-যাত্রার অনুবর্ত্তী হইব।" তিনিই যথার্থ পরমার্থ-সাধনে ব্রতী হইয়াছেন ;—যেখানে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি-ভক্তি আমাদের মনকে আর্দ্র করিবে, হায়, সেখানে আমাদের আপনাদের প্রভুত্ব, আত্ম-শ্লাঘা, অলীক গর্ব্ব আস্ফালন, উপহাস-জনক স্পর্দ্ধা, আমাদের হৃদয়কে কঠোর পাষাণে আবৃত করে—ইহা আমাদের কিরূপে সহ্য হয়? যেখানে মনুষ্যেরা সদ্ভাবে সাধুভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের হিতের জন্য সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবে, হায়, সেখানে বিবাদ-কলহ দ্বেষ-হিংসা কঠিন দুর্গ প্রতিষ্ঠা করে—ইহাই বা কিরূপে আমাদের সহ্য হয়! আমরা কি পরমার্থ-সাধন করিব না—পরমার্থ-সাধনের ভানই করিব—ভান-ই করিব! কার্য্যে বিসর্জ্জন দিয়া—দিন-রাত্রী কেবল আড়ম্বরেই নিযুক্ত থাকিব! ঈশ্বর আমাদিগকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুন।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের সহায় হও—নেতা হও,—তুমি আমাদিগকে বল দেও, যখন আমাদের সম্মুখে বিঘ্ন বিপত্তির তরঙ্গ উত্থিত হয়, তখন যেন আমরা চতুর্দ্দিক অন্ধকার না দেখি ; তোমার অপরাজিত বল আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠুক—সহস্র বিঘ্ন প্রতিহত হইয়া ধরাশায়ী হইবে ; তোমার বিমল প্রেমামৃত সিঞ্চনে আমাদের মনের সমস্ত মলিনতা প্রক্ষালিত হইয়া যাক—নূতন প্রাণ আসিয়া আমাদের হৃদয়কে অধিকার করুক্! তোমার আজ্ঞায় সমস্ত জগৎ আমাদিগকে প্রাণ দান করিতেছে—আমরাও যেন সমস্ত লোকের হিতের জন্য আমাদের প্রাণ মন উৎসর্গ করিতে পারি,—আমরা যেন তোমার কার্য্যে চির দিন নিযুক্ত থাকি—তোমার জ্যোতিতে বাস করি—তোমার ক্রোড়ে বিশ্রাম করি—তুমি আমাদিগের এই প্রার্থনা পূরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

হুগলী দশম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

২৭ জ্যৈষ্ঠ রবিবার।

সায়াহ্ন।

বঙ্গের চতুর্দ্দিকে কেবলই রোগ-শোকের নিদারুণ আর্ত্তনাদ, অভাব-অনটন-জনিত হৃদয়-বিদারক কোলাহলই অহর্নিশি উত্থিত হইতেছে। দুই জনে একত্রিত হইলে ... য়ই পরস্পরের দুঃখের কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। দশ জন সদাশয় ব্যক্তি সম্মিলিত হইলে, দেশের বর্ত্তমান দুর্গতি দুর্দ্দশা এবং ভবিষ্যতের মহা অমঙ্গল অনিষ্টের কথাই উত্থাপিত হইয়া থাকে। শরীরের বল নাই, মনের বীর্য্য নাই, যে তৎসমূহের প্রতিবিধান জন্য কেহ সাহস-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইবে। ভারত-ভাণ্ডারে ধন নাই, ভারত-বাসী—বঙ্গ-বাসীদিগের মধ্যে একতা নাই যে, স্বাধীন-ভাবে সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ দানের কোন সুব্যবস্থা হইবে। তাহার উপরে আবার নানা কারণে ভারতের দুর্নিবার্য্য সমাজ-শাসন এবং পরম কল্যাণকর পারিবারিক-বন্ধন পর্য্যন্তও শিথিল হইয়া পড়িতেছে সুতরাং এই পুরাতন ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে, পবিত্র আর্য্য-পরিবারের মধ্যে নানাবিধ পাপ-স্রোত অনায়াসেই প্রশ্রয় পাইতেছে। এখন নগর গ্রাম পল্লী যেখানে গমন করা যায়, সেই স্থানেই

সাধু সচ্চরিত্র অপেক্ষা, অসাধু অত্যাচারীর সংখ্যাই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখন সংযমী অপেক্ষা, স্বেচ্ছাচারীরই দল- , এখন মিতাচারী অপেক্ষা, বিলাসীর সংখ্যাই অধিক, এখন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু অপেক্ষা, ধর্ম্ম-দ্রোহীর এবং শান্ত সুশীল অপেক্ষা, উগ্র উদ্ধত লোকের ও স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন-প্রিয় মনুষ্য অপেক্ষা পরমতানুবর্ত্তী এবং পরানুকারী ব্যক্তির পরিমাণ অধিকতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সুতরাং যে যে কারণে জন-সমাজ উচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, ভারতে প্রায় সে সকল বিষ বৃক্ষের বীজ বিরোপিত হইয়াছে

আমারদের যথার্থই কি কেহ নেতা নাই, যথার্থই কি আমারদের উপরে অধর্ম্মের দণ্ডদাতা, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা স্বরূপ কোন রাজা নাই, ভারতের হৃদয়বিদারক দুঃখ-ক্লেশে ও গগনভেদী রোদন বিলাপে সকলেই কি উদাসীন? বিষয়-লোলুপ পাপ-পরবশ স্বার্থপর মনুষ্য, মনুষ্যের দুঃখ-দুর্দ্দশার উদাসীন থাকিতে পারে, কিন্তু যিনি "সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়" 'যিনি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন, যিনি সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন" সেই অনাথবৎসল অকিঞ্চন-গুরু ঈশ্বর কখনই উদাসীন নহেন। পিতা, শক্তি সামর্থের অল্পতা নিবন্ধন সন্তান সন্ততিকে স্বীয় বশে না রাখিতে পারেন, কিন্তু পূর্ণশক্তি পূর্ণজ্ঞান পরম পিতা, অনায়াসেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে কল্যাণ-পথে সঞ্চালন করিতেছেন। মাতা, অজ্ঞতা বা অপটুতা বশত সংসারের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে না পারেন, কিন্তু পরম মাতা পরমেশ্বর তাঁহার অপার স্নেহ-গুণে অযুত অগণ্য পুত্র-কন্যাকে অক্লেশেই প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। স্বার্থ-অন্ধ হইয়া প্রজার সর্ব্বনাশের প্রতি উদাসীন থাকা রাজার পক্ষে অসম্ভব নহে, কিন্তু সেই রাজ-রাজেশ্বর সেই সত্য-কাম মঙ্গল-স্বরূপ মহান্ ঈশ্বর, প্রজাবর্গের মধ্যে কদাচই পাপকে জয়-যুক্ত হইতে অধর্ম্মকে একাধিপত্য করিতে দেন না। গ্রীষ্মের আধিক্য বশত জীব-জন্তু প্রপীড়িত হইতে আরম্ভ হইলে যেমন অচিরাৎ মেঘাস্য বর্ষিত হইয়া চারিদিক শীতল করিয়া দেয় বায়ু-সাগর দূষিত ও বিষাক্ত হইয়া প্রাণিপুঞ্জের পক্ষে অনিষ্ট ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িলে যেমন ঘন ঘন বিদ্যুতাগ্নি নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহা শোধিত ও সংস্কৃত করিয়া দেয়, মনুষ্য-সমাজ মধ্যে তেমনি পাপ তাপ প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলে, ঈশ্বর তেমনি বিশুদ্ধ ধর্ম্মাগ্নি প্রেরণ করত জন সাধারণের বিঘ্ন-বিপত্তি বিনাশ-পূর্ব্বক প্রকৃত নব-জীবন সঞ্চার করেন, অবনত জাতির পুনরুত্থানের পথ প্রমুক্ত করিয়া দিয়া তাহারদিগের নির্ব্বাণপ্রায় আশা-প্রদীপকে প্রজ্বলিত করিয়া দেন। ইহা কেবল বাক্য বা কল্পনা-মাত্র নহে, ইহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-সিদ্ধ ব্যাপার। এই নিগূঢ় বাক্যের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য অতীত কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন নাই, দেশ দেশান্তর গমন করিবারও আবশ্যক করে না। একবার যদি আমরা এই বঙ্গের প্রতি, ভারতের প্রতি, দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলেই ইহার জাগ্রত জ্বলন্ত প্রমাণ সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর হইবে। দেখ, সকলে প্রত্যক্ষ দেখ, ভারতের অবনতি বঙ্গের অবসন্ন অবস্থায়, ঈশ্বর আমারদের মধ্যে ব্রহ্ম-জ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি প্রেরণ করিয়াই আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ংই কর্ণধার হইয়া কেমন বিচিত্র কৌশলে মগ্ন-প্রায় তরণীকে উদ্ধার করিয়াছেন।

যেমন মৃত্যুঞ্জয় ঔষধ ঘোর-বিকার-প্রাপ্ত অ-চেতনপ্রায় মৃত-কল্প ব্যক্তির শরীরের দূষিত বিষরাশি বিনষ্ট করিয়া আবার সংজ্ঞা চৈতন্য আনয়ন করে,—নব জীবন আনিয়া দেয়, তেমনি সেই অজর অমর পরমেশ্বর জাতিগত আত্ম-বিকার ও আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা বিদূরিত করিবার জন্য অব্যর্থ মৃত-সঞ্জীবন পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে মহা বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যেরূপে তাহা সেবন করিতে হয়, আমরা তাহা করি না, যেরূপে তাহা হৃদয়ে ধারন করিতে হয়, তাহার প্রতি আমারদের বিশেষ দৃষ্টি নাই, যে নিয়মে সেই দুর্লভ রত্নকে গৃহ-পরিবারের মধ্যে রক্ষা করিতে হয় তাহার প্রতি আমারদের যত্ন নাই, তথাচ দেখ,তাহার কি স্বর্গীয় প্রভাব! মলয়-সমীরণ-সংস্পর্শে যেমন শুষ্ক তরুও মঞ্জরিত হইয়া উঠে, আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পবিত্র ধর্ম্ম যাজন না করিলেও দেখ তেমনি তাহার স্বতঃ বিক্ষিপ্ত স্বর্গীয় জ্যোতিতে আমাদের মধ্যে অনেকেরই মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে, অনেকেরই মৃত-কল্প আত্মা নব জীবন প্রাপ্ত হইতেছে, অনেকেরই আশা-পথ প্রমুক্ত হইয়েছে, অনেকেই আপনারদিগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন। তখন যদি আমরা এই দেবসেব্য পবিত্র ধর্ম্মের যথা-বিধি সেবা করিতাম, ইহার যথাযথ আদেশ ও অনুশাসন ক্রমে সংসার-পথে পদ-বিক্ষেপ করিতাম, তাহা হইলে এতদিনে এই ভারত এই বঙ্গ-ভূমি ভিন্ন আকার ধারণ করিত। ইহার রোগ-শোক পাপ-তাপ অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি বহু পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া যাইত। আমারদিগের শরীরের বল, মনের বীর্য্যও অধিকাধিকরূপে বৃদ্ধি পাইত। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ" এই পবিত্র ধর্ম্মের অল্পমাত্রও মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে। এই সত্যটী যখন আমরা পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ জানিয়াছি, তখন যেন আর ইহার প্রতি উদাসীন না হই। যে ঔষধ-কণা অল্প দিন মাত্র সেবন করিলে ঘোর বিকারীর উপদ্রব-রাশি প্রশমিত হয়, সে কি তাহার পূর্ণমাত্রা ব্যবহার করিতে ঔদাস্য প্রদর্শন করিয়া থাকে? যে পবিত্র ধর্ম্মের মৃত-সঞ্জীবন-জ্যোতি অত্যল্প কালের মধ্যে পাপের প্রকৃত বিকট মূর্ত্তি এবং পুণ্যের প্রকৃত শোভা-সৌন্দর্য্য আমারদিগের সন্নিধানে প্রদর্শন করত অধর্ম্মের প্রতি ভয় বিতৃষ্ণা ও পুণ্যের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে আস্থা অনুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছে, সকলে সম্পূর্ণরূপে যথাশক্তি সেই পবিত্র ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও। সমুদায় শরীর মন আত্মার সহিত সেই মৃত-সঞ্জীবন ধর্ম্মের সেবা কর। কেবল সেই পবিত্র ধর্ম্মের স্বর্গীয় বল-প্রভাব মুখে কীর্ত্তন করিলে কি হইবে? এক দিন কি একঘণ্টা কালের জন্য সেই পবিত্র ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তদ্দ্বারা কি ব্যক্তিগত না জাতিগত পাপ-তাপ দুঃখ দুর্দ্দশার পরিহার হইবে? না আত্মার চির নির্ম্মলতা ও চির-পবিত্রতা সংসাধিত হইবে?

> "ফলং কতক বৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাধকং।
> ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি॥
>
> মনুসংহিতা।

নির্ম্মলী বৃক্ষের ফল, জলে নিক্ষেপ করিলেই তবে জলের মলক্লেদ সকল অধঃপতিত হয়, কিন্তু কেবল তাহার নাম গ্রহণ করিলে কদাচ জল নির্ম্মল হয় না। তেমনি সেই মৃত-সঞ্জীবন ধর্ম্মকে আত্মাতে ধারণ করিলেই আত্মার দুষ্কৃতি সকল অপসারিত হয়, গৃহেতে প্রতিষ্ঠিত করিলেই গৃহ-পরিবারের শান্তি-মঙ্গল প্রীতি সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয়, দেশেতে প্রতিষ্ঠিত করিলেই জাতিগত দুঃখ-দৌর্ব্বল্য, দেশব্যাপী অকল্যাণ অশান্তি তিরোহিত হইয়া

জন-সাধারণের আত্মাতে নূতন বল-বীর্য্য, নূতন প্রাণের সঞ্চার হইয়া থাকে কিন্তু কেবল তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে ইষ্টসিদ্ধি হয় না। অতএব ঈশ্বরের সেই অতুলন প্রসাদ সকলে হৃদয়ে ধারণ কর। তাঁহাকে আত্মার ভূষণ, কণ্ঠের অলঙ্কার, গৃহের জ্যোতি, মোহাচ্ছন্ন দেশের ধ্রুব-তারারূপে সকলে ব্যবহার কর, তাঁহারই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারই আদেশ-অনুশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া জীবন-পথে অগ্রসর হও; নিশ্চয়ই বল-বীর্য্য জ্ঞান প্রেম লাভ করিবে। নিশ্চয়ই ভয় তাপ জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। নিশ্চয়ই ইহ-লোকে শান্তি-মঙ্গল, পরলোকে সুখ সদ্গতি লাভে সমর্থ হইবে।

এই পবিত্র ধর্ম্মের প্রভাব এখনই সকলে প্রত্যক্ষ অনুভব কর। আমরা সকলে এই শুভক্ষণে সেই পবিত্র ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই মৃত-সঞ্জীবন ধর্ম্ম-প্রভাবেই ক্ষণকালের জন্যও আমারদের হৃদয়ের ভাব, মনের গতি শুভ পথে সঞ্চালিত হইতেছে, সকলের না হউক অনেকেরই অন্তশ্চক্ষু পরব্রহ্মের সত্তা সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছে। এই স্থান এই পবিত্র গৃহ আনন্দ উৎসব-ভূমি হইয়া উঠিয়াছে। আমরা যদি সেই ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, নির্ম্মল জ্ঞান-নেত্রে যদি তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পাই, পবিত্র প্রীতি-কুসুমে যদি নিয়ত তাঁহার পূজার্চ্চনা করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা রোগ-শোক পাপ-তাপ দুঃখ দুর্ব্বলতা সকলই তিরোহিত হইয়া যায়। আমরা দুর্ব্বল দুর্ম্মতি, সেই অনন্য চিত্ত স্থির—লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারি না। যোগানন্দের প্রেমানন্দের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াও আবার তাহা যাই। সেই জ্ঞান-চন্দ্রের প্রেম-চন্দ্রের অভ্যুদয় দেখিয়াও পুনর্ব্বার নতশিরে পৃথ্বী পাতালের নিবিড় অন্ধকারে প্রবেশ করি।

পরমাত্মন্! ধন্য তোমার করুণা, ধন্য তোমার দয়া। আমরা সহস্র দোষে দোষী হইলেও তুমি আমারদিগকে রক্ষা করিতেছ। আমরা তোমার প্রতি উদাসীন হইলেও তুমি আমারদিগের চির-কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছ। যে রোগের ঔষধ নাই, তুমিই তাহার পরমৌষধ হইয়া আত্মার অন্তরালে অবস্থান করিতেছ। যে বিপদুদ্ধারের উপায় নাই, তুমিই তাহার কর্ণধার হইয়া রহিয়াছ। তুমিই কেবল অঙ্গারকে হীরকে পরিণত করিতে পার। পাপী তাপীর শোক সন্তাপ-ভার বিমোচন করিয়া তুমিই কেবল তাহারদিগকে অনন্যপরায়ণ সাধক উপাসক করিয়া লইবার সামর্থ্য ধারণ কর। তুমি ভিন্ন দুর্ব্বলের বল, অগতির গতি, আর কেহই নাই। আমরা তোমার অযোগ্য সন্তান হইলেও আমারদিগকে পরিত্যাগ করিও না। আমরা তোমার অতুলন স্নেহ-প্রেমের অপব্যবহার করিতেছি বলিয়া, আমারদিগকে সহস্র দণ্ড দাও, কিন্তু হে পিতা! আমারদের প্রতি বিমুখ হইও না। তুমি ভিন্ন আর বঙ্গের গতি নাই, ভারতের আশ্রয়-স্থান নাই, পাপী তাপীর উদ্ধারের পথ নাই; "নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আত্মা।

(১)

সকল দ্রব্যই যাহা কিছু নিজের অনুকূল, উপযোগী, তাহাই আপন শক্তি-প্রভাবে চারি দিক হইতে আকর্ষণ করিতে থাকে, বাকী আর সকলের প্রতি তাহার তেমন ক্ষমতা নাই। নিজেকে যথাযোগ্য আকারে ব্যক্ত ও পরিপুষ্ট করিবার পক্ষে যে সকল

পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, উদ্ভিজ্জ-শক্তি কেবল তাহাই জল বায়ু মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করিতে পারে, আর কিছুই না। মানুষের জীবনী শক্তিও কিছুতেই আপনাকে উদ্ভিদ্ শরীরের মধ্যে ব্যক্ত করিতে পারে না। সে নিজের চারিদিকে এমন সকল পদার্থ সঞ্চয় করিতে পারে যাহা তাহার নিজের প্রকাশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল। মনের মধ্যে একটা পাপের সঙ্কল্প তাহার চারিদিকে সহস্র পাপের সঙ্কল্প আকর্ষণ করিয়া আপনাকে আকারবদ্ধ করিয়া তুলে ও প্রতিদিন বৃহৎ হইতে থাকে। পুণ্য-সঙ্কল্পও সেইরূপ। সজীবতার ইহাই লক্ষণ। আমরা যখন একটি প্রবন্ধ লিখি, তখন কিছু সেই প্রবন্ধের প্রত্যেক ভাব প্রত্যেক কথা ভাবিয়া লিখিতে বসি না। একটা মুখ্য সজীব ভাব যদি আমার মনে আবির্ভূত হয়, তবে সে নিজের শক্তি-প্রভাবে আপনার অনুকূল ভাব ও শব্দ গুলি নিজের চারিদিকে গঠিত করিতে থাকে। আমি যে সকল ভাব কোন কালেও ভাবি নাই, তাহাদিগকেও কোথা হইতে আকর্ষণ করিয়া আনে। এইরূপে সে, একটি পরিপূর্ণ প্রবন্ধ আকার ধারণ করিয়া আপনাকে আপনি মানুষ করিয়া তুলে। এই জন্য, প্রবন্ধের মর্ম্মস্থিত মুখ্য ভাবটি যত সজীব হয় প্রবন্ধ ততই ভাল হয়; নির্জ্জীব ভাব আপনাকে আপনি গড়িতে পারে না, বাহির হইতে তাহার কাঠামো গড়িয়া দিতে হয়। এই নিমিত্ত ভাল লেখা লেখকের পক্ষেও একটি শিক্ষা। তিনি যতই অগ্রসর হইতে থাকেন ততই নূতন জ্ঞান লাভ করিতে থাকেন

(২)

আমার মনে হয়, মানুষের আত্মাও এইরূপ ভাবের মত। ভাব নিজেকে ব্যক্ত করিতে চায়। যে-টি তাহার নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহ্য বিকাশ তাহাই আশ্রয় করিতে করিতেই তাহার ক্রমাগত পুষ্টি সাধন হয়। আমরা মনের মধ্যে যাহা অনুভব করি, কার্য্যই তাহার বাহ্য প্রকাশ। এই জন্য আমাদের অধিকাংশ অনুভাব কাজ করিবার জন্য ব্যাকুল, আবার, কাজ যতই সে করিতে থাকে ততই সে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। কিছুতেই যদি তাহাকে কাজ করিতে না দাও, তবে ক্রমে সে অসাড় হইয়া আইসে। আমাদের আত্মাও সেইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করিতে চায়। এবং সেই প্রকাশ চেষ্টা রূপ কার্য্যেতেই তাহার উত্তরোত্তর পুষ্টিসাধন হইতে থাকে। চারিদিকের বাতাস হইতে সে আপনার অনুরূপ ভাবনা কামনা প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিয়া নিজের আবরণ নিজের সীমা নিজে রচনা করিতে থাকে। অবশিষ্ট আর কিছুরই উপরে তাহার কোন প্রভুত্ব নাই। আমরা সকলেই বন্ধু বান্ধব ও অবস্থার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া একটি যেন ডিম্বের মধ্যে বাস করিতেছি, ঐ টুকুর মধ্য হইতে আমাদের উপযোগী খাদ্য শোষণ করিতেছি। একটি ব্যক্তি-বিশেষকে যখন আমরা দেখি, তখন তাহার চারিদিকের মণ্ডলী আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু তাহার সেই খাদ্যাধার মণ্ডলী তাহার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিত ভাবে ফিরিতেছে। যে ব্যক্তি সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সে তাহার দেহের মধ্যে, তাহার চর্ম্মাবরণ-টুকুর মধ্যে, বাস করে না। সে তাহার চারিদিকের তরুলতার মধ্যে আকাশের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মধ্যে বাস করে। সে যেখানেই যায় চন্দ্রসূর্য্যময় আকাশ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, তৃণ-পত্র-পুষ্পময়ী বনশ্রী তাহাকে ঘিরিয়া রাখে। ইহারা তাহার ইন্দ্রিয়ের মত। চন্দ্র সূর্য্যের মধ্য দিয়া সে কি দেখিতে পায়; কুসুমের সৌগন্ধ্য ও সৌন্দ-

বোধের সাহায্যে তাহার হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইতে থাকে। এই মণ্ডলীর বিস্তার লইয়া মানুষের ছোটবড়ত্ব। মনুষ্যের যে দেহ মাপিতে পারা যায়, সে দেহ গড়ে প্রায় সকলেরই সমান। কিন্তু যে দেহ দেখা যায় না, মাপা যায় না, তাহার ছোট বড় সামান্য নহে। এই দেহ, এই মণ্ডলী, এই বৃহৎ দেহ, এই অবস্থা-গোলক, যাহার মধ্যে আমাদের শাবক আত্মার খাদ্য সঞ্চিত ছিল, ইহাই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে পরলোকে জন্ম গ্রহণ করে।

(৩)

যেমন মানুষের বৃহৎ দেহটি আমরা দেখিতে পাই না, তেম্‌নি যথার্থ মানুষ যে তাহাকেও দেখিতে পাই না। এই জন্য কাহারও জীবনচরিত লেখা সম্ভব নহে। কারণ, লেখকেরা মানুষের কাজ দেখিয়া তাহার জীবনচরিত লেখেন। কিন্তু যে গোটাকতক কাজ মানুষ করিয়াছে তাই তিনি দেখিতে পান, লক্ষ লক্ষ কাজ, যাহা সে করে নাই, তাহা ত তিনি দেখিতে পান না। আমরা তাহার কতক গুলা কাজের টুক্‌রা এখান ওখান হইতে কুড়াইয়া জোড়া দিয়া দিয়া একটা জীবন-চরিত খাড়া করিয়া তুলি, কিন্তু তাহার সমগ্রটিত দেখিতে পাই না। তাহার মধ্যস্থিত যে মহাপুরুষ অসংখ্য অবস্থায় অসংখ্য আকার ধারণ করিত তাহাকে ত দেখিতে পাই না। তাহার কাজ-কর্ম্মের মধ্যে বরঞ্চ সে ঢাকা পড়িয়া যায়; আমরা কেবল মাত্র উপস্থিতটুকু দেখিতে পাই, যত কাজ হইয়া গিয়াছে, যত কাজ হইবে, এবং যত কাজ হইতে পারিত, উপস্থিত কার্য্যখণ্ডের সহিত তাহার যোগ দেখিতে পাই না। আমরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এক-একটা কাজ দেখিয়া সেই কার্য্য-কারকের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নাম দিই। সেই নামের প্রভাবে তাহার ব্যক্তি-বিশেষত্ব ঘুচিয়া যায়, সে একটা সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং ভিড়ের মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলি। আমরা রামকে যখন খুনী বলি, তখন সে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ খুনীর সহিত এক হইয়া যায়। কিন্তু রাম-খুনী ও শ্যাম-খুনীর মধ্যে এই খুন সম্বন্ধেই এমন আকাশ পাতাল প্রভেদ, যে, উভয়কে এক নাম দিলে বুঝিবার সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক, বুঝিবার ভ্রম হয়। আমরা প্রত্যহ আমাদের কাছের লোকদিগকে এইরূপে ভুল বুঝি। তাড়াতাড়ি তাহাদের এক্‌-এক্‌টা নামকরণ করিয়া ফেলি ও সেই নামের কৃত্রিম খোলষটার মধ্যেই সে ব্যক্তি ঢাকা পড়িয়া যায়। অনেক সময়ে মানুষ অনুপস্থিত থাকিলেই তাহাকে ঠিক জানিতে পারি। কারণ, সকল মানুষই বৃহৎ। বৃহৎ জিনিষকে দূর হইতে দেখিলেই তাহার সমস্তটা দেখা যায়, কিন্তু তাহার অত্যন্ত কাছে লিপ্ত থাকিয়া দেখিলে তাহার খানিকটা অংশ দেখা যায় মাত্র, সেই অংশকেই সমস্ত বলিয়া ভ্রম হয়। মানুষ অনুপস্থিত থাকিলে আমরা তাহার দুই চারি বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত মাত্র দেখি না, যত দিন হইতে তাহাকে জানি, তত দিনকার সমষ্টি স্বরূপে তাহাকে জানি। সুতরাং সেই জানাটাই অপেক্ষাকৃত যথার্থ। পৃথিবীর অধিবাসীরা পৃথিবীকে কেহ বলিবে উঁচু, কেহ বলিবে নীচু, কেহ বলিবে উঁচু-নীচু। কিন্তু যে লোক পৃথিবী হইতে আপনাকে তফাৎ করিয়া সমস্ত পৃথিবীটা কল্পনা করিয়া দেখে, সে এই সামান্য উঁচুনীচুগুলিকে গ্রাহ্য না করিয়া বলিতে পারে যে পৃথিবী সমতল গোলক। কথাটা খাঁটি সত্য নহে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সত্য।

(৪)

আত্মার উপরে শ্রেষ্ঠ অধিকার কাহার জন্মিয়াছে? যে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে পারে।

নাবালক যে, তাহার বিষয় আশয় সমস্তই আছে বটে, কিন্তু সে বিষয়ের উপর তাহার অধিকার নাই—কারণ তাহার দানের অধিকার নাই। এই দানের অধিকারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। যে ব্যক্তি পরকে দিতে পারে সেই ধনী। যে নিজেও খায় না পরকেও দেয় না কেবল মাত্র জমাইতে থাকে, তাহার নিজের সম্পত্তির উপর কতটুকুইবা অধিকার। যে নিজে খাইতে পারে কিন্তু পরকে দিতে পারে না সেও দরিদ্র—কিন্তু যে পরকে দিতে পারে নিজের সম্পত্তির উপরে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ অধিকার জন্মিয়াছে। কারণ, ইহাই চরম অধিকার। আমাদের পুরাণে যে বলে, যে ব্যক্তি ইহজন্মে দান করে নাই সে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া জন্মিবে, তাহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে, টাকাত আর পরকালে সঙ্গে যাইবে না, সুতরাং টাকাগত ধনিত্ব বৈতরণীর এ পার পর্য্যন্ত। যদি কিছু সঙ্গে যায় ত সে হৃদয়ের সম্পত্তি। যাহার সমস্ত টাকা কেবল নিজের জন্য—নিজের গাড়িটি ঘোড়াটির জন্যই লাগে, তাহার লাখ টাকা থাকিলেও তাহাকে দরিদ্র বলা যায় এই কারণে—যে, তাহার এত সামান্য আয় যে তাহাতে কেবল তাহার নিজের পেটটাই ভরে তা'ও ভরে না বুঝি! তাহার কিছুই বাকী থাকে না—যতই কিছু আসে তাহার নিজের অতি মহৎ শূন্যতা পূরাইতে, অতি বৃহৎ দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য দূর করিতেই খরচ হইয়া যায়। সুতরাং যখন সে বিদায় হয়, তখন তাহার সেই প্রকাণ্ড শূন্যতা ও হৃদয়ের দুর্ভিক্ষই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়, আর কিছুই যায় না। লোকে বলে, ঢের টাকা রাখিয়া মরিল! ঠিক কথা, কিন্তু এক পয়সাও লইয়া মরিল না।

(৫)

সুতরাং, আত্মকে যে দিতে পারিয়াছে আত্মা সর্ব্বতোভাবে তাহারই। আত্মা ক্রমশই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জড় হইতে মনুষ্য-আত্মার অভিব্যক্তি; মধ্যে কত কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধান। তেমনি স্বার্থসাধন-তৎপর আদিম মনুষ্য ও আত্মবিসর্জ্জনরত মহদাশয়ের মধ্যে কত যুগের ব্যবধান। একজন নিজের আত্মাকে ভালরূপ পায় নাই, আর এক জনের আত্মা তাহার হাতে আসিয়াছে। আত্মার উপরে যাহার অধিকার জন্মে নাই, সে যে আত্মাকে রক্ষা করিতে পারিবে তাহা কেমন করিয়া বলিব? সকল মনুষ্য নহে—মনুষ্যদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যথার্থ হিসাবে তাঁহাদেরই আত্মা আছে। যেমন গুটিকতক ফল ফলাইবার জন্য শতসহস্র নিষ্ফল মুকুলের আবশ্যক, তেমনি গুটিকতক অমর আত্মা অভিব্যক্ত হয়, এবং লক্ষ লক্ষ মানবাত্মা নিষ্ফল হয়।

(৬)

আত্মা বিসর্জ্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়। যে আত্মায় তাহা দেখা যায় না, সে আত্মার যতই বর্ণ থাকুক ও যতই গন্ধ থাকুক তাহা বন্ধ্যা। একজন মানুষ কেনই বা আত্মবিসর্জ্জন করিবে। পরের জন্য নিজেকে কেনইবা কষ্ট দিবে। ইহার কি যুক্তি আছে! যাহার সহিত নিতান্তই আমার সুখের যোগ, তাহাই আমার অবলম্বা আর কিছুর জন্যই আমার মাথাব্যথা নাই, এইত ইহ-সংসারের শাস্ত্র। জগতের প্রত্যেক পরমাণুই আর সমস্ত উপেক্ষা করিয়া নিজে টিঁকিয়া থাকিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতেছে; সুতরাং স্বার্থপরতার একটা যুক্তিসঙ্গত অর্থ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই স্বার্থপরতার উপরে মরণের অভিশাপ দেখা যায়, কারণ ইহা সীমাবদ্ধ। ঐহিকের নিয়ম ঐহিকেই অবসান, সে নিয়ম কেবল এইখানেই খাটে। সে নিয়মে যাহারা চলে তাহারা

ঐহিক অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখিতে পায় না, আর কিছুর উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করে না। কেনই বা করিবে? তাহারা দেখিতেছে, এইখানেই সমস্ত হিসাব মিলিয়া যায়, অন্যত্র অনুসন্ধানের আবশ্যকই করে না। কিন্তু অমরতা কখন দেখিতে পাই? পৃথিবীর মাটি হইতে উদ্ভূত হইয়া পৃথিবীতেই মিলাইয়া যাইব, এ সন্দেহ কখন দূর হয়? যখন দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে, যে ঐহিকের সকল নিয়ম মানে না। আমরা আপনার মুখ চাই না, আমরা আনন্দের সহিত আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারি, আমরা পরের সুখের জন্য নিজেকে দুঃখ দিতে কাতর হই না। কোথাও ইহার "কেন" খুঁজিয়া পাই না। কেবল হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারি যে, নিজের ক্ষুধায় কাতর, সংগ্রাম-পরায়ণ এই জগৎ অতিক্রম করিয়া আর এক জগৎ আছে, ইহা সেইখানকার নিয়ম। সুতরাং এইখানেই পরিণাম দেখিতেছি না। চারিদিকে এই যে বস্তু-জগতের ঘোর কারাগার-ভিত্তি উঠিয়াছে, ইহাই আমাদের অনন্ত কবরভূমি নহে। অতএব যখনি আমরা আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিখিলাম, তখনি আমাদের গুরুভার ঐহিক দেহের উপরে দুটি পাখা উঠিল। পৃথিবীর মাটিতে চলিবার সময় সে পাখাদুটির কোন অর্থ বুঝা গেল না। কিন্তু ইহা বুঝা গেল যে ঐ পাখা দুটি কেবল মাত্র তাহার শোভা নহে উহার কার্য্য আছে। তবে যাহাদের এই পাখা জন্মায় নাই তাহাদেরও কি আকাশে উঠিবার অধিকার আছে?

(৭)

আমাদের মধ্যে যে সকল উচ্চ আশা, যে সকল মহত্ত্ব বিরাজ করিতেছে তাহারাই স্থায়ী, আর যাহারা তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে, তাহাদিগকে কার্য্যে পরিণত হইতে দেয় নাই, তাহারা নশ্বর। তাহারা এইখানকারই জিনিষ, তাহারা কিছু সঙ্গে সঙ্গে যাইবে না। আমার মধ্যে যে সকল নিত্য পদার্থ বিরাজ করিতেছে, তাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ না; তাহাদের চারিদিকে যে জড়স্তূপ উপস্থিত হইয়া কিছুদিনের মত তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই তোমরা দেখিতেছ। আমার মনের মধ্যে যে ধর্ম্মের আদর্শ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহারই উপর আমার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। যখন কাষ্ঠলোষ্ট্রের মত সমস্ত পড়িয়া থাকে তখন ধর্ম্মই আমাদের অনুগমন করে। যাহার আত্মায় এ আদর্শ নাই, দেহের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যু হয়। জড়ত্বই তাহার পরিণাম। যে গেছে, সে তাহার জীবনের সার পদার্থ লইয়া গেছে, তাহার যা যথার্থ জীবন তাহাই লইয়া গেছে, আর তাহার দুদিনের সুখ দুঃখ, দুদিনের কাজ-কর্ম্ম আমাদের কাছে রাখিয়া গেছে। তাহার জীবনে অনেক সময়ে আজিকার কাজের সহিত কালিকার কাজের বিরোধ দেখিয়াছি; আজিকার মতের সহিত কালিকার মতের অনৈক্য দেখিয়াছি, এমন কি, তাহার মত একরূপ শুনা গিয়াছে, তাহার কাজ আর এক রূপ দেখা গিয়াছে—এই সকল বিরোধ অনৈক্য চঞ্চলতা তাহার আত্মার জড় আবরণের মত এই খানেই পড়িয়া রহিল, ইহাকে অতিক্রম করিয়া যে ঐক্য যে অমরতা অধিষ্ঠিত ছিল, তাহাই কেবল চলিয়া গেল। যখন তাহার দেহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম, তখন এগুলিও দগ্ধ করিয়া শ্মশানে ফেলিয়া আসা যাক্। তাহার সেই মৃত অনিত্যগুলিকে লইয়া অনর্থক সমালোচনা করিয়া কেন তাহার প্রতি অসম্মান করি? তাহার মধ্যে যে সত্য, যে দেবতা, ছিল, যে থাকিবে, সেই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠান করুক্!

আধ্যাত্মিক উপাসনা।

ব্রাহ্ম ভ্রাতারা এক্ষণে অতি সংকট স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন ;—তাঁহাদের প্রথম উদ্যমে তাঁহারা দেশের নানাবিধ কুসংস্কারের সহিত সংগ্রাম করিয়া অনেকাংশে জয়লাভ করিয়াছেন,—কুসংস্কারের দলবল এখন নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে,—কিন্তু ব্রাহ্ম ভ্রাতারা তাঁহাদের পুরাতন অভ্যাস বশতঃ সেই হতাবশিষ্ট কুসংস্কার গুলির উপর পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত করিতে করিতেই জীবনের অধিকাংশ কাল বৃথায় ক্ষেপণ করিতেছেন, ও দুর্লভ মানব জীবনের মুখ্য কার্য্যের প্রতি অযত্ন করিতেছেন। কাল্পনিক দেব-দেবীর পূজা করিব না—সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করিব—এই উদ্দেশেই প্রথমে আমরা কুসংস্কার সমূহের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করি,—এখন ভয় হইতেছে পাছে আমাদের মুখ্য সংকল্প যে, সত্য ঈশ্বরের উপাসনা, তাহা আমাদের মন হইতে উন্মূলিত হইয়া যায়, ও আমাদের গৌণ সংকল্প যে কুসংস্কার উন্মূলন তাহাই আমাদের একমাত্র ব্রত হয়, ব্রাহ্ম ভ্রাতারা এখন এমনি এক সংকট স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন যে, কুসংস্কার উন্মূলন করিতে করিতে তাঁহাদের মন হইতে ঈশ্বরোপাসনা উন্মূলিত হইয়া যাওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ভক্ত পৌত্তলিকদিগের ভক্তিকে আমরা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না—কাষ্ঠ লোষ্ট্রকে দেবতা-জ্ঞানই তাঁহাদের কুসংস্কার ; এক জন প্রকৃত ভক্ত পৌত্তলিকের নিকট ব্রাহ্মেরা যদি ভক্তি শিক্ষা করেন তবে তাহাতে তাঁহাদের লাভ ভিন্ন অলাভ হয় না। ঈশ্বরের উপাসনাই ব্রাহ্মের মুখ্য ব্রত এইটি যেন মনে থাকে, আর ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা এ কথাটিও যেন অন্তঃকরণে জাগ্রত থাকে ; তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, কুসংস্কার উন্মূলনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য নহে,—জ্ঞান দ্বারা কুসংস্কার উন্মূলন করা আমাদের যেমন কর্ত্তব্য, প্রীতি-ভক্তি দ্বারা হৃদয়কে আর্দ্র করা আমাদের তেমনি কর্ত্তব্য, ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে উজ্জ্বল করা-ও আমাদের তেমনি কর্ত্তব্য ;—কুসংস্কার-উন্মূলন ঈশ্বরোপাসনার তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র, তাহারই প্রতি যদি আমাদের সমস্ত যত্ন নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরোপাসনার অধিকাংশ বাদ দিয়া অল্প অংশেরই অনুশীলন করা হয় ; ও ক্রমে সেই অল্প-অংশ টুকু সমগ্র ঈশ্বরোপাসনার স্থান অধিকার করিয়া বিষম অনিষ্টের মূল হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ বিকৃতাবস্থা কাল-ক্রমে পরিপক্ক হইয়া উঠিলে—ঈশ্বরোপাসনার পরিবর্ত্তে আসুরিক সভ্যতার উপাসনা ব্রাহ্মের হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করে। পৌত্তলিকেরা পরিমিত দেব দেবীর উপাসক, আসুরিকেরা কালের উপাসক এবং কলের উপাসক ; এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের নিকট একটা প্রকাণ্ড বাষ্পীয় শকট ও মনুষ্য একটি ক্ষুদ্র বাষ্প-যন্ত্র ; তাঁহাদের নিকট সকলই যন্ত্র, কোথাও নাই ;—পৌত্তলিকদিগের যেমন ইষ্ট-কবচ, আসুরিকদিগের সেইরূপ ঘটিকা যন্ত্র,—কলে দান, কলে ধ্যান, কলে চলা, কলে বলা, ইহাই তাঁহাদের নিকট মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ; কলের পুথুল হওয়াই তাঁহাদের চরম পুরুষার্থ। ঈশ্বরের উপাসনা তো দূরের কথা মনুষ্যের আত্মা আছে ইহাই তাঁহাদের মনে ধরে না। এরূপ আসুরিকতা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় এই যে, জ্ঞানের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের এবং আত্মার উৎকর্ষ সাধনের প্রতি যত্ন করা।

ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করি যে, ভক্ত পৌত্তলিক যেমন তাঁহার ইষ্ট দেবতাকে হৃদয়াভ্যন্তরে প্রত্যক্ষবৎ অবলোকন করিয়া তদ্গত চিত্তে তাঁহার ধ্যান করেন, ভক্তি-ভরে তাঁহার পূজা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, ঈশ্বরকে তিনি ততদূর একমনে ধ্যান করেন কি—ততদূর ভক্তির সহিত আরাধনা করেন কি? পৌত্তলিক অপেক্ষা তাঁহার জ্ঞানের বিস্তার অধিক হইতে পারে—কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের বিস্তার যে পরিমাণে অধিক তাঁহার প্রেমের গভীরতা কি সেই পরিমাণে অধিক, না সেই পরিমাণে অল্প? কালের গতি দেখিলে বোধ হয় শেষোক্তেরই অধিক সম্ভাবনা। ভক্ত পৌত্তলিকেরা ব্রাহ্মের প্রতি এইরূপ উত্তর প্রদান করেন যে, "অনন্ত পরব্রহ্ম" আমাদের মনে ধারণা হয় না, কিন্তু আমাদের ইষ্ট দেবতাকে আমরা হৃদয়াভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই; প্রত্যক্ষ ছাড়িয়া আমরা কেন অনির্দ্দেশ্য দুরাসাদ্য বস্তুর অনুসরণ করিব? আর সেরূপ মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ধাবমান হইয়াই বা কিরূপে আমাদের হৃদয়ের পিপাসা শান্তি করিব? একথার আমরা কি প্রত্যুত্তর দিব? আমরা বৈজ্ঞানিকদিগের পথ অনুসরণ করিয়া সমস্ত জগতের মধ্যে একতা-সূত্র দেখিতে পাই। সে একতা-সূত্র পরমাত্মার ছায়া মাত্র—কিন্তু ভক্ত পৌত্তলিক যেমন আপনার হৃদয়-মন্দিরের জাগ্রত দেবতাকে উপলব্ধি করেন, আমরা কি সেরূপ জাগ্রত পরমাত্মাকে উপলব্ধি করি? অনেক ব্রাহ্ম অনন্ত অপার পরব্রহ্মকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পরাভব মানিয়া প্রকারান্তরে পৌত্তলিকদিগের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন—হৃদয়ের অনুরোধে জ্ঞানের বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করেন—কেহ বা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অভাবনীয় অচিন্তনীয় নূতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, জ্ঞানের বিরোধী ভক্তিও ব্রাহ্মকে শোভা পায় না, ভক্তির বিরোধী জ্ঞানও ব্রাহ্মকে শোভা পায় না, ভক্তি এবং জ্ঞান দুয়ের সামঞ্জস্যই ব্রাহ্মের শিরোভূষণ; ব্রাহ্মের ভক্তি এবং জ্ঞান—দুইই কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে তাহা দেখা যাউক।

সমস্ত জগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যে এক আশ্চর্য্য একতা বর্ত্তমান রহিয়াছে—সে একতার নিকট আত্ম-পর নাই—দূর-নিকট নাই—ছোট-বড় নাই—অন্তর-বাহির নাই; সেই একতা-সূত্র অবলম্বন করিয়া আমরা আপনারা অন্যদের অভ্যন্তরে কার্য্য করি, অন্যেরা আমাদের অভ্যন্তরে কার্য্য করে,—যাহা দূরস্থ তাহা নিকটস্থের অভ্যন্তরে কার্য্য করে, যাহা নিকটস্থ তাহা দূরস্থের অভ্যন্তরে কার্য্য করে,—যাহা ছোটো তাহা বড়'র অভ্যন্তরে কার্য্য করে, যাহা বড় তাহা ছোটোর অভ্যন্তরে কার্য্য করে,—যাহা অন্তরস্থিত তাহা বাহ্য বিষয়ের অভ্যন্তরে কার্য্য করে, যাহা বহিস্থিত তাহা অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে কার্য্য করে;—সেই একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সকল বস্তুই সকল বস্তুর অভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে—সমস্ত জগৎ আপনি আপনার অভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে; কিন্তু আমরা সে একতার ভাব আমাদের আত্মাতে যেমন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই—অন্য কোন স্থানেই তেমন নহে। সকল বস্তু সকল বস্তুর অভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে—ইহা সত্য; কিন্তু সেরূপ কার্য্যের অধিকাংশই আমাদের অজ্ঞাত-সারে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে,—এমন কি আমাদের মস্তক আমাদের হৃদয়ের উপর কখন কিরূপে কার্য্য করে—আমাদের হৃদয়ই বা আমাদের মস্তকের উপর কখন কিরূপে কার্য্য করে—তাহাও আমরা জানিতে পারি না। কিন্তু যখন আমাদের মনের মহদ্ভাব

জাগ্রত হইয়া নিকৃষ্ট ভাবের উপর কার্য্য করে—তখন সে কার্য্য আমাদের জ্ঞাত-সারে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তখন আমরা আমাদের জাগ্রত অন্তশ্চক্ষুর সমক্ষে আমরা আপনারা আপনাদের অভ্যন্তরে কার্য্য করি—সুতরাং সে কার্য্য আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। সূর্য্য পৃথিবীর অভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে—ইহা আমরা জানিতেছি বটে—কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি না,—কিন্তু যখন আমাদের মনুষ্যত্ব জাগ্রত হইয়া আমাদের পশুবৃত্তি সকলের অভ্যন্তরে কার্য্য করে—তখন সে কার্য্য আমরা আমাদের চক্ষের সামনে প্রত্যক্ষ অবলোকন করি। যে একতা-সূত্র সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছে—সে একতা-সূত্র আমাদের প্রতিজনেরই অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছে—কিন্তু সে মহান্ একতা-সূত্রকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা সাধন ব্যতিরেকে কখনই হইতে পারে না। যখন আমাদের মনুষ্যত্ব জাগ্রত হইয়া পশু-ভাব সকলের অভ্যন্তরে অন্তর্যামী হইয়া কার্য্য করে—তখনই আমাদের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হয়,—তখনই আমরা আমাদের অভ্যন্তর-স্থিত একতা-সূত্র প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, ও সমস্ত জগতের একতা-সূত্রকে সেই বিমল দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই। আমাদের নিজের অভ্যন্তরে যে একতা-সূত্র অবস্থিতি করিতেছে—তিনি জীবাত্মা,—পশু-ভাব সকলের উপর যখন তাঁহার প্রভাব পরিস্ফুট হয়, তখনই তাঁহার জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হয়—তখনই তিনি জাগ্রত হ'ন, "যোগী জাগে ভোগী রোগী কোথা জাগে" আত্মা এইরূপ জাগ্রত হইলেই আপনার একতা এবং ধ্রুবত্ব স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেন—আপনাকে আপনি প্রত্যক্ষ করেন—এবং সমস্ত জগতের একতা-সূত্র যে পরমাত্মা তাঁহাকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিবিম্বিত দেখেন। সেই আত্মাতে বৈজ্ঞানিকেরা যেখানে কেবল এক ঘুমন্ত একতা-সূত্র অবলোকন করে—জাগ্রত আত্মা সেখানে জাগ্রত পরমাত্মাকে অবলোকন করেন। আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, আমরা কুসংস্কার উন্মূলন করিয়াই তৃপ্ত না হই কিন্তু অন্তঃকরণের পশু-ভাব সকলকে,—বিষয়-লালসা—গর্ব্ব অহঙ্কার প্রমত্ততা—ঔদ্ধত্য কুটিলতা আন্তরিক যশঃস্পৃহা ও মৌখিক ধার্ম্মিকতা—এ সকলকে দমন করিয়া আত্মাকে জাগ্রত করিয়া তুলি; তাহা হইলেই ভক্ত পৌত্তলিকেরা যেমন তাঁহাদের ইষ্ট দেবতাকে হৃদয়াভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করেন, তাহা অপেক্ষাও জাজ্বল্যরূপে আমরা পরমাত্মাকে আত্মার অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করিব;—জগতের ঘুমন্ত একতা-সূত্র বৈজ্ঞানিকদিগের বিজ্ঞানান্ধ নয়নে অস্ফুটরূপে প্রতিভাত হউক্—ব্রাহ্মের জাগ্রত আত্মাতে জাগ্রত পরমাত্মা অন্তরে বাহিরে প্রকাশমান হইবেন—বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানের বিস্তার এবং পৌত্তলিকের প্রেমের গভীরতা—দুইই একাধারে মিলিত হইবে।

আর্য্যজাতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে আমরা পণ্ডিতপ্রবর কোরজোন সাহেবের প্রকাশিত মন্তব্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিব। তিনি সুন্দর যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন যে "আর্য্যাবর্ত্তই প্রাচীন আর্য্যদিগের নিবাস-ভূমি।"

"Arya-vartta, the land of the ancient Aryans, that is to say, to India proper, the land the true Indians."

আর্য্যদিগের প্রাচীন নিবাস-ভূমি নির্ণয় করিবার জন্য কোরজোন সাহেব প্রধানত মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আমরাও যখন সেই জগৎপূজ্য

প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তখন সে সকলের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতেছে। কিন্তু কোরজোন সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহার-ভাগে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন এস্থলে তাহার সার ভাগ উদ্ধৃত না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না।

কোরজোন বলেন "আর্য্যগণ ভিন্ন দেশ হইতে ভারতে উপনীত হইয়াছিলেন, তর্কচ্ছলে একথা স্বীকার করিলে দেখা উচিত তাঁহারা কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন।

১। আর্য্যগণ পশ্চিম হইতে ভারতে আসিয়াছেন কি না? পারস্যের আদিম ভাষা, কিম্বা জেন্দ ভাষা অনুসন্ধান দ্বারা অনুমিত হয়, যে আর্য্যদিগের ভাষা সংস্কৃত ইহার কোন ভাষা হইতে সমুৎপন্ন নহে; বিশেষত ইহাই অনুমিত হয় যে, জেন্দ ভাষা আর্য্য ভাষা হইতেই উদ্ভূত। তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, আর্য্যগণ পার্সিবংশ হইতে উৎপন্ন হন নাই। অধিকন্তু পার্সিগণ আর্য্যাবর্ত্ত-বাসী আর্য্য জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কোন প্রকার আত্মকলহ নিবন্ধন ইহাঁরা আর্য্যাবর্ত্ত পরিত্যাগ" পূর্ব্বক পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন।*

২। আর্য্যজাতি উত্তর কিম্বা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন কি না? ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব কিম্বা স্মরণার্থ লিপি অনুসন্ধান করিয়া ভারতের উত্তর কিম্বা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এমন কোন জাতি দৃষ্ট হয় না যাহাদের ভাষা কিম্বা ধর্ম্মের সহিত ইহাদের ভাষা ও ধর্ম্মের কিছুমাত্র সাদৃশ্য ছিল! কিম্বা সেই জাতিকে আর্য্যদিগের পিতৃবংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।" পাঠকগণ এস্থলে একটু বিশেষ বিবেচনা করিবেন, কারণ, কতিপয় পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে আর্য্যগণ উত্তর-পশ্চিম দিক হইতেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেই প্রদেশবাসী এমন একটী জাতিও তাঁহারা দেখাইতে পারেন না যাহাকে দৃঢ়তার সহিত আর্য্যদিগের পিতৃবংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

৩। "আর্য্যগণ পূর্ব্ব দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছেন কি না? যদি পূর্ব্ব দেশ হইতে আর্য্যদিগের আগমন স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে চীনদিগকে আর্য্যদিগের পিতৃ-বংশীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

৪। আর্য্যগণ তিব্বত দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছেন কি না? দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত-শ্রেণীর বিষয় কিছু মাত্র বিবেচনা না করিলেও চীন কিম্বা তিব্বত-নিবাসীদিগকে আর্য্যদিগের পিতৃবংশীয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ প্রাচীন আর্য্যদিগের ভাষা ও ধর্ম্ম প্রভৃতির সহিত চীন ও তিব্বতের প্রাচীন ভাষা, ধর্ম্মের রীতি, নীতি সম্বন্ধে কোন রূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না।

৫। ভাষা ও ধর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় আলোচনা দ্বারা আর্য্যদিগকে ফিনিশ, আরব কিম্বা সৈমিতিক বংশীয়ও বলিবার কোন অধিকার দৃষ্ট হয় না।

৬। জোন্স, উইলফোর্ড, বোলান প্রভৃতি কয়েক জন পণ্ডিত প্রাচীন মিসর-নিবাসী ও আর্য্যদিগকে একবংশীয় লিখিয়াছেন। কিন্তু মৈসর-পুরাতত্ত্ববিৎ চেম্পোলিয়ান, লিপিয়াস, বানসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সুদৃঢ় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন যে প্রাচীন মিসরবাসীগণ সৈমিতিক বংশীয় এবং ইহাদের সহিত আর্য্যদিগের কোন সম্পর্ক নাই।

উল্লিখিত জাতি সমূহ আর্য্যগণ হইতে

* বেন্দিদাদের মতে জোরেষ্টারের পিতৃপুরুষগণ "আর্যনো-বএ্জো" (আর্য্যদেশ বা আর্য্যাবর্ত্ত) নিবাসী।

আধুনিক। আর্য্যগণ যে ভিন্ন দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছেন, এরূপ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। * অপর পক্ষে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে আর্য্যগণ ভারতে অবস্থান পূর্ব্বক সমাজের, ধর্ম্মের ও সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। এবং ইহাই আংশিক রূপে তাহাদিগের হইতে সম্ভূত অন্যান্য জাতির নিকট বিতরণ করিয়াছিলেন।”

পৌরাণিক মতে মহর্ষি কশ্যপ দেব, দানব ও মানবের পিতৃপুরুষ। কাশ্মীরের বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে “বর্ত্তমান কল্পারম্ভে ব্রহ্মার পৌত্র মরীচির পুত্র প্রজাস্রষ্টা কশ্যপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব প্রভৃতি দেবগণের সাহায্যে সতীসরের অভ্যন্তরস্থিত ভূভাগের উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক কাশ্মীর প্রদেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন

ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে কাশ্মীর উপত্যকায় পরিণত হইলে প্রজাস্রষ্টা মহর্ষি কশ্যপ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবরোহণ করিয়া এস্থানেই বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং কাশ্মীর প্রদেশকে আর্য্যজাতির সূতিকা-গৃহ বলা যাইতে পারে। কাশ্মীরের ন্যায় প্রকৃতির উদ্যানসদৃশ একটী মনোহর স্থানে আর্য্য-জাতির শৈশব কাল অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা কোন মতেই অসঙ্গত বোধ হইতেছে না। মোগলেরা কাশ্মীর প্রদেশকে “ভূস্বর্গ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবাসীর চক্ষে কাশ্মীর চিরকালই ভূস্বর্গ। বৈদেশিক ভ্রমণকারীগণও কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছেন। ফরাসী পরিব্রাজক ডাক্তার বর্ণিয়ার কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যে এমনই মোহিত হইয়াছিলেন যে তিনি তাহা বারম্বার উল্লেখ না করিয়া বিরত হইতে পারেন নাই। বর্ণিয়ার এক স্থানে লিখিয়াছেন “আমি যথার্থই কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছি, কল্পনায় এই রাজ্যটীকে আমি যত সুন্দর বিবেচনা করিয়াছিলাম, প্রকৃত পক্ষে কাশ্মীর তাহা হইতেও অধিক সুন্দর। এ সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই।”

তৎপরে ফ্রোষ্টার সাহেব যিনি স্থলপথে কলিকাতা হইতে সেণ্টপিটার্সবর্গে গমন করিয়াছিলেন, আসিয়া ও ইয়োরোপের অধিকাংশ স্থান যাঁহার নয়নগোচর হইয়াছিল, সেই ফ্রোষ্টারও কাশ্মীরের অতুল সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

মেজর রেনেল বলেন “কাশ্মীর প্রদেশ, অলৌকিক সৌন্দর্য্য-ভূমির উর্ব্বরতা ও বায়ুমণ্ডলের তাপের সাম্যভাবের জন্য আসিয়ার সর্ব্বত্র বিখ্যাত; উল্লিখিত বিষয় সমূহের কারণ বিবেচনা দ্বারা এরূপ অনুমিত হয় যে, ইহা একটী সুবিস্তীর্ণ উচ্চ উপত্যকা, তাহার চতুর্দ্দিকে অভ্রংলিহ পর্ব্বত-মালা নীহার-মণ্ডিত প্রদেশ-সীমা ভেদ করিয়া ঋজু ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। একটী বৃহৎ নদীর সঞ্চিত কর্দ্দমরাশিতে এই উপত্যকা গঠিত হইয়াছে। সেই নদী সর্ব্ব-উপত্যকাব্যাপি হ্রদ হইতে উদ্ভূত হইয়া স্বীয় বলে পর্ব্বত বিদারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইয়াছে। তাহাতেই উর্ব্বর উপত্যকা অল্প পরিশ্রমে অপর্য্যাপ্ত ফলপ্রসূ এবং বহুকাল-প্রসিদ্ধ কাশ্মীরের প্রাচীন সুখী অধিবাসীদিগের স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ উপযোগী হইয়া রহিয়াছে।”

যে কাশ্মীর, এই প্রকার প্রকৃতির রমণীয় উদ্যান, যে স্থানে মানবের জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ-উপযোগী ধন-ভাণ্ডার হস্তে লইয়া প্র-

* পণ্ডিত মোক্ষমুলার ইয়োরোপনিবাসী “আর্য্য” দিগের সেই দেশে গমন লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, “No historian can tell us by what impulse those adventerous Namads were driven on through Asia towards the isles and shores of Europe.

কৃতি দেবী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, যাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য কি দেশী কি বিদেশী শত কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে, যে স্থানের প্রত্যেক বস্তু সরলতাময়, যেস্থানে গেলে সংসার-আসক্ত ঘোর নাস্তিকের হৃদয়ও পরমার্থ-ভাবে গলিয়া যায়, সেই স্থলে যে সরল-হৃদয়, ধর্ম্ম-প্রবণ আর্য্য শিশুর বাল্য-বিহারের স্থান, এবং সেই স্থানের অমানুষিক ভাবে উন্মত্ত হইয়া মহর্ষি কশ্যপ যে তথায় বাস করিয়া স্বীয় সন্তান লালন পালন করিয়াছিলেন ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদের প্রতিপক্ষগণ ভাষাগত সাদৃশ্যের প্রমাণটী লইয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে আমরা তাঁহাদের সেই "অখণ্ডনীয় ও সর্ব্বপ্রধান" প্রমাণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

জর্ম্মাণ পণ্ডিত মোক্ষমুলার বলেন যে "ভাষা সম্বন্ধীয় প্রমাণ অখণ্ডনীয়। ইতিহাসের জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের জন্য ইহাই বিশেষ শ্রবণ-যোগ্য প্রমাণ। ভাষা সম্বন্ধীয় প্রমাণ বর্ত্তমান না থাকিলে কৃষ্ণকায় ভারতবাসীর সহিত, তদ্বিজেতা আলেকজেণ্ডার হউন কিম্বা ক্লাইব হউন, তাঁহার যে কোন সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসাধ্য হইত। যে সময়ে গ্রীষদেশে গ্রাকদিগের ও ভারতে হিন্দুদিগের বসতি হয় নাই, সেই সময়ের জন্য, এই প্রমাণ পরিত্যাগ করিলে আর কি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। * * * ভারতে ও ইংলণ্ডে অদ্যাপি এরূপ কতকগুলি শব্দ আছে, যে সে সকলই উত্তর ও দক্ষিণগামী আর্য্যদিগের পৃথক প্রমাণ। কূট প্রশ্নেও এপ্রমাণ খণ্ডন হয় না। দেবতা, গৃহ, পিতা, মাতা, কন্যা, কুক্কুর, গাভি, হৃদয়, অশ্রুজল, কুঠার ও বৃক্ষ সৈনিকদিগের সাঙ্কেতিক বাক্য হিন্দু ও ইয়োরোপীয় সকল ভাষাতেই সমান।" †

ভাষা বিষয়ী তর্ক সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমরা দেখাইব যে পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ জর্ম্মাণ পণ্ডিত মোক্ষমুলারের বাক্যের কিরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন,

"উল্লেখিত ভাষা সকলে উল্লেখিত শব্দগুলির কিপ্রকার সাম্য এখন বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ মিলাইয়া দেখিলে সাম্য না হউক ঘুণাকারের সেই সেই শব্দে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই, ভাষা-সৃষ্টির ক্রম দর্শন করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, সকল ভাষাতেই ওষ্ঠ্য বর্ণ প্রথম সৃষ্ট হইয়াছে। বালকেরা যখন কথা কহিতে আরম্ভ করে, তখন প্রথমেই ওষ্ঠ্য বর্ণ তাহাদিগের বদন হইতে বিনির্গত হয়। ইংরাজ বালকের বাক্য পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বে তাহাদের মুখে "পা" "পা" এই শব্দ উচ্চারিত হয়; বাঙ্গালি বালকের মুখে

† The evidence of language is irrefragable, and it is the only evidence worth listening to with regard to ante historical periods. It would have been next to impossible to discover any traces of relationship between the swarthy natives of India and their conqueror's, whether Alexander or Clive but for the testimony borne by language. What evidence could have reached back to times when Greece was not peopled by Greeks nor India by Hindus? * * * Many words still line in India and in England, that have witnessed the first separation of the northern and southern Aryans and these are witnesses not to be shaken by cross examination. The terms for God, for house, for father mather, son, daughter for dog and cow, for heart and tears, for axe and tree, identical in all the Indo-European idioms, are like the wachwords of soldiers.

History of ancient Sanskrit literature.

ও ঐ শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গালিরা পিতাকে বাবা বলিয়া অভ্যস্ত, সুতরাং বাঙ্গালি বালক সত্বর সেই বাবা শব্দ শিখিয়া লয়। ইংরেজি পাপা শব্দের সহিত বাঙ্গালি বাবা শব্দের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইংরাজ বাঙ্গালির সহোদর এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত উপহাসকর।"

আমাদের পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ কতকগুলি পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির সহিত ইংরেজি পাপা শব্দের সাদৃশ্য আছে। অসভ্য ত্রিপুরা জাতি পিতাকে "ফা" মরুজাতি "পা" মগজাতি "(আ) কা" পেস্কুজাতি "পা" বলিয়া থাকে; সুতরাং ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতানুসরণ করিয়া এই সকল অসভ্য মঙ্গোলিয়ান বংশ-সম্ভূত জাতিগুলিকে ইংরাজের সহোদর বলা যাইতে পারে?

বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেছেন—"ইয়োরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আর্য্য সন্তানগণের যে সময়ে ইয়োরোপে ও ভারতে গমনের কথা বলেন সে সময়ে পাপা ও বাবা শব্দ ছিল না। এদুটী শব্দই আধুনিক। অতএব যাঁহারা এই আধুনিক শব্দ দ্বারায় সাদৃশ্য দর্শনে সিদ্ধান্ত করেন বাঙ্গালী ও ইংরাজ উভয়ই এক, তাঁহাদিগের বাক্য যে অমূলক, তাহা সমক্ষেই প্রমাণ হইতেছে।

আমরা জগতের অতি অল্প ভাষারই খবর রাখি। মনুবংশীয় মানব কিম্বা আদম বংশীয় আদমি—মনুষ্য সকলই একজাতীয় জীব। তাহাদের ভাষার কয়েকটী শব্দের সাদৃশ্য থাকা কিছুই আমাদের নিকট বিস্ময়কর বোধ হয় না।"

বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেছেন,—"ভিন্ন ভিন্ন ভাষার শব্দ-সাদৃশ্য থাকিলেও যে এক জাতীয় হয় না, আমরা ব্যতিরেক উদাহরণ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিতেছি। যথা বাঙ্গালা নাম শব্দ। সংস্কৃতে ইহাকে নামন বলে। ইংরেজি নেইম; সাকসন নামে; জর্ম্মণি নেমি; লাটিন নমেন; ভেনিস নামিস; ফরাসী নমিশ, সুইডিস নম, চীন নন; আরব্য নম, পুরাতন ইটালী নম। আমরা অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে কহিয়াছি, শব্দ-সাদৃশ্য থাকিলেই যে এক জাতীয় হয়, তাহা নহে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নাম শব্দের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতে গিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়াছেন যে চীন ভাষার "নন" (ও আরবি নম) শব্দের সহিত নাম শব্দের সাদৃশ্য প্রদর্শনে বিমুখ হন নাই। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতেই চীন ও আরবিগণ গ্রীক পারসি ও ভারতবাসির সহিত এক জাতীয় নহে।"

"পাঠক আরো একটু চমৎকার দেখুন, সংস্কৃতের সহিত মিলাইয়া অন্য অন্য ভাষার শব্দের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে সংস্কৃত কখন ও কোনও জাতির চলিত ভাষা ছিল না। এমতটী যদি সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের উল্লেখিত পত্তন-ভূমি বালুকারাশির উপরে স্থাপিত ভিত্তির ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর হইল।"

সংস্কৃত কখনই কোন জাতির প্রচলিত গ্রাম্য ভাষা ছিল না। আমাদের প্রাচীন কাব্য ও নাটক হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। জর্ম্মাণ পণ্ডিত বেবার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া প্রথমেই বলিয়াছেন যে সংস্কৃত, ভারতীয় আর্য্যদিগের প্রথম অবস্থার ভাষা ছিল না। প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় আর্য্যগণ যখন আর্য্য আখ্যা ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সংস্কারপ্রাপ্ত ভাষাকে সংস্কৃত আখ্যা প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

পরিব্রাজক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি মহাশয়ের পত্র।

হাবড়া হইতে ১২ ক্রোশ পশ্চিমে বাহিরগড় অবস্থিত। মুসলমান রাজগণের উৎপীড়নে বিতাড়িত হইয়া একজন রাজপুতানাবাসী ক্ষত্রিয় সর্দ্দার তথায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইনি এক বৃহৎ দুর্গ নিম্মাণ করিয়া তাহার ভিতর বাস করিতেন। দুর্গের চতুর্দ্দিক পরিখা বা গড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও গড় অদ্যাপিও রহিয়াছে। দুর্গ-প্রাচীরের উপর যথারীতি কামান সাজান থাকিত। পূর্ব্বোক্ত ক্ষত্রিয় সর্দ্দারের বংশধরেরা ঐ গড়ের ভিতরে আজিও বাস করিতেছেন। ইহাঁদের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে। মনুষ্যের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না, সৌভাগ্য ও সম্পদ চপলার ন্যায় চঞ্চল, বাহিরগড়ের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিবামাত্র ইহাই পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে উদয় হইতে থাকে। যদিও ইহাঁরা পূর্ব্বসম্পদহীন হইয়াছেন, কিন্তু ইহাঁদের মানসিক সদ্গুণের অভাব নাই। এই ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সিংহ মহাশয়ের যত্নেই বিগত বৎসরে তথায় একটি ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবার চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল তথায় আলোচিত হইতেছিল। গড়ের বাহিরে ক্ষেত্র বাবুর একটি সুন্দর বৈঠকখানায় প্রতি রবিবার সন্ধ্যার সময় উপাসনা হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপাচার্য্যের কার্য্যে ব্রতী আছেন। ইনি একজন অত্যন্ত উৎসাহী ব্রাহ্ম। ইনি বাহিরগড় বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত। পঁচিশ ত্রিশ জন ভদ্রলোক প্রতি রবিবার উপাসনার সময় উপস্থিত থাকেন। এতদ্ব্যতীত সমাজ-গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র কুটীরে ছয় সাত জন স্ত্রীলোক নিয়মিত রূপে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ দূর হইতেও আসিয়া থাকেন। কি অনুরাগ! কি উৎসাহ! ঈশ্বর করুন তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের কোমল জ্যোতি দিন দিন আরো বিকীর্ণ হউক। ইহাঁরাই গৃহের শ্রীস্বরূপা, ইহাঁদের উন্নতিতেই নিশ্চয় আমাদের দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। গত ২রা আষাঢ়ে এই বাহিরগড় ব্রাহ্ম-সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমি এই উপলক্ষে তথায় গিয়াছিলাম। উৎসবের পূর্ব্বদিন প্রদোষ কালে আমি সেখানে উত্তীর্ণ হইয়া দেখি, কতকগুলি ভদ্রলোক মহা উৎসাহের সহিত সমাজগৃহের সম্মুখে ম্যারাপ বাঁধিতেছেন। দূর হইতে ইহাকে বারইয়ারী পূজার অনুষ্ঠান মনে করিয়াছিলাম। পরে যখন ভ্রম ভঞ্জন হইল তখন আনন্দের আর সীমা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েক জন ব্রাহ্মের সমভিব্যাহারে আমি কাণা নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় বদান্য মহারাজ মহতাপচন্দ্র কে নূতন খাল খনন করিয়া দিয়াছেন, তাহারই জল এই নদীতে আসিয়া পড়াতে ইহা সকল সময়েই পূর্ণসলিলা হইয়া রহিয়াছে। ইহা দ্বারা দেশের লোকের বিস্তর উপকার হইয়াছে। নদীতীর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি ব্রাহ্মেরা উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কারণ উৎসব দিনের সাত দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা নিত্য উপাসনার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে ত্রিশ চল্লিশ জন ভদ্রলোক দ্বারা সমাজগৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা আসিয়া অপর কক্ষে সমাসীনা হইলেন। আমাকে ব্রাহ্মেরা বেদী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমি তাহা না করিয়া তাঁহাদের উপাচার্য্য মহাশয়কে বেদী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন। পরে চারি পাঁচ জন ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া মধুরকণ্ঠে তাঁহাদের রচিত সংগীত ও মহাত্মা রামমোহন রায়ের গান গাইলেন। আমি তাঁহাদের গান শুনিয়া যার পর নাই প্রীত হইয়াছিলাম। সে ভক্তিমিশ্রিত সংগীত যিনি শুনিয়াছেন ভক্তিবিহীন কলাবন্তের গান তাঁহার কখনই ভাল লাগিবে না। রাত্রি আট ঘটিকা হইতে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপাসনা ও সংগীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। পরে উৎসব দিনের কার্য্য-প্রণালী অবধারিত হইল

আমি সমাজগৃহে রাত্রি যাপন করিলাম। দুই জন ব্রাহ্ম আমার নিকট রহিলেন। নিশাবসানে কাণা নদীর সুশীতল জলে স্নান করিলাম। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক ভদ্রলোক আসিয়া সমাজগৃহ পরিপূর্ণ করিলেন। গৃহের বাহিরেও অনেক লোক দাঁড়াইয়াছিলেন। বেলা ৯ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মদের অনুরোধে আমি বেদী গ্রহণ করিয়াছিলাম। বেদী গ্রহণ করিবা মাত্রই "এস ভাই সবে মিলে ডাকি দয়াল পিতা বলে, হোক্‌না কেন পাষাণ হৃদয়, নামের গুণে যাবে গোলে" এই মনোহর গান সুরলয় তানযোগে গীত হইল। অনন্তর এই সমাজের শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উৎসাহের সহিত একটি বক্তৃতা করিলেন। পরে "হৃদয়েরি রাজা আজ এসেছেন হৃদয় মাঝে, সাজাও হৃদয় রাজে যেরূপে সাজালে সাজে" এই গান গীত হইলে আমি একটী বক্তৃতা করিয়াছিলাম। বক্তৃতার বিষয়—"আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়া প্রকৃতির উপর এক রূপ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং রণবিশারদ বীরগণ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পৃথিবীকে ভোগ করিতেছেন, পূর্ব্বকালীন ভারতবাসী আর্য্য ঋষিরা তেমনি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়া আত্মাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকৃতির পরিবর্ত্তে পরমাত্মাকে—সেই পরম পুরুষকে ভোগ করিয়া গিয়াছেন। আত্মতত্ব বিষয়ের গূঢ় রহস্য তাঁহারা যেমন আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন এমন আর কোন কালে কোন জাতি পারে নাই। সেই পূজ্যপাদ ঋষিরাই এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই ধর্ম্মকে বিদেশী ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা ও পরিত্যাগ করিবার কোন কারণ

দেখা যায় না।" তদনন্তর সমস্বরে চারি পাঁচ জন ব্রাহ্ম এমন মধুর ব্রহ্মসংগীত করিলেন, যে তৎ শ্রবণে কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বেলা ১০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল। অনন্তর দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছিল। আমি গিয়া ক্ষেত্রমোহন বাবুর ভ্রাতা হরমোহন বাবুর বৈঠকখানায় মধ্যাহ্নে অবস্থিতি করিলাম। বেলা ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত অনেক ভদ্রলোক তথায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা কথা হইয়াছিল। অনেকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি সাধ্যানুসারে সে সকলের উত্তর দিয়াছিলাম। পরিশেষে কয়েক জন ভট্টাচার্য্য "জগৎ মায়াময়' বলিয়া তর্ক আরম্ভ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আমি একটি বান্ধের সঙ্গে অতি সুন্দর এক মাঠে উপস্থিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম। তাহাতেই আমার সমস্ত শ্রম দূর হইল এবং পরম শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলাম।

সাড়ে সাত ঘটিকার সময় তথা হইতে সমাজগৃহের নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখি, নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বহু ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছে। গ্রামের ইতর লোকেরাও রাস্তার উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া সমাজগৃহকে পূর্ণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদের উপাসনা সমাজ গৃহে হয় নাই, এক জন্য তাহারা সমস্ত গৃহই দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। সমাজগৃহের সম্মুখে যে মণ্ডপ প্রস্তুত করা হইয়াছিল সেই স্থানেই রাত্রিকালের উপাসনা হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় তিন শত লোক উপাসনা স্থলে উপস্থিত ছিলেন। দেবদারু-পত্রে ও ফুলে পতাকায় আলোকে উৎসব-ক্ষেত্রের চমৎকার শোভা হইয়াছিল। রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হইল। আমি বেদী গ্রহণ করিয়াছিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য আমার পার্শ্বে স্বতন্ত্র এক কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রথমে সংগীত, পরে উপাসনা ও বক্তৃতা হইয়াছিল। আমার বক্তৃতার বিষয় এই "মনুষ্য সেই প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরকে আশ্রয় করে না বলিয়াই সংসারে এত ক্লেশ এত যাতনা—যে হৃদয়ে—যে পরিবারে তাঁর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে সেখানে অশান্তি প্রবেশ করিতে পারে না—সে প্রেমের রাজ্যে স্বর্গীয় আনন্দ বিরাজ করে" পরে কয়েকটি মনোহর ব্রহ্মসংগীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। পর দিন প্রাতে দীন দরিদ্রদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইয়াছিল। আমি ঐ দিন বেলা ৯ ঘটিকার সময় ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মাঠের সুন্দর শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে এবং মধ্যাহ্নে নিস্তব্ধতা উপভোগ করিতে করিতে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

আর একটি কথা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাহিরগড় ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে যখন আমি বিদায় গ্রহণ করি, তখন তাহাদের বিরহজনিত যাতনা আমি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলাম। তাঁহাদের তৎকালীন স্নেহময় বাক্য ও ... তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। তাঁহাদের বিনয়, সৌজন্য সরলতা ও ধার্ম্মিকতা সকলই হৃদয়গ্রাহী। ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা তাঁহারা যেন প্রাণপণে এই বাহিরগড় ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করেন এবং হৃদয়ের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে পালন করেন।

CONSTANCY.

FROM THE INDIAN MESSENGER.

Constancy in Faith is the only sure basis of life. All else vanishes—the soul ever remains our own; we can establish ourselves upon an imperishable foundation only by drawing ourselves away from things outward and seeking to realise the nearness of God with unceasing prayer and effort. Every human heart longs for an abode of peace and tranquillity, but few remember that such a state is to be attained through Faith alone. We groan under the burden of this life, and, thoughtless as children, we restlessly look around for consolation; but that burden can be lightened only by the love of God. Poor weary as we are, let us try to be true believers—there, and there alone is cure for our wretchedness! Life was not given to us for nothing. God cannot have sent us here without a solemn purpose to fulfil and that great purpose is—to teach us to believe in Him even in the darkness of this world. Every moment that we waste buries with it many a precious truth that it had brought in vain to our unawakened eyes. There is not a single day however dark and full of suffering, which does not in silence convey precious gifts of love and truth to the soul that submits patiently to the divine discipline and strives unceasingly against its own frailties. The earnest seeker of God defies the chances of Fate—the vicissitudes of pleasure and pain; joy or sorrow does not matter to him; he ever casts his longing eyes towards the throne of God, and the severest trials only bring to him opportunities of testing his reliance upon God. He interprets events only in their relation to the soul: without stopping to calculate the quantities of pleasure or pain which they bring to him. He uses them only as means of ascertaining his true spiritual condition. Even when weighed down by the burden of sorrow, what adds to the poignancy of his grief is the thought that he is far away from God: "Alas! sorrow could not have thus overpowered me, the stings of affliction would have been unfelt, if I had been with Him!"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৬ শ্রাবণ রবিবার ৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।

পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগকে অধ্যাত্ম যোগ কহে,—এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি বলিতেছেন শ্রবণ কর—"অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি," "অধ্যাত্ম-যোগের অবলম্বন দ্বারা পরম দেবতাকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ-শোক হইতে মুক্ত হ'ন;" অধ্যাত্ম-যোগের সাধন-কার্য্য কিরূপ তাহাও বলিয়াছেন;—প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ;" প্রণব ধনু—শর জীবাত্মা—লক্ষ্য পরব্রহ্ম; অপ্রমত্ত—অর্থাৎ প্রমাদ-বর্জ্জিত হইয়া—আত্মাকে পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করিতে হইবে—যেন শরের ন্যায় আত্মা পরমাত্মাতে তন্ময়ীভূত হইয়া যায়। প্রণব কি না ওঙ্কার—তাহা ধনুঃ-স্বরূপ, অর্থাৎ ওঙ্কার-দ্বারা আত্মাকে জাগ্রত [illegible] হইবে; ওঙ্কার [illegible] স্মরণ-পথে আন [illegible] ও-প্রলয়ের শক্তি; যে শক্তি-দ্বারা সূর্য্যের চক্ষু উন্মীলিত হয়—জ্ঞানের চক্ষু উন্মীলিত হয়, যে শক্তি-দ্বারা সমস্ত জগৎ উদাম উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তিতে জীবিত হয়, যে শক্তি-দ্বারা তমসাচ্ছন্ন পৃথিবী সুপ্তিতে বিলীন হয়, সেই মহতী শক্তি স্মরণ করিয়া আমাদের আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে।—ওঙ্কারের স্পন্দন-দ্বারা আত্মা নিকৃষ্ট বৃত্তি-সকলের আক্রমণ ছাড়াইয়া উঠিয়া বিমল জ্ঞানাকাশে উত্থান করিলে—অবাত-কম্পিত দীপ-শিখার ন্যায় স্থির-নিষ্ঠ হইলে—তবে পরমাত্মার দর্শন-লাভে কৃতার্থ হইতে পারে—তখন আত্মার জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা তিনেরই সম্যক্ চরিতার্থতা সম্পন্ন হয়। পৌত্তলিকেরা চক্ষু উন্মীলন করিলেই তাঁহার ইষ্ট দেবতার মৃৎকাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতে পা'ন—এবং চক্ষু নিমীলন করিলেই সেই প্রতিমূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়াভ্যন্তরে দেখিতে পা'ন—এবং তাহাতেই তিনি তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম স্থাপন করেন, ব্রাহ্ম তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না—কাল্পনিক ঈশ্বরে তিনি প্রেম স্থাপন করিতে পারেন না; সত্য ঈশ্বরকে—জাগ্রত ঈশ-

রকে পূজা করিতে পারিলেই তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়; সুতরাং অধ্যাত্মযোগের অবলম্বন দ্বারা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বিষয়েতে মনের যোগ করাকে মনোযোগ কহে, পরমাত্মাতে আত্মার যোগ করাকে অধ্যাত্ম-যোগ কহে। মনোযোগ ব্যতিরেকে বাহ্য-বিষয় কাহারো উপলব্ধিগম্য হয় না, অধ্যাত্মযোগ ব্যতিরেকে পরমাত্মা কাহারো উপলব্ধিগম্য হ'ন না। কত সময়ে এরূপ দেখা যায় যে, নিদ্রিত ব্যক্তির চক্ষু উন্মীলিত রহিয়াছে, তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, অথচ সম্মুখবর্ত্তী একটি বিষয়ও তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইতেছে না;—ইহার কারণ কেবল এই যে, তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারে মন উপস্থিত নাই। আমাদের মনোযোগের অভাবে কোন বস্তু যদি আমাদের চক্ষু এড়াইয়া যায়, তবে সেই-মাত্র প্রমাণের বলে আমরা বলিতে পারি না যে, সে বস্তু প্রত্যক্ষের অগোচর; নৈশ আকাশ-মণ্ডলে আমরা যদি ধ্রুব নক্ষত্র খুঁজিয়া না পাই, তবে তাহাতে ইহাই বুঝাইবে যে, আমাদের মনোযোগের ত্রুটি হইয়াছে, ইহা প্রমাণ হইবে না যে, ধ্রুব নক্ষত্র মানব-চক্ষুর অগোচর; সেইরূপ যদি আমরা আত্মাতে পরমাত্মার উপলব্ধি করিতে না পারি তবে তাহাতে কেবল ইহাই প্রকাশ পাইবে যে, আমাদের অধ্যাত্ম-যোগের ত্রুটি হইয়াছে, তদ্ভিন্ন তাহাতে এমন কিছু প্রমাণ হইবে না যে, পরমাত্মা আমাদের উপলব্ধিগম্য নহেন। বিষয়-বিশেষ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে মনোযোগই যেমন তাহার একমাত্র উপায়, সেইরূপ পরমাত্মাকে অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইলে, অধ্যাত্মযোগই তাহার একমাত্র উপায়।

অনেকে বলেন যে, মনের স্থৈর্য্যই অধ্যাত্ম-যোগ; এমন কি—তাঁহারা এ পর্য্যন্তও বলিতে ত্রুটি করেন না যে, অধ্যাত্মযোগে—মনঃস্থৈর্য্যই সার সংকল্প, ঈশ্বরোপাসনা তাহার একতম উপায়,—মনঃস্থৈর্য্যই সাধকের মুখ্য প্রয়োজনীয়, ঈশ্বরোপাসনা কেবল একটা উপলক্ষ্য মাত্র;"—ইহাঁদের কি ঘোরতর মতি-ভ্রম।—তন্মন-ভাবে কোন ব্যক্তি যখন উপন্যাস পাঠ করেন, তখন তাঁহার মনের এমনি স্থিরতা হয় যে, তাঁহাকে ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না,—তাহা বলিয়া তাঁহার সেই মনের স্থৈর্য্যকে কি আমরা অধ্যাত্ম-যোগ বলিব? মনঃ-স্থৈর্য্যই যদি সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করা অপেক্ষা আরব্য উপন্যাস পাঠ করা তাঁহার পক্ষে আশু-ফলপ্রদ। সংগ্রাম ব্যতিরেকে নেপোলিয়নের মন কিছুতেই স্থৈর্য্য মানিত না—কেবল সংগ্রাম-কোলাহলের মধ্যেই তাঁহার মন অটল স্থৈর্য্য লাভ করিত,—সে স্থৈর্য্যকে কি আমরা অধ্যাত্ম-যোগ বলিব? বিষয়ের মোহিনী শক্তি দ্বারা আমাদের মন যখন তাহাতে প্রবল বেগে আকৃষ্ট হয়, তখন আমাদের মনের খুবই একাগ্রতা হয়, খুবই স্থৈর্য্য হয়—কিন্তু তাহাতে অধ্যাত্ম-যোগের ব্যাঘাত ভিন্ন সাহায্য কিছুই হয় না। অতএব সাধকের এইটি মনে রাখা নিতান্ত আবশ্যক যে, বিষয়ের প্রতি মনের যে যোগ তাহা অধ্যাত্ম-যোগ নহে—তাহা মনোযোগ মাত্র; পরমাত্মাতে আত্মার যে, যোগ, তাহাই অধ্যাত্ম-যোগ।

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, বিষয়-বিশেষের অবলম্বন পাইলে তাহা কিয়ৎক্ষণের জন্য স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারে; ইহা দেখিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিরাও দেবদেবীর প্রতিমাকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার প্রতি মনঃসমাধা করিয়া থাকেন; কিন্তু অধ্যাত্ম-যোগের সাধন-প-

বৃত্তি সেরূপ নহে। মনের ক্ষণোত্তেজিত শাখা-বৃত্তির চরিতার্থতা স্বতন্ত্র এবং সমুদায় মনোবৃত্তি-সমন্বিত সমগ্র আত্মার চরিতার্থতা স্বতন্ত্র। শেষোক্ত প্রকার সমগ্র চরিতার্থতাই অধ্যাত্মযোগের উদ্দেশ্য;—ইহার তাৎপর্য্য একটু বিস্তার করিয়া বলা আবশ্যক;—

যখন আমরা শুষ্ক বিজ্ঞানের আলোচনায় মনঃ-সমাধান করি তখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সবিশেষ চরিতার্থতা লাভ করে—কিন্তু প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি আর আর অনেক মনোবৃত্তি পশ্চাতে পড়িয়া থাকে; যখন আমরা রামায়ণ প্রভৃতি কাব্য শাস্ত্রে মনঃ-সমাধান করি, তখন আমাদের হৃদয়ের প্রীতি-ভক্তি স্নেহ-করুণা প্রভৃতি সবিশেষ চরিতার্থতা লাভ করে, কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তি তাহার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে; যখন আমরা কোন বীর-চরিত পাঠ করি তখন আমাদেব জয়েচ্ছা সবিশেষ চরিতার্থতা লাভ করে, কিন্তু আব আর বহুতব মনোবৃত্তি পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ বিষয়েতে মনের যোগ সাধন দ্বারা বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তির চরিতার্থতাই সাধিত হয়, সমুদায় মনের চরিতার্থতা সাধিত হয় না; সম্মুখবর্ত্তি বিষয় দ্বারা যে মনোবৃত্তি উত্তেজিত হয় সেই মনোবৃত্তিই চরিতার্থতা লাভ করে—যে বৃত্তিগুলি প্রসুপ্ত থাকে সে-গুলি অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। ক্ষণোত্তেজিত উপস্থিত মনোবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন অধ্যাত্মযোগের উদ্দেশ্য নহে—অধ্যাত্ম-যোগের উদ্দেশ্য অতীব মহান্; পবিত্র-জ্ঞান-প্রেম-ধর্ম্ম-সমন্বিত যে আত্মা সেই আত্মার সম্যক চরিতার্থতাই অধ্যাত্মযোগের উদ্দেশ্য; বিষয়েতে মনঃসমর্পণ দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না, সত্য-সুন্দর-মঙ্গল পরমাত্মাতে আত্মসমর্পণ করাই সে উদ্দেশ্য-সাধনের একমাত্র উপায়। পশু পক্ষীদিগের মন পার্থিব বিষয়-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে গ্রস্ত হইয়া থাকে—তাহাদের মনের এক কোণও অবশিষ্ট থাকে না,—গায়ক বিহঙ্গেরা সমুদায় মনের সহিত গান করে, সিংহ ব্যাঘ্র সমুদায় মনের সহিত জীব হিংসা করে, মধুমক্ষিকা সমুদায় মনের সহিত মধুচক্র নির্ম্মাণ করে; কিন্তু মনুষ্য পার্থিব বিষয়ে যতই কেন মনের সহিত নিযুক্ত থাকুক না—তাহার ভিতরে অসীম গভীরতা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়—সেখানকার সেই গম্ভীর নিস্তব্ধ শূন্যতা পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুরই দ্বারা পূর্ণ হইবার নহে,—পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুতেই আত্মার ক্ষোভ শান্তি হইতে পারে না।

মনের সহিত বিষয় অবলম্বন করিয়া যেমন আমরা মনের ক্ষণিক তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকি, আইস আমরা, সেইরূপ সমুদায় আত্মার সহিত পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া আত্মার চিরন্তন শান্তির সোপান প্রতিষ্ঠা করি। সমস্ত সংসার—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড—বিস্মৃত হইয়া এই সুন্দর মুহূর্ত্তে আইস আমবা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত পরমাত্মাতে সংযুক্ত হই—আমাদের আত্মার অন্তরতম গভীরতম প্রার্থনার উৎস আইস আমরা তাঁহার প্রতি উন্মুক্ত করিয়া দিই তিনি অজস্র ধারে তাঁহার প্রসাদ বারি বর্ষণ করিবেন। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হও, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড তোমার নাম ধ্বনিত হউক, তোমার মহিমা প্রভাসিত হউক—তোমার প্রেমমুখ যেন আমাদের মোহ-মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকে,—তোমার সহিত যুক্ত হই। আমরা যেন তোমার প্রেমে উৎফুল্ল হই—তোমার আদেশে তোমাকে অবলম্বন করিয়া যেন সমুদায় কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করি—ও সংসারের সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া

তোমার জ্যোতির্ম্ময় মহিমার মধ্যে অবস্থান করি এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

গান।

ললিত। আড়াঠেকা।

চলিযাছি গৃহ পানে, খেলাধূলা অবসান।
ডেকে লও, ডেকে লও, বড় শ্রান্ত মন প্রাণ।
ধূলায় মলিন বাস,
আঁধারে পেয়েছি ত্রাস,
মিটাতে প্রাণের তৃষা বিষাদ করেছি পান॥
খেলিতে সংসারের খেলা কাতরে কেঁদেছি হায়,
হারায়ে আশার ধন অশ্রুবারি ব'হে যায়;
ধূলাঘর গড়ি যত
ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে তত,
চলেছি নিরাশ মনে, সান্ত্বনা কর গো দান।

টোড়ি। কাওয়ালি।

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই
কেন গো একেলা ফেলে রাখ'!
ডেকে নিলে, ছিল যারা কাছে,
তুমি তবে কাছে কাছে থাক'।
প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়,
রবি শশি দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায়
তারে তুমি ডাক, প্রভু, ডাক।
সংসারের আলো নিভাইলে,
বিষাদের আঁধার ঘনায়,
দেখাও তোমার বাতায়নে
চির-আলো জ্বলিছে কোথায়।
শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই,
পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই,
অসীম প্রেমের উৎস কই,
আমারে তৃষিত রেখনাক।
কে আমার আত্মীয় স্বজন
আজ আসে, কাল চলে যায়।
চরাচর ঘুরিছে কেবল
জগতের বিশ্রাম কোথায়!
সবাই আপনা নিয়ে রয়,
কে কাহারে দিবে গো আশ্রয়,
সংসারের নিরাশ্রয় জনে
তোমার স্নেহেতে, নাথ, ঢাক'॥

ভবানীপুর দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৮০৬ শক ৯ আষাঢ় রবিবার।

ঈশ্বরই এই অসীম জগতের স্রষ্টা-পাতা, তিনিই আমারদের এই শরীর মন আত্মার একমাত্র নির্ম্মাতা। যাহার যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, বা ভবিষ্যতে যে যাহা কিছু লাভ করিবে, তিনিই কেবল তৎসমূহের অদ্বিতীয় বিধাতা। তাঁহার নিত্য-উদার সদাব্রত ভিন্ন কি অন্ন পান, কি বলবীর্য্য, কি ধন সম্পদ, কি জ্ঞানধর্ম্ম, আর কোন স্থান হইতে কিছুই লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই, কেন না তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একাধিপতি, তিনিই অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। জননী-জরায়ু হইতে পিতা মাতারও অজ্ঞাতসারে তাঁহার দানে আমরা পরিপুষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছি, বর্ত্তমানে সকলের সমক্ষে তাঁহারই প্রসাদ উপভোগ করিতেছি, অনন্ত-জীবন লোকলোকান্তরে তাঁহারই স্নেহ করুণায়, জ্ঞান-ধর্ম্মে, প্রীতি-পবিত্রতায় পরিপোষিত হইব।

পৃথিবীতে অতুল ধনসম্পদশালী ব্যক্তি হয়তো খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিবার জন্য যাচকের অভাব অনটনের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি না রাখিয়া অকাতরে দান করেন, কিন্তু ঈশ্বরের ভাণ্ডার অশেষ বলিয়াই যে তিনি কেবল

দিবা রাত্রি উদাসীন ভাবে অজস্ররূপে দান করিয়া আপনার মহত্ত্ব-সাধন করিতেছেন, তাহা নহে। তিনি "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ"। তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথাপ্রয়োজন উপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। তাঁহার দানে তাঁহার অনন্ত জ্ঞান প্রেম অশেষ স্নেহ-করুণা সর্ব্বক্ষণই প্রদর্শিত হইতেছে। তাঁহার পালন ও রক্ষণ-ক্রিয়ায় অতুলন মাতৃ-স্নেহ, অকপট পিতৃ-ভাব স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে। মাতা যখন স্বীয় দুগ্ধ-পোষ্য শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া আপনার অকপট হৃদয় দান করত তাহাকে স্তন-দুগ্ধে পোষণ করিতে উপবেশন করেন, পরম মাতা পরমেশ্বর তখন সেই হৃদয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া স্নেহ প্রেমে তাহাকে পূর্ণ করত শিশুর প্রতি তাহা নিয়োগ করিতে মাতাকে শিক্ষাদান করেন। শিশু যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া মুখ-ব্যাদান করে, জননী যখন আগ্রহ সহকারে স্তন-বৃন্ত তাহার মুখ-বিবরে প্রদান করেন, অখিলমাতা তখন মাতার দেহাভ্যন্তরালে থাকিয়া তাঁহার শরীরের শোণিত পদার্থান্তরে সঞ্চালন পূর্ব্বক অদ্ভুত রাসায়নিক ক্রিয়া যোগে তাহাকে প্রাণদ দুগ্ধরূপে পরিণত করত মাতাকে স্তন্য দানে সমর্থ করেন। সেই জাগ্রত জীবন্ত দেব মাতার হৃদয়ে স্নেহের উৎস উৎসারিত করিয়া না দিলে, মাতা আর কোথা হইতে স্নেহ দান করিবেন, তিনি তাঁহার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার না করিলে জননী আর স্বীয় বলে কোথা হইতে দুগ্ধ আহরণে কৃতকার্য্য হইবেন। এইরূপে যেখান হইতে আমরা যাহা কিছু প্রাপ্ত হই, ঈশ্বরই তাহার একমাত্র বিধাতা।

মাতাই সন্তানের স্বাভাবিক রক্ষক। মাতৃ-ক্রোড়ই শিশুর নিরাপদ দুর্ভেদ্য দুর্গ। মাতা যতক্ষণ জাগ্রত বা সতর্ক থাকেন, ততক্ষণই তিনি কিয়ৎপরিমাণে শিশুর রক্ষায় সমর্থ হয়েন কিন্তু এমন কতশত দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন বিপত্তি চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে মাতার ক্ষীণ বুদ্ধি-নেত্র তাহা দেখিতেও পায় না। যিনি "রক্ষণং রক্ষণানাং" যিনি রক্ষকদিগের রক্ষক তিনি রক্ষা না করিলে আর কোন রূপেই সুরক্ষিত হইবার উপায়ান্তর নাই। রজনীর অসহায় অবস্থাতে মাতা যখন আপনার স্নেহের পুত্তলিকা শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া শিশুরক্ষা করা দূরে থাকুক, যখন আত্মরক্ষায়ও অসমর্থ হইয়া পড়েন, তখন সেই চির জাগ্রত জীবন্ত দেব, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিতেছেন, তিনি রক্ষা না করিলে আর রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা নাই। সেই সাক্ষাৎ প্রাণ-স্বরূপ ঈশ্বর হৃদয়াকাশে থাকিয়া আবার সেই নিশ্চেষ্ট শরীরে চেতনা না দিলে, নির্ব্বীর্য্য মনে চেষ্টা উদ্যম প্রেরণ না করিলে, কে আর আনন্দের সহিত প্রভাতের সূর্য্যোদয় দেখিতে সমর্থ হইত।

"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"

কেবা শরীর চেষ্টা করিত, কেবা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন।

কৌমার যৌবন বা বার্দ্ধক্যে আমরা আত্ম-চেষ্টা দ্বারা অন্নপান গ্রহণ করি, এবং দেহ-রক্ষা, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়বিস্তার করিয়া থাকি। কৌমার বার্দ্ধক্যে না হউক, যৌবনে আত্ম-প্রভাবের উপরেই মনুষ্যের অধিকতর নির্ভর। এই সময়ে তজ্জন্য আত্মগৌরবেই অনেকে যার পর নাই গর্ব্বিত ও স্ফীত হইয়া থাকেন। সর্দ্দীক্ষা ও সদ্দৃষ্টান্তের অভাবে পিতা মাতা গুরুজনের শাসন-প্রভুত্বের কথা দূরে থাকুক, অনেকের চক্ষে সেই পূর্ণপ্রেম পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-শক্তি সর্ব্বাচ্ছাদক ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব পর্য্যন্তও

আর সহ্য হয় না। অনেকে ক্ষুদ্র বুদ্ধির দূষিত তর্কে তাঁহার পূজার্চ্চনার আবশ্যকতা পর্য্যন্ত খণ্ডন করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন। সামান্য বিদ্যা-বুদ্ধির খদ্যোত-সদৃশ ক্ষীণ-জ্যোতিতে সেই অনন্ত জ্ঞান-সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিতেও উদ্যত হয়েন। সেই অসীম ব্রহ্মাণ্ড-পতিকে সিংহাসনচ্যুত করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। বল-বীর্য্য সুখ-সম্পদ জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতিকে অনেকেই আপনাপন যত্ন চেষ্টা ও শিক্ষা-সাধনের ফল মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু একবার চিন্তাও করেন না যে, এই দেহ মন আত্মা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলাম, কে আমারদের বৃত্তি প্রবৃত্তি সকলের নির্ম্মাতা, কে আমারদের যত্ন চেষ্টা শিক্ষা সাধনের ফলদাতা। কার ভাণ্ডার হইতে অন্ন জল, জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া শরীর মনের ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিতেছি। তাঁর সদাব্রত-দ্বার অবারিত বলিয়া কি তাহার কেহ কর্ত্তা নাই? যাচ্ঞা না করিয়াও তাঁহার অপার স্নেহ-গুণে জল-বায়ু আলোক প্রভৃতি বহুবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সম্ভোগ করিতে পাইতেছি বলিয়া তৎসমু হর কি কেহ বি-ধাতা নাই? শরীরের বল-পুষ্টিকর, ইন্দ্রি-য়ের সুখ-তৃপ্তিকর দ্রব্যাদি অহর্নিশি অনা-য়াসে লাভ করিতেছি বলিয়া সে সকলের কি কেহ স্রষ্টা নাই? ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, নিশ্বাসের বায়ু গ্রহণ করিয়া অক্লেশে প্রাণ ধারণ করিতেছি বলিয়া কেহ কি আ-মারদের রক্ষক নাই? এই নিখিল জগতের স্রষ্টা পাতা বিধাতা যে আমারদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পিতার ন্যায় রক্ষা না করিলে মাতার ন্যায় সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পালন না করিলে, যে আমরা এক মুহূর্ত্তও সুরক্ষিত হই না? তিনি শরীর অন্তরালে থাকিয়া ভুক্ত অন্ন যথাযোগ্য পথে সঞ্চালন করত তাহা হইতে রস রক্তাদি উৎপাদন পূর্ব্বক শরীরপোষণে নিয়োগ না করিলে, তিনি দেহযন্ত্রের অদ্বিতীয় যন্ত্রী হইয়া নিঃশ্বাস-গৃহীত বায়ু হইতে যাহা প্রাণদ যাহা সুখদ, তাহা সংগ্রহ করিয়া যাহা প্র-ত্যক্ষ বিষবৎ অনিষ্টকর অপকারক, তাহা বহির্গত করিয়া না দিলে এক মুহূর্ত্তেই যে আমরা মৃত্যুমুখে নিপতিত হই। দেহের ন্যায় এই বিশ্ব-চক্র তিনি স্বয়ং সঞ্চালন না করিলে যে এক পলকে সকলই বিনাশ-গ্রাসে নিপতিত হয়!

হে বিদ্বান্! যে রসনায় তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছ, যে বাক্যে তাঁহার উপা-সনার অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতেছ, এ রসনা ও বাক্‌যন্ত্র কি তোমার স্বহস্ত-নি-র্ম্মিত? ইহার ক্রিয়া-কলাপ কি তোমার বুদ্ধি-কৌশলে বা বাহুবলেই নিষ্পাদিত হই-তেছে? যিনি দেহ মনের রচয়িতা, যিনি অনন্ত বিশ্বের স্রষ্টা, তিনিই যে এই পরমা-শ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কৌশল-সম্পন্ন পরমাদ্ভুত যন্ত্রের যন্ত্রী হইয়া স্বয়ং ইহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সঞ্চালন করিতেছেন বলিয়াই যে ইহা চলিতেছে। তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাও না বলিয়া কি তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস কর? তাঁহারই প্রসাদে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছ, তুমি তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত করত সহস্র দোষে দোষী হইয়া তাঁহারই অনন্ত ক্ষমাগুণে এখনও জীবিত রহিয়াছ বলিয়া কি তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ অস্বীকার কর? বায়ু তো জড় পদার্থ, তাহাকে চক্ষে না দেখিয়াও তো কেবল স্পর্শ করিয়া তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছ। প্রাণ মন, শরীর-অভ্যন্তরে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহারা অদৃশ্য হইলেও তো তাহারদের কার্য্য দেখিয়াই তাহারদের স্থিতি উন্নতিতে বিশ্বাস কর? আর যিনি "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং

মনসোমনোযদ্বাচোহ বাচং সউ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ” যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, তাঁহার সত্তা সন্নিকর্ষ উজ্জ্বলতররূপে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিতে পার না? তিনি জড়ের ন্যায় চর্ম্ম-চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত হয়েন না বলিয়া কি তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে চেষ্টা কর না? তিনি যে এই শরীরে প্রাণের প্রাণ, আত্মার অন্তরাত্মা হইয়া অহর্নিশি বিরাজ করিতেছেন, তিনি যে এই বাহ্য জগতের প্রতিপদার্থের অন্তরালে যন্ত্রী নিয়ন্ত্রীরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। একবার অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন করিয়া কি তাঁহাকে দেখিবে না? চর্ম্মচক্ষেই যে জড় পদার্থ অবলোকন করিতেছ, এক দৃষ্টিতেই কোন্ তাহার অন্তর-বাহ্য সন্দর্শন করিতে সমর্থ হও? ফল পুষ্প হস্তে ধারণ করিয়া তো কেবল তাহার উপরিভাগ, তাহার বাহ্য-শোভাই নিরীক্ষণ করিয়া থাক; ফলের যাহা সত্ত, পুষ্পের যাহা সার, তাহা তো এই চর্ম্ম-চক্ষে প্রতিভাত হয় না। যতক্ষণ না তাহা ভেদ কর, যতক্ষণ না তাহা তন্ন তন্ন করিয়া ছেদ কর, ততক্ষণ আর প্রকৃত পদার্থে দৃষ্টি নিপতিত হয় না। যিনি জগতের সত্তা, ব্রহ্মাণ্ডের সার; কৌশলের কর্ত্তা, প্রাণের প্রাণ; নিয়মের নিয়ন্তা, আত্মার জীবন; তাঁহাকে ক্ষুদ্র বুদ্ধি-নেত্র উন্মীলন করিয়া আর কি দেখিবে? যেমন তিলে তৈল, দধিতে ঘৃত, অন্তঃসলিলা নদীর গর্ত্তে জল, কাষ্ঠে অগ্নি প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে বলিয়া তাহা সহসা দৃষ্ট হয় না, যে ব্যক্তি যন্ত্রযোগে তাহা নিষ্পীড়ন, মন্থন, খনন ও সংঘর্ষণ করেন, তিনি তাহাদিগের অন্তর্ভূত সার-পদার্থ সকল দেখিতে পান; তেমনি যিনি শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া সত্যের দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে সকল আবরণ আচ্ছাদন ভেদ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারই নির্ম্মল অন্তশ্চক্ষুতে তিনি প্রতিভাত হয়েন।

> তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
> রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
> এবং আত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
> সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি।

এইরূপে যিনি তাঁহাকে সকল সত্তার সত্তা, সকল শক্তির শক্তি, সকল প্রাণের প্রাণ রূপে সর্ব্বত্র জাগ্রত জীবন্ত ভাবে সন্দর্শন করিতে যত্নশীল হয়েন, তিনিই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। কেবল চর্ম্ম-চক্ষে বাহ্য বস্তু দেখিয়া ব্রহ্মদর্শনে নিরাশ হইও না। কেবল বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষীর জীবন মৃত্যু দেখিয়া আপনার আশা ভরসা এই পৃথিবীতে আবদ্ধ করিও না। আত্মার প্রকৃতি, উন্নতিশীল অমর আত্মার আশা অধিকার, বলবীর্য্য সন্দর্শন করিয়া আত্মার স্রষ্টা পাতা ও আশ্রয়দাতা সেই পরমাত্মাকে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া সকলে কৃতপুণ্য হও। সেই নেতা নিয়ন্তার অতুলন স্নেহ-প্রেম প্রতি নিমেষে, প্রতি নিঃশ্বাসে প্রত্যক্ষ অনুভব করত তাঁহার প্রীতি সাধনে এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত থাক। তিনিই আমারদের সর্ব্বস্ব। তাঁহারই উপাসনা এই শোক-তাপ-জরা-মৃত্যু-পূর্ণ সংসারে শান্তি মঙ্গল লাভের সোপান। তাঁহারই উপাসনা শোকার্ত্ত তাপার্ত্তের সান্ত্বনা, তাঁহারই উপাসনা পাপার্ত্ত ব্যক্তির দুর্ব্বিসহ অন্তর-জ্বালার একমাত্র মহৌষধ। তাঁহারই উপাসনা সাধকের ইহলোকের বল, পরলোকের সম্বল। হে জ্যোতির জ্যোতি! এখন যেমন তুমি আমারদের অন্তরাকাশ আলো করিয়া প্রকাশ পাইতেছ, তেমনি আমাদের আত্মাতে তুমি চির-প্রকাশিত থাক, তোমার সন্নিধানে এই আমারদের আন্তরিক প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নূতন ধর্ম্মমত।

কোন মহাকবি বলিয়াছেন যে ঈশ্বরকে জানা বিদ্যার উদ্দেশ্য। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় যে আমাদিগের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা কোথায় ঈশ্বরনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবেন তাহা না হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নাস্তিকতা, সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, জড়বাদ, অথবা কোমত্‌বাদ অবলম্বন করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি একটি নূতন ধর্ম্মমত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। সে মত এই যে কোমতের মতই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। "নবজীবন" নামক অভিনব সাময়িক পত্রিকায় এই মত সমর্থিত হইতে দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। নবজীবনের "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" শিরস্ক প্রস্তাবের লেখক এই মত সমর্থন করিয়াছেন যে চির চমৎকৃতি এবং সুখই ধর্ম্ম এবং হিন্দু শাস্ত্র সকল এই মত প্রতিপাদন করিতেছে। এই মত একটি অদ্ভুত মত বলিতে হইবে। আমরা যদি উক্ত প্রস্তাবের লেখক বঙ্কিম বাবুকে দিনরাত্রি চমৎকার ভাবে দেখি তাহাকে কি ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে? কোন প্রকার সুখ ইচ্ছা করিয়া ধর্ম্মসাধনই কি ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে? বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতাতে নামিয়া এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় নাই যেমন এই মত প্রচলিত হইলে তাহা হইবে। ইহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক করে না যে ব্রহ্মের উপাসনাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। ব্রহ্মই হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্র সকলই ইঁহারই কীর্ত্তন করিতেছে। যোগীরা ব্রহ্মকেই ধ্যান করেন, কর্ম্মীরা কর্ম্মের ফলাফল সকল ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া সেই কর্ম্মের সার্থকতা সম্পাদন করেন। চির-চমৎকৃতিও ধর্ম্ম নহে; সুখও ধর্ম্ম নহে; একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্ম্ম। তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে। "নবজীবন" সম্পাদক বলিয়াছেন "নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে বাঙ্গালী একটু একটু বুঝিতেছেন যে ধর্ম্মে উপেক্ষা করিলে আমরা কোন তত্ত্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতি হইবে না"। ঘৃণিত কোমত্‌বাদের * প্রবর্ত্তন যদি নবজীবন সঞ্চারের

* Permanent admiration এবং Culture সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু যাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে Comte এইরূপ বলেন "This crowning step of sound training in positive thought awakens perpetual feelings of veneration and gratitude, which rise often into enthusiastic admiration of the Great Being (*Humanity*) who is the author of all these conquests, be they in thought or be they in action"। যাঁহারা মনে করেন যে কোমতের এই মত ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত তাঁহারা একবার দেখুন যে প্রসিদ্ধ দার্শনিক Spencer কি অকাট্য যুক্তি দ্বারা কোমতের উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন।

"What may have been the conceptions of veneration and gratitude entertained by M Comte, we cannot of course say; but if any one not a disciple will examine his consciousness, he will I think, quickly perceive that veneration or gratitude felt towards any being, implies belief in the conscious action of that being, implies ascription of a prompting motive of a high kind, and deeds resulting from it gratitude cannot be entertained towards something which is unconscious. So that the 'Great Being Humanity" must be conceived as having in it incorporated form ideas, feelings and volitions. Naturally there follows the inquiry. 'Where is its seat of consciousness?' Is it diffused throughout mankind at large? that cannot be, for consciousness is an organized combination of mental states, implying instantaneous communications such as certainly do not exist throughout Humanity. Where then, must be its centre of consciousness? In France of course, which, in the Comtean system, is to be the the leading state, and naturally in Paris to which all the major axes of the temples of Humanity are to point. Any one with adequate humour might raise amusing questions respecting the constitution of that

কারণ হয় তাহা হইলে স্বদেশীয় লোকদিগকে এরূপ নবজীবন প্রাপ্ত হইতে আমরা পরামর্শ দিই না। যথার্থ বলিতে গেলে, ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদিগের মৃতবৎ হিন্দু সমাজে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মই বঙ্গদেশের লোকদিগকে সেই মৃতসঞ্জীবন, জীবনের জীবন, সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের দিকে ক্রমে ক্রমে আকর্ষণ করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদিগের দেশের লোকদিগকে পান-দোষ প্রভৃতি দোষ হইতে ক্রমে ক্রমে বিরত করিতেছে এবং তাহাদিগের নৈতিক উন্নতি সাধন করিতেছে। আমরা অধিক বলিব কি, দেশের অনেক স্থানে যে সকল হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদিগের কার্য্য-প্রণালী ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণেই গঠিত হইয়াছে। এই সকল সভা বিশেষ কোন পৌত্তলিক মত সমর্থন না করিয়া এক্ষণে সাধারণ ধর্ম্মের যে অধিক আলোচনা করেন তাহা কেবল ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবেই। ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টান্তেই উত্তেজিত হইয়া দয়ানন্দ সরস্বতী বেদ অবলম্বন করিয়া অপৌত্তলিক ধর্ম্মের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দু সমাজে তুমুল আন্দোলন উৎপাদন পূর্ব্বক আর্য্য সমাজ সকল প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতএব মৃতবৎ হিন্দু সমাজকে নবজীবনের সঞ্চার করিল? ব্রাহ্মধর্ম্মই করিল। "নবজীবনের" সহযোগী "প্রচার" পত্রিকার কোন লেখক বলেন "হিন্দু ধর্ম্মের কি স্বপক্ষ কি বিপক্ষ সকলই স্বীকার করেন যে এই বিমিশ্র ও কলুষিত হিন্দু ধর্ম্মের দ্বারা হিন্দু সমাজের উন্নতি হইতেছে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে টুকু হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম সেই টুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগের স্থির করা উচিত। * * * *। যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয় তাহাই ধর্ম্ম। এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্ম্মেরই সার ভাগ গঠিত; এরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব, সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্মেই প্রবল। হিন্দুধর্ম্মে তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দু ধর্ম্মে যেরূপ আছে এরূপ আর কোন ধর্ম্মেই নাই। সেই টুকু সার ভাগ। সেই টুকু হিন্দু ধর্ম্ম। সে টুকু ছাড়া যাহা থাকে—শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক, বা লোকালয়ে থাকুক—তাহা অধর্ম্ম। যাহা ধর্ম্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য তাহা অধর্ম্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে অথবা বেদে থাকে তবু অসত্য অধর্ম্ম বলিয়া পরিহার্য্য।" এই কথাতে আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত সায় দিই, কিন্তু "প্রচারের" উক্ত প্রস্তাবের লেখক আবার নবজীবনের "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" শিরস্ক প্রস্তাবের লেখক। "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" শিরস্ক প্রস্তাবে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বোধ হইতেছে যে তিনি কোম্‌তের মত হিন্দু ধর্ম্মের সার ভাগ মনে করেন। যদি কোম্‌তের মত হিন্দুধর্ম্মের সার ভাগ হয় তাহা হইলে এমন হিন্দুধর্ম্ম আমরা চাহি না কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কোম্‌তের মত হিন্দু ধর্ম্মের

---

consciousness of the Great Being supposed to be thus localized. But, preserving our gravity, we have simply to recognize the obvious truth that Humanity has no corporate consciousness whatever. Consciousness, known to each as existing in himself, is ascribed by him to other beings like himself, and in a measure to inferior beings; and there is not the slightest reason for supposing that there ever was, is now or ever will be, any consciousness among men save that which exists in them individually. If then, the Great Being who is the author of all these conquests is unconscious, the emotions of veneration and gratitude are absolutely irrelevant. See *Nineteenth Century* July, 1884.

সার ভাগ নহে ইহা প্রমাণ করিবার অধিকার রাখে না।

"প্রচার পত্রিকার" "হিন্দু ধর্ম্ম" শিরস্ক প্রস্তাবের লেখকের যে কথা উপরে উদ্ধৃত হইল তাহাতে লিখিত আছে যে হিন্দু ধর্ম্মের সার কি তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য এবং ঐ ধর্ম্মে যাহা সত্য আছে তাহাই হিন্দু ধর্ম্ম। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইল আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু ধর্ম্মের সার কি তাহা স্থির করিয়া তাহা সঙ্কলন পূর্ব্বক "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থ" নামক গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়া প্রচার করেন। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম ভাগে উপনিষদ হইতে ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ক এবং দ্বিতীয় ভাগে স্মৃতি ও মহাভারতাদি গ্রন্থ হইতে নীতিবিষয়ক শ্লোক সকল সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই এক্ষণে যাঁহারা উপনিষদ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করেন তাঁহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থে উক্ত গ্রন্থের যে সকল শ্লোক আছে প্রায় তাহাই উদ্ধৃত করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রণালী অনুসারে যদি উক্ত লেখক বেদ, উপনিষদ মহাভারতাদি গ্রন্থ সকল হইতে আরো অধিক শ্লোক সংগ্রহ করিয়া প্রচার করেন তাহা হইলে একটী কাজ হয়। "নবজীবন" পত্রিকার "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" প্রবন্ধের লেখক আচার্য্য গোল্ডষ্টুকরের নিম্নে লিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "If the creed of an individual is founded on texts held sacred, it is a national creed; no nation can surrender it without laying the axe to its own root. For a religion based on Texts believed sacred embodies the whole history of the Nation which professes it; it is the shortest abbreviation of all that ennobles the nation's mind, is most dear to its memory and most essential to its life." "যদি কোন বিশেষ ব্যক্তির ধর্ম্ম, জাতীয় পবিত্র গণ্য ধর্ম্মগ্রন্থের শ্লোকমূলক হয় তাহা হইলে তাহা জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; কোন জাতি আপনার পায়ে কুড়াল না মারিয়া সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। যে ধর্ম্ম জাতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থের শ্লোকমূলক তাহাতে সেই জাতির পূর্ব্বপুরাবৃত্ত সংক্ষেপে পাওয়া যায়। উক্ত শ্লোক-সকল জাতীয় মনের মহত্ত্ব-সম্পাদক সমস্ত পদার্থের সংক্ষিপ্ত সার। উহা ঐ জাতির স্মৃতির অত্যন্ত প্রিয় বিষয় এবং উহা তাহার জীবনের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক।" আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর যে সকল শ্লোকের কথা বলিয়াছেন তাহা আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। উক্ত গ্রন্থ অসাধারণ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত সঙ্কলিত হইয়াছে এবং প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল প্রচারিত আছে। যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রচারিত হয় তখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতের কোন চর্চ্চাই ছিল না এবং ভট্ট মোক্ষমুলর এবং গোল্ডষ্টুকরের এত প্রাদুর্ভাবই ছিল না। উহা একেবারে ছাটিয়া ফেলিয়া সকলই নূতন করিতে চেষ্টা করা "নবজীবন" সম্পাদকের পক্ষে উচিত হয় নাই। এইরূপ করিয়া যদি পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে তাহা ছাটিয়া ফেলা হয় তাহা হইলে পৃথিবীতে কোন কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। "নবজীবন" সম্পাদক যদি এইরূপে পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে তাহা ছাটিয়া ফেলেন তাহা হইলে তিনি যে সত্য উদ্ভাবন করিবেন পরবংশের লোকেরা তাহা ছাটিয়া ফেলিতে পারে। ধর্ম্মসংস্কার কার্য্য ভূতকালের সঙ্গে যোগ রাখিয়া সম্পাদন না করিলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

"নবজীবন" সম্পাদক একস্থানে আমাদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে এক্ষণে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার কার্য্য ফুরাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন "তত্ত্ববোধিনীতে যে সকল প্রাণী-তত্ত্ব জড়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাই সাধারণে পাঠ করেন।" তত্ত্ববোধিনীতে জড়তত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ে যে সকল প্রস্তাব কুচিৎ

কখন প্রকাশিত হয় কেবল তাহাই কি সাধারণে পাঠ করেন? আর আচার্য্যের উপদেশ প্রভৃতি ধর্ম্মবিষয়ক যে সকল উৎকৃষ্ট প্রস্তাব প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে তাহা কি কেহ পাঠ করেন না? ইহা অতি অযথার্থ কথা।

"ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" প্রবন্ধলেখক তাঁহার প্রস্তাবের শেষে বলিয়াছেন "যে ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসনা যে ধর্ম্মে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, যে ধর্ম্মের নীতি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী সেই ধর্ম্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" হিন্দুধর্ম্মের সার ব্রাহ্মধর্ম্মই এই সকল লক্ষণাক্রান্ত। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক যে সকল শ্লোক আছে তাহা সকলই সত্য। ব্রহ্মোপাসনা যেমন চিত্ত-শুদ্ধিকর ও মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক এমন অন্য কোন ধর্ম্মের উপাসনা নহে। ঐ ধর্ম্মের নীতি যেমন ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির উপযোগী এমন অন্য কোন ধর্ম্মের নীতি নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোক মাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। তাহাতে জাতীয় ভাব ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। উহা দেশের উন্নতির সঙ্গে সুসঙ্গত। উহা সমস্ত বঙ্গদেশের লোক গ্রহণ করিলে বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

নব্য হিন্দু-সম্প্রদায়।

নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় এক প্রকার নূতন হিন্দুধর্ম্মের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে—এবং তাহা প্রশ্নোত্তর আকারে ব্যাখ্যাত হইতেছে। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার লেখক—সুতরাং তাহা উপেক্ষণীয় ।—আবার তাহা ধর্ম্মের মর্ম্মে আঘাত করিতে উদ্যত—সুতরাং আমাদের নীরব থাকা অকর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক এবং তিনি স্বয়ং আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র; তবে যে, আমরা তাঁহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি—সে কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে।

গ্রীক দেশীয় একটি পুরাতন প্রবাদ আছে যে, এক ব্যক্তি মদ্দা ছাগল দুহিতেছে এবং আর-এক ব্যক্তি দুগ্ধ লইবার জন্য চালনী ধরিয়া আছে; সুবিখ্যাত দর্শনকার কাণ্ট এই প্রবাদটির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এস্থলে যেমন দোগ্ধা এবং দুগ্ধগৃহীতা উভয়েরই সমান অনবধানতা প্রকাশ পাইতেছে, সেইরূপ প্রশ্নের গোড়াতেই যদি দোষ থাকে তবে, যেমন সে প্রশ্নের জিজ্ঞাসু তেমনি সে প্রশ্নের উত্তরদাতা উভয়েই সে দোষে কলঙ্কিত হ'ন। নিতান্ত পল্লীগ্রামস্থিত এক জন চাসা বড়মানুষ যদি একজন নব্য কলিকাতা-বাসীকে জিজ্ঞাসা করেন যে "সোণার পাথরবাটী কোন্ দোকানে পাওয়া যায়?" আর উত্তর-দায়ক যদি বলেন যে "অসলরের দোকানে নানাবিধ স্বর্ণপাত্র বিক্রীত হয়-সেইখানে একবার তত্ত্ব করিয়া দেখুন" তাহা হইলে ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে কাহার অনভিজ্ঞতা অধিক ইহা বলা দুষ্কর। সেইরূপ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করিতে গিয়া কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, "ঈশ্বর-বর্জ্জিত পরকাল বর্জ্জিত ধর্ম্ম কি এবং উত্তর-প্রদাতা যদি বলেন যে "সুখই ধর্ম্ম" তাহা হইলে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসুও যেমন—উত্তরপ্রদাতাও তেমনি—উভয়েই আপনার অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন;—কেননা ঈশ্বর-বর্জ্জিত পরকাল-বর্জ্জিত ধর্ম্ম আর সোণার পাথরবাটী দুয়ের একই তাৎপর্য্য। সুখের অর্থ যদি কেবল-মাত্র বিষয়-সুখ হয়, তবে ঈশ্বরকে

এবং পরকালকে ছাড়িয়া দিলেও সে সুখের সাধন-কার্য্য শুদ্ধ কেবল বিষয়ের যোগাযোগ-দ্বারা অবাধে চলিতে পারে, ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। কিন্তু বিষয়-সুখ প্রকৃত সুখ কি না সে-বিষয়ে বঙ্কিম বাবু সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন; যদিচ সুখের তত্ত্ব মীমাংসা করিতে গিয়া প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন "পিপাসা পাইলে জল খাইলেই সুখ" কিন্তু এরূপ সুখ তাঁহার মতে নিকৃষ্ট সুখ; তিনি বলেন "ইন্দ্রিয়ের পরিমিত এবং যথা-কর্ত্তব্য পরিতৃপ্তি সুখ হইলে হইতে পারে—কিন্তু ইহা সুখের অল্পাংশ; একটা নিকৃষ্ট প্রকারের সুখ মাত্র"। "সুখ"এ শব্দটির দোষ কাটাইবার জন্য বঙ্কিম বাবু "প্রকৃত" এই শব্দ-টিকে পারত-পক্ষে তাহার কাছ-ছাড়া করেন না; তিনি কখনও বলেন না যে, সামান্য সুখের উপায় ধর্ম্ম, তিনি কেবল বলেন "প্রকৃত সুখের উপায় ধর্ম্ম"; প্রকৃত সুখ যে, কাহাকে বলে তাহাও তিনি খুলিয়া বলিয়াছেন, যথা, "মনুষ্য-প্রকৃতিকে কতকগুলি শারীরিক মানসিক ও আন্তরিক (?) বৃত্তির সমষ্টি মনে করা যাইতে পারে; সেই গুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য, এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ" তবে কি—ঐ বৃত্তি-গুলির আংশিক স্ফূর্ত্তি বা বিশৃঙ্খল স্ফূর্ত্তি বা অনুপযুক্ত পরিতৃপ্তি সুখ নহে? পারিজাতের সুগন্ধ সকল-সুগন্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তাহা বলিয়া জুঁই ফুলের সুগন্ধ কি সুগন্ধই নহে? আমরা বলি আংশিক সুখ অবশ্য পূর্ণ সুখের মত মাত্রার বেশী নহে, কিন্তু উভয়েই জাতিতে এক,—বঙ্কিম বাবু মুখে বলেন "সুখই ধর্ম্ম" ভাবে বলেন আংশিক সুখ বা নিকৃষ্ট সুখ ধর্ম্ম নহে" তাহা হইলেই হইল যে, তাঁহার মতে আংশিক সুখ সুখই নহে। বঙ্কিম বাবুর মতে দুই রূপ সুখ দাঁড়াইতেছে—(১) সামান্য সুখ—অর্থাৎ যে সুখ বৃত্তি-সকলের আংশিক অথবা অনিয়মিত স্ফূর্ত্তি মাত্র, ও যে সুখ অনুপযুক্ত তৃপ্তির সহবর্ত্তী, আর (২) প্রকৃত সুখ—অর্থাৎ বৃত্তি-সকলের সম্পূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল স্ফূর্ত্তি ও সমুচিত তৃপ্তি; এই দুই প্রকার সুখের মধ্যে সামান্য সুখকে বঙ্কিম-বাবু সুখ বলিতে নারাজ—তাঁহার মতে প্রকৃত সুখই সুখ। কাব্যের অলঙ্কার-চ্ছলে যদি বলা যায় যে, আরব অশ্বই অশ্ব তবে তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকে না, কিন্তু অশ্ব কাহাকে বলে এই তত্ত্বটির মীমাংসা স্থলে যদি বলা যায় যে, আরব অশ্বই অশ্ব—অথবা যে চতুষ্পদ জন্তু দানা খায় এবং গাড়ি টানে ও যাহার আদিম নিবাস আরব দেশ সেই জন্তুই অশ্ব, তবে অশ্বের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করিতে গিয়া এক-দেশীয় অশ্বেরই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হয়, সুতরাং সে সংজ্ঞা অব্যাপ্তি-দোষে দূষিত। তত্ত্ব-মীমাংসা স্থলে সুখের এরূপ একটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক যাহা সামান্য সুখ এবং প্রকৃত সুখ উভয়েরই পক্ষে খাটে; অথবা যদি এরূপ বোঝো যে, তুমি যাহাকে প্রকৃত সুখ বল, তাহা সামান্য সুখের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য নহে, তবে তাহাকে সুখ না বলিয়া আর কিছু বল—আত্মপ্রসাদ বল—আধ্যাত্মিক আনন্দ বল—তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিবে না। বিড়াল যদি ব্যাঘ্রের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য হইত, তবে আমরা ব্যাঘ্রকে উৎকৃষ্ট বিড়াল এবং বিড়ালকে নিকৃষ্ট ব্যাঘ্র বলিলে তাহা দোষের হইত না; কিন্তু বিড়াল যেহেতু মানুষ খায় না ও ব্যাঘ্র যেহেতু মৎস্যে সন্তুষ্ট হয় না—এজন্য দুয়ের দুইটি পৃথক্ নাম রাখা হইয়াছে ভালই হইয়াছে; বিদেশী নাবিক-লোক—যাহারা ব্যাঘ্র কি তাহা জানে না—তাহারা যদি শুনে

"উৎকৃষ্ট বিড়াল" তাহা হইলে তাহারা তাহার পায়ে হাত বুলাইতে ধাবিত হইতে পারে—কিন্তু "ব্যাঘ্র" শুনিলে তাহাদের কৌতুহলের বেগ তৎক্ষণাৎ শমতা প্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। তাহা বলিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা স্বকার্য্যে ক্ষান্ত হইতে পারেন না; তাঁহারা ব্যাঘ্র এবং বিড়ালকে এক শ্রেণীতে নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন,—কিন্তু সে শ্রেণীকে তাঁহারা ব্যাঘ্রও বলেন না বিড়ালও বলেন না,—বলেন "মার্জ্জারিক শ্রেণী" (Feline species); এইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুবর্ত্তী হইয়া বিষয়-সুখ এবং আত্মপ্রসাদ এ দুয়ের পৃথক্ পৃথক্ ভাব সত্ত্বেও উভয়কে যদি এক শ্রেণীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা যায় এবং সে শ্রেণীর যদি নাম দেওয়া যায়—সুখ, তবে আমরা এই বলি যে, আত্ম-প্রসাদরূপী যে আধ্যাত্মিক সুখ তাহাই ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য, বিষয়-সুখ ধর্ম্ম-সাধনের উদ্দেশ্য নহে। বঙ্কিম বাবু প্রকৃত-সুখ বলিতে কি আত্ম-প্রসাদ বোঝেন? তাহা যদি হয় তবে তাঁহার সহিত আমাদের আর-কোন বিবাদ নাই; কিন্তু আত্ম-প্রসাদের মূল হ'চ্চে আত্মার ধ্রুব অস্তিত্ব—আত্ম-প্রসাদের সঙ্গে ইহকাল এবং পরকাল দুইই অনুসৃত রহিয়াছে—বঙ্কিম বাবু বলেন যে ঈশ্বর এবং পরকালের সহিত ধর্ম্মের কোন অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ নাই, সুতরাং আত্মপ্রসাদ—যাহা আত্মা এবং পরমাত্মার পরস্পর-সম্বন্ধ-সাপেক্ষ—তাহা বঙ্কিম বাবুর সুখ-রাজ্যের সীমাভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না। বঙ্কিম বাবুর প্রকৃত-সুখ এবং আমাদের আত্মপ্রসাদ—এ দুয়ের মধ্যে কিরূপ ইতর-বিশেষ তাহা একবার ভাল করিয়া প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক;—

বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "শারীরিক মানসিক ও আত্মিক (?) বৃত্তি-সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ"—এবং সেই "সুখের যে উপায় তাহারই নাম ধর্ম্ম,"—এবং তিনি ইহাও বলিতে ছাড়েন নাই যে, সেই "সুখই ধর্ম্ম।" ওরূপ সুখ প্রথমতঃ পূর্ণ যৌবন-কালের ধর্ম্ম—কেননা প্রাচীন বয়সে বৃত্তি-সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি একেবারেই অসম্ভব; দ্বিতীয়তঃ উহা খুব এক জন সাবধানী প্রবীণ লোকের ধর্ম্ম; কেননা, কতটুকু জ্ঞান-প্রসঙ্গের সঙ্গে কতটুকু প্রেম-প্রসঙ্গ চাই—কতটুকু ইহার সঙ্গে কতটুকু উহা চাই,—শাস্ত্রালাপ, সখ্যালাপ, এবং রাগ-রাগিণীর আলাপ, এ তিনের মধ্যে কোন আলাপ কি মাত্রায় চাই—এ সকল স্থির করিয়া-ওঠা একজন সুখ-পরায়ণ যুবা ব্যক্তির কর্ম্ম নহে। সুখানুরাগী যুবা ব্যক্তি তোল-দাঁড়ি হস্তে করিয়া স্ফূর্ত্তি এবং সামঞ্জস্য দুইকে এই রূপে ওজন করিতে পারেন যথা,—

(১) চরিতার্থতা-সাধন।

বৃত্তি-সকলের স্ফূর্ত্তিতে এবং আশু চরিতার্থতাতে আপাতত নিষ্কণ্টকে সুখভোগ চলিতে পারে; পরে—ভবিষ্যৎ কালে—সকলেরই বৃত্তি নিস্তেজ হয়—আমার নয় একটু পূর্ব্বাহ্নে তাহা হইবে। অতএব উপস্থিত বৃত্তি-সকলের আশু চরিতার্থতা সাধন কর্ত্তব্য; যে বৃত্তি যখন উত্তেজিত হইবে সেই বৃত্তির তখনই চরিতার্থতা সাধন করা কর্ত্তব্য

(২) সামঞ্জস্য-সাধন।

বৃত্তি-সকলের সামঞ্জস্য-সাধন বড়ই কর্ম্মভোগ—তাহাতে সুখের অনেক ব্যাঘাত হয়; অনেক কাল কষ্টে যাপন করিতে হয়; অগত্যা এক-সময়ে আমাকে সমস্ত ইন্দ্রিয়-সুখে বঞ্চিত হইতে হইবে—যখন হইবে তখন হইবে,—এখন কেন সাধ করিয়া সুখের মাত্রা কমাই—সামঞ্জস্য-সাধনের কষ্ট-দ্বারা চরিতার্থতা সাধনের সুখকে কেন কল-

ক্ষিত করি ;—যদি বুঝিতাম যে, তাহাতে কোন স্থায়ী ফল আমার হস্তগত হইবে, তবে না-এখন একটু কষ্ট স্বীকার করিলাম—তাহা ত নয়, খুব সাবধানী প্রবীণ যুবারও বৃত্তি সকল ভবিষ্যতে নিস্তেজ হইবে—তবে আর তাঁহার সাবধানতার ফল কি হইল ?—তাহা অপেক্ষা বৃত্তি-সকলের যে-মাত্র উত্তেজনা তৎক্ষণাৎ তাহাদের চরিতার্থতা-সাধন—এই তো ভাল ছিল ;—লোকে বলে "শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণং" আমি বলি "সুখস্য শীঘ্রং অসুখস্য কালহরণং"। যে ব্যক্তি দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানিল না—সে ব্যক্তি কি আর পরে তাহা জানিবে ? চরিতার্থতা সাধনে এখন সুখ ভবিষ্যতে দুঃখ, সামঞ্জস্য-সাধনে এখনো দুঃখ ভবিষ্যতেও দুঃখ। সুখই যদি ধর্ম্ম হয় তবে দুঃখই পাপ,—এ পাপকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া ক্ষণকালের জন্যও কেন আমরা সুখের বিরহ-যন্ত্রণা—নরক-যন্ত্রণা—সহ্য করিব ? চির-যৌবন অপ্রাপ্য বলিয়া কে চির-প্রাচীনতাকে আলিঙ্গন করিবে ? আমরা যুবা,—যাহাতে প্রবৃত্তি সকলের আশু চরিতার্থতা হয়—তাহাই আমাদের শ্রেয়,—বৃদ্ধেরা সামঞ্জস্য করুক-গে-যা'ক্, তাহা ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর নাই।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সুখাসক্ত যুবকেরা স্ফূর্ত্তি এবং তৃপ্তিকে ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করে কিন্তু সামঞ্জস্যকে বড় ডরায়। বৃত্তি-সামঞ্জস্য যদি সুখের অঙ্গ হইত তবে সুখের চেলারা—সৌখীন ব্যক্তিরা—কখনই তাহাকে বিষ দৃষ্টিতে দেখিত না; বৃত্তি-স্ফূর্ত্তি এবং বৃত্তি-চরিতার্থতা এ দুইকে যেমন সুখের অঙ্গ বলিতে পারা যায়, বৃত্তি-সামঞ্জস্যকে কখনই সেরূপ বলিতে পারা যায় না; বৃত্তি-সামঞ্জস্য মনঃসংযমকে অপেক্ষা করে, মনঃসংযম তপস্যারই অঙ্গ,—তাহা দুঃখ-ময় ;—সুখই যদি ধর্ম্ম হয় আর দুঃখই যদি অধর্ম্ম হয়, তবে বৃত্তি-সামঞ্জস্য এক প্রকার অধর্ম্ম,—সম্পূর্ণ অধর্ম্ম না হউক্ কিয়ৎ পরিমাণে অধর্ম্ম ! ভাবী সুখের উদ্দেশে বর্ত্তমান দুঃখ আলিঙ্গন করা, এবং ভাবী দান-ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের উদ্দেশে বর্ত্তমান-কালে ডাকাতি করা,—এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ইহা আমরা স্বীকার করি ; কিন্তু সুখই যদি ধর্ম্ম হয়—দুঃখই যদি অধর্ম্ম হয়—তবে ও-দুই কার্য্য জাতিতে সমান হইয়া দাঁড়ায়।

প্রকৃত কথা এই যে, যৌবন-কালেই বৃত্তি-সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হয় ; সুখের অনুরোধে লোকে সেই স্ফূর্ত্তির আশু চরিতার্থতায় ধাবিত হয়, ও কেবল অর্থের এবং ধর্ম্মের অনুরোধে বৃত্তি-সকলের সামঞ্জস্য সাধনে তাহারা যত্ন নিয়োগ করে ; অর্থ এবং ধর্ম্মের সহিত সুখের স্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা সময়ে সময়ে জাগ্রত হইয়া উঠে। বঙ্কিম বাবু বলিবেন সন্দেহ নাই যে, সদ্য উত্তেজিত বৃত্তির সহিত এই যে, সংগ্রাম, তাহা ভাবী সুখের হেতু ; সৌখীন যুবা তাহার প্রত্যুত্তর এই দিবে যে, "তাহা বর্ত্তমান দুঃখের হেতু। বর্ত্তমান দুঃখ উপস্থিত দুঃখ—ভাবী সুখ অনুপস্থিত সুখ—বর্ত্তমান সুখ অপেক্ষা ভাবী সুখ বড় কিসে ? মৃত্যু (৩০ বৎসর বয়স্ক যুবার) বর্ত্তমান সুখ হইতে ৩০ বৎসরের পথ দূরে রহিয়াছে, (৫০ বর্ষ বয়সের) ভাবী সুখ হইতে দশ-বৎসরের পথ দূরে বই নয়, মৃত্যু যাহার দ্বারের কাছে—সুখে তাহার রুচি হইবে কেন ? ব্যাঘ্র যদি পিঞ্জরস্থও থাকে তথাপি নিকটস্থ গো-অশ্বেরা ঘাস খাওয়া পরিত্যাগ করে ! অতএব মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী নির্জীব নিস্তেজ মৃতবৎ ভাবী সুখের উদ্দেশে—মৃত্যু-হইতে দূরবর্ত্তী জাগ্রত জীবন্ত বর্ত্তমান সুখের কণামাত্রও পরিত্যাগ করা নির্ব্বোধের কার্য্য ; লোকে বৃদ্ধ-বয়সে যুবা ব্যক্তিদিগকে ওরূপ

বৃত্তি-সামঞ্জস্যের উপদেশ দিতে পারেন—তাহা তাঁহাদের কালোপযোগী—তাঁহারা আপনারা ভোগ-সুখে বঞ্চিত তাই তাঁহারা অন্যকেও ভোগ-সুখে বঞ্চিত করিতে চা'ন—কিন্তু যুবা ব্যক্তিরা তাঁহাদের কথা শুনিয়া উপস্থিত ছাড়িয়া অনুপস্থিতে আশা স্থাপন করিতে পারে না—বিশেষতঃ যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সে আশা মৃগতৃষ্ণিকা অপেক্ষাও অধম;—মৃত্যু সে আশার মস্তকে যমদণ্ড নিক্ষেপ করিবার জন্য পথ আগুলিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।" অতএব বঙ্কিম বাবু যে ধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করিতেছেন—যে ধর্ম্ম ঈশ্বর-বর্জ্জিত এবং পরকাল-বর্জ্জিত—সামঞ্জস্য সে ধর্ম্ম-পথের চক্ষের বিষ; তথাপি বঙ্কিম বাবুকে সেই বিষ-বৃক্ষ রোপণ করিতে হইয়াছে; বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার বিষ-ফলের বিষপানে বঙ্কিম বাবুর মতের আত্ম-হত্যা অনিবার্য্য।

হিন্দু-শাস্ত্রে চতুর্বর্গ বলিয়া একটা জীবন-যাত্রার পথ নির্দ্দিষ্ট আছে—সে পথের চারিটি স্থানে চারিটি আড্ডা—(১) ধর্ম্ম, (২) অর্থ, (৩) কাম, (৪) মোক্ষ। আমরা বলি যে, চারি আড্ডার সুখও চারি জাতীয়, (১) কাম-সুখ (২) অর্থ-সুখ (৩) ধর্ম্ম-সুখ (৪) মোক্ষ-সুখ। তাহার মধ্যে—অর্থ-সুখে উঠিতে হইলে কাম-সুখকে কিয়ৎ-পরিমাণে দমন করিতে হয়, ধর্ম্ম-সুখে উঠিতে হইলে কাম-সুখ এবং অর্থ-সুখ উভয়কে যথা-পরিমাণে দমন করিতে হয়,—মোক্ষ-সুখে উঠিলে মনুষ্যের সকল কামনার সম্যক্ চরিতার্থতা হয়। কাম-শব্দে ভোগ-লালসা; কাম-সুখ সচরাচর ইন্দ্রিয়-সুখ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অর্থ-সুখ সচরাচর বিষয়-সুখ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; ধর্ম্ম-সুখ আত্মপ্রসাদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; মোক্ষ-সুখ ব্রহ্মানন্দ বা ভূমানন্দ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বিষয় এবং বিষয়ী এতদুয়ের মধ্যে যে স্থানে সম্বন্ধ-সেতু, সেই স্থানে ইন্দ্রিয়-সুখ এবং বিষয়-সুখ এই দুই সুখের আধিপত্য; এই দুই প্রকার সুখ হইতে দুই প্রকার কার্য্য উদ্ভূত হয়—(১) ভোগ-সাধন; অর্থাৎ উত্তেজিত প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন; এবং (২) স্বার্থ সাধন; অর্থাৎ উত্তেজিত অনুত্তেজিত সকল প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য-বিধায়ক যে, বিষয়-বুদ্ধি—তাহার অনুগত হইয়া চলা;—এই গেল কাম এবং অর্থ এই দুয়ের রাজ্য। অতঃপর বক্তব্য এই যে, আত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ের মধ্যে যে স্থানে সম্বন্ধ-সেতু সেই স্থানে আত্মপ্রসাদ এবং ভূমানন্দ এই দুই প্রকার সুখের বাস-স্থান। এই দুই প্রকার সুখ হইতেও দুই প্রকার কার্য্য উদ্ভূত হয়, (৩) ধর্ম্ম-সাধন এবং (৪) যোগ-সাধন। উদ্দাম মনো-অশ্বকে আত্মা-রূপ সারথীর বশে আনয়ন করিয়া—নিষ্কাম-ভাবে—স্বাধীন এবং স্ববশ ভাবে—কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করাই ধর্ম্ম-সাধন; আর, পরমাত্মাতে আত্মাকে সংযুক্ত করাই যোগ-সাধন। এইরূপ, কাম অর্থ ধর্ম্ম এবং মোক্ষ এই চারিটি আড্ডায়—ইন্দ্রিয়-সুখ, বিষয়-সুখ, আত্ম প্রসাদ এবং ব্রহ্মানন্দ, এই চারি-জাতীয় সুখ, আর ভোগ-সাধন, স্বার্থ-সাধন, ধর্ম্ম-সাধন এবং যোগ সাধন, এই চারি জাতীয় সাধন, অধিষ্ঠান করে।

আত্মপ্রসাদ এবং ব্রহ্মানন্দ এই দুই আধ্যাত্মিক সুখও ধর্ম্ম-সাধন এবং যোগ-সাধন এই দুই আধ্যাত্মিক সাধন হিন্দু-শাস্ত্রে ভূয়োভূয় উপদিষ্ট হইয়াছে—বিশেষতঃ ভগবদ্গীতায়

বঙ্কিম বাবু বলেন "যদি কেহ মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্য-লোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন তবে সে গ্রীষ-

ভগবদ্গীতাকার।" এ কথা আমরা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু ভগবদ্গীতার আদিতে পরকালের অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে, ও আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আত্মার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে—পরকালকে আত্মাকে এবং পরমাত্মাকে ছাড়িয়া দিয়াও যে, ধর্ম্ম-সাধন হইতে পারে, এ কথা ভগবদ্গীতার কথা নহে। পাঠকদিগের ভ্রম নিবারণার্থ আমরা ভগবদ্গীতার গোটা কত শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী

যেমন দেহাভিমানী জীবের এই স্থূল দেহে কৌমার যৌবন ও জরা এই তিন অবস্থা সেইরূপ তাহার দেহান্তর প্রাপ্তি। ধীর ব্যক্তি দেহের এই বিনাশে মুগ্ধ হন না।

মনুষ্য যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে সেইরূপ জীব জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে।

(১) এই গেল পরকাল।

রাগ-দ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।

যে ব্যক্তির মন স্ববশ তিনি—রাগ-দ্বেষবিমুক্ত, বশীভূত, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-রাজ্যে বিচরণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

'আত্মপ্রসাদ হইলে ঐ ব্যক্তির সমস্ত দুঃখের বিনাশ হয়, যেহেতু প্রসন্নচেতার বুদ্ধি শীঘ্র সর্ব্বতোভাবে স্থির হইয়া থাকে।

(২) এই গেল আত্মপ্রসাদ।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ
প্রশান্ত-মনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষং॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।

চঞ্চল অস্থির মন যে যে বিষয়ে আসক্ত হয় তাহাকে তত্তৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাতেই স্থির রাখিবে। নিরতিশয় সুখ এই প্রশান্তমনা অপগত-মোহ জীবন্মুক্ত নিষ্পাপ যোগীকে প্রাপ্ত হয়।

নিষ্পাপ যোগী এইরূপে আত্মাকে সর্ব্বদা যোগযুক্ত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ উপভোগ করেন।

(৩) এই গেল ব্রহ্মানন্দ।

বঙ্কিম বাবুর ন্যায় শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির এই সব শ্লোকের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টিপাত করা এবং তাহার গম্ভীর মর্য্যাদা পাঠকবর্গকে অবগত করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

এখন-ধর্ম্ম কি? তাহা এক কথায় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। স্বার্থকে পরমার্থের বশে নিয়োগ করাই ধর্ম্ম।

স্বার্থ কাহাকে বলে? না এ-প্রবৃত্তির বা ও-প্রবৃত্তির নহে কিন্তু সকল প্রবৃত্তির যথোচিত চরিতার্থতা। পরমার্থ কাহাকে বলে? না একা-কেবল আমার স্বার্থ বা তোমার স্বার্থ নহে কিন্তু সকল জগতের স্বার্থ—এক কথায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। স্বার্থের কেন্দ্র কে—ভিত্তি-মূল কে? না আমি আপনি; আপনাকে স্মরণ করিয়া তদুপযুক্ত কার্য্য করিলেই সকল প্রবৃত্তির সমুচিত চরিতার্থতা সাধন করা হয়, স্বার্থ-সাধন করা হয়। পরমার্থের কেন্দ্র কে? না ঈশ্বর। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তদুপযুক্ত কার্য্য করিলেই, সাধ্যানুসারে সকল জগতের প্রকৃত স্বার্থ সাধন করা হয়—পরমার্থ সাধন করা হয়। পরমার্থ সাধন করিলে—সকল জগতের স্বার্থ সাধন

করিলে সেই সঙ্গে আপনারও যথাবিহিত স্বার্থ সাধন করা হয়, যেহেতু সকলের মধ্যে আমিও একজন আছি; এবং আপনার স্বার্থ সাধিত হইলে—উত্তেজিত অনুত্তেজিত সকল প্রবৃত্তিরই যথাবিহিত চরিতার্থতা সাধিত হয়।

স্বার্থকে পরমার্থের অধীনে নিয়োগ করিলে তাহার ফল কি হয়? না প্রবৃত্তি সকলও স্বার্থের অধীনে নিয়োজিত হয়। পরমার্থ-সাধনের সঙ্গে যথাবিহিত স্বার্থ-সাধন এবং প্রবৃত্তি সকলের যথাবিহিত চরিতার্থতা একই কার্য্য-কারণ-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। আমরা দেয়ালে আঘাত করিলে দেয়ালও আমাদিগকে আঘাত করে, আমরা অন্তঃকরণের সহিত জগতের মঙ্গল-চেষ্টা করিলে জগৎও অদৃশ্যরূপে আমাদের মঙ্গল-চেষ্টা করে, আমরা জগৎকে ঠকাইতে চেষ্টা করিলে জগৎও অদৃশ্যরূপে আমাদের ঠকাইতে চেষ্টা করে। আত্মা পরমাত্মার বশীভূত হইলে প্রবৃত্তি-সকলও আত্মার বশীভূত হয়। প্রবৃত্তি সকল বশীভূত হইলে আত্মাতে অটল আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হয়। আত্ম-প্রসাদের পরিপক্বতা হইলে, পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ সাধনের দিকে আমাদের লক্ষ্য যায়। তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে কামনার সমস্ত ফল আমাদের হস্তগত হয়। অতএব, ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার স্থূল মীমাংসা নিম্নের এই তিনটি কথাতেই পর্য্যবসিত,

ধর্ম্ম কি? না স্বার্থকে পরমার্থের অধীনে নিয়োগ করা। তাহার সাক্ষাৎ ফল কি? না অটল আত্মপ্রসাদ। তাহার চরম ফল কি না ব্রহ্মানন্দ উপভোগ; যথা,—

"যোগরতোবা ভোগরতোবা
সঙ্গ-রতোবা সঙ্গবিহীনঃ।
পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তো
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।"

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

ষোড়শ ব্যাখ্যান।

দয়া প্রেম যাঁর, বর্ষে শত ধার, অবিরত জগজ্জনে।
অন্তর-অন্তরে, প্রেম ভক্তি-ভরে, ভাব জীব! সেই জনে॥

যিনি করিলেন এই অখিল ভুবন।
অবিরত তিনি তাহা করেন পালন।
শুধু এ পৃথিবী নয়, ঊর্দ্ধে যত লোক চয়,
সবার উপর তাঁর প্রীতির নয়ন॥

তাঁহার ইচ্ছায় ধরা ধরিছে শোভন
পর্ব্বত কুসুম রাজি বন উপবন।
তাঁহার বিশ্বের শোভা, হয় কিবা মনোলোভা,
তাঁহার রচনা মন নয়ন রঞ্জন॥

অসংখ্য জীবেতে তাঁর করুণা প্রচার।
তিনি স্নেহময় পিতা পাতা সবাকার।
কি আকাশে জলে স্থলে, কত জীব দলে দলে!
সদাব্রত কিবা তাঁর ভুঞ্জিছে উদার॥

সর্ব্বজীবে করিছেন যিনি প্রেম দান।
তোমা কাছে তিনি নর! প্রেম-ভিক্ষা চান।
আছে যত অচেতন, কিম্বা পশু পাখীগণ,
তাঁরে প্রেম দানে কেহ নহে ক্ষমবান্॥

হে মানব! পাইবারে জ্ঞান তোমার,
যে জন তোমারে প্রেম করে অনিবার।
প্রীতিভক্তি উপহারে, পূজিবে না তুমি তাঁরে,
তাঁর কায করিবে না জীবনের সার?

কেন বিভু প্রীতি-প্রেম চাহেন তোমার?
ভাবিয়া দেখহ আছে নিদান তাহার।
ভাল বাসা আমাদের স্বেচ্ছাধীন হয়।
ভাল বাসা কারো কভু কাড়িবার নয়॥

দাসে ভাল বাসাইতে করিয়া মনন।
প্রভু যদি তারে করে নির্দয় পীড়ন॥
তবু তার ভাল বাসা প্রভু নাহি পায়।
ভাল বাসা নাহি মেলে মুদ্রার সংখ্যায়॥
স্বাধীন যেহেতু হয় মানব হৃদয়।
তাই তার ভাল বাসা অকৃত্রিম হয়॥
যবে আত্মা মলিনতা করি পরিত্যাগ।
পুণ্যের পথেতে চলে করি অনুরাগ॥
অনিত্য বিষয়ে প্রেম করিয়া বর্জ্জন।
ঈশ্বরেতে প্রীতি ভক্তি করয়ে স্থাপন॥
দেব ভাব কিবা তার প্রকাশে তখন।
মঙ্গল সোপানে সেই করে আরোহণ।
যদি বিভু করিতেন এরূপ আত্মায়।
গ্রহ যথা রবি-টানে নিজ পথে ধায়॥
সে রূপ তাঁহার দিকে করি আকর্ষণ।
ধর্ম্ম কার্য্যে করিতেন সবে নিয়োজন॥
তা হলে আত্মার কিসে হইত গৌরব?
না থাকিত প্রেম তার মুক্ত ভাব সব॥
এখন বিনাশি যথা শত প্রলোভন।
শ্রেয়ঃ পথ বেছে লয় করিয়া যতন॥
প্রেম ভরে চলে তাহে তাঁহার সহিত।
অন্তরে তাঁহারে পেয়ে সদা আনন্দিত॥
নিয়তির বদ্ধ ভাব—এ সব নাশিত।
আত্মার উৎসাহ প্রেম—সকলি হরিত॥
তাঁরে প্রেম দানে কার আছে অধিকার?
আপনার আত্মা যার আছে আপনার॥
পরাধীন যেবা হয় রিপুর অধীন।
বিষয় জালেতে বদ্ধ অতি দীন হীন॥
প্রবৃত্তির প্রতিকূলে না করে গমন।
ধর্ম্মের আদেশ নাহি করয়ে পালন॥
আপনার প্রীতি যেবা দিয়াছে সংসারে।
কোথা তার প্রীতি আর—দিবে তাহা তাঁরে?

কার কাছে বিভু প্রীতি করেন গ্রহণ?
যে তাঁরে জানয়ে হৃদি জীবন-জীবন,
অবিরত প্রেমদাতা মঙ্গল আকর।
তাঁর গুণে মুগ্ধ যার অন্তর অন্তর।
যে তাঁরে সঁপিয়ে দেয় জীবন আপন।
প্রেম-ভাবে সদা করে তাঁহারে মনন॥

তাঁর প্রেমে মজিয়াছে হৃদয় যাহার।
দেখিতে তাঁহারে সদা যতন তাহার॥
কি আনন্দ হয় তাঁরে হৃদয়ে রাখিতে।
তাঁহার মধুর বাণী হৃদয়ে শুনিতে॥
তাঁর কাযে প্রাণ মন সকলি সঁপিতে।
তাঁর তরে দুঃখ কষ্ট সহস্র সহিতে॥
জগৎ তাহার কাছে হয় সুধাময়।
তাঁহার সুবাস যথা চারিদিকে বয়॥
জগৎ মন্দিরে দেখে তাঁর অধিষ্ঠান।
তাঁহার মহিমা যথা তথা বিদ্যমান॥

সে প্রীতি যাহার মনে হয় বিকশিত।
অন্য প্রীতি সবে হয় তার নিয়মিত॥
তাঁর জন্য ভালবাসে তাঁহার সংসার।
তাঁর পানে চেয়ে করে পর উপকার॥
তাঁর প্রীতি যেবা করে জীবনের সার।
পৃথিবীর অন্য ভোগ তুচ্ছ হয় তার॥
তাঁহার প্রীতিতে সাধু করয়ে রমণ।
প্রেমদাতা হয় তার প্রিয়তম ধন॥
অন্তরে তাহার কিবা বিমল জ্যোৎস্নায়।
সুনির্ম্মলা শান্তি—তৃপ্তি—সুখ প্রতিভায়॥
সে আলোকে দেখে সাধু—উৎসাহ জনন
প্রেম-দয়া-স্নেহভরা বিভুর বদন॥
অমৃত বচন বিভু বলেন তাহারে।
"যে পথে চলেছ তাহে পাইবে আমারে"॥
আত্ম প্রসাদের জ্যোতি যতই বাড়িবে।
তাঁর প্রেম-মুখ-আলো ততই দেখিবে॥
এ দুই আলোকে যার আত্মা আলোকিত।
সে আত্মার শোভা দেখে জগৎ মোহিত॥
নির্ম্মল করহ তবে আত্মার দর্পণ।
দেখিবে তাহাতে যদি প্রেম প্রস্রবণ॥
ডাক তাঁরে তিনি দয়া করিয়া বর্ষণ।
তোমারে হৃদয়ে আসি দিবেন দর্শন॥

ক্রমশঃ।

স্বীকার।

নারীনীতি। শ্রীঈশানচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রণীত। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে আমাদের মনে হইল, ইহা সাধারণ স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের ন্যায় নহে। ইহাতে কিছু বিশেষত্ব আছে। অতএব আমরা অধিকতর মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করিয়া দেখিলাম, সম্প্রতি আমাদের সমাজের স্ত্রীদিগের মানসিক ও পারিবারিক যেরূপ অবস্থা, এ পুস্তকখানি প্রায় সকল বিষয়ে তাহার উপযোগী নীতিশিক্ষা দিতে সমর্থ। ইহাতে গ্রন্থকার যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। যেরূপ ভাব, ভক্তি, ক্রিয়া ও ধর্ম্ম স্ত্রীদিগের প্রকৃত সঙ্গত তাহা ইহাতে যুক্তি ও বিচার পূর্ব্বক অথচ পরিমিত কথায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অল্প অল্প কথায় পরিশুদ্ধ ভাষায় পরিব্যক্ত হওয়াতে নীতিগুলি পড়িতেও সুখবোধ হয়। ইহাতে স্ত্রীনীতিঘটিত যে সকল বিশেষ তত্ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক নূতন বিষয় দৃষ্ট হয়। পুস্তক প্রণেতা নিপুণতার সহিত দেখাইয়াছেন যে স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্ন-প্রকৃতি-সম্পন্ন; তাহাদের প্রকৃতির সেই ভিন্ন ভাবই তাহাদিগকে পরস্পরের নিকট মনোরম করিয়া রাখে। বালক ও পুরুষ, ইহাদের মধ্যবর্ত্তী স্ত্রীগণ। এই নিমিত্ত যেমন বালকেরা তেমনি পুরুষেরা স্ত্রীদিগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্ত্রী তাহার স্বামীর "সন্তানের জননী; গৃহের গৃহিণী; ক্ষুধা তৃষ্ণায় তৃপ্তিদায়িনী; সুখালাপে পরিতোষিণী; মর্য্যাদা পালনে কুটুম্বিনী; উপদেশে অন্তেবাসিনী; সেবায় আজ্ঞাকারিণী; বিষয় কর্ম্মে মন্ত্রিণী; সৎকর্ম্মে সহকারিণী; উৎপথ গমনে বন্ধনী; বিপদতরঙ্গে তরণী; শোক ব্যথায় সন্তাপহারিণী; রোগশয্যায় স্বাস্থ্যরক্ষিণী; ক্লেশ-পরম্পরায় শান্তিবিধায়িনী; দেবগৃহে শুভার্থিনী; এবং সমস্ত জীবন-পথে সহায়িনী"। আমাদের বিবেচনায় সহায়িনীর পরিবর্ত্তে সহগামিনী বলিলে ভাল হইত।

আপৎকালে কুলবতীদিগের আত্মরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষা করিয়া কিরূপে থাকা উচিত, তাহা এই গ্রন্থে উত্তমরূপে বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সন্তান পালন, কন্যা ও পুত্রবধূর পালন এবং সাধারণ গৃহিণী-ধর্ম্মের সম্বন্ধেও অনেক গুলি নীতি ইহাতে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ পাঠে একবার মনে হইল, এখন সন্তান বয়স্থ ও কর্ম্মক্ষম হইলেই স্ত্রী লইয়া তফাৎ হয় তবে আর শাশুড়ীর পুত্রবধূপালন শিক্ষা করিয়া কি হইবে? আবার বুঝা গেল যে বিধবা স্ত্রীগণের স্বকীয় গার্হস্থ্য ব্যাপার অধিক না থাকিলে, তাহাদের পুত্র যেখানে থাকে, সেই স্থানে তাহাদের থাকা সম্ভব তেমন অবস্থায়, তাহাদের পুত্রবধূ পালন বিষয়ক নীতির অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক হইবে। যিনি পরম সৌভাগ্যবতী, যাঁহার পরিবারের শাখা প্রশাখা অধিক, তাঁহার পক্ষে যে সকল নীতিপালন প্রয়োজনীয়, তাহা ও এই গ্রন্থে বাহুল্যরূপে বর্ণিত আছে। সুতরাং এই নারীনীতি পুস্তকখানি সর্ব্বাবস্থায় স্ত্রীদিগের সুগতির নিয়ামক হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

আদর্শনারী। শ্রী যুক্ত নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক বিরচিত। মূল্য ।০ আনা। ইহাতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ নারীর সংক্ষেপ জীবন রচিত আছে। রূপমঞ্জরীর জীবন চরিত একটী সম্পূর্ণ নূতন সংগ্রহ। আমরা এই গ্রন্থপাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। ইহার ভাষা সরল। ইহা বালিকাবিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ পাঠোপযোগী হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

অগ্রে আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে কেবল সমাজেরই পুস্তকাদি মুদ্রিত হইত। বাহিরের কোন লোকের কাজ প্রায়ই হইত না। কিন্তু আমরা দেখিলাম এখানে পুস্তকাদি মুদ্রিত করিতে অনেকেই সমুৎসুক। অনেকের এইরূপ মনের ভাব পাইয়া আমরা যন্ত্রালয়ের অক্ষরাদি বৃদ্ধি করিয়াছি। বর্ত্তমানে যত উৎকৃষ্ট অক্ষর পাওয়া যাইতে পারে সংগ্রহ করিয়াছি। ছাপা যতদূর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আছে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের এই যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের এই বাক্যের প্রমাণ পাইবেন। আমরা অল্প সময়ের মধ্যে অল্পলাভে গ্রন্থাদি মুদ্রিত করিয়া দিব সংস্কৃত বাঙ্গলা ও ইংরাজী এই তিন প্রকার গ্রন্থই এখানে মুদ্রিত হইতে পারিবে। যদি কোন গ্রন্থকার আমাদিগকে মুদ্রিত করিবার জন্য গ্রন্থাদি দিতে ইচ্ছা করেন তবে আবশ্যক হইলে তাঁহার গ্রন্থ-সংশোধনের ভার পর্য্যন্ত আমরা লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যে গ্রন্থে অশ্লীলতাদি বিশেষ দোষ আছে এবং যে গ্রন্থ কোন ধর্ম্মের অযথা নিন্দাবাদে পূর্ণ আমরা সে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার ভার লইব না। যদি এই সমস্ত বিষয়ে কিছু জানিবার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে আমার নিকট পত্র লিখিলে তিনি সমস্ত জানিতে পারিবেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা। } শ্রী হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন সংস্করণ। ইহাতে মূল টীকা অর্থ ও তাৎপর্য্য আছে। মূল্য অতি সুলভ ।৵ আট আনা মাত্র। মূল্য সুলভ অথচ পুস্তক খানির ভিতর সমস্তই আছে। ছাপা উৎকৃষ্ট ও পরিশুদ্ধ।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য কিম্বা পুস্তকাদি ক্রয় জন্য হুণ্ডি মণিঅর্ডর ইত্যাদি পাঠাইবেন তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

যাঁহাদিগের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য বাকি আছে তাঁহারা দেয় টাকা শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অনর্থক মাশুল ব্যয় করিয়া বারংবার পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতে না হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

"আদর্শ-নারী" এবং "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ, আদি ব্রাহ্ম-সমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রয় জন্য মজুৎ আছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে তিনি মূল্য এবং ডাক মাশুল পাঠাইলে প্রেরণ করা যাইবে

নূতন পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-গীতা।

প্রথম প্রকরণ।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যান পদ্যে রূপান্তরিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মপ্রেম ও ব্রহ্মযোগ বিষয়ক গ্রন্থ অতি বিরল, ইহা সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত সরল পদ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। অল্পজ্ঞ বালক ও অল্পজ্ঞ স্ত্রীলোকও ইহা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু এই গ্রন্থ পাঠ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। ইহা উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত এবং সুন্দর বস্ত্রে বাঁধান। ইহার মূল্য ১।০ টাকা ও সামান্য বাঁধান মূল্য ১ টাকা। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন।

একাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
আশ্বিন ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৫
[illegible] সংখ্যা — শকাব্দা ১৮০৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্ম-স্বয়ম্ভূ।

যেথা নাহি অন্ধকার, দিবালোক নাই,
ভূত ভবিষ্যৎ নাই, অধ ঊর্দ্ধ ঠাঁই;
মঙ্গল জ্যোৎস্না এক ফুটে অনিবার,
রয়েছে মহিমা ধ্রুব করিয়া বিস্তার,
বাজি' যেথা আনন্দের অনাহত নাদ
দিতেছে অনন্ত হ'তে অভয় সম্বাদ,—
অকাল সেখানে সব, সবি অনাকাশ,
কেবল অনাদি-জ্ঞান আছয়ে প্রকাশ।
সেই বিন্দু—সেই লক্ষ্য—সেই দিকে গতি,
আত্মবান্ ছুটে নিত্য সেই লক্ষ্য প্রতি।
তোমরাও হে মানব হও জাগরিত,
অন্তরে আত্মার জ্যোতি কর প্রজ্বলিত,
সংশয় তিমির সব যাইবে কাটিয়া,
ধ্রুব বিশ্বাসের অগ্নি উঠিবে জ্বলিয়া,
দেখিবে অতুল্য জ্যোতি অন্তর শোভন,
সকল কামনা তব হইবে পূরণ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

২. [illegible] ৫৫ ব্রাহ্ম সংবৎ।

[illegible]

[illegible] [illegible]-পরিবারের, এবং [illegible] করিয়া দেখা

উচিত—কি নিমিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছি—কি নিমিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি—কি নিমিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি? এই নিমিত্তে যে, জগতে ব্রহ্মের নাম ধ্বনিত হউক, পরিবারে ব্রহ্মের প্রসাদ-বারি অবতীর্ণ হউক, আত্মা ব্রহ্মের শান্তিতে অভিষিক্ত হউক; একথাটি যেমন সহজ ইহার সাধন-পদ্ধতি সেরূপ নহে;—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত সাধন-পদ্ধতি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে অতীব স্পষ্ট কথায় এবং অতীব অল্প-কথায় উপদিষ্ট হইয়াছে,—যেমন মহোচ্চ হিমালয়ের কক্ষ হইতে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সুবিমল সূক্ষ্ম ধারায় ত্রিধা বিনিঃসৃত হয় সেইরূপ আমাদের পুরাতন ঋষিদিগের পবিত্র হৃদয় হইতে এই তিনটি সার উপদেশ বিনিঃসৃত হইয়াছে—"সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং" সত্য হইতে বিচ্যুত হইবে না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না, মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হইবে না।

সত্য হইতে বিচ্যুত হইবে না—ইহা শুনিতে অতি সহজ কিন্তু ইহার সাধন অতীব সুকঠিন;—মুখে মিথ্যা বলিব না,

কার্য্যে মিথ্যা আচরণ করিব না, হৃদয়ে মিথ্যাকে স্থান দিব না, কায়-মনোবাক্যে সত্যের অনুষ্ঠান করিব ;—ইহা যে সত্য-সাধনের কার্য্য তাহা সাধকই জানেন। এইরূপ সত্য অনুষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, "অদ্ভির্গাত্রাণি শুদ্ধন্তি মনঃ সত্যেন শুদ্ধতি" জলের দ্বারা যেমন শরীর নির্ম্মল হয়, সত্যের দ্বারা সেইরূপ মন নির্ম্মল হয়। সত্য শুধু মুখে-মুখে কি[illegible] করিলে তাহাতে কিছু হয় না [illegible] যখন সত্য হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন তাহাতে মনের সমস্ত মালিন্য প্রক্ষালিত হইয়া যায়। (১) সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মিথ্যার প্রতি বিরাগ সত্য-সাধনের মূল—(২) তাহার পরে সত্য-জিজ্ঞাসা—(৩) তাহার পরে সত্য উপার্জ্জন এবং মিথ্যা-পরিবর্জ্জন—(৪) তাহার পরে সত্য-অনুশীলন—(৫) তাহার পরে সত্য প্রচার, সত্যের সাধন এইরূপ পাঁচটি অঙ্গে বিভক্ত। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ ;, শরীরের পুষ্টির জন্য অন্ন যেমন প্রয়োজনীয়, হৃদয়ের পুষ্টির জন্য প্রেম যেমন প্রয়োজনীয়, জ্ঞানের পুষ্টির জন্য সত্য সেইরূপ প্রয়োজনীয় ; সকলেই যেমন অন্ন-দ্বারা স্ব স্ব শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে অভিলাষী—সকলেই সেইরূপ সত্য দ্বারা স্ব স্ব জ্ঞানের পুষ্টি-সাধন করিতে অভিলাষী ; অন্ন যেমন সাধারণতঃ সকল মনুষ্যেরই সেবনীয়, সত্যও সেইরূপ সর্ব্বজনসেব্য। অন্নে অরুচি যেমন শারীরিক রোগের অবিচ্ছেদ্য সহচর, সেইরূপ সত্যে অশ্রদ্ধা আধ্যাত্মিক রোগের অবিচ্ছেদ্য সহচর ; সত্যে যাঁহার শ্রদ্ধা নাই—সত্যং জ্ঞানমনন্তং পরব্রহ্মকে তিনি প্রমাণ-দ্বারা আয়ত্ত করিতে গিয়া অকূল পাথারে নিপতিত হ'ন ; চক্ষুর দোষবশতঃ যিনি সূর্য্যকে দেখিতে পান না—তিনি প্রদীপ ধরিয়া সূর্য্যকে দেখিবার জন্য চেষ্টা করিলে তাঁহার সে চেষ্টা কেমন করিয়া সফল হইবে ? আত্মার অপবিত্রতা-দোষে যিনি পরমাত্মাকে সকল সত্যের মূল সত্যকে—জ্ঞানের জ্ঞানকে—প্রাণের প্রাণকে—অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি না করেন—তিনি যুক্তির প্রভাবে তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলে, তাঁহার সে চেষ্টা ত ব্যর্থ হইবারই কথা ;—মূল জ্ঞানকে প্রমাণ-দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করা যে, কি হাস্যজনক তাহা আমাদের দেশের দর্শনকারেরা সুন্দর রূপে অবগত ছিলেন,—যথা

"মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং যে মানেন বুভুৎসন্তে।
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহা সুধিয়ঃ॥"

প্রমাণকে প্রবোধিত করিতেছে যে, মূলবর্ত্তী জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে যাঁহারা প্রমাণ-দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন, সেই সকল মহা পণ্ডিতেরা কি করেন ?—না, ইন্ধন কাষ্ঠকে দগ্ধ করিবে যে অগ্নি সেই অগ্নিকে ইন্ধন-কাষ্ঠ দ্বারা দহন করিতে ইচ্ছা করেন। নির্ম্মল অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর অঞ্জন-স্বরূপ—তাহার অভাব হইলে আমাদের জ্ঞান কুতর্ক কুহেলিকা-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায়—ও পরমাত্মার জ্যোতি অন্তরিত হইয়া যায়। প্রথমে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা তাহার পর সত্য-জিজ্ঞাসা ; জলের সম্বন্ধে যেমন পিপাসা—সত্যের সম্বন্ধে সেইরূপ জিজ্ঞাসা ; "জিজ্ঞাসা"—অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা। জিজ্ঞাসা কিরূপে কর্ত্তব্য তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের গোড়াতেই উপদিষ্ট হইয়াছে ;—যথা,

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় সমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতোব্রহ্মবিদ্যাং।"

"পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান-লাভার্থে আচার্য্য-সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন ; সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য শিষ্যকে সম্যক্ শান্ত সমাহিত-চিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর সত্য

পুরুষকে জানা যায় তাহার উপদেশ করিবেন।"—"তদ্‌জ্ঞানার্থং" নহে কিন্তু "তদ্‌বিজ্ঞানার্থং" "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভার্থে নহে কিন্তু পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান-লাভার্থে আচার্য্যসন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন—এই কথাটির প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য; পূর্ব্ব হইতেই পরব্রহ্মের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা আছে—সকল সত্যের মূল সত্য একজন আছেন ইহা যাঁহার ধ্রুব জ্ঞান—তিনি তাঁহার সেই জ্ঞানকে দৃঢ় করিবার জন্য সেই জ্ঞানের গভীরতা এবং বিস্তৃতি সাধন করিবার জন্য—সেই জ্ঞানকে যথোচিত পরিপোষণ এবং পরিবর্দ্ধন করিবার জন্য গুরুর নিকট গমন করিবেন; সূর্য্যের ধ্রুব অস্তিত্বের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা নাই,—যাঁহার বিশ্বাস যে, সূর্য্য আমাদের মনের ভ্রান্তি—আজ আছে, কাল নাই—তাঁহাকে কেহ বলে না যে, তিনি জ্যোতিষ শিক্ষার্থে আচার্য্যের নিকট গমন করুন; সূর্য্যের আশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া সূর্য্যের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে,—জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপদেশ-গ্রহণ তাঁহাকেই শোভা পায়; সেইরূপ ব্রহ্মের প্রতি যাঁহাদের যথোচিত শ্রদ্ধা বর্ত্তমান আছে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা তাঁহাকেই শোভা পায়। শিষ্যের জ্ঞানকে সৃষ্টি করিয়া তোলা গুরুর কার্য্য নহে—শিষ্যের আত্মাতে যে জ্ঞান আছে তাহাকে উদ্বোধিত করিযা দেওয়াই গুরুর কার্য্য। আপনার জ্ঞানের মূল-জ্ঞানের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা নাই—সে ব্যক্তির ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা আন্তরিক ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা নহে,—যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত এবং যিনি শমান্বিত, এক কথায় যিনি শ্রদ্ধাবান—তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী;—তাঁহার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাই তাঁহার হৃদয়ের পিপাসা—মুখের কথা-মাত্র নহে; এই জন্য কথিত হইয়াছে,

"তস্মৈ স বিদ্বান্ সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়'

"সম্যক্‌রূপে যিনি প্রশান্তচিত্ত—সম্যক্‌রূপে যিনি শমান্বিত—গুরু তাঁহাকেই ব্রহ্ম জ্ঞান উপদেশ করিবেন।" অতএব প্রথম সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, তাহার পরে সত্য-জিজ্ঞাসা। শ্রদ্ধা আত্মার স্বাস্থ্য—জিজ্ঞাসা আত্মার পিপাসা—শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির জিজ্ঞাসা এবং জ্বর-রোগীর পিপাসা—উভয়ই বিকারের লক্ষণ। শারীরিক পুষ্টি উপার্জ্জন করিতে হইলে অগ্রে যেমন ক্ষুধা আবশ্যক হয় এবং পরে যেমন অন্ন ভোজন আবশ্যক হয়, সত্য উপার্জ্জন করিতে হইলে অগ্রে সেইরূপ জিজ্ঞাসা আবশ্যক হয়, পরে গুরূপদেশ আবশ্যক হয়। চিকিৎসক যেমন অগ্রে রোগীর ক্ষুধা জন্মাইয়া দিয়া পরে পথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দেন, গুরুর সেইরূপ কর্ত্তব্য যে অগ্রে শিষ্যের জিজ্ঞাসা উদ্বোধিত করিয়া পরে তদুপযোগী সত্যের উপদেশ করেন। অনেকে শিক্ষার দোষে নানা গ্রন্থের নানা সত্যে এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন যে, অজীর্ণ অন্নের ন্যায় ইষ্টসাধন করিতে গিয়া তাহা তাঁহাদের প্রভূত অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। শিষ্যের কর্ত্তব্য যে, তিনি যতটুকু সত্য উপার্জ্জন করেন—তাহা তিনি বুদ্ধিতে সুন্দর-রূপে আয়ত্ত করেন; গুরুর নিকট হইতে যে সত্য উপার্জ্জন করিয়াছেন—তাহা তিনি রীতিমত অনুশীলন করেন। অনেকে সত্য উপার্জ্জন করিবা-মাত্রেই তাহা অন্যের নিকট প্রচার করিতে উদ্যত হ'ন—তাঁহারা নিজে যাহা ভাল করিয়া বোঝেন না—তাহা অন্যকে বুঝাইতে যা'ন—তাঁহারা অন্যকে সত্য বুঝাইতে গিয়া আপনাদের বুদ্ধিমত্তা বুঝাইতেই ব্যস্ত হ'ন,—অন্যেরাও তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা স্বীকার করেন,—ক্রমে তাঁহাদের নিজেরও এইরূপ এক কুসংস্কার জন্মে যে, আমি যাহা বুঝি তাহাই সত্য—আমি যাহা না বুঝি তাহা কিছুই নহে;

ইহার ফল এই হয় যে, তাঁহাদের মনোমধ্যে সত্যের দ্বার একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যায় ও ঘোরতর মিথ্যা অভিমান আসিয়া সত্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়; এইরূপে অন্যের ইষ্ট-সাধন করিতে গিয়া আপনার এবং অন্যের উভয়েরই অনিষ্ট সাধন করা হয়। অতএব অন্যের নিকট সত্য প্রচার করিবার পূর্ব্বে অগ্রে আপনি ভাল করিয়া সত্যের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য;—সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য,—সৎসঙ্গ করা কর্ত্তব্য—পবিত্র ঋষি-দিগের সরলান্তঃকরণের বাক্য-সকল আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ মনন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রণালীতে চলিয়া সাধক যখন সত্যের পথে সমুচিত অগ্রসর হ'ন তখন সেই সত্য জন-সমাজে প্রচার করা তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া উঠে। যিনি গুরুর গুরুতর ভারবহন করিবার উপযুক্ত হইয়াছেন—সে কার্য্যে বিধিমতে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহারই কর্ত্তব্য। উপযুক্ত অধিকারীগণকে জ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া তাঁহারই কর্ত্তব্য। সত্য-সত্যই যাহাতে শ্রদ্ধাবান্ সত্য-জিজ্ঞাসুর সংশয়ান্ধকার দূরীভূত হয় জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়, মনের মালিন্য প্রক্ষালিত হইয়া যায়—তদুপযুক্ত উপদেশ প্রদান করা তাঁহারই কর্ত্তব্য। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সত্যের জিজ্ঞাসা, সত্যের উপার্জ্জন, সত্যের অনুশীলন, সত্যের প্রচার, এইরূপ সহজ পদ্ধতি অনুসারে যাঁহারা সত্যের পথে অগ্রসর হ'ন—সত্য তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করেন,—সত্যান্ন প্রমদিতব্যং এইটি ঋষিদিগের প্রথম উপদেশ—দ্বিতীয় উপদেশ ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং,—তৃতীয় উপদেশ কুশলান্ন প্রমদিতব্যং: অদ্য "সত্যান্ন প্রমদিতব্যং" ইহার ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে সত্যের ধারাবাহিক ক্রম-পদ্ধতি প্রদর্শিত হইল; সত্যের পালন যাহা ধর্ম্মের মূল তাহা আগামী বারে ব্যাখ্যাত হইবে; এবং ক্রমে সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং—কুশলান্ন প্রমদিতব্যং ইহার সম্বন্ধে ঋষিদিগের কিরূপ অভিপ্রায় তাহা ব্যাখ্যাত হইবে।

হে পরমাত্মন্। তুমি সকল সত্যের মূল সত্য—তুমি জল-স্থল শূন্য পরিপূর্ণ করিয়া আমাদের সম্মুখে বিরাজমান রহিয়াছ—এবং আমাদের প্রাণ মন হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া আমাদের আত্মাতে বিরাজমান রহিয়াছ; তুমি আমাদের পূর্ব্বতন গুরুরও গুরু তোমাকে আমরা প্রণাম করিতেছি তুমি আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেও, যাহাতে জগতের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত—তোমাকে দেদীপ্যমান দেখিতে পাই,—আত্মার অভ্যন্তর হইতে সকল বস্তুর—সকল জীবের—অভ্যন্তর পর্য্যন্ত তোমাকে প্রত্যক্ষবৎ জাগ্রত অবলোকন করি; এবং হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ তোমাতে অর্পণ করিয়া কামনার সমস্ত বিষয় উপভোগ করি

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

(আলোচনা নামক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।)

জান না ত নির্ঝরিণী, আসিয়াছ কোথা হতে,
কোথায় যে করিছ প্রয়াণ,
মাতিয়া চলেছ তবু, আপন আনন্দে পূর্ণ,
আনন্দ করিছ সবে দান।
বিজন অরণ্য-ভূমি, দেখিছে তোমার খেলা,
জুড়াইছে তার নয়ান,
মেষ শাবকের মত, তরুদের ছায়ে ছায়ে
রচিয়াছ খেলিবার স্থান।
গভীর ভাবনা কিছু, আসে না তোমার কাছে,
দিনরাত্রি গাও শুধু গান।
বুঝি নর-নারী মাঝে, এমনি বিমল হিয়া,
আছে কেহ তোমারি সমান।

চাহে না চাহে না তারা, ধরণীর আড়ম্বর,
সন্তোষে কাটাতে চায় প্রাণ,
নিজের আনন্দ হতে আনন্দ বিতরে তারা,
গায় তারা বিশ্বের কল্যাণ।

জ্ঞান-বৃক্ষ।

আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচরে যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহা একটা প্রকাশ মাত্র—অভিব্যক্তি মাত্র। অন্ধকার রজনীতে হঠাৎ আলোক অভিব্যক্ত হইলে আমাদের মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার পর আমরা তাহার সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই,—সে আলোক কি জাতীয়—কোথা হইতে উৎপন্ন—বাস্তবিক না কাল্পনিক—ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। প্রকাশ-মাত্রটির যে সত্তা তাহাকে দর্শন-কারেরা প্রাতিভাসিক সত্তা বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রাতিভাসিক সত্তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) ভাব এবং (২) আবির্ভাব। ভাব মনে প্রকাশ পায়, আবির্ভাব বাহিরে প্রকাশ পায়। যাহা বাহিরে—অর্থাৎ আকাশে—প্রকাশ পায়, তাহাই মুখ্যরূপে আবির্ভাব শব্দের বাচ্য—তাহাকেই আমরা বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করি; আর, যাহা অন্তরে—অর্থাৎ আকাশে নহে শুদ্ধ কেবল কালে—প্রকাশ পায়, তাহাকে আমরা ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করি। আবির্ভাব প্রত্যক্ষ-গম্য—ভাব অনুভব-গম্য। ভাবের সহিত আবির্ভাবের ঐক্য, অথবা এক ভাবের সহিত আর-এক ভাবের ঐক্য, তত্ত্ব বলিয়া উক্ত হয়;—"তত্ত্ব" কিনা যাথার্থ্য,—"যাথার্থ্য" কিনা যথা অর্থ তথা—যেমন বিষয় তেমনি ভাব—বিষয় এবং ভাবের মিল। আবির্ভাব ভাব এবং তত্ত্ব তিনের বাস একই রাজ্যে—প্রাতিভাসিক রাজ্যে, কিন্তু ভিন্ন গ্রামে; (১) আবির্ভাব আকাশে অবস্থিতি করে, (২) ভাব কালে অবস্থিতি করে, (৩) তত্ত্ব যোগে অবস্থিতি করে। মনে কর, একটা মরুভূমির মধ্য দিয়া একটা অরণ্য-প্রদেশে উপনীত হওয়া গেল; সেখানে উত্তীর্ণ হইয়া আমরা দেখিতেছি যে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পুষ্প-বৃক্ষ ও ফল-বৃক্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে,—এই যে আকাশ-স্থিত বৈচিত্র্য ইহাই আবির্ভাব; ঐ বৃক্ষ-রাজি দেখিয়া আমাদের মনের ভাব-পরিবর্ত্তন হইল; মরু-প্রদেশীয় নীরস ভাবের পরিবর্ত্তে বন-কানন-প্রদেশীয় সরস ভাবের উদয় হইল; এই যে, কালোত্থিত মনের বিকার বা মনের পরিবর্ত্তিত অবস্থা ইহাই ভাব। আমাদের মনের ভাব-পরিবর্ত্তন হইবা-মাত্রই জিজ্ঞাসা উঠিল "কোথায় আইলাম"—প্রথমে মনে হইল "অরণ্যে বা আসিয়াছি" পরে মনে হইল "মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী নানা জাতীয় ফল-বৃক্ষ ও পুষ্প-বৃক্ষ রহিয়াছে,—এটা তবে উপবন"। পরে মনে হইল যে, "বৃক্ষের শাখা পত্র ধূমে বিবর্ণ হইয়াছে,—তবে এটা ঋষির তপোবন"; পরে এক জন বল্কলধারী বালক আমাদের সম্মুখে দেখা দিতেই সে-বিষয়ে আমাদের মনে তিলার্দ্ধও সংশয় রহিল না। প্রথম যখন মনে হইয়াছিল "অরণ্যে বা আসিয়াছি" তখন মনোমধ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি নানা প্রকার বিভীষিকা দেখা-দিয়াছিল; পরে যখন মনে হইল "না—এটা উপবন" তখন যূথি জাতি মল্লিকা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প, সুগন্ধ-যুক্ত স্নিগ্ধ সমীরণ ইত্যাদি নানা প্রকার প্রলোভন মনে দেখা-দিয়াছিল; শেষে যখন আমরা নিশ্চিত বুঝিলাম যে, এটা তপোবন, তখন পবিত্র স্থান, ঋষিদিগের প্রশান্ত মূর্ত্তি, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, হোম, যাগ, যজ্ঞ, ইত্যাদি শান্তি-প্রধান ভাব সকল আমাদের মনে একযোগে উদিত হইল। যতক্ষণ

না আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিয়াছিলাম ততক্ষণ আমাদের মনে নানা ভাব আসা যাওয়া করিতেছিল বটে কিন্তু তাহাদের মধ্যে নিশ্চয়তার বন্ধন ছিল না,—(১) ব্যাঘ্র ভল্লুক, (২) সুগন্ধ পুষ্প, সুকোমল লতা,—একবার এটা একবার ওটা নাড়াচাড়া হইতেছিল—ক্ষণে ক্ষণে আমাদের মনে ভাব-পরিবর্ত্তন হইতেছিল; কিন্তু যখন বল্কল-ধারী বালক ও শাখাপত্রের ধূম-মালিন্য এই দুই বিষয় প্রত্যক্ষ করিলাম, তখন সংশয় একবারেই মন হইতে অপনীত হইল, তখন "বন-কানন" এই যে একটি ভাব—ইহার সহিত "ঋষির আবাস" এই আর একটি ভাব এবং তাহার আনুষঙ্গিক আর আর অনেক-গুলি ভাব অকাট্য যোগ-সূত্রে বাঁধিয়া গেল এবং "এই বনটি তপোবন" এই তত্ত্বটি আমাদের বুদ্ধিতে স্থিরীভূত হইল। এই জন্য আমাদের দর্শন-কারেরা অন্তঃকরণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন (১)মন—কিনা সংশয়াত্মক বা বিমর্শাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তি, আর (২)বুদ্ধি—কিনা নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তি। (১) মনোমধ্যে ভাবের ওলট্ পালট্ হয়,—(২) বুদ্ধিতে তত্ত্বের অবধারণ হয়। "বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি" ইহা শুনিবামাত্র কেহ মনে করিতে পারেন যে, বুদ্ধির তত্ত্ব তবে একবারেই অভ্রান্ত; কিন্তু এখানকার তাৎপর্য্য তাহা নহে; "নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি" অর্থাৎ যে বৃত্তি দ্বারা আমরা এক ভাবের সহিত আর এক ভাব অকাট্যরূপে বন্ধন করি,—উপরে যেমন বনের ভাবের সহিত ঋষি-নিকেতনের ভাব অকাট্যরূপে যুড়িয়া দিলাম; হইলেও হইতে পারে যে, বাস্তবিক তাহা তপোবন নহে,—পথিকেরা বৃক্ষ-তলে রন্ধন করিয়া খাওয়াতে শাখাপত্র ধূমে বিবর্ণ হইয়াছে—ও নিকটস্থ আশ্রম হইতে বল্কলধারী ঋষি বালক ফল আহরণ করিতে আসিয়াছে, এই মাত্র। তাহা হইলেও বনের ভাবের সহিত তাপসাশ্রম ভাবের ঐ যে যোগ-বন্ধন—এই বন তপোবন এই যে নিশ্চয় ক্রিয়া—ইহাকে নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তি বলিবার কিছুমাত্র বাধা নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি (১)আবির্ভাব আকাশে অবস্থিতি করে(২) ভাব কালে অবস্থিতি করে,(৩)তত্ত্ব যোগে অবস্থিতি করে,—"যোগ" অর্থাৎ ভাবের সহিত ভাবের যোগ; বনের ভাব আমাদের মনে বর্ত্তমান আছে, তপঃসদনের ভাবও আমাদের মনে বর্ত্তমান আছে, এই দুই ভাবের যোগে আমরা এই তত্ত্বটি অবধারণ করি যে, এই বন তপোবন। অতএব ভাবের সহিত ভাবের যোগ হইতে তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। ভাবের সহিত ভাবের যোগ দুই রূপে ঘটিতে পারে—(১) সংস্কার-প্রভাবে ঘটিতে পারে, (২) আত্মার প্রভাবে ঘটিতে পারে; এতদনুসারে তত্ত্ব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) সংস্কার-মূলক এবং (২) আত্ম-প্রত্যয়-মূলক। সংস্কার-মূলক তত্ত্বের দৃষ্টান্ত যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে;—"সংস্কার" কি না পুনঃ পুনঃ দেখা-শুনা-জনিত—অভ্যাস-জনিত—ব্যুৎপত্তি;—পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি যে, ধূম লাগিলে বস্তু বিবর্ণ হয়—পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছি যে, ঋষিরা হোম করিয়া থাকেন—ইহাতে করিয়া শাখাপত্রের ধূম-মালিন্যের সহিত তাপসাশ্রমের সহিত যোগ বাঁধিয়া গিয়াছে,—অতএব "এই বন ঋষি-আশ্রম" এ তত্ত্বটি সংস্কার-মূলক। যে কোন তত্ত্ব আমরা বহির্বস্তুর দেখা-শুনা হইতে উপার্জ্জন করি সেই তত্ত্বই সংস্কার-মূলক; আর যে-কোন তত্ত্ব আমরা আত্মার স্বকীয় প্রভাব হইতে উদ্ভাবন করি সেই তত্ত্বই আত্ম-প্রত্যয়-মূলক। বহির্বস্তু উপলক্ষে আত্মা আপনার ভিতর হইতে তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে পারে কি না—এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন,—

নিম্নের দৃষ্টান্তটির প্রতি তাঁহারা মনোনিবেশ করুন;—

সংস্কার মূলক তত্ত্বের একটি-দৃষ্টান্ত এই যে, বোম্বাই আম্র মিষ্ট ; আত্ম-প্রত্যয়-মূলক তত্ত্বের একটি-দৃষ্টান্ত এই যে, ঘটনা-মাত্রই কারণাধীন। আমরা যতবার বোম্বাই আম্র আস্বাদন করিয়াছি ততবার মিষ্টত্ব অনুভব করিয়াছি, এইরূপ অভ্যাসের গুণেই আমাদের মনে এই সংস্কারটি বদ্ধমূল হইয়াছে যে "বোম্বাই আম্র মিষ্ট"; আবার যদি কতকগুলি বোম্বাই আম্র আস্বাদন করিয়া দেখি যে, সমস্ত গুলিই টক, তবে আমাদের পূর্ব্বতন সংস্কারের পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে ; তাহা হইলে "বোম্বাই আম্র মিষ্ট" এ তত্ত্বটির পরিবর্ত্তে আমাদের বুদ্ধিতে এই আর-একটি তত্ত্ব উৎপন্ন হইবে যে, "কোন কোন বোম্বাই আম্র মিষ্ট, কোন কোন বোম্বাই আম্র টক।" সংস্কার-মূলক তত্ত্বের এইরূপ বিকল্প সম্ভবে—আত্মপ্রত্যয়-মূলক তত্ত্ব নির্ব্বিকল্প; "ঘটনা-মাত্রই কারণাধীন" এ তত্ত্বের বিকল্প সম্ভবে না ; অর্থাৎ এমন হইতে পারে না যে, কোন কোন ঘটনা কারণাধীন, কোন কোন ঘটনা কারণাধীন নহে। বোম্বাই আম্র আমরা চক্ষে দেখিয়াছি—এবং তাহার মিষ্টত্ব আমরা জিহ্বায় আস্বাদন করিয়াছি ; তাহার পরে আমরা চক্ষে-দেখা বোম্বাই আম্রের সহিত—জিহ্বায় আস্বাদন-করা মিষ্টত্বের যোগ-বন্ধন করিয়া এই তত্ত্বটি স্থির করিয়াছি যে, বোম্বাই আম্র মিষ্ট ; কি "ঘটনা মাত্রই কারণাধীন" ইহাও কি আমরা সেইরূপ করিয়া পাইয়াছি ? বোম্বাই আম্র এবং তাহার মিষ্টত্ব উভয়কেই আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিয়া অবশেষে উভয়ের মধ্যে যোগ-বন্ধন পূর্ব্বক এই তত্ত্বটি পাইয়াছি যে, বোম্বাই আম্র মিষ্ট ; তেমনি কি—ঘটনা এবং তাহার কারণাধীনত্ব বা উৎপাদিকা শক্তি উভয়কেই আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিয়া অবশেষে উভয়ের মধ্যে যোগ-বন্ধন পূর্ব্বক এই তত্ত্বটি পাইয়াছি যে, ঘটনা-মাত্রই কারণাধীন ? কখনই না ; ঘটনাকেই আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি কিন্তু তাহার কারণাধীনত্ব বা উৎপাদিকা শক্তি আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর। আমরা ঘটনামাত্রেরই সহিত যে, কারণাধীনত্ব জুড়িয়া দিই,—সে কারণাধীনত্ব আমরা কোথা হইতে পাইলাম? আমরা কি পূর্ব্ববর্ত্তিতা হইতে কারণত্ব টানিয়া আনি ? কৈ? (১) কাক তাল-গাছে বসিল—(২) তাল পড়িল, একটার পর আর একটা ঘটিল, তাহা হইলেই কি পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাকে পরবর্ত্তী ঘটনার কারণ বলিতে হইবে—কাকের উপবেশনকে তাল-পতনের কারণ বলিতে হইবে ? কখনই না ;—কাকের উপবেশন-বশত তাল পড়িল, কিম্বা তালের পরিপকতা-বশত তাল পড়িল, তাহা আমরা জানি না ; কি কারণবশত তাল পড়িল, তাহা আমরা চক্ষে দেখিও না—চক্ষে দেখিবার সম্ভাবনাও নাই,—কাকের উপবেশনবশতও তাল পড়িতে পারে—পরিপকতা বশতও পড়িতে পারে—বৃন্ত-ক্ষয় বশতও পড়িতে পারে,—যে কারণ হইতেই তাল পড়ুক্ না কেন, সে কারণ কেবল যে, তাল-পতনের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা নহে—পরন্তু তাহা তাল-পতনের নিয়ামক। পূর্ব্ববর্ত্তিতাতেই যদি কারণের কারণত্ব হইত তবে কাকের উপবেশনকেই আমরা তাল-পতনের কারণ বলিতে বাধ্য হইতাম—অতএব তাহা নহে—নিয়ামকত্বেই কারণের কারণত্ব হয় ; পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী ঘটনা আমাদের প্রত্যক্ষের গোচর, কিন্তু কারণের নিয়ামকত্ব বা শক্তিমত্তা আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর ; যাহা গোড়াতেই প্রত্যক্ষের অগোচর তাহা কখন সংস্কার-মূলক হইতে পারে না ; যাহা

পুনঃ পুনঃ দেখা যায়, শুনা যায়, তাহাতেই সংস্কার জন্মে,—যাহা দেখা যায় না শুনা যায় না তাহাতে আর সংস্কার জন্মে না;—সুতরাং কারণের নিয়ামকত্ব যাহা কেহই চক্ষে দেখে নাই—কর্ণে শুনেনাই—জিহ্বায় আস্বাদন করে নাই—তাহা সংস্কার-মূলক বিশ্বাস নহে—তাহা আত্মপ্রত্যয়-মূলক সিদ্ধান্ত;—অতএব এই যে একটি তত্ত্ব—যে, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কিছুর নিয়ামকতা বা শক্তিমত্তা ব্যতিরেকে পরবর্ত্তী ঘটনা ঘটিতে পারে না—এ তত্ত্বটি আত্ম-প্রত্যয়-মূলক; অর্থাৎ বাহিরের বস্তুরাশির প্রত্যক্ষ-জনিত সংস্কার হইতে ও-তত্ত্বটি উদ্ভাবিত হয় নাই—আত্মার নিজের অভ্যন্তর হইতেই ও-তত্ত্বটি উদ্ভাবিত হইয়াছে। আমরা কেবল বলিতেছি যে ঘটনা মাত্রই কারণাধীন—যেমন বৃষ্টিপাত কারণাধীন—এই তত্ত্বটি আত্মপ্রত্যয়-মূলক; এখানে কেহ যেন ভুল না বোঝেন—কেহ যেন মনে না করেন যে, "মেঘ বৃষ্টিপাতের কারণ" এ তত্ত্বটাও তবে আত্মপ্রত্যয়-মূলক। কারণের নিয়ামকত্ব আমরা ভিতর হইতে পাইতেছি—বাহির হইতে নহে—উপরে ইহা অকাট্যরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে; সেই নিয়ামকত্ব মেঘেই আরোপ কর—আর ইন্দ্রেই আরোপ কর, তাহার সত্যাসত্যের জন্য আত্মপ্রত্যয় কোন অংশে দায়ী নহে; আত্মপ্রত্যয় কেবল এইটুকু বলিয়াই খালাস যে, বৃষ্টিপাতের কারণ আছেই আছে। কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব আত্মপ্রত্যয়-মূলক তত্ত্বের একটা কেবল দৃষ্টান্ত; আত্মপ্রত্যয়-মূলক তত্ত্ব আরো অনেক আছে—পরে দেখা যাইবে। আত্ম-প্রত্যয়-মূলক তত্ত্ব—মূল তত্ত্ব নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

সমস্ত জড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যাইতেছে;—ইন্দ্রিয়ের যেমন—বিষয় বা (১) আবির্ভাব, মনের তেমনি—(২) ভাব, বুদ্ধির তেমান—(৩) তত্ত্ব, আত্মপ্রত্যয়ের (সংক্ষেপে আত্মার) তেমনি—(৪) মূলতত্ত্ব। আবির্ভাব, ভাব, তত্ত্ব, এবং মূলতত্ত্ব এই চারি-জাতীয় সত্তার চারিটি উপাধি অর্থাৎ বিরাম-স্থান দেখিতে পাওয়া যায়; আবির্ভাবের উপাধি কি? না আকাশের বৈচিত্র্য; আবির্ভাব মাত্রই অনেক বিষয়ের সমষ্টি, এবং আকাশ-খণ্ড-মাত্রই অনেক আকাশ-খণ্ডের সমষ্টি; শেষোক্ত সমষ্টি পূর্ব্বোক্ত সমষ্টির বিরাম-ক্ষেত্র। আকাশের বৈচিত্র্য যেমন আবির্ভাবের উপাধি, কালের বিকার—বা কালের পরিবর্ত্তন—তেমনি ভাবের উপাধি; যে-কোন ভাব মনে উদিত হউক-না কেন তাহা কালের পরিবর্ত্তনের উপরে অবস্থিতি করে; আমাদের মনের ভাব যেমন নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে—কালের মুহূর্ত্তও তেমনি নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কাল-পরিবর্ত্তন ভাব-পরিবর্ত্তনের উপাধি কি না বিরাম-ক্ষেত্র। কালের মুহূর্ত্ত যেমন পরিবর্ত্তিত হইতেছে—তেমনি আবার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত-পরম্পরার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগ-সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে; এই যোগ-সূত্র তত্ত্বের উপাধি; তত্ত্বের মধ্যে যেমন ভাবের সহিত ভাবের যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, কাল-খণ্ডের মধ্যে সেইরূপ মুহূর্ত্তের সহিত মুহূর্ত্তের যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, শেষোক্ত যোগ পূর্ব্বোক্ত যোগের উপাধি। মনে কর দেব-দত্ত আমার একজন বাল্যকালের বন্ধু; অনেক বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই, এক দিন দৈবাৎ তাঁহার সহিত দেখা হইল—এবং আমি ঠাহরিয়া দেখিয়া চিনিলাম যে, ইনি সেই দেবদত্ত; তাঁহার বাল্য-কালের ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তাঁহার মূল-গত কতকগুলি ভাব আজিও পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে—তাহা দেখিয়া তাঁহাকে আমি চিনিতে পারিলাম;

তবেই হইল যে, সেই বাল্যকালের দেবদত্ত—এবং এই আজিকের দেবদত্ত—এই দুই ভাবের মধ্যে যেমন একটি যোগ-সূত্র বহমান আছে—পূর্ব্বেকার সেই কালের মধ্যে এবং আজিকার এই কালের মধ্যে তেমনি একটি যোগ-সূত্র বহমান আছে; শেষোক্ত কাল-যোগ পূর্ব্বোক্ত ভাব-যোগের উপাধি অর্থাৎ বিরামক্ষেত্র;—"ইনি সেই দেবদত্ত"এই যে একটি বুদ্ধির তত্ত্ব, ইহাতে স্মরণ-গম্য দেবদত্তের পূর্ব্বতন ভাবের সহিত, প্রত্যক্ষ-গম্য দেবদত্তের বর্ত্তমান ভাবের যোগ সমর্থন করা হইতেছে; ইহা হইতেই দাঁড়াইতেছে যে, কাল মুহূর্ত্ত পরম্পরার নিরন্তর পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহাদের মধ্যে যে এক যোগ-সূত্র বহমান আছে সেই যোগ-সূত্রই—ঐ ভাব-যোগের, এক কথায়—ঐ তত্ত্বের, বিরাম-ক্ষেত্র। অতএব (১) আকাশের বৈচিত্র্য আবির্ভাবের উপাধি; (২) কালের বিকার ভাবের উপাধি, (৩) কালের যোগ তত্ত্বের উপাধি;—এখন, মূল-তত্ত্বের উপাধি কি?—আমরা বলি যে, মূলতত্ত্বের উপাধি—কালের একত্ব। আমাদের সকল জ্ঞানই এক মূল-জ্ঞানের অন্তর্গত—এই জন্য এক জ্ঞানের (অর্থাৎ গোড়ার এক জ্ঞানের—আত্মার) মূল সিদ্ধান্তগুলি * সকল জ্ঞানের পক্ষেই বলবৎ। আমাদের সকল জ্ঞান যেমন এক জ্ঞানের অন্তর্গত, সকল কাল সেইরূপ এক কালের অন্তর্গত;—শেষোক্ত কালের একতা পূর্ব্বোক্ত মূল-জ্ঞানের একতার—মূলতত্ত্বের একতার—বিরাম-ক্ষেত্র। জ্ঞানের একতা কাহাকে বলে—তাহা যেমন আমাদের বেদান্ত দর্শনে পাওয়া যায় এমন আর কোথাও নহে;—আমাদের মতে অদ্বৈত-বাদ এবং দ্বৈতবাদ দুয়ের মধ্যেই সত্য আছে;—অর্থাৎ "হয়" এবং "নয়" এ দুয়ের মধ্যে যেমন সাঙ্ঘাতিক বিরোধ—অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদের মধ্যে সেরূপ নহে;—তবে কি—না "সমষ্টি" বলিতে যেমন একও বুঝায়—অনেকও বুঝায়, তাহা যেমন এক হিসাবে এক—আর এক হিসাবে অনেক, তেমনি বেদান্ত এক হিসাবে অদ্বৈত-বাদ, আর এক হিসাবে দ্বৈত-বাদ; সে যাহা হউক আমরা বাদাবাদি এবং মতামতি ছাড়িয়া দিয়া অদ্বৈত-বাদের মধ্যে যাহা সত্য তাহা গ্রহণ করিতে পারি। মূল-জ্ঞানের একত্ব সম্বন্ধে পঞ্চদশী কেমন দেখ সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন;—যথা,—

> শব্দস্পর্শাদয়োবেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্‌
> ততোবিভক্তা তৎসম্বিৎ ঐকরূপ্যা ন্ন ভিদ্যতে।
> তথা স্বপ্নেঽত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরং।
> তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ সম্বিদ্ একরূপা ন ভিদ্যতে॥
> সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
> সা চাব-বুদ্ধবিষয়াঽববুদ্ধং তত্তদা তমঃ।
> স বোধো বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্নবোধবৎ।
> এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সম্বিৎ তদ্বৎ দিনান্তরে॥

ইহার অর্থ;—জাগ্রৎ কালে শব্দস্পর্শাদি বিষয় সকল বৈচিত্র্য বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন—কিন্তু শব্দস্পর্শাদি হইতে বিভক্ত যে শব্দস্পর্শাদির জ্ঞান তাহা একরূপতা-হেতু অভিন্ন। (অর্থাৎ যে জ্ঞান শব্দ জানিতেছে সেই জ্ঞানই স্পর্শ জানিতেছে, যে জ্ঞান এক শব্দ জানিতেছে সেই জ্ঞানই আর এক শব্দ জানিতেছে—একই অভিন্ন জ্ঞানে বিভিন্ন শব্দ

* অনেকে মনে করেন সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থ Conclusion; কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে; সিদ্ধান্ত-শব্দের অর্থ Theory; যথা, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত solar theory; "Theory" কি না নির্দ্ধারিত তত্ত্ব—Established truth। Fact এবং Theory এ দুয়ের প্রকৃত অনুবাদ—বৃত্তান্ত এবং সিদ্ধান্ত। Theoretical এবং practical এ দুয়ের যথার্থ অনুবাদ—তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক। Theoretical শব্দের অনুবাদ-স্থলে কেহ কেহ "ঔপপত্তিক" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন—ইহা তাঁহারা কোথা হইতে পাইলেন বুঝা দুষ্কর। "নেদ মুপপন্নং" ইহার অর্থ এই যে, ইহা যুক্তি-সঙ্গত নহে; Theory যুক্তি-সঙ্গতও হইতে পারে—অসঙ্গতও হইতে পারে,—নানা লোকের নানা সিদ্ধান্ত—তাহার মধ্যে ভ্রম সিদ্ধান্তও অনেক আছে—ভ্রম সিদ্ধান্তও সিদ্ধান্ত শব্দের বাচ্য; আমাদের মতে Theory-কে উপপত্তি বলা, আর, যুক্তিকে রজত বলা—একই কথা।

স্পর্শাদি প্রতিভাত হইতেছে)। জাগ্রৎকালে যেমন—স্বপ্ন-কালেও সেইরূপ। স্বপ্ন-কাল এবং জাগ্রৎকালের মধ্যে প্রভেদ কেবল এই মাত্র যে, স্বপ্নকালে জ্ঞেয় বিষয়-সকল অস্থির জাগ্রৎকালে জ্ঞেয় বিষয়-সকল স্থির; কিন্তু স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ উভয় কালের জ্ঞান একরূপী সুতরাং অভিন্ন। (অর্থাৎ একই অভিন্ন জ্ঞানে স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ উভয়-কালীন বিভিন্ন বিষয় সকল প্রতিভাত হয়)। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মরণ হয় যে, আমি সুষুপ্তির অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলাম, স্মরণ সাক্ষাৎ জ্ঞানেরই অনুবৃত্তি (অর্থাৎ ধ্বনি ব্যতিরেকে যেমন প্রতিধ্বনি সম্ভবে না—সাক্ষাৎ জ্ঞান ব্যতিরেকে সেইরূপ স্মরণ সম্ভবে না); অতএব সুষুপ্তি-কালে আমার সাক্ষাৎ জ্ঞানে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, আমি সুষুপ্তির অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছি, তাই সেই বিষয়টি জাগ্রৎকালে আমাদের স্মরণ-পথে উপস্থিত হইল। সে জ্ঞান—বিষয় হইতেই ভিন্ন—জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে (অর্থাৎ কি জাগ্রৎ কি স্বপ্ন কি সুষুপ্তি, তিন কালেরই জ্ঞেয় বিষয়-সকল হইতে জ্ঞান ভিন্ন—কিন্তু জ্ঞান হইতে জ্ঞান ভিন্ন নহে;—তিন কালেরই বিভিন্ন বিষয়-সকল একই অভিন্ন জ্ঞানে প্রতিভাত হইয়া থাকে।) এইরূপ, জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি তিন কালেই জ্ঞান একই অভিন্ন,—এক দিন এক রাত্রিতে যেমন বিষয়ভেদে জ্ঞানের ভিন্নতা হয় না—সেইরূপ দিনান্তরের বিষয়ান্তরেও জ্ঞানের রূপান্তর হয় না।

"মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা॥

মাস বৎসর যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে—কিন্তু স্বয়ম্প্রভারূপী যে, সম্বিৎ, তাহা উদয়ও হয় না অস্তও হয় না। ("সম্বিৎ" অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে consciousness বলে,—সং = con, বিৎ = sciousness সং + বিৎ = con + sciousness)। সর্ব্ব-শুদ্ধ ধরিয়া পাওয়া গেল, (১) আবির্ভাবের উপাধি আকাশের বৈচিত্র্য, (২) ভাবের উপাধি কালের বিকার, (৩) তত্ত্বের উপাধি কালের যোগ (৪) মূলতত্ত্বের উপাধি কালের একতা।

সর্ব্ব প্রথমেই আমরা বলিয়াছি যে, প্রাতিভাসিক সত্তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) ভাব এবং (২) আবির্ভাব। প্রাতিভাসিক সত্তা কাহাকে বলে তাহাও বলিয়াছি, যথা, "শুদ্ধ কেবল প্রকাশ মাত্রটির যে, সত্তা, তাহাই প্রাতিভাসিক সত্তা"—তৎপরে দেখাইয়াছি যে, প্রাতিভাসিক সত্তা-সকলের যোগাযোগ হইতেই বুদ্ধির তত্ত্ব সকল উৎপন্ন হয়; ইহা হইতে আসিতেছে যে, বুদ্ধির তত্ত্ব-সকল প্রাতিভাসিক সত্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধির তত্ত্ব-সকলের যেরূপ সত্তা তাহাকে দর্শনকারেরা ব্যবহারিক সত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; যখন আমরা বলি যে, আম্র মিষ্ট, তখন আম্র যে স্বরূপতঃ কি—মিষ্টতা যে স্বরূপতঃ কি—তাহা আমরা জিজ্ঞাসা করি না, তখন আম্রের ব্যবহারের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য নিবিষ্ট থাকে—আম্র কি কাজে লাগে ইহাই তখন জিজ্ঞাস্য; এই জন্য "আম্র মিষ্ট" এইরূপ তত্ত্ব সকলের নাম রাখা হইয়াছে ব্যবহারিক তত্ত্ব; স্থূল তত্ত্ব মাত্রই ব্যবহারিক তত্ত্ব। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মূলতত্ত্ব-সকলের সত্তা কিরূপ? ইহার উত্তর এই যে, এক দিকে তাহা ব্যবহারিক, আর এক দিকে তাহা পারমার্থিক। ঘটনা-মাত্রেরই কারণ আছে—ইহা আমাদের সাংসারিক সকল কার্য্যেই লাগে—সুতরাং ব্যবহারিক; আবার, মূল-কারণ স্বরূপতঃ কি—ইহার মীমাংসা করিতে হইলেও ঐ তত্ত্বটিকে বিচার-ক্ষেত্রে না আনিলে চলে না,—এই হিসাবে উহা পারমার্থিক; অতএব মূলতত্ত্ব সকল এক দিকে ব্যবহারিক আর

এক দিকে পারমার্থিক ;—অথবা, তাহারা ঠিক্ যে ব্যবহারিক তাহাও নহে;—ঠিক্ যে পারমার্থিক তাহাও নহে—কিন্তু মাঝামাঝি, —এক কথায় বলিতে হইলে—মূলতত্ত্ব-সকল বৈজ্ঞানিক শব্দের বাচ্য। বিজ্ঞান-রাজ্য—পারমার্থিক এবং ব্যবহারিক এই দুই রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী; বিজ্ঞান প্রথমতঃ লৌকিক ব্যবহারের প্রতি উপেক্ষা করিয়া ঠিক্ সত্য কি—তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, এই হিসাবেই তাহা পারমার্থিক ; কিন্তু তাহাতে যথোচিত কৃতকার্য্য না হওয়াতে ব্যবহারিক রাজ্যে ফিরিয়া আসে ও সেইখানেই আপনার শিবির সংস্থাপন করে—এই হিসাবে ব্যবহারিক। এমন কি—তীব্র বৈজ্ঞানিকেরা পারমার্থিক রাজ্যের সহিত একেবারেই আপনাদের সম্পর্ক রহিত করিতে ইচ্ছা করেন; ইচ্ছা করিলে হইবে কি—মনুষ্য পারমার্থিক রাজ্যের আকর্ষণ কিছুতেই এড়াইতে পারে না—আবার সেই-বৈজ্ঞানিকেরা পারমার্থিকের সহিত সম্বন্ধ বাধাইবার জন্য আঁকুবাঁকু করিতে থাকেন,—তাঁহাদের মহা বিপদ উপস্থিত হয়—প্রথম উদ্যমে তাঁহারা পারমার্থিক রাজ্যকে উড়াইয়া দিয়াছেন—এখন কোন্ লজ্জায় তাঁহারা তাহার দিকে অগ্রসর হইবেন? এই জন্য প্রকৃত পারমার্থিক রাজ্যের পরিবর্ত্তে তাঁহারা একরূপ মনগড়া পারমার্থিক রাজ্য সৃষ্টি করিতে বিস্তর আয়াস পা'ন—তাঁহারা ধর্ম্মের ভিত্তিমূল উড়াইয়া দিয়া ধর্ম্মের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে থাকেন—বৃক্ষের গোড়া কাটিয়া আগায় জল-সিঞ্চন করিতে থাকেন। ইংলণ্ড-দেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত স্পেন্সর যদিও ঐ শ্রেণীরই একজন—কিন্তু তিনি স্পষ্টবাদী; তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, পারমার্থিক রাজ্য উপেক্ষণীয় নহে; তিনি বলেন যে গোড়ায় এক অদ্বিতীয় মূল-সত্য বা সৎপদার্থ বর্ত্তমান আছে—বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম উভয়ই এ তত্ত্বটি অকাট্যরূপে সমর্থন করিতেছে—এ তত্ত্বটিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না—"নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকঃ" এই সেতুকে রাত্রি দিন জরা মৃত্যু শোক কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। প্রকৃত কথা এই যে, একদিকে ব্যবহারিক রাজ্য আর একদিকে পারমার্থিক রাজ্য আত্মা উভয়ের সন্ধি স্থলে; অথবা, একদিকে সংসার, আর একদিকে ঈশ্বর, আত্মা উভয়ের সন্ধি স্থলে। দেশ-কাল-ঘটিত যোগাযোগ যাহা আত্মার ব্যবহারিক সত্তার পরিচয় প্রদান করে—তাহাই মূলতত্ত্ব সকলের বিচরণ-ক্ষেত্র, এবং দেশ-কালের অতীত নিরুপাধিক জ্ঞান যাহা পারমার্থিক সত্তার পরিচয় প্রদান করে—তাহাই মূলতত্ত্ব-সকলের নিভৃত নিলয়; এই নিভৃত নিলয়ের গুণে মূল তত্ত্ব-সকল পারমার্থিক—এবং ঐ বিচরণ ক্ষেত্রের গুণে উঁহারা ব্যবহারিক, এক কথায় —মূল তত্ত্ব-সকল বৈজ্ঞানিক। এখন বিশুদ্ধ পরমার্থ তত্ত্ব (সংক্ষেপে পর-তত্ত্ব) কিরূপ তাহার প্রতি প্রণিধান করা যাউক ;—

এক দিকে স্থূল তত্ত্ব আর এক দিকে পর তত্ত্ব—মূল তত্ত্ব উভয়ের মধ্য স্থলে। (১) মূল তত্ত্ব-সকলের আশ্রয় জীবাত্মা, (২) স্থূল-তত্ত্ব-সকলের আশ্রয় অব্যক্ত প্রকৃতি, এবং (৩) পর-তত্ত্বের আশ্রয় পরমাত্মা। এই তিনটি বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে—কিরূপে আত্মা হইতে মূল-তত্ত্ব-সকল স্ফুরিত হয়—এবং সেই মূল-তত্ত্ব-গুলির সংখ্যাই বা বা কত—তাহা জানা আবশ্যক; অতএব প্রথমে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে ;—

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মূলতত্ত্ব-সকল আত্মপ্রত্যয়-মূলক; বহির্বিষয়ের উপলক্ষে আত্মা আপনা হইতে যে সকল তত্ত্ব উদ্ভাবন করে

তাহাই মূলতত্ত্ব। স্থূল-তত্ত্ব-সকল জানিবার সময় আত্মাকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, মূল-তত্ত্ব-সকল জানিবার সময় আত্মাকে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে হয়; বিষয়ের প্রভাবে—আত্মেতর বস্তুর প্রভাবে—আমরা যে-সকল তত্ত্ব উপার্জ্জন করি তাহাই স্থূল তত্ত্ব, এবং আত্মার প্রভাবে আমরা যে-সকল তত্ত্ব উপার্জ্জন করি তাহাই মূল-তত্ত্ব। কোন্ তত্ত্ব-গুলি আমরা আত্মার প্রভাবে উপার্জ্জন করি তাহার সন্ধান পাওয়া সহজেই হইতে পারে;—মনে কর একটা দীপের আলোক রক্ত বর্ণ, এবং সেই দীপটি শ্যাম বর্ণ কাচের আবরক-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টিত; এমত স্থলে সেই দীপের প্রভা যাহা গৃহ-মধ্যে বিকীর্ণ হইতেছে তাহা অবশ্য—রক্তবর্ণও নয়—শ্যামবর্ণও নয়, কিন্তু দুয়ের মাঝামাঝি; এখন, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, দীপের নিজের আলোক কিরূপ? তাহা হইলে সেই কাচের আবরক সরাইয়া ফেলিলেই তাঁহার সে প্রশ্নের সমুচিত মীমাংসা হইয়া যায়;—এই প্রণালীর অনুবর্ত্তী হইয়া আত্মেতর সমস্ত বস্তুকে ভাবনা হইতে সরাইয়া ফেল—কি অবশিষ্ট থাকিবে? না এক দিকে আত্মা এবং আর এক দিকে শূন্য আকাশ এবং শূন্য কাল। সেই শূন্য আকাশ এবং শূন্য কালের বৈচিত্র্যকে আত্মার একতা গুণে বন্ধন করিয়া আমরা যে-কোন তত্ত্বে উপনীত হই তাহাই মূলতত্ত্ব—কেননা সে তত্ত্ব শুদ্ধ কেবল আত্মার প্রভাবেই স্ফুরিত হয়—বহির্বস্তুর প্রভাবে নহে। দেশ-কালের বৈচিত্র্যকে প্রথমতঃ আত্মা আপনার আয়ত্তাধীনে আনয়ন করে, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মধ্যে নিয়ম সংস্থাপন করে, এই দুই পদ্ধতির ভিন্নতা অনুসারে মূলতত্ত্ব-সকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—পারিমাণিক (Mathamatical) এবং নিয়ামিক (Regulative)।

প্রথম পারিমাণিক মূল-তত্ত্ব। পারিমাণিক মূল-তত্ত্ব দুইটি—(১) আয়তন-ঘটিত—(২) মাত্রা-ঘটিত।

প্রথমতঃ আয়তন-ঘটিত মূল-তত্ত্ব এই যে, কাল-খণ্ড মাত্রই অনেক মুহূর্ত্তের সমষ্টি; এই মূল-তত্ত্ব-অনুসারে আমরা একগজ পরিমাণ কাষ্ঠদণ্ডকে সাতবার সাতস্থানে প্রয়োগ করিয়া সাতগজ কাপড় মাপি—"সাত বার" কিনা সাত মুহূর্ত্ত।

দ্বিতীয়তঃ মাত্রা-ঘটিত মূলতত্ত্ব এই যে, কালের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আত্মা অনেক আকাশ-খণ্ড এক যোগে গ্রহণ করে, এক মুহূর্ত্তে যত অধিক পরিমাণ আকাশ গৃহীত হয় ততই মনোযোগের মাত্রাধিক্য হয়—যত অল্প পরিমাণ আকাশ গৃহীত হয় ততই মনোযোগের মাত্রার ন্যূনতা হয়,—কালের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আকাশের অনেকত্বকে স্বীয় গর্ভে ধারণ করে—ইহাই মাত্রা-ঘটিত মূলতত্ত্ব। এই মূলতত্ত্ব অনুসারে আমরা পূর্ব্ব হইতেই বলিতে পারি যে, যে-কোন ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা মনোবৃত্তি যখনই উদিত হইবে—তাহারই একটি নির্দ্দিষ্ট মাত্রা থাকিতে চায়। এই মূলতত্ত্ব অনুসারে দাঁড়াইতেছে যে, দীপালোক এক মুহূর্ত্তে যতটা দূর দেশ আলোকিত করে, তাহার ঔজ্জ্বল্যের মাত্রা তত অধিক, চলমান বস্তু এক মুহূর্ত্তে যত দূর-দেশে উপনীত হয় তাহার বেগ-মাত্রা তত অধিক; বলের, গুরুত্বের, এবং ঘনত্বের—তিনেরই মাত্রা-নিরূপণ চরমে বেগের মাত্রা-নিরূপণের উপরেই নির্ভর করে; কেননা বলোৎপাদিত বেগের মাত্রাধিক্য দ্বারাই বলের মাত্রাধিক্য নিরূপিত হয়, বহন-ক্ষম বলের মাত্রাধিক্য-দ্বারাই গুরুত্বের মাত্রাধিক্য নিরূপিত হয়, আর নির্দ্দিষ্ট আয়তন-বিশিষ্ট বস্তুর গুরুত্বের মাত্রা দ্বারাই ঘনত্বের মাত্রা নিরূপিত হয়; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ঘনত্বের মাত্রা-

নিরূপণ পরম্পরা-সম্বন্ধে বেগের মাত্রা-নিরূপণের উপরে নির্ভর করে ও বেগের মাত্রা-নিরূপণ মুহূর্ত্ত-কবলিত আকাশ-বৈচিত্র্যের উপরে নির্ভর করে। মাত্রা-ঘটিত মূলতত্ত্বে দেখা যায় যে, আত্মা মুহূর্ত্ত-গর্ভস্থিত বৈচিত্র্যে আপনার একত্ব স্ফুরিত করে; আয়তন-ঘটিত মূলতত্ত্বে দেখা যায় যে, আত্মা মুহূর্ত্ত-পরম্পরা-গত বৈচিত্র্যে আপনার একত্ব স্ফুরিত করে; অতএব আত্মার একত্বই উক্ত পারিমাণিক মূলতত্ত্ব-দ্বয়ের বন্ধন-রজ্জু।

দ্বিতীয়, নিয়ামিক মূলতত্ত্ব। নিয়ামিক মূলতত্ত্ব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত (১) বৈজ্ঞানিক এবং (২) দার্শনিক। বিজ্ঞান-শব্দে বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান বুঝায়; দর্শন-শব্দে বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান বুঝায়। প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব তিনটি,—(১) বস্তু-গুণের মূল-তত্ত্ব, (২) কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্ব, (৩) ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মূলতত্ত্ব। (১) একই আত্মাতে নিত্যকাল এবং খণ্ড কাল-পরম্পরা দুইই প্রতিভাত হয়,—আত্মা আপনার একত্ব গুণে দুইকে যোগ-বদ্ধ করে; তাহা হইতেই পাওয়া যায় যে, খণ্ড-কাল ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে কিন্তু যে নিয়মে তাহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা অপরিবর্ত্তনীয়—তাহা সার্ব্বকালিক; নিত্যকালের নিয়ম দ্বারাই খণ্ড-কাল সকল নিয়মিত হইতেছে; এই মূলতত্ত্ব-অনুসারেই আমরা বলি যে, কালোৎপন্ন প্রাতিভাসিক সত্তা মাত্রই কালাতীত পারমার্থিক সত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই মূলতত্ত্বটিকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন "Persistence of Force"। (২) একই অভিন্ন আত্মাতে বিভিন্ন কাল-পরম্পরা উত্তরোত্তর প্রতিভাত হয়; ইহা হইতেই আসিতেছে যে, সেই কাল-পরম্পরার মধ্যে একটি আনুপূর্ব্বিক যোগ-সূত্র বহমান রহিয়াছে; সেই আনুপূর্ব্বিক যোগ-সূত্রকেই আমরা বলি—কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা; এবং তাহা হইতে আমরা পাই যে, পরবর্ত্তী-কাল-মাত্রই পূর্ব্ববর্ত্তী-কাল-দ্বারা নিয়মিত বা নিয়ন্ত্রিত। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এই মূলতত্ত্বটিকে বলেন কার্য্য কারণের নিয়ম Law of causation। (৩) একই আত্মাতে মধ্যস্থিত আকাশ-খণ্ড এবং তাহার (অর্থাৎ সেই মধ্যস্থিত আকাশখণ্ডের) চতুর্দ্দিকস্থিত আকাশ-খণ্ড দুইই প্রতিভাত হয়; মধ্যস্থিত আকাশ-খণ্ডকে সংক্ষেপে অন্তরাকাশ এবং বহিস্থিত আকাশখণ্ডকে সংক্ষেপে বহিরাকাশ বলা যায়; বহিরাকাশ অন্তরাকাশকে সীমাবদ্ধ করে—অন্তরাকাশ বহিরাকাশকে প্রতিরোধ করে, ইহাই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মূলতত্ত্ব; ইহা হইতেই পাওয়া যায় যে কাহারো উপর বাহির হইতে বল প্রয়োজিত হইলে তাহার (কিনা সেই বস্তুর) ভিতর হইতে সেই বল প্রতিরোধিত হয়। এই মূলতত্ত্বটিকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার নিয়ম Law of action and reaction। কার্য্যকারণের নিয়ম এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম জীবরাজ্যে যেরূপ ভাব ধারণ করে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা পূর্ব্বোক্ত নিয়মকে বলেন—আনুপূর্ব্বিকতার নিয়ম Law of Heredity, এবং শেষোক্ত নিয়মকে বলেন আনুষঙ্গিকতার নিয়ম Law of adaptation;—'সংসর্গজা দোষ-গুণা ভবন্তি' ইহা শেষোক্ত নিয়মেরই একটি ফল। বস্তুগুণের মধ্যে যেরূপ যোগ, কার্য্য কারণের মধ্যে যেরূপ যোগ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যেরূপ যোগ তাহা যেমন-তেমন যোগ নহে দুই বস্তুকে দুই ঠাঁই হইতে আনিয়া ইহাকে উহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে দুয়ের মধ্যে একটা যোগ বাঁধিয়া যায় বটে কিন্তু এখানে সেরূপ যোগের উল্লেখ হইতেছে না; এখানকার যোগ অতীব ঘনিষ্ঠ যোগ; দুই বস্তু যদি একই-কোন কিছুর দুইটি অঙ্গ হয়, তবে "উভ-

য়ের মধ্যে যোগ আছে” বলিলে যেরূপ যোগ বুঝায়—এখানে সেইরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ বুঝিতে হইবে—একতা-মূলক যোগ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা এবং পরবর্ত্তী ঘটনা দুইকে আত্মা যখন আপনার একত্ব-গুণে এক করিয়া ফেলে, তখনই সে উভয়ের মধ্যে কার্য্য কারণের বন্ধন দেখিতে পায়; কার্য্য এবং কারণের সন্ধিস্থলে যে, উভয়ের একত্ব অবস্থিতি করে তাহা আত্মার একত্বেরই প্রতিনিধি-স্বরূপ; এক অভিন্ন আত্মাতে যদি পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী এই দুই বিভিন্ন মুহূর্ত্ত প্রতিভাত না হইত, তবে কার্য্যকারণ বলিয়া একটা কথাই অভিধানে স্থান পাইত না। দ্বিতীয়তঃ দার্শনিক মূলতত্ত্ব তিনটি; প্রথমটি মূলতত্ত্ব-ঘটিত, দ্বিতীয়টি স্থূল তত্ত্ব-ঘটিত এবং তৃতীয়টি পরতত্ত্বের আভাস প্রদান করে। (১) মূল-তত্ত্ব-সকল সাধারণতঃ সকল কালের উপযোগী, (২) বিশেষ বিশেষ স্থূল-তত্ত্ব বিশেষ বিশেষ কালের উপযোগী, এবং (৩) পরতত্ত্ব উভয়-বিধ কালের (অর্থাৎ নিত্য-কালের এবং অনিত্য-কালের) যোগোপযোগী। প্রথমটি হইতে পাওয়া যায় যে, মূলতত্ত্ব-সকল সাধারণতঃ সকল বিষয়ের উপযোগী, দ্বিতীয়টি হইতে পাওয়া যায় যে, বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপযোগী, তৃতীয়টি হইতে পাওয়া যায় যে, বিশেষ বিশেষ সমস্ত স্থূল তত্ত্বের সহিত মূলতত্ত্বের যে যোগ আছে—পরতত্ত্ব সেই যোগের উপযোগী; —মূল-তত্ত্ব-সকল জীবাত্মার পরিচয় প্রদান করে, স্থূল তত্ত্ব-সকল অব্যক্ত প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করে এবং প্রকৃতি ও জীবাত্মা দুয়ের মধ্যে যে যোগ তাহা পরমাত্মার পরিচয় প্রদান করে।

উপরে কেহ যেন ভুল না বোঝেন—কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, “অন্তরাকাশ বহিরাকাশকে প্রতিরোধ করে” “কাল-খণ্ড সকল এক-সূত্রে আবদ্ধ” এ সকল কথা-দ্বারা শূন্য দেশ-কালে বস্তুত্ব আরোপিত হইতেছে। আত্মেতর বস্তু সকলকে ভাবনা হইতে সরাইয়া ফেলিলে বস্তু যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা আত্মা, দেশকাল যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা আর কিছু নহে—কেবল আত্মাশ্রিত দুইটি বস্তু-শূন্য উপাধি। আত্মা আপনার ভাব দেশকালে প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বস্তুরূপে গড়িয়া তোলে—সুতরাং দেশকাল নিজে কিছুই নহে আত্মাই তাহাদের সর্ব্বস্ব। দেশ-কালরূপ শূন্য উপাধিকে আপনার ভাব দ্বারা পূর্ণ করিবার শক্তি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ,—তাহা ঐশী শক্তির প্রতিনিধি-স্বরূপ; সেই শক্তি দেশ-কালের উপর প্রয়োগ করিয়া আত্মা মূলতত্ত্ব সকল উৎপাদন করে। আমরা সমস্ত বহির্ব্বস্তুকে ভাবনা হইতে সরাইয়া ফেলিয়া এই কয়েকটি মূলতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলাম (১) বিষয় মাত্রেরই নির্দ্দিষ্ট আয়তন চাই (২) ইন্দ্রিয়-বৃত্তি মাত্রেরই নির্দ্দিষ্ট মাত্রা চাই, (৩) গুণ মাত্রেরই মূলে বস্তু চাই, (৪) ঘটনা মাত্রেরই মূলে কারণ চাই, (৫) ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া চাই, (৬) জ্ঞানের সাধারণ বিষয়োপযোগিতা চাই, (৭) বিশেষ বিশেষ-জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিষয়োপযোগিতা চাই, (৮) সর্ব্ব-সাধারণ জ্ঞান হইতে বিশেষ বিশেষ সমস্ত জ্ঞান পর্য্যন্তে আদ্যোপান্ত অখণ্ডনীয় যোগ-শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকা চাই। একটা বৃক্ষের উপর ঐ মূল-তত্ত্ব-গুলিকে প্রয়োগ করিলে কিরূপ দাঁড়ায় দেখা যাউক্,—(১) তরুর বৃদ্ধির একটা আয়তন চাই, (২) তাহার বিকাশের মাত্রা চাই, (৩) তাহার মূলস্থিত বাস্তবিক সত্তা চাই, (৪) বীজ হইতে ফল পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক কার্য্য কারণের শৃঙ্খলা চাই, (৫) বৃক্ষের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চাই, (৬) বৃক্ষ-জ্ঞান উৎপন্ন হইবার পূর্ব্ব হইতে সাধা-

রণ জ্ঞান বিদ্যমান থাকা চাই, (৭) বৃক্ষরূপ বিশেষ জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়া চাই, এবং (৮) সাধারণ জ্ঞান বৃক্ষ-জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে তন্ময়ীভূত হওয়া চাই; বৃক্ষ-জ্ঞানের পক্ষে এই মূলতত্ত্ব-গুলি অবশ্যম্ভাবী। আকাশ এবং কাল এই দুই শূন্য উপাধির বৈচিত্র্যকে আত্মা আপনার একতা-গুণে বন্ধন করিয়া ঐ মূল-তত্ত্ব গুলি উদ্ভাবন করে। অতএব আত্মার একত্বই মূলতত্ত্ব গুলির নিভৃত নিলয়, সেই থান হইতেই তাহার দেশ-কাল-ক্ষেত্রে বাহির হয়। এই গেল মূল তত্ত্ব,—এখন স্থূল তত্ত্ব কি রূপ তাহা দেখা যাউক,—

মনে কর আমি বসিয়া আছি—হঠাৎ আমার মন উদ্বিগ্ন হইল,—কেন যে,এরূপ হইল আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, পরে ঠাহরিয়া দেখিলাম যে, পূর্ব্বে বায়ু নির্মুক্ত ভাবে বহিতেছিল এক্ষণে তাহা স্তম্ভিত ভাব ধারণ করিয়াছে,—ইহা ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ। প্রথমতঃ আমার মনের উদ্বেগ কোথা হইতে আইল—কি বৃত্তান্ত—কিছুই বুঝিতে পারি নাই, পরে তাহার উপর কার্য্য-কারণের মূল-তত্ত্ব খাটাইবার চেষ্টা পাইলাম,—উপযুক্ত কারণ কি হইতে পারে ঠাহরিয়া দেখিয়া বায়ুর স্তম্ভিত ভাবের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করিলাম এবং তাহাকেই কারণ বলিয়া অবধারণ করিলাম, কিন্তু "উক্ত উদ্বেগের কারণ আছেই আছে" ইহা যেমন আমি সুস্পষ্ট বুঝিতেছি, "বায়ুর স্তম্ভিত ভাবই আমার মানসিক উদ্বেগের কারণ" ইহা তেমন স্পষ্ট রূপে বুঝিতেছি না,—হয় তো পার্থিব বা নভস্থলীয় তাড়িত পদার্থের কোন ব্যতিক্রম হওয়াতে আমার মনের ঐরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কোন্‌টা ঠিক্ তাহা আমি বলিতে পারি না—অথচ আমি মোটামুটি এই একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলাম যে "বায়ুর স্তম্ভিত ভাবই আমার মানসিক উদ্বেগের কারণ"—ইহাই স্থূল তত্ত্ব। শুধু যে কেবল মনের ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ আমাদের নিকট অব্যক্ত তাহা নহে, বাহিরের ঘটনার কারণও তদ্বৎ। বৃষ্টির একটা কারণ আছেই আছে ইহাতে আর সংশয় মাত্র নাই,—"ঘটনা মাত্রই কারণাধীন" এই মূল তত্ত্বটির প্রসাদে উহা একেবারেই অভ্রান্ত; কিন্তু "বৃষ্টির কারণ মেঘ" ইহা সেরূপ নহে;—ইহার বিপক্ষে কেহ বলিতে পারেন যে, "মেঘই তো বৃষ্টি—বৃষ্টিই বাষ্পীয় অবস্থায় মেঘ বলিয়া উক্ত হয়; মেঘকে বৃষ্টির কারণ বলিলে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, বৃষ্টিই বৃষ্টির কারণ; এই জন্য আমি বলি যে বৃষ্টির কারণ মেঘ নহে—যে শক্তি দ্বারা মেঘ ঘনীভূত হইয়া জলাকারে পরিণত হয় সেই শক্তিই বৃষ্টির কারণ কিন্তু সে শক্তি যে কি তাহা আমি জানি না।" কারণের নিয়ামকত্ব বা শক্তিমত্তা—এই যে একটি ভাব, ইহা আমরা আত্মা হইতে পাই—বহির্জ্জগতে আরোপ করি,—বহির্জ্জগতে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করি না; এই পর্য্যন্ত নিশ্চিত বলিতে পারি যে, ঘটনা মাত্রেরই কারণ আছেই আছে; কিন্তু সেই কারণত্ব যদি কোন বস্তু-বিশেষে (যেমন মেঘে) আরোপ করি তবে তাহাতে একটা অপ[illegible] স্থূল সিদ্ধান্ত-মাত্র আমাদের হস্তগত হয়। বৃত্তান্ত (fact) শুধু এই যে, মেঘ বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ,—সিদ্ধান্ত (rationale কিংবা theory) শুধু এই যে, মেঘ হইতে যে বৃষ্টি নিপাতিত হয় তাহার একটা কারণ আছেই আছে, কিন্তু "মেঘ বৃষ্টির কারণ" এ কেবল একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত। উপরি-উক্ত বৃত্তান্ত এবং মূলতত্ত্ব দুইকে এক সঙ্গে ব্যক্ত করিবার জন্য আমরা সাঁটে বলি যে, মেঘ বৃষ্টির কারণ,—ইহাই স্থূল তত্ত্ব। বৃষ্টির একটা কারণ আছে—ইহা আমরা নিশ্চিত জানি;—মে

বৃষ্টির কারণ—ইহা আমরা নিশ্চিত জানি না অথচ মনে করি তাহা আমরা নিশ্চিত জানি; ব্যবহার-কালে এরূপ মনে করাতে কোন হানির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তত্ত্ব-মীমাংসা-স্থলে ও-রূপ মনে করিলে চলিবে না,—এখানে স্পষ্ট কথা বলাই শ্রেয়,—এখানে এই বলা উচিত যে, বৃষ্টির কারণ আছেই আছে ইহা আমার নিকট সুব্যক্ত, বৃষ্টির কারণ কি—তাহা আমার নিকট অব্যক্ত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মূল তত্ত্বের একদিকে স্থূল তত্ত্ব, আর একদিকে পরতত্ত্ব,—মূলতত্ত্ব উভয়ের সন্ধি স্থলে; মূলতত্ত্ব এবং স্থূলতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়াছি,—এক্ষণে পরতত্ত্ব কিরূপ তাহার প্রতি প্রণিধান করা যাউক;—আকাশ এবং কাল এই দুইটি শূন্য উপাধি মূলতত্ত্ব-সকলের বিচরণ ক্ষেত্র, এবং আমাদের আত্মা সেই দুইটি উপাধির সহবর্ত্তী, এই জন্য আমাদের আত্মা সোপাধিক শব্দের বাচ্য। যদি ঐ দুইটি উপাধিকে ভাবনা-হইতে সরাইয়া ফেলা যায়, তবে কার্য্য-কারণাদি সমুদায় তত্ত্ব এক নিরুপাধিক জ্ঞান-তত্ত্বে পরিণত হয়; আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি এক ধী-শক্তিতে—সত্ত্ব-গুণে—পর্য্যবসিত হয়; আকাশের সহিত সমুদায় বাহ্য জগৎ এক জড় শক্তিতে বা আবরণ শক্তিতে (তমো-গুণে) পর্য্যবসিত হয়; কালের সহিত সমুদায় মানসিক জগৎ এক কল্পনা-শক্তিতে বা বি-ক্ষেপ শক্তিতে (রজো-গুণে) পর্য্যবসিত হয়; এবং তিনই এক অব্যক্ত ঐশী-শক্তিতে পর্য্য-বসিত হয়। পূর্ব্বোক্ত নিরুপাধিক বা নিরা-লম্ব জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া শেষোক্ত অব্যক্ত ঐশী-শক্তি দীপ্তি পায়—ইহাই পর-তত্ত্ব। মূলতত্ত্বের সহিত পরতত্ত্বের যে কিরূপ অবশ্যম্ভাবী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি;—

ঘটনা মাত্রেরই কারণ আছেই আছে—এ তত্ত্বে আমাদের জ্ঞানের প্রভাব স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে—কিন্তু সে কারণ যে, কি, তাহা আমাদের নিকট অব্যক্ত—ইহাতে আমাদের জ্ঞানের অভাব স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে;—কারণ যে কি তাহা আমাদের এই সোপাধিক জ্ঞানের নিকটেই অব্যক্ত; কিন্তু তাহা কি কোন জ্ঞানেই প্রকাশ নাই?—তাহা যদি হয় তবে সে কারণ "মূলেই নাই" এরূপ বলিবার কোন বাধা থাকে না; তবে আর "কারণ আছেই আছে" এই প্রবলতম নিশ্চয়তার অর্থ কি?—এ নিশ্চয়তা তবে ফাঁকি!—সত্য তবে মিথ্যা। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, "ত্রিশিরা মনুষ্য আছেই আছে, কিন্তু কোন-একটি ত্রিশিরা মনুষ্যই কাহারো জ্ঞানে প্রকাশ নাই, না আমার জ্ঞানে—না অন্যের জ্ঞানে—এমন কি ত্রিশিরা-মনুষ্যের নিজের জ্ঞানেও তাহা অপ্রকাশ, তবে এই নূতন সংবাদটি যে, কতদূর বিশ্বাস-যোগ্য, তাহা বুঝাই যাইতেছে! আত্মপ্রত্যয়ের কথা কি এইরূপ অমূলক? তাহা যদি হয় তবে অভ্রান্ত সত্যই অমূলক এইরূপ এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়; কেননা আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের নামই অভ্রান্ত সত্য। অতএব আমাদের সোপাধিক আত্মপ্রত্যয় নিরুপাধিক পূর্ণ জ্ঞানের উপরে—ঐশ্বরিক জ্ঞানের উপরে—প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ে আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না। যাঁহারা আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ তত্ত্বের সত্যতার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করেন তাঁহাদের প্রতি দর্শন-কারেরা এইরূপ বলেন

"মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং যে মানেন বুভুৎসন্তে।
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহা-সুধিয়ঃ॥"

প্রমাণকে প্রবোধিত করিতেছে যে মূল-জ্ঞান তাহাকে যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা জা-নিতে ইচ্ছা করেন, সেই মহা পণ্ডিতেরা কি করেন? না ইন্ধন-কাষ্ঠকে দহন করিবে যে অগ্নি সেই অগ্নিকে ইন্ধন-কাষ্ঠ দ্বারা

গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। অতএব আত্ম-প্রত্যয়ের সত্যতার উপরে কোন কথাই চলিতে পারে না; সেই আত্মপ্রত্যয়ের সত্যতা সর্ব্বমূলাধার নিরুপাধিক পূর্ণ জ্ঞানেরই পরিচয় প্রদান করে; কেননা আত্মপ্রত্যয়ের যে অংশটি অব্যক্ত সে অংশটি নিরুপাধিক পূর্ণ-জ্ঞানের নিকট ব্যক্ত না থাকিলে আত্মপ্রত্যয় সমূলে মিথ্যা হইয়া যায়—ইহা ইতি-পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি।

মোট কথা এই যে, মূলতত্ত্ব-সকলের নিভৃত নিলয়-স্বরূপ যে একটি স্বাধীন প্রদেশ মনুষ্যের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছে তাহাই জীবাত্মা-শব্দের বাচ্য; জীবাত্মার চারিদিকে মূলতত্ত্ব-সকলের জ্যোতি বিকীর্ণ রহিয়াছে এবং অব্যক্তের অন্ধকার সেই জ্যোতি টুকুর চারি দিক্ ঘিরিয়া রহিয়াছে;—মূলতত্ত্ব-সকল যেমন জীবাত্মার নিকট সুব্যক্ত তেমনি সমস্ত অব্যক্ত যাঁহার নিকটে সুব্যক্ত তিনিই পরমাত্মা। মূল-তত্ত্ব-সকল যেমন আমার নিকট সুব্যক্ত—সমস্ত জগৎ যদি তেমনি আমার নিকট সুব্যক্ত হইত তাহা হইলে এখন যেমন দেখিতেছি যে, আত্মা হইতে মূলতত্ত্ব-সকল স্ফুরিত হইতেছে, তখন তেমনি দেখিতাম যে, আত্মা হইতে সমস্ত জগৎ স্ফুরিত হইতেছে,—কিন্তু এরূপ সর্ব্বজ্ঞতা পরমাত্মারই ধর্ম্ম;—তাহার একটি আদর্শ জীবাত্মাতে আছে—এই মাত্র, কিন্তু তাহার লক্ষণ জীবাত্মাতে দৃষ্ট হইতে পারে না। আত্ম-প্রত্যয়ের জ্যোতি দ্বারা অব্যক্তকে গোটামুটি কতক-পরিমাণে ব্যক্ত করিয়া সেই জ্যোতি টুকুর মধ্যে যেমন জীবাত্মা বাস করিতেছে, সেইরূপ সমস্ত জগৎকে জ্ঞান-জ্যোতিতে সুব্যক্ত করিয়া সেই জ্যোতিতে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। আত্মপ্রত্যয় যেমন জীবাত্মার সহজ জ্ঞান—ও মূলতত্ত্ব-সকল যেমন সেই জ্ঞানের সম্যক্ আয়ত্তাধীন, সেইরূপ, সর্ব্বজ্ঞতা পরমাত্মার সহজ জ্ঞান ও সমস্ত জগৎ পরমাত্মার সম্যক্ আয়ত্তাধীন;—এই জন্য পূর্ব্বতন ঋষিরা বলিয়াছেন যে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ, পরমাত্মার জ্ঞান-ক্রিয়া এবং বল-ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে এই কয়টি বিষয় ব্যাখ্যাত হইল,—(১) বিষয়ের আবির্ভাব, (২) মনের ভাব, (৩) বুদ্ধির তত্ত্ব, (৪) আত্মার মূলতত্ত্ব (৫) অব্যক্তের বন্ধন, (৬) পরমাত্মার আদর্শ। বিষয়ের আবির্ভাবের মূলে যে বাহ্যেন্দ্রিয় বৃত্তির স্ফুরণ আবশ্যক হয়—ইতি পূর্ব্বে তাহা আমরা পৃথক্ রূপে নির্দ্দেশ করি নাই—এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। অব্যক্ত প্রকৃতির শক্তি-বিশেষ দ্বারা আমাদের বহিরিন্দ্রিয় উপরক্ত হইলে তাহারই উত্তেজনায় আবির্ভাবের উৎপত্তি হয়,—পরমাত্মার সহিত যেমন জীবাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ—অব্যক্তের সহিত সেইরূপ বহিরিন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ,—এই জন্য এই দুই সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার জন্য আর-কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। জীবাত্মার এক প্রান্তে অব্যক্তের শক্তি এবং আর-এক প্রান্তে পরমাত্মার আদর্শ,—উভয়ের মধ্যস্থলে ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন, বুদ্ধি এবং আত্মা, এই কয়টি পদার্থ উত্তরোত্তর ক্রমে অবস্থিত করে। সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া সাতটি আলোচ্য বিষয় দাঁড়াইতেছে (১) ইন্দ্রিয়ের উপরাগ, (২) বিষয়ের আবির্ভাব, (৩) মনের ভাব, (৪) বুদ্ধির তত্ত্ব, (৫) আত্মার মূলতত্ত্ব, (৬) অব্যক্তের বন্ধন, (৭) পরমাত্মার আদর্শ, এই কয়টি বিষয় কঠোপনিষদের একটি শ্লোক-সূত্রে আনুপূর্ব্বিক গ্রথিত রহিয়াছে, যথা,

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।

মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ॥

ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ, আত্মা হইতে অব্যক্ত (অর্থাৎ ঐশী শক্তি) শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ (অর্থাৎ পূর্ণ-জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা) শ্রেষ্ঠ—পুরুষের ঊর্দ্ধে আর কেহ নাই—তিনিই পারকাষ্ঠা তিনিই পরাগতি। এই শ্লোকের আদর্শে নিম্নস্থিত জ্ঞান-বৃক্ষটি বিরচিত ;—

ঊর্দ্ধমূলো অবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
(কঠোপনিষদ্ ৬ বল্লী)
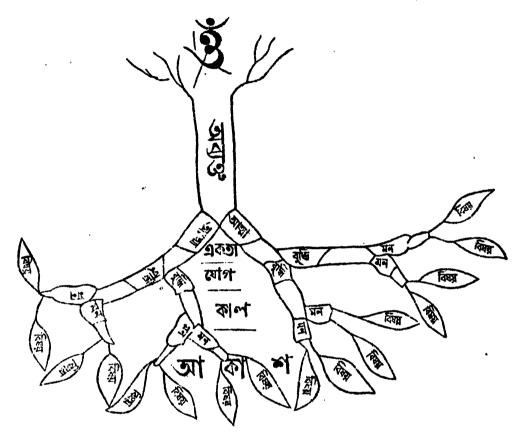
দুই আত্মা—অর্থাৎ জীবাত্মা অনেক সংখ্যক; প্রত্যেক আত্মার দুই দুই বুদ্ধি অর্থাৎ অনেক-সংখ্যক বুদ্ধি ; প্রত্যেক বুদ্ধির দুই দুই মন—অর্থাৎ অনেক সংখ্যক মন; এইখানটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক,—এক একটি বুদ্ধির তন্ত্রে—অনেকগুলি ভাব একত্ব-শৃঙ্খলে গ্রথিত থাকে, এবং প্রত্যেক ভাব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মানসিক ক্রিয়া-সাপেক্ষ; সুতরাং এক এক বুদ্ধি-বৃত্তির অধীনে অনেক-সংখ্যক মনোবৃত্তি নিযুক্ত থাকে; এই কথাটি সংক্ষেপে বলিতে গেলেই দাঁড়ায় যে, এক এক বুদ্ধির অনেক-সংখ্যক মন ; প্রত্যেক মনের দুই দুই বিষয় অর্থাৎ অনেক সংখ্যক বিষয় ; কেন না নানা ইন্দ্রিয়ের নানা বিষয় একই মনের অধীনে নিযুক্ত—মনোযোগ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ই প্রত্যক্ষ-সাধ্য নহে।

TRUE FAITH.

What is the supreme ambition of the servant of God? That of the courtier who wishes to stand nearer the steps of the throne. So, the supreme ambition of God's servant is to live nearer to his God. What is his most ardent desire—desire so strong that, by the side of it, other wishes fade into pale preferences, the thwarting of which brings no crushing disappointment? His ardent desire is to know in himself more and more of that higher life which means walking with God, union with God. He wants to feel bounding in his veins more and more of that life of God which

looked at in little bits is obedience, submission, patience, trust, hope, and which looked at in the lump may be called the life of faith.

Well—the servant of God, devoured by the ambition to creep a little nearer to his God, finds that misfortune is one of the best instruments for gratifying his ambition. He never passes thro' any severe misfortune, always supposing he takes it in the right way, without finding himself drawn a little bit nearer to the throne.

In the first place, without any effort of our will, the mere menace of misfortune is enough to send us instinctively to God if we are in any degree happily related to Him. We may sit rather loose to Him when all things go pleasantly, satisfied innocently satisfied up to a certain point, with the bright and busy life to which He has called us, but He may know that it is not good for us to dwell very long in this way, careless and secure. He may know that our souls are drying up for want of closer intercourse with Him; and so the note of alarm is sounded, which is in truth His call to us. You know the homely saying said they "can't stand beans." Well, in the spiritual world, this is true, probably, of the great majority of souls; they cannot stand beans, cannot stand the high feeding of perpetual prosperity, and God, in his mercy, sends them the low diet of anxiety and the medicine of downright misfortune, until it becomes a second nature with them to realise their need of Him. What a light this simple truth throws on the dark side of life. The simple truth that the immediate effect of anxiety, of sorrow, if we can presume in any sense to call ourselves servants of God, is to send us to God. "The high hills are a refuge for the wild goats, and so are the stony rocks for the conies." Those of you who have shot rabbits know what it is to see them after the first frightened pause hurry into the holes round which they have been feeding. Just in the same way do those who love God hurry at the first alarm into the shelter of His presence. Thus the evil thing that affrighted them has worked obviously for their good.

Passing on from these first and almost instinctive effects of misfortune, we come to the after processes worked out by God's servant, at first, perhaps, with toil and pain, but yielding afterwards consolation and even joy. Consumed by the desire to enter more thoroughly into the joys and privileges of the higher life, he turns all his misfortunes in to opportunities for exercising obedience, submission, patience, trust, hope; the wreck of his earthly palaces he converts into fuel for his faith. Ah! he has the magic shield from which every spear drops blunted to the ground. He has the true philosopher's stone, exceeding in its virtues the wizard's wildest dream, for with his stone he turns even the dross to gold. He has constant access to the crucible of God, and into that crucible he pours—

"The precious things whate'er they be
That haunt and vex him heart and brain,"

and lo! there comes out this crown, crown with the jewels clustering thick of obedience, submission, patience, trust, hope, and in the centre the fair, rare, jewel, joy.

Are not those jewels fair? Look at one or two of them. Look at submission for example. If some terrible loss or bodily suffering comes to one who is not a servant of God what are the natural results—results from which men have for ages tried in various ways to deliver themselves—are they not vexation, rage, despair? But if some terrible loss or bodily suffering comes to the servant of God these would not be the natural results—and why? Because the loss the suffering, has not really *come*, that in this case, is not the right way of putting it, *it has been sent*, sent by a Father, sent by a friend. We may be sorry that it has pleased Him to send us this which wrings our heart, or racks our frame, but there is little vexation, no rage, no despair. The wild man endures an apprenticeship of torture so that he may learn indifference to pain: the philosopher tries to teach himself that nothing matters, and is content to lose the pleasure of life if he may thereby escape the pain; but the servant of God need not, like the wild man, vaccinate himself for the desease of life, he need not, like the philosopher, seek to close up the avenues alike of joy and of woe, the good his Father sends him is enjoyed to the uttermost, enhanced by glad thankfulness, and when his Father sends sorrow he submits, and so comes the compensation for sorrow, the peace of God filling his heart and mind, and passing,

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

অনন্ত কোথায় ?

মহা ঘুম ঘোরে ছিল বিশ্ব ভুলে
সহসা কি ভাব এ'ল,
"অনন্ত কোথায় ?" প্রকৃতি মণ্ডলে
জিজ্ঞাসা পড়িয়া গেল।
দিগন্ত ব্যাপিয়া ছুটিল আকাশ
আসিতে বারতা ল'য়ে,
আপনার সীমা আপনি হারায়ে
রহিল নিঝুম হ'য়ে।
"ঐ আগে যায় ধরি ধরি" বলি'
মহাকাল প্রধাবিল,
যুগান্ত হইতে যুগান্ত অযুত
ঘুরিয়া, ফিরিয়া এ'ল।
রবি মনে কয় প্রখর কিরণে
দেখাব তাঁহার জ্যোতি,
চন্দ্র বলে তাঁর শোভা দেখাইব
ধরিয়া চাঁদের বাতি।
তাই শুনি' তারা অম্বর ছাইল,
বজ্র চমকিল মেঘে,
করিতে উদ্দেশ; পরাণের টানে
পবন ধাইল বেগে।
কোটি জিহ্বা ল'য়ে ধাইল অনল—
প্রপঞ্চ ভূতের ত্রাস।
কিন্তু ক্ষুদ্র এরা। অনন্তের পথে
যাইতে পাইল নাশ।
মহা নিরুৎসাহে প্রলয়ের কোলে
প্রকৃতি পড়িল যবে,
জ্ঞানের আলোক করিয়া বিকাশ
জীবাত্মা আইল তবে।
আপনার হিয়া আপনি চিরিয়া
ধরিল সবার আগে,
দেখিল জগৎ নিরাধার দেব
আত্মার অন্তর ভাগে।
আনন্দে তখন মহা উলুরব
উঠিল আকাশ ঘিরি,'
নিদ্রিত বিশ্বের হারান চেতনা
আইল আবার ফিরি'।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী বড়হংস সারঙ্গ তাল—চৌতাল।

(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ
তাঁর জগত-মন্দিরে।

অনাদি কাল অনন্ত গগন
সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন
আনন্দ নন্দ নন্দ রে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি,
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ
কত গীত কত ছন্দ রে।
বিহগগীত গগন ছায়,
জলদ গায়, জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায়
গাহে গিরি কন্দরে।
কতকত শত ভকত প্রাণ
হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম
টুটিছে মোহ বন্ধ রে।

রাগিণী আশাবরি—তাল ঝাঁপতাল।

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে।
সে আনন্দে উপবন, বিকসিত অনুক্ষণ,
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা কয়ে।
সে পুণ্য নির্ঝর স্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃত ধারা পূরিয়া হৃদয় প্রাণ।
তোমরা এসেছ তীরে, শূন্য কি যাইবে ফিরে,
শেষে কি নয়ন নীরে ডুবিবে তৃষিত হ'য়ে।
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।
সে আনন্দ রস পানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে,
দহেনা সংসার তাপ সংসার মাঝারে র'য়ে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৬ আশ্বিন রবিবার ৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উপদেশটি আপামর সাধারণ সকল লোকেরই মনে গ্রথিত হওয়া কর্ত্তব্য যে, "ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং" ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না। ধর্ম্ম উপদেশ দেওয়া—ধর্ম্ম প্রচার করা কঠিন নহে, ধর্ম্ম পালন করাই কঠিন; কিন্তু পূর্ব্বতন ঋষিরা বলিয়াছেন "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধু স্বরূপ; ধর্ম্ম এক দিকে যেমন কঠোর আর এক দিকে তেমনি মধুর।

প্রথম পক্ষে ধর্ম্ম অতীব কঠোর। আমাদের দেশের দর্শনকারেরা বলেন "নোদনালক্ষণোধর্ম্মঃ;" নোদনা—কিনা বিধির প্রবর্ত্তনা; বিধির প্রবর্ত্তনা অনুসারে কার্য্য করার নামই ধর্ম্ম-সাধন,—অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিবর্জ্জন। জর্ম্মন দেশীয় দর্শনকারেরা ধর্ম্মের এইরূপ লক্ষণ করেন যে,—ধর্ম্ম কি? না দ্বিধাবর্জ্জিত দ্বিরুক্তিবর্জ্জিত অনুশাসন—নোদনাশব্দের তাৎপর্য্যও ঠিক তাই। নোদনা কিম্বা দ্বিধাবর্জ্জিত অনুশাসন কাহাকে বলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে হইলে এইটির প্রতি প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে, মনুষ্য মাত্রই দেশকাল-অবস্থা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, আর, প্রত্যেক দেশকাল অবস্থায় তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য একটি মাত্র—অকর্ত্তব্য কার্য্য অসংখ্য; সমস্ত অকর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই কর্ত্তব্য কার্য্যটি অনুষ্ঠান করাই ধর্ম্ম; ও যে আধ্যাত্মিক বল দ্বারা সেই কার্য্যটি অনুষ্ঠিত হয় তাহারই নাম নোদনা, তাহারই নাম দ্বিধাবর্জ্জিত দ্বিরুক্তি-বর্জ্জিত অনুশাসন। ভৌতিক বিজ্ঞান বলে যে, অবাধিত গতি মাত্রই সরল-পথ অবলম্বন করে, ও যে-গতি বক্র পথ অবলম্বন করে তাহা বল-বিশেষ দ্বারা বাধিত বা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই সেরূপ করে, আরও বলে যে; দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী সরল পথ একটি মাত্র কিন্তু বক্র-পথ অসংখ্য; ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে, যে, অবাধিত আত্মার অবলম্বনীয় পথই ধর্ম্মের

পথ; আর এই যে, দেশ কাল অবস্থার সীমাভ্যন্তরে সেই ধর্ম্মের পথ—কর্ত্তব্যের পথ—একটি মাত্র—অকর্ত্তব্যের পথ অসংখ্য; সেই অসংখ্য অকর্ত্তব্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই একটি কর্ত্তব্যের পথ অবলম্বন করিতে হইবে—কি কঠিন কার্য্য। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি" কবিরা বলেন যে, সে পথ শাণিত ক্ষুর-ধারের ন্যায় দুর্গম। কিন্তু এই পথকে লক্ষ্য করিয়াই আবার ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়াছেন "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু," ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধু-স্বরূপ। দুই কথারই অর্থ আছে—দুই কথার কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে। যাঁহারা ধর্ম্মের কঠোরতার প্রতি উপেক্ষা করিয়া শুদ্ধ কেবল ধর্ম্মের মাধুর্য্যের প্রতিই মনোনিবেশ করেন—তাঁহারা পথের বিঘ্ন বিপত্তির সহিত সংগ্রামের জন্য পূর্ব্ব-হইতে প্রস্তুত থাকেন না—এই জন্য তাঁহারা শীঘ্রই পরাভব প্রাপ্ত হ'ন; আবার, যাঁহারা ধর্ম্মের মাধুর্য্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া শুদ্ধ কেবল কঠোরতার প্রতিই মনোনিবেশ করেন, তাঁহারা ধর্ম্মকে ব্যাঘ্র ভল্লুকের মত দেখেন সুতরাং তাঁহাকে তাঁহারা দূর হইতেই পরিত্যাগ করেন। অতএব সাধকের ইহা জানা উচিত যে, পদ্মের মৃণাল যেরূপ কণ্টকময় ও তাহার পুষ্প যেরূপ মধুময়, সেই রূপ ধর্ম্মের অঙ্কুর কণ্টকময় কিন্তু তাহার ফল মধুময়; আরো জানা উচিত যে, কঠোরতা ধর্ম্মের বাহ্য লক্ষণ—মাধুর্য্য তাহার আন্তরিক লক্ষণ। ধর্ম্মের অঙ্কুর কি? না তপস্যা ও সাধনা—ইহা কণ্টকময়;—ধর্ম্মের ফল কি? না ইহা মধুময়। এই আত্ম-প্রসাদের মাধুর্য্যই ধর্ম্মের আন্তরিক লক্ষণ—তপস্যা ও সাধনার ক্লেশ তাহার বাহ্য লক্ষণ; কেননা বাহিরের বাধা মোচনার্থেই তপস্যা ও সাধনার ক্লেশ স্বীকার করা আবশ্যক হয়; পরন্তু, আত্মার আভ্যন্তরিক স্ফূর্ত্তিই আত্মপ্রসাদের প্রস্রবণ।

আত্মপ্রসাদের মূল অন্বেষণ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাই আত্ম-প্রসাদের মূল। ধর্ম্মের ভিত্তিমূল আত্ম-প্রভাব; আত্ম-প্রভাব পরিস্ফুট হইলে পরমাত্মা হইতে আত্মাতে যে প্রসাদ-বারি অবতীর্ণ হয় তাহাই আত্ম-প্রসাদ। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তি আপনি আপনাকে সাহায্য করে, ঈশ্বর তাহাকে সাহায্য করেন, ইহারও ঐ অর্থ; আত্ম-প্রভাবই দেব-প্রসাদ আকর্ষণ করে,—আত্ম-প্রভাবই আত্ম-প্রসাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র; আত্মপ্রভাবরূপ ক্ষেত্রে আত্মপ্রসাদ রূপ বারি নিপতিত হইয়া ধর্ম্মের মধুময় ফল উৎপাদন করে।

আর একদিকে দেখা যায় যে, যেমন বর্ষার বারি নিপতিত হইলে বীজ অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রসাদ অবতীর্ণ হইলে আত্মার প্রভাব অঙ্কুরিত হয়; অতএব ঈশ্বরের প্রসাদ প্রার্থনা করিয়া ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হওয়া ধর্ম্মসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ। ঈশ্বরের প্রসাদই ধর্ম্ম-পথের পাথেয় সম্বল। ইউরোপে এককালে এইরূপ এক বীরধর্ম্ম প্রচলিত ছিল যে, বীর-পুরুষেরা স্ব স্ব প্রেয়সীর প্রীতি-কামনায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে স্ব স্ব প্রেয়সীকে ধ্যান করিয়া তাহাদের প্রসাদ যাচ্ঞা করিতেন, এ সকল প্রথার অর্থ আর কিছু নহে—আধ্যাত্মিক ঈশ্বরোপাসনায় যাঁহারা অক্ষম, তাঁহারা পার্থিব প্রেমের পাত্রকে ঈশ্বরের স্থানাভিষিক্ত করিয়া এক বস্তুর বাসনা আর এক বস্তু দ্বারা পূরণ করেন। ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য যে, তিনি প্রকৃত ঈশ্বরের প্রসাদ

যাচ্ঞা করিয়া ধর্ম্মের দুর্গম পথে দিন দিন অগ্রসর হ'ন,—ক্রমে যখন সেই দুর্গম পথ তাঁহার নিকট সুগম হইয়া যাইবে, তখন তিনি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বলিতে পারিবেন "ধর্ম্মঃসর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।"

ধর্ম্মসাধন দ্বারা আত্মার আধ্যাত্মিক বল—তপোবল—পরিস্ফুট হয়, যে বল দ্বারা বিষয়ের প্রতিকূল স্রোতে আত্মা অটল থাকিয়া আত্মপ্রসাদে পরিপ্লুত হয়—যে বল ইহকাল পরকাল সকল কালেরই অমোঘ সহায়—সেই দেব-স্পৃহনীয় প্রশান্ত অক্ষুব্ধ বল আত্মাতে আবির্ভূত হয়; সে বল শারীরিক বল নহে যে আজ আছে কাল নাই; তাহা মানসিক বল নহে যে, শ্রমে শ্রান্ত হইবে; সমস্ত জগৎ যেরূপ বলে চলিতেছে, তাহা সেই রূপ অপরাজিত অক্ষুব্ধ প্রশান্ত বল; কালিদাস বলিয়াছেন,

"ভানুঃ সকৃদ্‌যুক্ততুরঙ্গ এব,
রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রযাতি,
শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ,
ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম্ম এষঃ।"

সূর্য্যের রথে একবার মাত্র অশ্ব যোজিত হইয়াছে, রাত্রিদিন গন্ধবহ চলিতেছে, বাসুকি নিয়তই ভূমিভারে আক্রান্ত রহিয়াছে, রাজাদেরও এইরূপ ধর্ম্ম। শুধু কেবল রাজাদের নহে,—যে কেহ ধর্ম্ম-ব্রতে ব্রতী তাঁহারই ঐরূপ ধর্ম্ম। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অধর্ম্মের বক্র পথ অসংখ্য কিন্তু ধর্ম্মের পথ একটি-মাত্র সরল পথ;—সেই পথই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। আমরা সেই পথে চলিলেই ঈশ্বরের অপরাজিত শক্তি—সমুদায় প্রকৃতি—আমাদের সহায় হয়, আমাদের যত কিছু শক্তির অভাব সমস্তই ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা পূরিত হয়। যিনি যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত একতানে মিলিত হয়, সমুদায় প্রকৃতির আন্তরিক মঙ্গল-চেষ্টার সহিত তাঁহার চেষ্টা একতানে মিলিত হয়; এইরূপ যোগের প্রভাবে সাধু ব্যক্তির আত্মার অভ্যন্তরে এরূপ এক আনন্দের উৎস খুলিয়া যায় যে, ধর্ম্ম-সাধনের কষ্ট আর তাঁহার নিকট কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না; ধর্ম্ম তাঁহার নিকট মধু-স্বরূপ হয়। ধর্ম্ম দ্বারা তখন তিনি ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হ'ন—

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ,
যস্মিন্ স্থিতে ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।"

যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে কোন লাভই তাহা হইতে অধিক মনে হয় না—যাঁহাতে অবস্থিতি করিলে গুরু দুঃখেও মনুষ্য বিচালিত হয় না।

নানা পথের মধ্যে কোন্‌টি ধর্ম্মের পথ তাহা চিনিয়া লওয়া কখন কখন কঠিন হইয়া পড়ে। আমাদের দুই দিক্ দিয়া দুই প্রকারের বক্র পথ প্রসারিত রহিয়াছে—বাম দিক্ দিয়া নিরুৎসাহ আলস্য অনবধানতা হতশ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়-পরতা এই সকল পথ চলিয়াছে—শাস্ত্র-কারেরা এই সকল পথ তামসিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন,—ডাহিন দিক দিয়া ঔদ্ধত্য গর্ব্ব অহঙ্কার আত্মাভিমান স্বার্থপরতা ক্ষমাহীনতা বল-দর্প এই সকল পথ চলিয়াছে,—শাস্ত্রকারেরা এই সকল পথ রাজসিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এ দুই প্রকার পথের মাঝ-খান দিয়া সত্যের, আত্মপ্রসাদের, এবং মঙ্গলের একটি সরল পথ প্রসারিত রহিয়াছে—শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই সাত্ত্বিক নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—তাহাই ধর্ম্মের পথ। তামসিক পথের নিরুৎসাহ কখন কখন ধর্ম্ম-পথের শান্তির মত ভান করে—রাজসিক পথের ঔদ্ধত্যও কখন কখন ধর্ম্মপথের উৎসাহের মত ভান করে—সাধককে দুই দিক্ বাঁচাইয়া চলিতে হয়; তামসিক ইন্দ্রিয়পরতা কখন কখন ধর্ম্ম-পথের প্রেমের ভান করে, রাজসিক স্বার্থ-পরতা

কখন কখন ধর্ম্ম-পথের আত্মনির্ভরের ভান করে—এ দুই দিকও বাঁচাইয়া চলিতে হয়; ধর্ম্মের সরল মধ্য-পথের ঠিকানা পাইতে হইলে তাহার প্রধান উপায় এই যে ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা আত্মাকে সরল নম্র ও প্রশান্ত করা—তাহা হইলেই ধর্ম্মের সরল ও সূক্ষ্ম পথ সহজে আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইবে; বীণা-যন্ত্রের সুর বাঁধিলে তাহা হইতে যেমন সহজেই সুস্বর নিষ্ক্রান্ত হয়, তেমনি পরমাত্মার সহিত আত্মা একতান হইলে, আত্মা আপনাপনি সাত্ত্বিক ধর্ম্ম-পথে উন্মুখ হয়, শ্রদ্ধা ভক্তি উৎসাহ দয়া-দাক্ষিণ্য ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণের বীজ আপনা-আপনি অঙ্কুরিত হইয়া উঠে।

হে পরমাত্মন্ আমরা মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া সংসার-সাগরে ইতস্ততঃ নীয়মান হইতেছি—তোমার অভয় মঙ্গল-মূর্ত্তিই আমাদের সমস্ত আশা ভরসা। তুমি আমাদিগকে কোন কালেই পরিত্যাগ কর না—আমরা আমাদের আপনাদের দোষে তোমা হইতে দূরে পড়িয়া অসহায় শিশুর ন্যায় চারিদিকে বিভীষিকা দর্শন করি; মাতার ন্যায় তুমি আমাদিগকে দেখা দিয়া আমাদের ভয়তাপ নিবারণ কর—পিতার ন্যায় তুমি আমাদিগকে মঙ্গলময় ধর্ম্মের পথ প্রদর্শন কর—যাহাতে আমরা চির জীবন তোমাকে হৃদয়ে পাইয়া অক্ষয় ধনে ধনী হই; তোমার প্রেমরসে মগ্ন থাকিয়া যাহাতে আমরা সংসারের সকল দুঃখতাপ বিস্মৃত হই—আমাদের প্রতি সেইরূপ করুণা বিতরণ কর!—তোমার করুণা আমাদের সকল পাপের মহৌষধি—সকল তাপের শান্তিবারি—অমৃতের একমাত্র প্রস্রবণ; আমাদের ব্যাকুল হৃদয় তোমাকে পাইলেই শান্তি পায়—তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সমস্ত পাপ-তাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আত্মার অনন্ত জীবন।

পরমাত্মা জীবাত্মার প্রতিষ্ঠা। পরমাত্মাতে জীবাত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেম লাভ করিতেছে এবং নিত্যকাল তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। জীবাত্মা পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মনুষ্য-শরীর গ্রহণ করিয়া এখানে ভূমিষ্ঠ হয় এবং মৃত্যুকালে পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শরীরকে পরিত্যাগ করে। যেমন পৃথিবীর সহিত শরীরের আকর্ষণ, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সেই প্রকার আকর্ষণ। শরীর যেমন মৃত্যু হইলে পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকে, আত্মা তেমনি পরমাত্মাতেই অবস্থিতি করে। আত্মা জীবনে মরণে, ইহলোকে পরলোকে,কোথাও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। জীবাত্মার প্রতিষ্ঠা পরমাত্মা, তাহার যন্ত্র শরীর এবং তাহার কর্ম্ম-ক্ষেত্র সংসার। জীবাত্মা যে শরীরে, যে ক্ষেত্রে যেরূপ জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেম লাভ করিবে, সে শরীর, সে ক্ষেত্র পরিত্যাগের পর সেই লব্ধ জ্ঞান ধর্ম্ম ও প্রেমের অনুসারে আবার অন্য উন্নত শরীর ও উন্নত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইবে। যেমন কাল-স্রোতের বেগে শিশু যৌবনে, যুবা বার্দ্ধক্যে ধারাবাহিক রূপে উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ আত্মার ঐহিক জীবন পারত্রিক জীবনে উত্তীর্ণ হইবে। আত্মা যখন যে লোকে যে জীবন প্রাপ্ত হয়; সেই জীবন তাহার সেই লোকের ঐহিক জীবন। যেমন গর্ভাশয় হইতে পৃথিবীতে আগমন, সেইরূপ পৃথিবী হইতে পরলোকে গমন, এই দুইটি স্বাভাবিক কার্য্যের একটি জন্ম আর একটি মৃত্যু শব্দের বাচ্য হইয়া থাকে। জন্ম যেমন গর্ভস্থ শিশুর জীবন বিনাশ করিয়া তাহাকে আর এক নূতন জীবন দেয় না, বরং জন্ম দ্বারা সেই গর্ভস্থ জীবনই এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া আরো বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ

মৃত্যু আত্মার পৃথিবীস্থ জীবন বিনাশ করিয়া নূতন জীবন উৎপন্ন করে না কিন্তু সেই ঘটনাতে সেই জীবনই লোকান্তরে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
এবং শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর ধারণ করে।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তি-মূল।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তি-মূল দুই জাতীয়—আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহাসিক, দুইই যা'র পর নাই দৃঢ়। (১) আধ্যাত্মিক ভিত্তি-মূল কি? না পরমাত্মার সহিত আত্মার সম্বন্ধ। (২) ঐতিহাসিক ভিত্তি-মূল কি? না আমাদের দেশের পুরাতন কালের সহিত বর্ত্তমান কালের সম্বন্ধ।

প্রথম, আধ্যাত্মিক ভিত্তি মূল। পিতা পুত্রের সম্বন্ধ হইতে যেমন পাওয়া যায় যে, পিতার প্রতি ভক্তি-ভাবই পুত্রোচিত ভাব এবং পিতার প্রিয়-কার্য্য-সাধনই পুত্রোচিত কার্য্য,—আত্মা পরমাত্মা'র সম্বন্ধ হইতে সেই রূপ পাওয়া যায় যে, পরমাত্মার প্রতি প্রীতি-ভাবই মনুষ্যোচিত ভাব এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করাই মনুষ্যোচিত কার্য্য; এই মনুষ্যোচিত ভাব এবং কার্য্য ঈশ্বরোপাসনা বলিয়া উক্ত হয়। হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রেম উদ্দীপন করিবার জন্য ঈশ্বরারাধনা আবশ্যক, এবং ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য-সাধন করিবার জন্য যত্নপূর্ব্বক সদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক;—দেশীয় সহজ ভাষায় এই দুই কার্য্য ভজন এবং সাধন বলিয়া উক্ত হয়,—দুইই ঈশ্বরোপাসনা। ভজন ব্যতিরেকেও ঈশ্বরোপাসনা অঙ্গহীন হয়, সাধন-ব্যতিরেকেও ঈশ্বরোপাসনা অঙ্গহীন হয়,—দুয়ের যোগেই ঈশ্বরোপাসনা সর্ব্বাঙ্গীণ হয়।

ঈশ্বরের নাম জপ—ঈশ্বরের স্তুতি-পাঠ-ঈশ্বরের মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তন—ঈশ্বরের নিকট প্রসাদ যাচ্ঞা—এই রূপ—দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ঈশ্বরারাধনার নানা উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। কখনও বা অনেক গুলি উপায় এক সঙ্গে অবলম্বিত হয়, কখনও বা এটি, কখনও বা ওটি; যেটি যখন উপযোগী—যেটি যে স্থানে উপযোগী—যেটি যাহার উপযোগী—সেই কালে এবং সেই স্থানে সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক সেইটি অবলম্বিত হয়;—যাহাই হউক্ না কেন—ঈশ্বর-প্রীতিই ঈশ্বরারাধনার সার-কথা। বিষয়ীর উপাসনা প্রীতি-প্রধান নহে—বিষয়ীর স্তব স্তুতি স্তুতিকারীর মনের কথা নহে,—স্তুতিকারীর মনের কথা শুধু—বাক্যের বিনিময়ে অর্থের উপার্জ্জন, কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা প্রীতি-প্রধান—ঈশ্বরের স্তব-স্তুতি স্তুতিকারীর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস—কথার বাণিজ্য নহে;—কে এমন নির্ব্বোধ যে, ঈশ্বরকে কথায় ভুলাইবার জন্য তাঁহাকে মহৎ হইতে মহৎ পরাৎপর পরম ব্রহ্ম বলিয়া সম্বোধন করিবে। যাঁহারা ঈশ্বরকে স্তুতি-বাক্যে সম্বোধন করেন—তাঁহারা আপনাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া ঈশ্বরকে ডাকেন—এই পর্য্যন্ত,—ঈশ্বরকে কথায় সন্তুষ্ট করিবার জন্য ওরূপ করেন না; আরাধকের মন প্রথমে কথার সাহায্য গ্রহণ করে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবার সময় কথাকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখে। ঈশ্বরোপাসনার একটি অঙ্গ ঈশ্বরের আরাধনা, আর একটি অঙ্গ ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য সাধন। ঈশ্বরের

প্রিয়-কার্য্য-সাধন কি? না মঙ্গল-সাধন। মঙ্গল-সাধন দুই জাতীয়—(১) আপনার মঙ্গল-সাধন এবং (২) লোকের মঙ্গল-সাধন; আপনার মঙ্গল-সাধন কিসে হয়? না প্রবৃত্তি সকলকে আত্মার অধীনে নিয়োগ করায়; লোকের মঙ্গল-সাধন কিসে হয়? না আপনার এবং অন্যের আত্মাকে পরমাত্মার অধীনে নিয়োগ করায়; এখানে ইহা বলা বাহুল্য যে, ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আপনার মঙ্গল সাধন করিলেও লোকের মঙ্গল সাধন করা হয়, লোকের মঙ্গল সাধন করিলেও আপনার মঙ্গল সাধন করা হয়; কেননা ঈশ্বরের অধিষ্ঠান-প্রভাবে সকল লোকই এক অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মঙ্গল সাধন করিলে তাহা স্বার্থ-সাধন হইয়া উঠে, হয় আপনার স্বার্থ-সাধন—নয় অন্যের স্বার্থ-সাধন;—কিন্তু আপনার ও অন্যের স্বার্থ-সাধনের মধ্যে যে এক মহান্ পরমার্থ প্রচ্ছন্ন আছে—মঙ্গল প্রচ্ছন্ন আছে—ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন আছে—ওরূপ লক্ষ্যহীন সাধনে তাহা প্রচ্ছন্নই থাকিয়া যায়; কাহার নিকট তাহা প্রচ্ছন্ন থাকে না? যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আপনার এবং অন্যের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হ'ন—তাঁহারই নিকট। ভজনাতে যেমন ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, সাধনাতে সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক;—যাঁহারা সূর্য্যের উপাসক তাঁহারা নবোদিত সূর্য্যকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করিয়া প্রীতি ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা করেন, এবং দিবাভাগে তাঁহারা যে-কোন কার্য্য করেন তাহা তাঁহাদের উপাস্য দেবতার আলোকেই নিষ্পাদন করেন; পরমাত্মার উপাসক সেইরূপ আত্মার নিভৃত নিকেতনে—আধ্যাত্মিক দেবালয়ে—পরমাত্মাকে প্রীতির সহিত আরাধনা করেন; এবং তাঁহার প্রসাদ-জ্যোতিতেই সংসারের মঙ্গল পথে বিচরণ করেন। এইরূপ ঈশ্বরোপাসনাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভিত্তি মূল। এখন, ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐতিহাসিক ভিত্তি-মূল কিরূপ তাহা দেখা যা'ক্:—

পরমাত্মার সহিত আত্মার সম্বন্ধ যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভিত্তি-মূল, সেইরূপ আমাদের দেশের পুরাতন-কালের সহিত বর্ত্তমান কালের সম্বন্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐতিহাসিক ভিত্তি-মূল। পরমাত্মার সহিত আত্মার সম্বন্ধ হইতে যেরূপ ঈশ্বরোপাসনা ব্রাহ্মের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ আমাদের দেশের পুরাতন কালের সহিত বর্ত্তমান কালের সম্বন্ধ হইতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রন্থ ভারতবর্ষে অঙ্কুরিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত,—প্রথম খণ্ড ঈশ্বরাধনার উদ্দীপক—দ্বিতীয় খণ্ড ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের প্রবর্ত্তক,—সমগ্র গ্রন্থ ঈশ্বরোপাসনার অবলম্বন। এই জন্য ঈশ্বরোপাসনাকে যেমন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভিত্তি-মূল বলা যাইতে পারে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকে সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐতিহাসিক ভিত্তি-মূল বলা যাইতে পারে।

জীব-রাজ্যে বৈজ্ঞানিকেরা দুইরূপ নিয়মের আধিপত্য দেখিয়াছেন—(১) আনুপূর্ব্বিকতার নিয়ম, এবং (২) আনুষঙ্গিকতার নিয়ম। ব্রাহ্মধর্ম্মের অবতারণাতেও সেই দুই রূপ নিয়মের কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়;—আনুপূর্ব্বিকতার নিয়ম হইতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ যে ফল, তাহা উপনিষদ্‌রূপ বীজেরই ফল। কেমন করিয়া উপনিষদ্‌রূপ বীজের প্রভাব হিন্দুধর্ম্মের শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্পের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ ফলে পরিণত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান দ্বারা আবিষ্কার করা একজন সুনিপুণ

ইতিহাসবেত্তার কার্য্য সুতরাং এখানে তাহার কিঞ্চিৎমাত্র আভাস প্রদর্শন ভিন্ন অধিক কিছুই প্রত্যাশিত হইতে পারে না। ইহা অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, উপনিষদ্‌ই রূপক-পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন হইয়া পৌরাণিক বেশে আবির্ভূত হইয়াছিল। পুরাণ প্রথমে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপিণী ঐশী শক্তিকে তিন পৃথক্‌ ধারায় বিভক্ত করিয়া ঈশ্বরকে তিনেরই অধিদেবতা রূপে অবধারণ করিয়াছিলেন,—ক্রমে সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয় রূপ তিনটি ক্রিয়া-ভেদের অনুযায়ী তিনটি পুরুষ-ভেদ কল্পনা করিলেন—তাহাতেই ব্রহ্মা হইলেন সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু হইলেন পালনকর্ত্তা, রুদ্র হইলেন সংহারকর্ত্তা। রূপকের কালে রূপক শোভা পাইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান কাল রূপকের কাল নহে ইহা বলা বাহুল্য। বর্ত্তমান কাল বিশিষ্ট রূপে বিজ্ঞানের কাল,—পূর্ব্ব কালে বিজ্ঞান অপেক্ষা কাব্যের প্রাধান্য ছিল—বর্ত্তমান কালে কাব্য অপেক্ষা বিজ্ঞানের প্রাধান্য সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়;—এ জন্য পুরাণ আর এখন লোকের মনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, এখন আর চাকচিক্যে লোকে সন্তুষ্ট হয় না—এখন খাঁটি সুবর্ণকেই লোকে সুবর্ণ জ্ঞান করে; এখন, অগ্নি-পরীক্ষায় যাহা টেঁকে তাহাতেই লোকের আস্থা জন্মে, আড়ম্বর দেখিয়া লোকে তত ভোলে না—যদি ভোলে সে অতি অল্প কালেরই জন্য;—ভ্রান্ত ব্যক্তির শীঘ্রই চটক ভাঙিয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আনুপূর্ব্বিকতার নিয়ম হইতে আসিতেছে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদ্‌ রূপ বীজের ফল স্বরূপ এক্ষণে বক্তব্য যে, আনুষঙ্গিকতার নিয়ম হইতে আসিতেছে যে, উপনিষদ্‌ শাস্ত্র বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ ফলে পরিণত হইয়াছে।

তিন কালের আলোচনা পদ্ধতি তিন রূপ, (১) অত্যন্ত পুরাকালের পদ্ধতি—আনুমানিক পদ্ধতি, (২) মধ্যম কালের পদ্ধতি—ঔপমানিক পদ্ধতি, (৩) আধুনিক পদ্ধতি—প্রামাণিক পদ্ধতি। যেমন দেখা যায় যে, মুলস্থিত বীজের সহিত অন্তস্থিত শস্যের মিল আছে কিন্তু মধ্যস্থিত শাখা-প্রশাখার মিল নাই, সেইরূপ দেখা যায় যে, মুলস্থিত আনুমানিক পদ্ধতির সহিত অন্তস্থিত প্রামাণিক পদ্ধতির মিল আছে কিন্তু মধ্যস্থিত ঔপমানিক পদ্ধতির মিল নাই। নিষ্পাপ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের অনুমান—প্রমাণের অনেক কাছাকাছি যায়, কিন্তু সেই অনুমানকে নানাবিধ উপমা-ভারে—জটিল রূপক-ভারে—আক্রান্ত করিলে তাহা প্রমাণ হইতে অনেক দূরে পড়িয়া যায়, পরে সেই সকল অনুমানকে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সত্য দ্বারা পরিপুষ্ট করিলে তাহা প্রমাণ-রূপে পরিণত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদ্‌ হইতে সেই সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহা উপমালঙ্কারে জড়িত নহে—ও যাহা বৈজ্ঞানিক সত্যের অবিরোধী; ইহাতে আনুপূর্ব্বিকতার নিয়ম এবং আনুষঙ্গিকতার নিয়ম দুইই সুন্দর রূপে রক্ষিত হইয়াছে।

যে কোন মঙ্গল কার্য্য আনুপূর্ব্বিকতা এবং আনুষঙ্গিকতা এই দুই নিয়মের উপরে রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা যথোচিত স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। আনুপূর্ব্বিক—কিনা পূর্ব্বের অনুযায়ী,—পুত্রের যেমন পৈতৃক আচার-ব্যবহার; আনুষঙ্গিক—কিনা সঙ্গের অনুযায়ী,—সহবাসীর যেমন সংসর্গের অনুরূপ আচার-ব্যবহার; দুইই প্রকৃতির নিয়ম। এই দুই প্রকৃতির নিয়মকে এক সঙ্গে রক্ষা করিয়া যে-কোন মঙ্গল-কার্য্য অনুষ্ঠান করা যায়—তাহাকে আনুশেষিক বলা যাইতে পারে; আনুশেষিক—কিনা চরমের অনুযায়ী

—অর্থাৎ চরমে যাহাতে ফল ফলে—শেষ পর্য্যন্ত যাহা টেঁকে।'

"সুচিন্তা চোক্তং সুবিচার্য্য যৎ কৃতং
সুদীর্ঘকালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াং"

যদ্রূপে চিন্তা করিয়া যাহা বলা হয়, আর, উত্তম-রূপে বিচার করিয়া যাহা করা হয় —সুদীর্ঘ কালেও তাহার বিপর্য্যয় ঘটে না। উত্তম রূপে চিন্তা করিতে হইলেই পূর্ব্বাপর চিন্তা করিতে হয়—ও বর্ত্তমানের চারিদিক চিন্তা করিতে হয়,—উত্তম-রূপে বিচার করিতে হইলেই অগ্র পশ্চাৎ নিরীক্ষণ করিতে হয় ও চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে হয়,—আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এবং আনুসঙ্গিক বিবরণ—দুইই নিরীক্ষণ করিতে হয়;—আনুপূর্ব্বিক এবং আনুসঙ্গিক দুইকে বাঁচাইয়া কার্য্য করিবার নিয়মকে আমরা বলি—আনুশেষিকতার নিয়ম। (১) পূর্ব্বকালের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলা—আনুপূর্ব্বিক পদ্ধতি, (২) বর্ত্তমান কালের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলা—আনুষঙ্গিক পদ্ধতি, (৩) দুইই যথাবিধি রক্ষা করিয়া চলা—আনুশেষিক পদ্ধতি;—আমরা যদি প্রথম পদ্ধতি অবহেলা করি তবে আমরা পৈতৃক ধন হইতে—মূল ধন হইতে—বঞ্চিত হই,—যদি আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতি অবহেলা করি তবে আমরা সেই ধনের সুব্যবহার-জনিত লভ্য অথবা উপস্বত্ব হইতে বঞ্চিত হই; অতএব দুইই যথাবিধি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য—আনুশেষিক পদ্ধতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। বিশেষ বিশেষ মনুষ্য-সমাজ একই সময়ে সকল মঙ্গল আয়ত্ত করিতে পারে না—বিশেষ বিশেষ কালে বিশেষ বিশেষ মঙ্গল-সোপানে উপনীত হয়,—এ জন্য নানা কালের নানা মঙ্গল হইতে সার মঙ্গল বাছিয়া লওয়া এক এক সময়ে এক এক জাতির আবশ্যক হইয়া উঠে; পুরাতন-কাল হইতে নূতন-কাল পর্য্যন্ত যে মঙ্গল-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে তাহার মধ্য হইতে বর্ত্তমান কালোচিত সার সংগ্রহ করিলে—সেই সকল রত্ন পাওয়া যায় যাহা এ যাবৎকাল কাল-স্রোতে অবিধ্বস্ত রহিয়াছে—ভবিষ্যতেও অবিধ্বস্ত থাকিবে;—এইরূপ সার সংগ্রহ করাকেই আমরা বলি—আনুশেষিক পদ্ধতি। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ এইরূপ আনুশেষিক পদ্ধতির একটি অমূল্য ফল, ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐতিহাসিক ভিত্তিমূল।

প্রতিবাদ।

মনু ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান ব্যবহার শাস্ত্র। প্রসিদ্ধি আছে, মন্বর্থবিপরীত, অন্য স্মৃতির প্রামাণিকতা নাই। ফলতঃ এই গ্রন্থে মনুষ্য-জীবনের অপরিহার্য্য এমন অনেক ব্যবস্থা আছে, যাহার মূল সত্যে প্রতিষ্ঠিত। যুগযুগান্তরের ঘোর বিপ্লবেও তাহা বিপর্য্যস্ত হইবার নহে। এই ব্যবহার শাস্ত্র চিরকাল আদৃত হইয়া আসিয়াছে এবং যত দিন ধর্ম্ম ও সত্যের মর্য্যাদা ইহা আদৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু সম্প্রতি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জাতি-ভেদ বিষয়ক বক্তৃতায় কহিয়াছেন, এইরূপ গ্রন্থকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ কর। এই কথায় আমাদের হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিয়াছে। এক্ষণে আমরা দেখাইতে চাই, তিনি যে সমস্ত দোষ মনুতে আরোপ করিতেছেন, বাস্তবিক সে গুলি কি। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে জাতিভেদের বিচার করিতে চাহি না কিন্তু তিনি মনুকে যে সমস্ত দোষে দূষিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাহারই ক্ষালন করিতে চাই

সমাজসংস্কারকের কার্য্য বড় সহজ নয়। প্রথম তাঁহাকে দেশকালপাত্র দেখিতে হয়। ইহা কখন অনুকূল কখন বা প্রতিকূল। প্রতি

কুল অবস্থায় পড়িলে তাঁহাকে লক্ষ্যসিদ্ধির নিমিত্ত এমন সব কাজ করিতে হয়, যাহা লইয়া উত্তরকালে বিতর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু এইরূপ বিতর্ক উঠিবার সময় বিচক্ষণ লোক অগ্রে তাঁহার দেশকালটী বুঝিতে চেষ্টা পান এবং তখনই তিনি প্রকৃত আলোকে তাঁহার কার্য্য বিচার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই দেশকাল ছাড়িয়া বৃদ্ধ মনুকে বিচার করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন। এক্ষণে এই দেশকাল ধরিয়া দেখিলে মনু কিরূপ দাঁড়ান, অগ্রে তাহার আলোচনা আবশ্যক।

এখন উনবিংশ শতাব্দী। মনুষ্য-সমাজ এক প্রকার নিরাপদ; জীবিকার বেশ ব্যবস্থা আছে; জ্ঞানলাভের দ্বার অবারিত; ধর্ম্মযাপনের কোন ব্যাঘাত নাই; কেহ নিরাশ্রয় নহে, ধন প্রাণ অক্লেশে রক্ষা হইতেছে। এই সময়ের আলোকে দাঁড়াইয়া মনুকে ঠিক্ বুঝা যাইবে না। যদি মনুর কার্য্য আলোচনা করিতে হয়, তাহা হইলে একবার অতীতের সেই ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ কর। তথায় কি দেখিবে? লোকের জীবিকা অনিশ্চিত; স্বত্বরক্ষার তাদৃশ উপায় নাই; জনসমাজ অজ্ঞানতার গভীরে নিমগ্ন; পদে পদে ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত; চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির প্রতিকূলতা; দুরন্ত শীত, প্রচণ্ড বায়ু, কঠোর রৌদ্র, প্রবল বর্ষা; স্বচ্ছন্দে থাকিবার ব্যবস্থা কিছু নাই; সর্ব্বত্র হিংস্রজন্তুপূর্ণ নিবিড় অরণ্য এবং প্রাণের জন্য কঠোর চেষ্টা। জনসমাজের এই ভ্রূণ অবস্থায় মনুর জন্ম। ইহা কবিকল্পনা নয়, মনুস্মৃতি পাঠেই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেই তমোময় দুর্দ্দিনে জনসমাজের ভাবী সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কি সঙ্গত, মনু তাহাই দেখিয়াছিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক, বাক্য মন ও শরীরের উন্নতিকর ধর্ম্ম ও তদানুষঙ্গিক জনসমাজের উন্নতি মনুর লক্ষ্য ছিল। পৌরাণিক প্রমাণে বুঝা যায় যে অগ্রে একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য ব্রাহ্মণদিগের চেষ্টা হয়। এই সূক্ষ্ম ধর্ম্মের উন্নতিই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইলে সামাজিক সমস্ত নিয়মই উৎকৃষ্ট হইবে ইহা তাঁহাদের অবান্তর লক্ষ্য। মনু শ্রেণীবিভাগ করিয়া সেই ধর্ম্মরক্ষার ভার ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই দেন এবং তাঁহাদিগকে কঠোর ধর্ম্মনিয়মে বদ্ধ করেন। এই ধর্ম্মনিয়ম বড় সহজ-সাধ্য নহে। ভোগায়তন দেহ আছে পার্থিব ভোগ্যও যথেষ্ট কিন্তু এই ধর্ম্মনিয়মে বদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণেরা প্রকৃতির প্রতিস্রোতে আপনাদিগের যত্ন ও চেষ্টা নিয়মিত করিতে লাগিলেন। এরূপ কৃচ্ছ্রসাধনের দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে যথেষ্ট আছে। মনু ব্রাহ্মণজাতিকে যেরূপ কঠোর নিয়মে বদ্ধ করিলেন অন্য জাতিকে সেরূপ নহে। পার্থিব ভোগে তাহাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা রহিল। কিন্তু যাহা ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বাঙ্গীণ সুখসৌভাগ্যের মূল সেই ধর্ম্মকে যাহারা রক্ষা করিবে প্রকৃতির তাদৃশ প্রতিকূলতার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে তাহাদের রক্ষার নিয়ম করা আবশ্যক। এই জন্য ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতিই উহাঁদের সাহায্যের জন্য রহিল। ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত নিবারণের জন্য ক্ষত্রিয়, জীবিকার জন্য বৈশ্য ও সামান্য গৃহকার্য্য করিবার জন্য শূদ্র ব্যবস্থাপিত হইল। মনু যদি মনুষ্যের সেই দুর্দ্দিনের অবস্থায় বর্ণবিভাগে এইরূপ কার্য্য-বিভাগ না করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে প্রকৃত ধর্ম্ম ও প্রকৃত সভ্যতার অভ্যুদয় হইত কি না সন্দেহ। এক বর্ণকে ধর্ম্মের উন্নতির জন্য রাখিয়া অপর তিন বর্ণকে সমাজসেবায় নিয়োগ করিবার প্রকৃত তাৎপর্য্য সহজ বোধ্য। প্রকৃত ধর্ম্মের উন্নতিতে জনসমাজের চরমোৎকর্ষতা সুসম্পূর্ণ

নির্ভর করে। ব্রাহ্মণ সেই ধর্ম্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত। মনুতে গার্হস্থ্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের অধিকাংশই যে গৃহস্থ ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গৃহীদিগের নানা কার্য্য। এই গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে ব্রাহ্মণেরা জাতীয় উন্নতির নিদান ধর্ম্মে শিথিল-প্রযত্ন হইবেন, এই আশঙ্কায় মনু সাংসারিক কার্য্য অপর তিন বর্ণে অর্পণ করিয়াছেন। এই বিষয়টী স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত দেই। মনে কর কোন এক পরিবারে একটি কর্ত্তা আছেন। তাঁহার লক্ষ্য পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি। এক্ষণে পাকক্রিয়া গোসেবা কৃষি এবং আর আর সাংসারিক কার্য্য যদি সমস্তই তাঁহাকে করিতে হয়, তাহা হইলে কি কোন জন্মে তিনি শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। কখনই না। এই জন্য পারিবারিক ব্যবস্থায় লোকভেদে কার্য্যবিভাগ আছে এবং ইহারই বলে গৃহস্বামীর অভীষ্টসিদ্ধি হয়। একটী ক্ষুদ্র পরিবারে যেরূপ ব্যবস্থা, মনু সমস্ত ভারতের পক্ষে তাহাই করিয়াছিলেন। ইহার সুফল ধর্ম্ম ও সমাজের অসম্ভব উন্নতি, আজিও আমরা তাহা ভোগ করিতেছি।

বক্তা যে দাসপ্রথার জন্য মনুর উপর বিষম কটাক্ষপাত করিয়াছেন, এখন তাহার অর্থ সুগম হইবে। মনে কর একটী পরিবারে কেহ ধনোপার্জ্জনে কেহ রন্ধন ও সন্তানপ্রতিপালনে কেহ অতিথি ও দেবসেবায় ব্যাপৃত। সমস্ত কার্য্যই সংসারের অপরিহার্য্য ও হিতকর। কিন্তু এই সমস্ত ব্যতীত আরও সামান্য কতকগুলি কার্য্য অবশিষ্ট থাকে। সেই গুলির উপর অর্জ্জক প্রতিপালক প্রভৃতির খানিকটা অর্থসিদ্ধি নির্ভর করে। সেই সামান্য কার্য্য যাহারা করে তাহারাই দাস। অথবা ব্যাখ্যাছলে এরূপও বলা যায় তাহারা পারিবারিক অর্থসিদ্ধির সামান্য কিন্তু অপরিহার্য্য সহায়। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদিগের কেবল ব্রাহ্মণদিগের কেন সামাজিক উন্নতিসাধনে উদ্যত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণেরই দাস বা অপরিহার্য্য সহায় ছিল। প্রকৃতির উল্লিখিত সেই প্রতিকূলতার মধ্যে, স্পষ্ট কথায় সেই দুর্দ্দিনে, যাঁহারা জনসমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের রক্ষার এবং জীবনোপায় ও গৃহকার্য্যে সহায়তার একটা সুব্যবস্থা না থাকিলে এখন যে এই ভারত জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতার সর্ব্ববিজয়ী পতাকা বক্ষোপরি বহন করিতেছে, বর্ত্তমানের এই গৌরবের দৃশ্য বোধ হয় আমরা দেখিতে পাইতাম না। সাম্যের নিয়ম জনসমাজের প্রথমাবস্থায় উপযোগী নয়, কেবল প্রথমাবস্থায় কেন, কোন কালেই ইহার উপযোগিতা নাই। এই উচ্চনীচ ভাব চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে এবং কার্য্যসৌকর্য্যের নিমিত্ত চিরকালই চলিবে। দেখ আমাদের এই প্রশস্ত ধর্ম্মক্ষেত্র ব্রাহ্মসমাজে কি হইতেছে। আমরা যখন ব্রহ্মোপাসনার জন্য সমাজগৃহে উপবিষ্ট হই, তখন বহুসংখ্য লোক আমাদের পরিচারণার জন্য কেন নিযুক্ত থাকে? কেহ পাখা টানিতেছে, কেহ গোলযোগ থামাইবার জন্য ব্যগ্র আছে, এবং কেহ বা আমাদের পরিশ্রান্ত দেহ নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে পৌঁছিবার জন্য গাড়ির বন্দোবস্ত করিতে থাকে। কেন? আমরা তো জ্ঞান ও সভ্যতার মধ্যে সাম্যের নিয়ম শিক্ষা করিয়াছি? ঐ সকল শ্রমজীবিদিগেরও তো আত্মা ও জ্ঞান ধর্ম্ম আছে? তাহারা কেন ব্রহ্মোপাসনার সময় আমাদের সহিত যোগ দেয় না? না, তাহা অসম্ভব, তাহারা আমাদের পরিচারণায় নিযুক্ত না থাকিলে আমাদের ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত হয়।

এখন বুঝিয়া দেখ মনু কি জন্য শূদ্রদিগকে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফলত এই দাসপ্রথা না থাকিলে ব্রাহ্মণদিগের উচ্চ লক্ষ্য সাধনের ব্যাঘাত ঘটিত। সাংসারিক নানা রূপ জটিল ক্রিয়ায় তাঁহারা আবদ্ধ ও মুহ্যমান হইয়া থাকিতেন। আরও সমাজের প্রথমাবস্থায় এই দাসপ্রথা থাকা বিশেষ আবশ্যক। মহাত্মা আরিষ্টটল প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতেরা ইহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। প্রায় সকল উন্নত সমাজের প্রথমাবস্থায় ইহার সদ্ভাব দৃষ্ট হয়। এই আমেরিকায় সে দিন তো ইহার বিলোপ হইল। সুতরাং দূরদর্শী ধীমান মনু হিন্দুসমাজের প্রথমাবস্থায় যাহা করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত সঙ্গত এবং শূদ্রেরা যে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জাতীয় উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল তজ্জন্য চিরকালই সাধুবাদের পাত্র হইয়া থাকিবে।

বক্তা একস্থলে শূদ্রের দণ্ডবিধি লইয়া মনুকে হাস্যাস্পদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে ইহাতে উপহাসের কথা তো কিছু খুঁজিয়া পাই না। মনুস্মৃতিপাঠে ইহা অবশ্যই দেখা যায় যে, শূদ্রের কোন কোন কার্য্যে কঠোর দণ্ডের বিধি আছে। কিন্তু সেই গুলি মনুর অসৎশূদ্রপর শাসনবাক্য মাত্র। তৎকালে সৎ শূদ্রের যথেষ্টই মর্য্যাদা ছিল। এমন কি লোকে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণেরই তুল্য বলিয়া বুঝিত *। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দণ্ডবিধির কথা হয় নাই। কিন্তু যাহারা নিরক্ষর ও বর্ব্বর, যাহারা যথেচ্ছ পানাহার ও লোকের প্রতি অত্যাচার লইয়াই উন্মত্ত, যাহারা পদে পদে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাঘাত করিত সেই সমস্ত দুর্দ্দান্ত দস্যু শূদ্রকে লক্ষ্য করিয়াই তৎসমুদায় উক্ত হইয়াছে। অধিক ভয় প্রদর্শন না করিলে তাহাদিগকে শাসনে রাখা সুকঠিন। মনু এই বুঝিয়াই ঐ দণ্ডবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। ফলত শাসনবাক্য মাত্রে উহার পর্য্যবসান। ক্ষমা ও সর্ব্বভূতে দয়াই যাঁহাদের ধর্ম্ম সেই ব্রাহ্মণজাতি দ্বারা কদাচ তাহার অনুষ্ঠান হইত না। আমরা যে কেবল অনুমান-বলে এইরূপ কহিতেছি তাহা নহে, মনুস্মৃতি পাঠে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হয়। বক্তা "যেন কেনচিৎ অঙ্গেন" এই যে বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন ইহার শেষ চরণে "তন্মনোরনুশাসনং" এই একটু কথা আছে। ইহাতেই আমাদের বাক্য সপ্রমাণ হইবে। মহর্ষি ভৃগু মনুস্মৃতির রচয়িতা। তিনি ঐ দণ্ডবিধির রচনাকালে "তন্মনোরনুশাসনং" এই টুকু যোগ করিয়া একটু গূঢ় ব্যঙ্গের অপেক্ষা রাখিলেন। অর্থাৎ "তন্মনোরনুশাসনং" মনুর ইহা অনুশাসন বটে, অস্মাকন্তু ন, কিন্তু আমাদের নয়। টীকাকার কুল্লূকভট্ট ইহা আরও বিশদ করিয়াছেন। "শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য" এই বচনটীর শেষে "শূদ্রস্তু বধমর্হতি" এই একটু কথা আছে। ইহার যথাশ্রুত অর্থ এই যে ব্রাহ্মণের প্রতি পরুস বাক্য প্রয়োগ করিলে শূদ্রের প্রাণদণ্ড করিবে। কি ভয়ানক কথা। কিন্তু এরূপ একটা কঠিন দণ্ডের স্থলে টীকাকারেরা কিছু না লিখিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা অর্থ করিলেন "তাড়নাদিরূপং বধমর্হতি" দেখ এস্থলে স্থূল কথাটী কত নরম হইয়া পড়িল। যদি বল বধ শব্দের এইরূপ অর্থ অপ্রামাণিক, ইহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। আমি তাঁহাদিগকে মহাভারতের একটী স্থল স্মরণ করাইয়া দেই। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা এই যে যিনি গাণ্ডীবের নিন্দা করিবেন, তাঁহাকে বধ করিতে হইবে। ঘটনাক্রমে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে ভর্ৎসনা করিবার কালে

* সৎ শূদ্রো দ্বিজ উচ্যতে। ম, ভা,

এই শাস্ত্রীবের নিন্দা করেন। অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা স্মরণ হওয়াতে যুধিষ্ঠিরের প্রাণবধে উদ্যত। সেই সময় কৃষ্ণ এই বধ শব্দের কত প্রকার অর্থ করিয়াছেন তাহা দেখিলেই টীকাকার কুল্লুকভট্টের অর্থ সপ্রমাণ হইবে। যদি বল, যদি এই সমস্ত দণ্ডের প্রয়োগই না হইত তবে নিরর্থক কতকগুলা বলিবার বিশেষ উদ্দেশ্য কি ছিল? উদ্দেশ্য আছে। আমরা প্রথমে বলিয়াছি যে এই সমস্ত দণ্ড অসৎশূদ্রপর শাসনবাক্য মাত্র। তদ্ব্যতীত আরও একটু অভিপ্রায় আছে। যিনি ব্যবস্থাপক হন তাঁহাকে চারি দিক দেখিয়া চলিতে হয়, নচেৎ তাঁহার ব্যবস্থার সারবত্তা থাকে না। মনু ব্রাহ্মণজাতিকে কঠোর ধর্ম্মনিয়মে বদ্ধ করিলেন। শিলোঞ্ছ বৃত্তি দ্বারা তাঁহাদের দিনপাতের ব্যবস্থা করিয়া সাংসারিক সমস্ত ভোগসুখে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেন। কেন? না ব্রাহ্মণেরা ভোগাসক্ত হইলে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতি ও তন্মূলক সামাজিক উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিবে। এক্ষণে দেখা উচিত, যে জাতির প্রতি এরূপ গুরুতর ভার এবং সেই ভার বহিবার নিমিত্ত নানারূপ কষ্টসাধ্য নিয়ম তাঁহাদের মর্য্যাদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করা একজন বিচক্ষণ ব্যবস্থাপকের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কি না। কষ্টকর কাজটী যাহার হাতে তাহার মানাপমানে উপেক্ষা করিলে অবলম্বিত কার্য্যে আর উৎসাহ থাকে না; এই বুঝিয়াই মনু ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদক শূদ্রের প্রতি এইরূপ শাসনবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলত ব্রাহ্মণের ভক্তি সম্পাদনই তাঁহার অপর উদ্দেশ্য।

একস্থলে বক্তা বিস্ময় সহকারে বলিয়াছেন, শূদ্র ধনী হইলে পাছে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্বের হানি হয় এই আশঙ্কায় মনু তাহাদিগকে ধনাধিকারে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। এ কথায় আমরা শ্রদ্ধা করিতে পারিলাম না। মনু যে শূদ্রকে বহুধনসঞ্চয়ে বঞ্চিত করিয়াছিলেন তাহার অপর কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। সেই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে পাঠকগণকে আবার স্মরণ করাইয়া দেই যে মনু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বসিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন নাই। তাঁহার কাল সেই অতীতের ঘোর অন্ধকার। সেই কালে যাঁহার লক্ষ্য জনসমাজকে জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতায় উন্নত করা, তাঁহার পদবী কিরূপ বিঘ্নসঙ্কুল বুঝিয়া দেখ। এ অবস্থায় মানদণ্ড ধরিয়া সামাজিক সমস্ত অধিকার অবিরোধে সকলকে সমভাগে বিভাগ করিয়া দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব। ইহাতে তাঁহার উচ্চ লক্ষ্য সিদ্ধির বিঘ্ন ঘটে। এই জন্য সরলস্বভাব মনু স্পষ্ট কথায় বলিয়াছেন 'শূদ্রোহি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে'। টীকাকার কুল্লুকভট্ট ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়াছেন—"ধনার্জনসমর্থেনাপি শূদ্রেণ পোষ্যবর্গনির্ব্বর্ত্তনপঞ্চযজ্ঞাদ্যুচিতাদধিকবহুধনসঞ্চয়োন কর্ত্তব্যঃ। যস্মাৎ শূদ্রোধনং প্রাপ্য শাস্ত্রানভিজ্ঞত্বেন ধনমদাৎ শুশ্রূষায়াশ্চাকরণাৎ ব্রাহ্মণানেব পীড়য়তি"। অর্থাৎ শূদ্র একে মূর্খ, তাহার হস্তে অধিক ধন হইলে সে ধনগর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের সেবা করিবে না। সেবা ব্যতীত তাঁহাদের অভীষ্ট ব্রতপালনের ব্যাঘাত ঘটিবে। এক্ষণে আমরা বক্তাকে জিজ্ঞাসা করি জাতিসাধারণ উন্নতির উদ্দেশে শ্রেণীবিশেষকে যদি সাংসারিক কোন অধিকারে বঞ্চিত করা যায় তাহা ভাল কি মন্দ? নিরক্ষর বর্ব্বর শূদ্র ধনমদে ব্রাহ্মণদিগের সেবার ব্যাঘাত করিবে। সেবার ব্যাঘাতে জাতীয় উন্নতির ব্যাঘাত। এই শুভ উদ্দেশে মনু শূদ্রের বহুধন সঞ্চয়ে অধিকার দেন নাই। বক্তার যে আশঙ্কিত ব্রাহ্মণের আধিপত্যলোপ সেটী নিতান্ত অমূলক কথা। ফলত এই ব্যবস্থার লক্ষ্য সাধারণের হিতকর ও অতি উচ্চ।

ভাল, শূদ্রকে বহুধন অধিকারে বঞ্চিত রাখায় মনুকে যদি একটী নির্য্যাতক বলিয়া বুঝ তাহা হইলে ব্রাহ্মণের দিকটা একবার বিচার করিয়া দেখ। মনু এই জাতির জন্য পার্থিব কোন্ সুখসচ্ছন্দ অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন। শিলোঞ্ছ বৃত্তি দ্বারা দিনপাত, (স্থূল কথায় কাঁচকলাভাতে ভাত,) ব্রত নিয়ম, উপবাস, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, শরীরশোষণ, যে গুলি স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প হয়, ব্রাহ্মণদিগের জন্য সেই ব্যবস্থা। প্রতিগ্রহের যা একটী নিয়ম ছিল, তাহারও আবার অতিমাত্রায় দোষ। মনু এই জাতিকে এইরূপ দীন ও দরিদ্র দশায় ও মনুষ্যের অসাধ্য কৃচ্ছ্র সাধনে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বক্তা যদি এই টুকু ভাবিয়া দেখিতেন তাহা হইলে শূদ্রের বহুধনসঞ্চয়ে অধিকার না দেওয়ায় মনুর নির্য্যাতনেচ্ছা কিছুতেই অনুমান করিতে পারিতেন না। মনুর এ তুলাদণ্ডের বিচার, ইহাতে আমরা পক্ষপাত দোষ খুঁজিয়া পাই না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংস্কারকদিগের দেশ কাল বুঝিয়া কার্য্য করিতে হয়। মনু তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি যদি দেশ কাল উপেক্ষা করিতেন তাহা হইলে এতদ্দেশের শ্রীবৃদ্ধি বহুদূরে পড়িত। এস্থলে আর একটু গূঢ় কথা বলা আবশ্যক। মনুষ্যসমাজকে সর্ব্বপ্রথমে যাঁহারা কোন রূপ একটা বন্ধনে আনিতে পারেন, সর্ব্বাংশে তাঁহাদেরই জয়জয়কার। পরে কাল ও স্বভাবের নিয়মে সংস্কার-কার্য্যের দোষাংশ চলিয়া যায়, গুণের ভাগ উজ্জ্বলবর্ণে দাঁড়াইয়া থাকে। মনুর পরবর্ত্তী যে সকল সংস্কারকেরা জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থপাঠে তাহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অতএব বিশেষ না বুঝিয়া মনুর ন্যায় একজন বিচক্ষণ সংস্কারককে ঘৃণার চক্ষে দেখা বড় অসঙ্গত কাজ।

বক্তা শূদ্রের প্রতি মনুর এই সমস্ত অত্যাচার বর্ণন করিয়া শেষে শূদ্রের ধর্ম্মে অনধিকার দর্শনে এককালে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন,এবং সর্ব্বজনপূজনীয় মনুর প্রতি শ্রোতৃবর্গের ঘৃণাবৃত্তি উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সমস্তই তাঁহার বুঝিবার দোষ। "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ" তিনি এই বচনটীর একটী স্বকপোলকল্পিত অর্থ করিয়া বিষম গোলযোগে পড়িয়াছেন। তিনি অর্থ করিয়াছেন, "শূদ্র যে কোন দুষ্কার্য্য করুক না কেন তাহার পাতক নাই, শূদ্রের কোন প্রকার ধর্ম্মসংস্কার নাই, তাহার ধর্ম্মে অধিকার নাই, সুতরাং ধর্ম্ম হইতে কোন নিষেধও নাই।" পরেই বলিয়াছেন, "কি সর্ব্বনাশ! আমরা যাহাকে দুষ্কর্ম্ম বলি পশুগণ তাহা করে অথচ তাহাদের পাপ নাই। কারণ তাহারা ধর্ম্মনিয়মের অধীন নয়, সেই রূপ শূদ্র যদি গুরুতর দুষ্কার্য্য করে তাহার পাতক নাই কারণ তাহার ধর্ম্মে অধিকার নাই।" কি বুঝিবার ভ্রম! তিনি যে বচনটী ধরিয়া মনুকে ঘৃণিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার অর্থ আদৌ ঐরূপই নয়। তাহার অর্থ ভিন্ন প্রকার। মনু 'ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ' এই বচনে বলিতেছেন (১) "লশুনাদি ভক্ষণে শূদ্রের পাতক নাই। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণ্যসাধারণ যে সমস্ত ধর্ম্ম আছে তাহার অপ্রতিপালনে তাহার

(১) লশুনাদিভক্ষণেন শূদ্রে ন কিঞ্চিৎ পাতকং ভবতি নতু ব্রহ্মবধাদাবপি, অহিংসা সত্যমিত্যাদেশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যসাধারণত্বেন বিহিতত্বাৎ। নচ উপনয়নসংস্কারমর্হতি নাস্ত্যাগ্নিহোত্রাদিধর্ম্মে অধিকারোস্তি অবিহিতত্বাৎ। নচ শূদ্রবিহিতাৎ পাকযজ্ঞাদিধর্ম্মাদস্য প্রতিষেধঃ।

কুল্লূকভট্ট।

শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের টীকাকার গোবিন্দানন্দও শঙ্করধৃত 'ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ' এই শ্লোকে 'পাতকং অভক্ষ্যভক্ষণকৃতং' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পাতক। তাহার উপনয়নাদি সংস্কার নাই কিন্তু পাকযজ্ঞাদি ধর্ম্মসাধনে তাহার নিষেধ নাই। কিন্তু বক্তা প্রকৃত অর্থ ত্যাগ পূর্ব্বক লোকের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপের পাইয়াছেন। ইহাকেই বলে ভিত্তি-বিরহিত চিত্ররচনা। ভাল, যদি কুল্লুকভট্ট ও গোবিন্দানন্দের অর্থ ত্যাগ করিয়া বক্তার অর্থ গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে এই একটী কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে মনুতে শূদ্রের আবার প্রায়শ্চিত্তের বিধি কেন? বক্তার মতে তাহার তো পাতক নাই। আরও মনুতে শূদ্রকে শপথ করাইবার কালে বিধি আছে "শূদ্রং সর্ব্বৈস্তু পাতকৈঃ." অর্থাৎ শূদ্র শপথ করিবার সময় বলিবে যদি আমি মিথ্যা বলি তাহা হইলে আমার সমস্ত মহাপাতক ও উপপাতক হইবে। মনুর মতে যদি শূদ্রের পাতক নাই তবে এ কথার অর্থই বা কি? বক্তা কহিয়াছেন মনু শূদ্রের ধর্ম্মে অধিকার দেন নাই, তবে 'ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ' এই শ্লোকের পরশ্লোক 'ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ' ইহার অর্থ কি হইতে পারে? বক্তার মতে মনু তো শূদ্রের ধর্ম্মে অধিকার দেন নাই তবে শূদ্রের পক্ষে 'ধর্ম্মজ্ঞ' এই বিশেষণের সার্থকতা কি? কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে উপক্রমোপসংহার অভ্যাস প্রভৃতি লিঙ্গষট্ক দ্বারা তাহা বুঝিতে হয়। অভ্যাসের অর্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি। কিন্তু মনু, শূদ্রের ধর্ম্মে অধিকার নাই এইটী, না সমন্ত্রক যজ্ঞে অধিকার নাই এইটী, উপক্রমোপসংহারে কোন্‌টী প্রতিপাদন করিয়াছেন? এবং কোন্ প্রতিপাদ্য বিষয়টীরই বা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়াছেন? স্থির চিত্তে দেখিলে বুঝা যায় যে সমন্ত্রক যজ্ঞেই উঁহাদের অধিকার নাই ইহাই পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের যে সমস্ত ধর্ম্মের সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যে ধর্ম্মের বলে আত্মোন্নতি ও মুক্তি হয়, সেই মনুষ্যসাধারণ ধর্ম্মে মনুর মতে শূদ্রের সম্পূর্ণ অধিকার। সাক্ষাৎ বেদপাঠে বা তাহার অর্থগ্রহে শূদ্রের পক্ষে বিধি ছিল না বটে কিন্তু ইতিহাস পুরাণাদি দ্বারা সেই বেদার্থ তাহারা গ্রহণ করিতে পারিত। (২) মনু যে 'ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ' ইহার পর বচনে 'ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ' শূদ্রের এই বিশেষণটী দিয়াছেন উক্ত সিদ্ধান্তেই তাহার সার্থকতা। ইতিহাস পুরাণাদি শ্রবণে তাহারা ধর্ম্ম জানিতে পারিত। শূদ্র শিয়াল কুকুরের ন্যায় পাপ করিবে তাহাতে উপেক্ষাবুদ্ধির কথা দূরে থাক্ প্রত্যুত মনু যাহাতে তাহারা সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক হয় এমন ভূরি ভূরি কথা বলিয়াছেন। এক স্থলে বলা হইয়াছে (৩) শূদ্র যদি সচ্চরিত্র হয় তাহা হইলে সে ইহ লোকে প্রশংসিত হইয়া স্বর্গলাভ করে। মনুর চক্ষে শূদ্র জাতি যে ধর্ম্মনিয়মশূন্য পশুর তুল্য ছিল মনুর এই সমস্ত ও অন্যান্য স্থল আলোচনা করিলে ইহা কিছুতেই আমাদের বোধ হয় না। পরম কারুণিক মনু ইহাদিগকে কৃপাচক্ষেই দেখিয়াছিলেন এবং এই নিরক্ষর বর্ব্বর জাতি যাহাতে ক্রমোন্নতি লাভে সমর্থ হয় এই জন্যই ইহাদিগকে বিদ্বান ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত বিচার না করিয়া অন্যায়ত মনুতে দোষারোপ করায় আমরা বড়ই ব্যথিত হইলাম। মনু গ্রন্থের শিরোমণি। বর্ত্তমান কালের ভাবগতির সহিত ইহার কোন কোন অংশ না মিলিলেও ইহাতে যে সমস্ত ধর্ম্ম ও সদাচার

(২) শ্রাবয়েচ্চতুরোবর্ণান্ ইতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকারস্মরণাৎ বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণাং। শাঙ্করভাষ্য।

(৩) যথাযথাহি সদ্বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনসূয়কঃ তথাতথেমং চামুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ। ১০ অঃ মনু

শিক্ষা দিয়াছে যাবৎ পৃথিবী যাবৎ চন্দ্র-সূর্য্য তাবৎ তৎসমুদায়ের ঘরে ঘরে পূজা হইবে। এখন ইংরাজীর অনুশীলনে একেই তো সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি লোকের উপেক্ষা হইতেছে। এ সময় হৃদয়বান্ লোকের উচিত, প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া এই সমস্ত গ্রন্থের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা উৎপাদন করা। কিন্তু তাহা না করিয়া এই সমস্ত বিশ্বপূজ্য গ্রন্থকে বিকৃত আকারে ব্যাখ্যা করিয়া লোকের চিত্তবিকার উৎপাদনের চেষ্টা করিলে এই দুর্ভাগ্য দেশের যৎপরো নাস্তি অনিষ্ট হইবে।

বলীদ্বীপ।

আমাদিগের পাঠকবর্গ অবশ্য জ্ঞাত আছেন যে প্রাচীন কালে সুমাত্রা, যব ও বলী দ্বীপে হিন্দুরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে সুমাত্রা ও যব দ্বীপের লোকেরা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে কিন্তু বলী দ্বীপের লোকেরা অদ্যাপি হিন্দু আছে। আমাদিগের কোন বন্ধু সে দিন বলিতে ছিলেন তাঁহার ইচ্ছা হয় যে তিনি সমুদ্র-পোতারোহণ করিয়া বলী দ্বীপে উপস্থিত হইয়া তথাকার নিবাসীদিগকে এই কথা বলেন যে "বহুদিবস হইল তোমরা ভারত-মাতার ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। তিনি আমাকে তোমাদিগের সম্বাদ লইতে প্রেরণ করিয়াছেন।" আমাদিগের বন্ধু যদি যথার্থ বলীদ্বীপে যান এবং তথা হইতে উল্লিখিত সম্বাদ লইয়া আইসেন তাহা হইলে অনেক পরিমাণে আমরা নিম্নে উক্ত দ্বীপ সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম তাহার সঙ্গে মিলিবে সন্দেহ নাই।

আমরা ১৭৮৭ শকের ভাদ্র মাসের পত্রিকাতে আর্য্যজাতির উৎপত্তি ও বিস্তার বিষয়ে একটি প্রস্তাব প্রকাশ করি। তাহাতে লিখিত ছিল, "সুমাত্রা, যব ও বলীদ্বীপ সকলের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে সকল অপেক্ষা অধিক দূর বলীদ্বীপেই হিন্দু উপনিবেশের প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি জাতি আছে এবং হিন্দু দেবদেবীর বিস্তর মন্দির দৃষ্ট হয়। তাহার মধ্যে কোন কোন মন্দিরে কোন প্রকার দেবমূর্ত্তি নাই। ব্রাহ্মণদিগের অসামান্য সম্মান ও শিখা রাখিবার বিশেষ প্রথা, সমান বর্ণের সহিত বিবাহ, গোবধ প্রতিষেধ, মৃতপতির অনুগমন, মৃতশরীর দাহ, নানাবিধ ছন্দের নাম, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাদি গ্রন্থ, সময় বিভাগ এই সকল বিষয়ে বলী দ্বীপস্থ হিন্দু ও ভারত-বর্ষীয় হিন্দুদিগের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।"

সুমাত্রা ও যব দ্বীপ ওলন্দাজদিগের অধিকৃত ও বলী দ্বীপ ঠিক তাহাদিগের অধিকৃত না বলা গেলেও তাহাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে অবস্থাপিত বলা যাইতে পারে। সম্প্রতি বেরণ টেঙ্গনগেল (Baron Tengengell) নামক একজন সম্ভ্রান্ত ওলন্দাজ বলীদ্বীপের একটি বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা গত মে মাসের মিয়দফিষ্ট পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই বৃত্তান্ত নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"বলী দ্বীপ ওলন্দাজ জাতির কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপিত। উহা নয় অংশে বিভক্ত। এই নয় অংশ পরস্পর স্বাধীন। এই সকল বিভাগের নাম (১) বলিলং (২) জেম্ব্রেণা, (৩) করং অস্সেম (৪) ক্লুংকন (৫) জনঞ্জর (৬) বঙ্গলা * (৭) বদং (৮) মেঙ্গইবি (৯)

* ইহা প্রসিদ্ধ যে বঙ্গীয় বৌদ্ধ রাজাদিগের সময়ে বাঙ্গালী জাহাজ সর্ব্বদা এই সকল দ্বীপে যাতায়াত করিত এবং সম্ভবত বাঙ্গালীরা তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল অতএব একটি বিভাগের নাম যে বঙ্গলা হইবে ইহা বিচিত্র নহে।

তবনন্‌। ইহা অনুমিত হয় যে, যে সকল হিন্দু যবদ্বীপে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিল তাহারাই বলীদ্বীপে গিয়া তাহা করিয়াছিল কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে মুসলমানেরা যবদ্বীপ অধিকার করিলে সেই দ্বীপের যে সকল লোকেরা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল তাহারা বলী দ্বীপে গিয়া বসতি করে ও তথায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করে। সুমাত্রা ও যবের হিন্দুধর্ম্ম বলী দ্বীপে লব্ধপ্রবেশ হইলে পর তথায় তাহা নূতন ও প্রশস্ত আকার ধারণ করে। বর্ত্তমান সময়ে তথায় উভয় শৈব এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক অনুবর্ত্তী আছে। উক্ত দ্বীপে বৌদ্ধ যে অধিক আছে তাহা বলা যাইতে পারে না। কেবল করং আসেম ও জনজন্‌ এই উভয় স্থানে তাহাদিগকে দেখা যায়। ব্রাহ্মণধর্ম্মযাজকেরা তাহাদিগের ধর্ম্মের আদিম বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াছে। তাহারা সকল বিষয়ে ঠিক হিন্দু ধর্ম্মের অনুশাসনানুসারে চলে কিন্তু সাধারণ লোকে বেদ অথবা পুরাণোক্ত দেবতা ছাড়া পিতৃ ও বোয়েতা (ভূত) নামে মঙ্গলাধিষ্ঠাত্রী অথবা আনন্দাধিষ্ঠাত্রী উপদেবতার পূজা করিয়া থাকে। ছয়টি মন্দিরে শিবের প্রতিমা আছে ও তথায় তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। সে ছয় মন্দিরের নাম "সদ্‌কা জনঙ্গন"। আরো অনেকগুলি মন্দির আছে, সে গুলি এতদ্রূপ শ্রদ্ধেয় নহে। এতদ্ব্যতীত পরজঙ্গন নামে কতকগুলি মন্দির আছে তথায় সকল দেবতার পূজা হইয়া থাকে এবং রইমাদেব নামক কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির আছে তাহাতে এক একটি বিশেষ দেবতার উপাসনা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সঙ্গর নামে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র ভজনালয় আছে। পনতরণ (পুণ্যতরণ) নামে কতকগুলি পবিত্র স্থান আছে যথায় দেবতা অথবা উপদেবতা উদ্দেশে তণ্ডুল, পক্কমাংস, মৎস্য, ফল, রৌপ্য এবং বস্ত্র নিবেদিত হয়। গুরুতর পূজা ক্রিয়া উপলক্ষে মহিষ, কুক্কুট ও শূকর বলি হয়।

বলীদ্বীপবাসীরা চারি বর্ণে বিভক্ত—যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (ক্ষত্রিয়), বেশ্য (বৈশ্য) এবং শোইদ্রা (শূদ্র)। যাহারা ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের উপাধি "ইদবা-গো-ইস" (বিদাবাগীশ) এবং তাঁহাদের পত্নীদিগের উপাধি "ইদজোই" (বিজ্জায়া)। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ জ্ঞানাপন্ন তাহাদিগকে পলণ্ডা (পণ্ডা অর্থাৎ পণ্ডিত) বলে। ব্রাহ্মণেরা সংখ্যায় অনেক। তাহাদিগের মধ্যে দারিদ্র্য বশতঃ অনেকে কৃষক অথবা ধীবর অথবা খর্জ্জুর বিক্রয়ের ব্যবসায় দ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ক্ষত্রিয়েরা যোদ্ধা। তাহাদিগের উপাধি "দেব"। পূর্ব্বে পূর্ব্বে সকল রাজারা এই বংশীয় ছিলেন কিন্তু এক্ষণে সেরূপ নাই। এক্ষণে রাজাদিগের মধ্যে কেবল "দেব অনাং" নামক রাজা ক্ষত্রিয় জাতীয় হওয়া কর্ত্তব্য।

তৃতীয় জাতি বেশ্য অর্থাৎ বৈশ্য। উহা বলী দ্বীপে একটি প্রধান জাতি। ইহারা পূর্ব্বে বাণিজ্য, কৃষি অথবা শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত কিন্তু এক্ষণে এই জাতীয় লোকেরা কেবল বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহারা অন্য বৃত্তিকে হীন মনে করে। বলী দ্বীপের রাজারা প্রায় সকলই এই জাতীয়। ইহাদিগের উপাধি "গোএষ্ঠী"।

নিম্নতম জাতি শোইদ্র (শূদ্র)। সাধারণ লোকে এই জাতিভুক্ত। তাহাদিগের কোন উপাধি নাই। যখন শ্রেষ্ঠ জাতীয় লোকে তাহাদিগের কথা কহে তখন তাহাদিগকে "কহোহইলা" অর্থাৎ ভৃত্য অথবা "ওঅং" অর্থাৎ সামান্য মনুষ্য বলিয়া থাকে। তাহারা সম্পূর্ণ রূপে শ্রেষ্ঠ জাতীয় লোকদিগের

অধীন। সেই শ্রেষ্ঠ জাতীয় লোকেরা তাহাদিগকে অথবা তাহাদিগের সম্পত্তি লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে।

এই সকল জাতি ব্যতীত তজণ্ডাল (চণ্ডাল) নামক এক জাতি আছে। তাহারা সকলের ঘৃণিত ও পরিত্যজ্য। যাহারা অসাধ্য রোগে আক্রান্ত তাহারা জাত্যন্তরিত হইয়া তজণ্ডাল বলিয়া গণ্য হয়। তাহারা অতি নির্জ্জনে ও বিষণ্ণ ভাবে অবশিষ্ট জীবন যাপন করে।

যাহাতে লোকের প্রেতাত্মা ইন্দ্রলোক তৎপরে বিষ্ণুলোকে তৎপরে শিবলোকে গমন করিতে পারে তজ্জন্য দাহক্রিয়া আবশ্যক। তিন উচ্চতর জাতীয় ব্যক্তির মৃতদেহের দাহক্রিয়া হয় কিন্তু ঐ ক্রিয়া অতি ব্যয়সাধ্য এই জন্য যে পর্য্যন্ত না মৃতদিগের পরিজনেরা আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় সে পর্য্যন্ত উক্ত দেহ মৃত্তিকা-প্রোথিত থাকে অথবা সুগন্ধি দ্রব্য যুক্ত হইয়া রক্ষিত হয়। শূদ্রেরা তাহাদিগের পরিজনের মৃত শরীর দাহ করে না, সমাহিত করে। সকলেরই এইরূপ বিশ্বাস যে শূদ্রের আত্মা পশু-শরীর বিশেষতঃ কুক্কুর-শরীর গ্রহণ করে এই জন্য শূদ্রেরা উক্ত পশুকে বিশেষ সম্মান করে। যদ্যপি ঘটনাক্রমে কোন শূদ্র ধনবান হয় তাহা হইলে সে তাহার পিতা মাতার শরীর মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া দাহ করে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির দাহ-ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। কেবল রাজাদিগের স্ত্রীরা স্বামীর সহমৃতা হয়। এই সহমরণ-ক্রিয়া দুই প্রকারে সম্পাদিত হয়। প্রথমে তাহার মৃত স্বামীর চিতার নিকট ইষ্টক দ্বারা একটি তিন হাত পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে। স্বামীর শব শ্মশানে আনয়নের সময় যে সকল ক্রিয়া বিহিত সেই সকল ক্রিয়ার সহিত উক্ত স্ত্রীলোকেরা তথায় আনীত হয়। তাহারা এ প্রকারে আনীত হইলে তাহারা হয় একেবারে প্রজ্বলিত চিতা আরোহণ করে অথবা ছুরিকা দ্বারা আপনার শরীর স্থানে স্থানে বিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ মৃতাবস্থাতে চিতার উপর পতিত হয়। প্রথম প্রক্রিয়ার নাম "মাবিলা" আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার নাম "সত্য যা সত্য"। যে স্ত্রী শেষোক্ত প্রকারে সহমৃতা হয় সে "সত্যবতী" উপাধি প্রাপ্ত হয়। যখন কোন রাণীর মৃত্যু হয় তখন তাঁহার কোন কোন সহচরী এইরূপে তাঁহার সহমৃতা হয়"।

ঋষি-উপাখ্যান।

কহিলেন যেই আত্মা পুরুষ অমর,
তিনি তো আছেন এই চক্ষের ভিতর।
ইহা শুনি' দেবাসুর কহিল দুজনে—
একটি সংশয় এই আসিতেছে মনে,
উদক পূরিত পাত্রে করি দরশন
অথবা দর্পণে মুখ করি বিলোকন,
দুয়ের মধ্যেই যে পুরুষ দৃষ্ট হয়,
কে আত্মা ইহার মধ্যে কহুন নিশ্চয়।

প্রজাপতি—
সর্ব্বত্রে আছেন যিনি একই সময়
তিনি এক অদ্বিতীয় পুরুষ অব্যয়।
মৃত্তিকার পাত্রে এক সলিল রাখিয়া
আত্মাকে তাহার মধ্যে দেখ চক্ষু দিয়া;
আঁখি-পাতে যদি নাহি হয় আত্ম-জ্ঞান
বুঝাইয়া দিব আত্ম-বিদ্যার সন্ধান।
"যে আজ্ঞা," বলিয়া উভে অসুর অমর
করিলেন অক্ষপাত জলের ভিতর।

প্রজাপতি—
কি দেখিলে সুরাসুর জলগর্ভে কহ,
পে'লে কি আত্মার তত্ত্ব ঘুচিল সন্দেহ?

ইন্দ্র-বিরোচন—
পায়ের নখর হতে কুন্তল মাথার
করিলাম দরশন সকলি আত্মার।

প্রজাপতি—
যতনে বারেক দেহ কর প্রক্ষালন
যথা অঙ্গে যথা যোগ্য পরহ ভূষণ,
পরিয়া সুন্দর বাস সুন্দর প্রকারে
দর্পণ ধরিয়া পুন দেখ আপনারে।

যথা আজ্ঞা সম্পাদিয়া ইন্দ্র বিরোচন
প্রজাপতি সদনে করিল নিবেদন—
দেখিলাম ওগো দেব অতি মনোহর
এই আমাদের আত্মা দর্পণ ভিতর
যেমন ভূষণ অঙ্গে যেমন বসন
করিলাম তেমনি দর্পণে দরশন।

এই কথা প্রজাপতি করিয়া শ্রবণ
কহিলেন, ওহে ইন্দ্র, ওহে বিরোচন,
যার তরে আসিয়াছ আমার আলয়,
জানহ সে এই আত্মা অমৃত অভয়।
ইহা শুনি' দেবাসুর প্রফুল্ল হইয়া
আপন আপন পথে গেলেন চলিয়া।
মর মর্ত্ত্যে গেল, গেল অমর্ত্ত্যে অমর
প্রচারিতে আত্ম-জ্ঞান স্বজন ভিতর।
ইহা দেখি' প্রজাপতি কহিলেন হাসি'
কি বিদ্যাই শিখে গেল মূর্খ দুটা আসি'।
দেহকেই যাহাদের হবে আত্ম জ্ঞান
তাহাদেরি হইবে সমূহ অকল্যাণ।

বিরোচন হৃষ্টমনে ত্বরায় অসুরগণে
দিল গিয়া এই সমাচার,
ওরে ভাই শীঘ্র করি' সুন্দর বসন পরি'
গাত্রে দেও স্বর্ণ অলঙ্কার।
স্নান করি' উষ্ণ জলে, লেপনী লেপিয়া ভালে
শত স্তরে সাজাও কুন্তল,
আন গন্ধী মৃগনাভী, অতি শীঘ্র দোহ গাভী
যাও সবে যাও দলে দল।
ক্ষীর ছানা ননী সরে, শুধু উদরের তরে,
পূর্ণ কর সকল ভাণ্ডার,
আন মদ্য কাট পাঁটা, শতটা বা সহস্রটা
খাও নাচ গাও অনিবার।
কেবল দেহের সেবা করিলেই আর কেবা
আমাদের সমযোগ্য হবে,
দেহ আত্মা জ্ঞান মর্ম্ম, দেহের সেবাই ধর্ম্ম;
কাম, অর্থ, ইহাই এ ভবে।
নাই স্বর্গ নাই মোক্ষ, আছে শুধু পেয় ভক্ষ্য
আত্মা নামে সূক্ষ্ম কিছু নাই,
প্রেতে পরলোক কোথা? সে কেবলি মিথ্যা কথা,
ধূর্ত্তের ভণ্ডামী জেনো ভাই।
নাই ব্রহ্ম, উপাসনা, সে কেবলি জলপনা,
ব্রহ্মচারী ঋষিদের ছল,
পতি পত্নীপুত্র মিলে, কাটাইবে কুতূহলে,
তাহা হ'লে সকলি মঙ্গল।
যাহে আছে কিছু তৃপ্তি, অমনি তাহার প্রাপ্তি
করিবে কৌশলে ছলে বলে,
ঋণ করি' খাবে ঘৃত, কিম্বা একটি কি অযুত
অসত্য কহিবে স্বার্থ পে'লে।
যদিই বা থাকে কিছু পরলোক পড়ে পিছু
তাও পা'বে পূজিয়া শরীর
তমুছাড়ি অণুমাত্র চাহিবে না ফেলি' নেত্র,
অসুরের ধর্ম্মে ইহা স্থির।
এই বলি দিব্য জ্ঞান দিয়া বিরোচন
করিলেন অসুরের দুর্গতি সাধন।
অন্য দিকে স্বর্গরাজ শচীপতি ধীর,
বৃদ্ধ অতি ধীর-গতি নুয়াইয়া শির
চলে যথা, চলিতে চলিতে অদ্ধ-পথে
চমকিয়া উঠিলেন ভয়ে আচম্বিতে।
এ কি হায়! বলিয়া দিলেন প্রজাপতি,
বাক্যে যে তাঁহার বিন্দু দেখি না সঙ্গতি।
শরীরে করিলে যুক্ত বস্ত্র আভরণ
বস্ত্র অলঙ্কারে আত্মা হয় সুশো[illegible]
শরীর ধুইলে আত্মা হয় পরিষ্কার
কিছুই সন্দেহ বটে নাহিক ইহার।
কিন্তু যদি অন্ধ হয় দেহ আপনার
আত্মাও হইবে অন্ধ কি সন্দেহ তার?
খড়্গাঘাতে কাটি যদি শির কিম্বা কর
বহিবে রুধির ধারা বক্ষের উপর
আত্মারো যাইবে কর মস্তক পড়িয়া
বহিবে রুধির ধারা বক্ষে গড়াইয়া।
শরীরের নাশে আত্মা নষ্ট অতঃপর
কিসে বলি এই আত্মা অজর অমর?
ভীত হ'য়ে ইন্দ্র অতি এই ভাবনায়
প্রজাপতি সমীপে গেলেন পুনরায়।
স্মিতাননে প্রজাপতি কহিলেন ধীরে
বিরোচন সহ যদি গিয়াছিলে ফিরে,
কহ গো মনীষী ইন্দ্র, কি হেতু আবার
আইলে আমার কাছে, কহ সমাচার?
ইন্দ্র——
হয়েছে ভাবনা বড়, দেব প্রজাপতি,
না দেখিয়ে বাক্যে তব কোনই সঙ্গতি।
শরীরে করিলে যুক্ত বস্ত্র আভরণ
বস্ত্র অলঙ্কারে আত্মা হয় সুশোভন,
শরীর ধুইলে আত্মা হয় পরিষ্কার
কিছুই সন্দেহ বটে নাহিক ইহার।
কিন্তু যদি অন্ধ হয় দেহ আপনার
আত্মাও হইবে অন্ধ কি সন্দেহ তার?
খড়্গাঘাতে কাটি' যদি শির কিম্বা কর
বহিবে রুধির ধারা বক্ষের উপর,
আত্মারো যাইবে কর মস্তক পড়িয়া
বহিবে রুধির ধারা বক্ষে গড়াইয়া,

শরীরের নাশে আত্মা নষ্ট, অতঃপর
কিসে বলি এই আত্মা অজর অমর?
প্রজাপতি——
তাই, ইন্দ্র, ঠিক যাহা বলিতেছ তুমি,
আবার তোমারে ইহা বুঝাইব আমি।
বত্রিশ বৎসর ফের কাটাও দুয়ারে
কাল পূর্ণ হ'লে আসি' কহিব তোমারে।

ক্রমশঃ

আয় ব্যয়।

ফাল্গুন ও চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৪ এবং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৫।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	২৫১৬ ৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত			৩০৩৯ /০
সমষ্টি	...	...	[illegible]৫। ৬
ব্যয়	...	...	২৭[illegible]। ৬
স্থিত	...	...	২[illegible]৩৲

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	[illegible]৶৬
দান প্রাপ্তি।		
শ্রীমৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		২৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায় প্যারীমোহন রায়		২০৲
,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়		২৲
,, অখিলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়		২৲
,, চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত (পাতুয়া)		১৲
[illegible]নাথ ঠাকুর		১৲
,, ,, সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৲
,, ,, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৲
,, ,, অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৲
,, ,, দয়ালচন্দ্র শিরোমণি		২৲
,, ,, দীননাথ অধ্যেতা		১৲
,, ,, শ্যামলাল সুর		২৲
,, ,, মণিলাল মল্লিক		৪৲
,, ,, বনমালী চন্দ্র		১৲
,, ,, নীলকমল মুখোপাধ্যায়		১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫৲
,, ,, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৲
,, ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
,, ,, জানকীনাথ ঘোষাল	৩৲
,, ,, ভবদেব নাথ (কালনা)	২৲
,, ,, চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত (পাতুয়া)	১৲
	৩৫
দানাধারে দান প্রাপ্তি	১১৶৩
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৫।৩
	১২৯।৶৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৯৯৸৶০
পুস্তকালয়	...	১৮৩৸৵০
যন্ত্রালয়	...	১৫১৭।৵৩
গচ্ছিত	...	১৭২॥ ৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২৩৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার		৯০৲
সমষ্টি		২৫১৬ ৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৫৮৯॥ ৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৭৭৫।৶০
পুস্তকালয়	... ...	১৯৫॥৵৩
যন্ত্রালয়	... ...	৮৮৩৸/৯
গচ্ছিত	... ...	১৫৫॥/৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৮২। ৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার		৯০৲
সমষ্টি	... ...	২৭৭২। ৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক শুক্রবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

একাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৫
৪৯৬ সংখ্যা
শক ১৮০৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আত্মা-পরমাত্মা।

বড়ই সুন্দর দুটি বড়ই পুলকে ভরা
এক নিরালম্ব, তার, অন্যটি বক্ষেতে ধরা।
একের মঙ্গল-সুধা বহিতেছে প্রেম টানে
নিয়ত তাহাই পিয়ে অন্যটি বাঁচিয়া প্রাণে।
একটির আদি নাই, অন্ত নাই, সীমা নাই,
কালহারা দেশহারা নিজে আছে নিজঠাঁই।
স্বাভাবিক জ্ঞান তার স্বাভাবিক ক্রিয়া বল,
স্বভাবে ফুটিয়া জ্যোতি করিতেছে ঢল ঢল।
সে মহান্ জ্যোতি পে'য়ে ক্ষুদ্রটি আলোকময়,
সূর্য্য পরকাশে যথা চন্দ্র পরকাশ হয়।
ও যত ইহারে চায়, এ তত উহারে চায়,
উহার কিরণে ক্রমে এ অতি প্রকাশ পায়।
আহা মরি এ কি ভাব। সবি অতুলন হেথা,
আহা মরি এ সুদৃশ্য অনত্র পাইব কোথা?

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৪ কার্ত্তিক রবিবার ৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।

ঈশ্বর মঙ্গল-স্বরূপ। সমস্ত প্রকৃতিই ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য। কিন্তু মনুষ্যের মন এক অপূর্ব্ব আদর্শে বিরচিত; মনুষ্য মঙ্গল উপভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না—মঙ্গল সাধন করিতে চাহে। পশু পক্ষীদের মন প্রকৃতির আদর্শে গঠিত—মনুষ্যের আত্মা স্বয়ং ঈশ্বরের আদর্শে গঠিত। প্রকৃতি যেমন চালিত হইয়া কার্য্য করে—পশু পক্ষীরাও সেইরূপ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে; আর, ঈশ্বর যেমন মঙ্গলের প্রবর্ত্তক মনুষ্যও সেইরূপ মঙ্গলের অনুষ্ঠাতা। মঙ্গল কেবল উপভোগ-মাত্র করিয়া কোন কালেই মনুষ্য নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই—পারিবে না। পুরাকালে ভারতবাসীরা অল্প মঙ্গল-ভোগেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন—এবং অধিকাংশ কাল মঙ্গলের সাধন কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতেন,—দেবতা অতিথি প্রভৃতি অর্চ্চনা না করিলে তাঁহাদের মন কিছুতেই তৃপ্তি মানিত না। ঈশ্বর সকল মঙ্গলের আকর—সমস্ত প্রকৃতিই ঈশ্বরের মঙ্গল ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতেছে; ঈশ্বর সকলের প্রতি চাহিয়া আছেন—কিন্তু ঈশ্বরের দিকে কেহ চাহে না;—মনুষ্যই কেবল ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া থাকিতে পারে না—মনুষ্যই ঈশ্বরের জন্য কার্য্য করিতে ব্যগ্র হয়। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাঁহার

প্রদত্ত মঙ্গল উপভোগ করা—এবং ঈশ্বরোদ্দেশে মঙ্গল সাধন করা—ইহাই মনুষ্যের প্রকৃত মঙ্গল,—ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করাই মনুষ্যের প্রকৃত মঙ্গল;—আর, ঈশ্বরকে স্মরণ না করিয়া পশুদিগের ন্যায় তাঁহার প্রদত্ত মঙ্গল উপভোগ করা এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনায় কার্য্য করা—ইহাই মনুষ্যের অমঙ্গল। আর আর জীবেরা প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া যাহা করে তাহাই তাহাদের মঙ্গল; কেন না স্ব স্ব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের অন্তঃকরণে মঙ্গলের যে একটি ভাব আছে, তাহা তাহার মনোরাজ্যের (অর্থাৎ প্রবৃত্তি-রাজ্যের) অনেক উপরে অবস্থিতি করে। স্ব স্ব প্রবৃত্তির উপরে নিকৃষ্ট জীবদিগের কোন অধিকার নাই—তাহারা প্রবৃত্তি-পাশে এরূপ জড়িত যে, কদাচিৎ যদি তাহারা কোন প্রবৃত্তি সম্বরণ করিতে বাধ্য হয়—সে কেবল আর-এক প্রবৃত্তির অনুরোধে; যদি তাহারা লোভ সম্বরণ করে—সে হয় ত ভয়ের অনুরোধে—যদি ভয় সম্বরণ করে—সে হয়ত অপত্য-স্নেহের অনুরোধে; মঙ্গল বিবেচনা করিয়া তাহারা কোন কার্য্যই করিতে পারে না; মঙ্গলের ভাব যাহাকে আমরা বলি তাহা তাহাদের অন্তঃকরণের কোন স্থানেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মনুষ্যই কেবল আপন মনোরাজ্যের অনেক উপরে অবস্থিতি করে—এবং সেই উচ্চ প্রদেশ হইতে মনোরাজ্যের কোথায় কি হইতেছে তাহা দেখিতে পায় এবং দেখিয়া শুনিয়া তাহার উপর আপনার অধিকার বিস্তার করে। মনুষ্যই কেবল দেখিতে পায় যে, এক এক প্রবৃত্তি আর আর সমুদায় প্রবৃত্তির সহিত জড়িত,—এরূপ দৃঢ় পাশে জড়িত যে, কোন একটি প্রবৃত্তিকে বেশী-মাত্রা প্রশ্রয় দিলে তাহারও অনিষ্ট সাধন করা হয়,—আর আর প্রবৃত্তিরও অনিষ্ট সাধন করা হয়;—যুদ্ধ-সম্বন্ধে যেমন বলা যাইতে পারে যে, সেনা-বিশেষের জয় হউক বা না হউক—সেনাপতির জয়ই প্রকৃত জয়, মনুষ্যের কার্য্য সম্বন্ধে সেইরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রবৃত্তি-বিশেষ চরিতার্থ হউক বা না হউক—আত্মার মঙ্গল উদ্দেশ্যের চরিতার্থতাই মনুষ্যের প্রকৃত পুরুষার্থ। সে মঙ্গল উদ্দেশ্য যে, কি তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি—ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন,—এক কথায়, ঈশ্বরের উপাসনা,—ইহাই মনুষ্যের প্রকৃত পুরুষার্থ; তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "কুশলান্ন প্রমদিতব্যং" মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হইবে না—ইহার অর্থ ঈশ্বরোপাসনা হইতে বিচ্যুত হইবে না।

মঙ্গলের পথ কোথায় না উন্মুক্ত রহিয়াছে—মঙ্গল যেখানে নাই এমন স্থানই নাই; জলে স্থলে আকাশে অন্তরীক্ষে ভূলোকে দ্যুলোকে সর্ব্বত্রই মঙ্গল-শোভা দীপ্তি পাইতেছে—মঙ্গল-ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে। বহির্জগতে মঙ্গলের আবির্ভাব এবং মনুষ্যের অন্তঃকরণে মঙ্গলের ভাব উভয়ে একতানে মিলিত হইয়া জোড় করে সকল মঙ্গলের আকর পরমাত্মাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করিতেছে—"যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভিঃ অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো-জাতানি ভুবনানি বিশ্বা"। আমরা পুরাণ পরব্রহ্মকে রাশি রাশি নমস্কার দ্বারা যোজনা করি—হে অনাদিমৎ তুমি আপন মহিমাতে বর্ত্তমান রহিয়াছ—তোমা হইতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। অদ্যকার কি মঙ্গল দৃশ্য, সাধু সজ্জন-বৃন্দের নব-বিকসিত প্রীতির আলোকে শরৎকালের এই নবোদিত প্রভাত-কিরণ কি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে—এইরূপ দৃশ্য দেখিলে হৃদয় আপনা

হইতেই গান করিয়া উঠে "মঙ্গল তোমার নাম, মঙ্গল তোমার ধাম, মঙ্গল তোমার কার্য্য তুমি মঙ্গল-নিদান।"

হে পরমাত্মন্। তুমি মুক্ত হস্তে তোমার মঙ্গল বর্ষণ করিতেছ—আমরা মুক্ত-হৃদয়ে তোমার প্রতি প্রীতি-ভক্তি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইব—এই উদ্দেশে এখানে মিলিত হইয়াছি—তুমি আমাদের বাসনা পূর্ণ কর; তুমি আমাদিগকে যাহা দিয়াছ তাহাই তোমাকে প্রত্যর্পণ করিব—আমাদের হৃদয় তোমাকে অর্পণ করিব—আমাদের এই অভিলাষ পূর্ণ কর। তোমার উদ্দেশে কার্য্য করিব—আমারদেরই এই মহান্ অধিকার! সে অধিকার তুমিই আমারদিগকে প্রদান করিয়াছ—সে অধিকার পালন করিতে পারিলে আমাদের এই ক্ষুদ্র হৃদয় আকাশ অপেক্ষা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়,—আমরা যেন মোহে মুগ্ধ হইয়া সেই দেবদুর্লভ অধিকার হইতে বিচ্যুত না হই—তোমার মঙ্গল মুখ-জ্যোতি আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ের এক-মাত্র ভরসা, সেই জ্যোতি বর্ষণ করিয়া আমাদের হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত কর—তোমার প্রেমামৃত সিঞ্চনে আমাদের হৃদয়কে মধুময় কর—তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে আমাদের আত্মাকে বলীয়ান কর—এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

গান।

রাগিণী বিভাস—তাল চৌতাল।

ওঠ ওঠরে—বিফলে প্রভাত বহে যায় যে,
মেল আঁখি, জাগ জাগো, থেকনারে অচেতন।
সকলেই তাঁর কাজে ধাইল জগত মাঝে,
জাগিল প্রভাত বায়ু, ভানু ধাইল আকাশ পথে।
একে একে নাম ধরে ডাকিছেন বুঝি প্রভু—
একে একে ফুলগুলি তাই ফুটিয়া উঠিছে বনে।
শুন সে আহ্বান বাণী—চাহ সেই মুখপানে—
তাঁহার আশীষ লয়ে, চলরে যাই সবে তাঁর কাজে

পুরাতন আর্য্যদিগের চতুরাশ্রম।

শরীরের পক্ষে যেমন বাল্য-কৌমার যৌবন-বার্দ্ধক্য এই চারিটী অবস্থা, আর্য্যঋষিগণ তেমনি মনুষ্যের ধর্ম্ম-জীবনের পক্ষে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বানপ্রস্থ এবং যতি এই আশ্রম-চতুষ্টয় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বাল্যের সুস্থতা ও সুপালনের উপর যেমন কৌমারের স্ফূর্ত্তি-উদ্যম নির্ভর করে, তেমনি কৌমারের সুশিক্ষা ও সুপোষণ, যৌবনের বল-বীর্য্য বিদ্যা-বিজ্ঞান ও জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিক্ষার অতিমাত্র সাহায্য করে। তেমনি আবার যৌবনের শক্তি-সামর্থ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান বার্দ্ধক্যের সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও শান্তি মঙ্গলের একমাত্র কারণ হইয়া থাকে। শিশু যদি বাল্য-জীবনে সুপোষিত না হয়, তাহা হইলে কৌমারের সুখ-স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত হয়। কৌমারের সুশিক্ষা ও সদ্দৃষ্টান্তের ব্যতিক্রম ঘটিলে, যৌবনের বলবীর্য্য শিক্ষা-সাধনের এবং চরিত্র-সংগঠনের বিশেষ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইয়া বার্দ্ধক্যকে এককালে অসুখ অশান্তি দুঃখ-ক্লেশের একায়তন করিয়া তোলে। মনুষ্যের দৈহিক জীবনের মধ্যে যেমন একটী অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তেমনি তাহার ধর্ম্ম-জীবনে আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে একটী নৈকট্য সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন করিয়া দিলে মনুষ্য-জীবন পশু-জীবন অপেক্ষা হেয় হইয়া পড়ে। এই সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিলে মনুষ্য উত্তরোত্তর উন্নতি-সোপানে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা ও সমাধি-সাধনে সামর্থ্য লাভ করত ক্রমে দেব-লোক ব্রহ্মলোকের উপযুক্ত হইতে থাকে এবং ঈশ্বরের সহিত সর্ব্বদা যুক্ত-মনা যুক্তাত্মা হইয়া থাকিতে পারিলে ক্রমে তাহার মুক্তির পথ সহজ ও সরল হইয়া যায়।

১। ব্রহ্মচর্য্য। মনুষ্যের ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম অবস্থাই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যই

সকল আশ্রমের ভিত্তি-ভূমি। ব্রহ্মচর্য্যই ক্রমোন্নত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-সাধনের একমাত্র সোপান-স্বরূপ। ব্রহ্মচর্য্য যথানিয়মে প্রতিপালিত হইলে মনুষ্য অপরাপর আশ্রমোচিত ধর্ম্মসাধনে শক্তি সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য যথাবিধি সংসাধিত না হইলে উপর্য্যুপরি আশ্রমত্রয়ের কর্ত্তব্য সাধন বিষয়ে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। দৈহিক জীবনের ন্যায় ধর্ম্ম-জীবনের মধ্যেও একটি পরস্পর সাহায্য-সাপেক্ষ নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়াই প্রকৃতিদর্শী আর্য্য-ঋষিগণ আশ্রম-চতুষ্টয়ের অবতারণা করত পারমার্থিক উন্নতি-সাধনের প্রশস্ত বর্ত্ম প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বাল্যাবস্থা যেমন ঊর্দ্ধতন অবস্থা সকলের আধার, তেমনি ব্রহ্মচর্য্যই সকল আশ্রমের পত্তন-ভূমি। এই জন্যই গর্ব্ভবাস কাল হইতে গণনা করিয়া অষ্টমবর্ষই সাধারণতঃ দ্বিজের ব্রহ্মচর্য্য ধারণের মুখ্য কাল বলিয়া আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। যথা—

"গর্ব্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নং।"

মনু।

কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মতেজঃপ্রার্থী, তাঁহাদের গর্ব্ভবাস হইতে পঞ্চমবর্ষেই উপনয়ন হওয়া উচিত, ইহারও বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

"ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।"

মনু।

ইহার তাৎপর্য্য আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে মানসিক বৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই গুরু-গৃহে সদাচার ও সদ্ব্যবহার শিক্ষা আরম্ভ হইলে, সাধু-সঙ্গ ও সদ্দৃষ্টান্ত লাভ করিতে পারিলে, বাল্য-জীবন হইতেই ব্রহ্মবিদ্যায় উপদিষ্ট হইতে থাকিলে, ব্রহ্মচারী শুদ্ধসত্ব ও জ্ঞান-প্রেমে উন্নত হইয়া কালেতে যথার্থই ভূমণ্ডলে দেব-প্রভাব ধারণ করিতে পারে। কে না জানে যে বাল্যকালে যাহা শিক্ষিত বা অভ্যস্ত হয়, প্রস্তর-খোদিত রেখার ন্যায় তাহা চির জীবন দীপ্তি পাইতে থাকে। সেই জন্যই বাল্য জীবন হইতেই ব্রহ্মচর্য্য ধারণের পদ্ধতি আর্য্য-ভূমিতে প্রচলিত হইয়াছিল।

২। ব্রহ্মচারীর শিক্ষা। ব্রহ্মচারীর গুরু-গৃহে শৌচাচার প্রভৃতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মিতাচারী মিতাহারী হইয়া, শরীরের দৃঢ়তা-সাধন ও মনের স্থিরতা সম্পাদন পূর্ব্বক দশবিধ ধর্ম্মলক্ষণ শিক্ষা করিয়া, তৎসমূহ কার্য্যেতে পরিণত করিবার বিধিব্যবস্থা আছে। সেই ধর্ম্মলক্ষণ এই যথা—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং।

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অস্তেয়, দেহ ও অন্তরশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্র-জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্য-কথন ও অক্রোধ, বাল্যকাল হইতে এই সকল শিক্ষা করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে অভ্যাস হইলে, মনুষ্যের উন্নতি-সোপানে উত্থিত হইবার আর কোন অভাবই থাকে না। তিনি যথার্থই ভূদেব হইয়া কি বিষয়-ক্ষেত্রে, কি ধর্ম্ম-রাজ্যে সর্ব্বত্রই দীপ্তি পাইতে থাকেন। গুরু-গৃহে বাস করত ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য তপস্যার অনুষ্ঠান করিবে, সংক্ষেপে ব্রহ্মচারীর প্রতি এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

"গুরৌ বসন্ সঞ্চিনুয়াদ্ ব্রহ্মাধিগমিকং তপঃ।

মনু।

৩। ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ। ব্রহ্মচারী দুই প্রকার, উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। যাঁহারা গুরু-গৃহে দীর্ঘকাল অবস্থান পূর্ব্বক সদাচার ও সদ্ব্যবহার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অস্তেয়, দেহ ও অন্তর-শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্র-জ্ঞান, ব্রহ্ম-বিদ্যা, সত্য-

কথন, ও অক্রোধ এই দশবিধ ধর্ম্ম-লক্ষণ শিক্ষা করিয়া তৎসমুহ কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি সামর্থ্য লাভ করত তথা হইতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক দার-পরিগ্রহানন্তর সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করেন, তাঁহারা উপকুর্ব্বাণ; এবং যাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমৃত্যু গুরু-গৃহে অবস্থান করিয়া বিষয়-ভোগস্পৃহা ইন্দ্রিয়-সুখ-কামনায় জলাঞ্জলি দিয়া, কেবলই অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও পরব্রহ্মের ধ্যান, ধারণা এবং সমাধি-সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া, লোক-সাধারণের মধ্যে বিবেক-বৈরাগ্যের ও জ্বলন্ত ঈশ্বর-প্রেমের জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করত কেবল তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করেন, তাঁহারাই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মচার্য্যুপকুর্ব্বাণোনৈষ্ঠিকোব্রহ্মতৎপরঃ।
যোহধীত্য বিধিবদ্বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাব্রজেৎ।
উপকুর্ব্বাণকোজ্ঞেয়োনৈষ্ঠিকোমরণান্তিকঃ।
কূর্ম পুরা

দ্বিতীয়, সংসার-আশ্রম। ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইলেও ব্রহ্মচর্য্য তাঁহার পক্ষে পরিত্যজ্য নহে। গুরু গৃহে ব্রহ্মচর্য্য-সাধন-জনিত যে শরীরের দৃঢ়তা, মনের স্থিরতা উপার্জ্জন এবং যে দশ বিধ ধর্ম্মলক্ষণ শিক্ষা করিয়াছিলেন, গৃহস্থের পক্ষে সংসারই তৎসমূহের একমাত্র অভিনয়-ক্ষেত্র। তাঁহাকে যে সংসাররূপ রণ-ভূমিতে বিষয়ের আকর্ষণ, পাপের প্রলোভন, রোগ-শোক দুঃখ-তাপ প্রভৃতির দুর্জ্জয় আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত হইতে হইবে, ব্রহ্মচর্য্য-সাধন-জনিত আধ্যাত্মিক বলই তাহার দুর্ভেদ্য বর্ম্ম-স্বরূপ। সংসারে প্রবেশ করিলেও ঈশ্বরকে চির-শরণ্য চির-সুহৃৎরূপে প্রত্য[illegible] উপলব্ধি করিয়া, ফলকামনাশূন্য হই[illegible] তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সংসাধন করিবার আদেশ ও অনুশাসন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

গৃহীর কর্ত্তব্য।

'ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহ পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। গৃহী হইলেও ব্রহ্মেতে তাঁহার চির নিষ্ঠা রাখিতেই হইবে পরমার্থ-তত্ত্ব-জ্ঞানের আলোচনায় তাঁহাকে দিনপাত করিতেই হইবে। তিনি যে কোন কার্য্য করুন, ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া, অভিমানশূন্য হইয়া, তাহা ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন, যশ-মান-খ্যাতি প্রতিপত্তির আশা বিসর্জ্জন দিয়া, নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম ভাবে আপনাকে ঈশ্বরের সেবক ও আজ্ঞাধীন ভৃত্য জানিয়া, কেবল তাঁহারই ইচ্ছা ও উদ্দেশ সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন। "তাঁহাতেই যোগ জিত-চিত্ত হইয়া সংসার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। সম্পৎকালে তাহারই অনুগত হইয়া চলিবেক, বিপৎকালে তাঁহারই শরণাপন্ন হইবেক। শরীর পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিবে কিন্তু আত্মা পরমাত্মাতে অবস্থিত থাকিবে সংক্ষেপেতে ইহাই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম।

গৃহস্থ দ্বারা আত্মীয় স্বজন প্রতিপালি[illegible] হয়, আত্মপর সকলের জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতি ও উৎকর্ষ সংসাধিত হয়, অতি[illegible] অভ্যাগত ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ এবং য[illegible] প্রভৃতি নিরুপায় নিরাশ্রয় ব্যক্তিবর্গ পোষি[illegible] ও সুরক্ষিত হইয়া থাকে, এই জন্যই গৃহস্থাশ্রমের এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগ[illegible] যান্তি সংস্থিতি
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিং।

যেমন সমুদায় নদনদী সাগরে যাই[illegible] অবস্থান করে, তেমনি অন্যান্য সকল আশ্র[illegible] বাসীরাই গৃহস্থাশ্রমের সাহায্যেই প্রাণ ধার[illegible] করে। পশু পক্ষীর ন্যায় কেবল আত্মোদ[illegible] পূরণ, আত্ম-সুখ-সাধন গৃহস্থের কার্য্য নয়

নিত্য দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, নিত্য অতিথি অভ্যাগত আত্মীয় কুটুম্বের সেবা, নিত্য জ্ঞান-ধর্ম্ম বিতরণ প্রভৃতিই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম।

শক্ত্যান্নদানং সততং তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
যথার্হং প্রতিপূজা চ সর্ব্বভূতেষু বৈ সদা॥
দেয়মার্ত্তস্য শয়নং পরিশ্রান্তস্য চাসনম্।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্॥
অন্নদঃ সুখমাপ্নোতি সুতৃপ্তঃ সর্ব্ববস্তুদ্।
ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিদ্যাদানাৎ ততোঽধিকম্॥
ঔষধং পথ্যমাহারং স্নেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়ম্।
দানান্যেতানি দেয়ানি দানানি চ বিশেষতঃ॥
দীনান্ধকৃপণাদিভ্যঃ শ্রেয়স্কামেন ধীমতা।

"যথাশক্তি সতত অন্নদান করিবেক, তিতিক্ষা করিবেক, ও নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক, এবং সর্ব্বদা সকলের প্রতি যথোচিত সমাদর করিবেক। রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয়, এবং ক্ষুধিতকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিবেক।

যিনি অন্নদান করেন, তিনি অন্য বস্তু সকলের দাতা অপেক্ষা সুতৃপ্ত হইয়া সুখ লাভ করেন। ভূমি দানের পর আর দান নাই; বিদ্যাদান তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট।

শ্রেয়োভিলাষী ধীমান দীন অন্ধ প্রভৃতি কৃপা পাত্রদিগকে ঔষধ পথ্য আহার মেক্ষণীয় স্নেহদ্রব্য ও স্থান এই সকল দান এবং অন্য অন্য দানও দিবেন"। গৃহস্থের প্রতি পবিত্র আর্য্য-ধর্ম্মের এই বলবৎ অনুশাসন।

দানধর্ম্ম গৃহস্থের নিত্যধর্ম্ম। অমঙ্গল অশৌচ নিবন্ধন যে কয়েক দিন গৃহ-পরিবারের মধ্যে দান-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না হয়, অশৌচ-অন্তে পঞ্চশূনাবধ জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিশেষ দান না করিলে কি দেব-কার্য্যে কি পিতৃ-কার্য্যে আদৌ অধিকারই হয় না, আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার বিশেষ অনুশাসন দৃষ্ট হইয়া থাকে। কি ব্রত কর্ম্ম কি শ্রাদ্ধ-প্রায়শ্চিত্ত, কি শান্তি স্বস্ত্যয়ন, কি অন্যবিধ দেব-কার্য্য, ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতাগণ দান ক্রিয়াকেই তন্মধ্যে মুখ্য-কর্ম্ম রূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ যতি এই চারি আশ্রম গৃহস্থাশ্রম হইতেই উৎপন্ন হয়, গৃহস্থাশ্রম হইতেই ইহা পালিত পোষিত এবং রক্ষিত হইয়া থাকে। গৃহস্থগণ অপরাপর আশ্রমীদিগকে পোষণ না করিলে তাঁহারদের আশ্রমোচিত ধর্ম্ম-সাধন ও প্রাণ ধারণ হয় না বলিয়াই গৃহস্থাশ্রমের এত গৌরব এত প্রভাব। যথা

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতে গৃহস্থপ্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ।
যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বআশ্রমাঃ।

মনু।

গৃহস্থ ব্যক্তি আমৃত্যু কেবল ইন্দ্রিয়-সেবা বিষয়-সেবাতেই নিযুক্ত থাকিলে, তাহার সংসার-সুখ লালসাই বৃদ্ধি হইবে, বিষয়-বিভব মান সম্ভ্রম, আত্মীয়-স্বজনের প্রতিই তাহার ঐকান্তিক মমতা বৃদ্ধি পাইবে, তন্নিবন্ধন পরলোক-চিন্তা ক্রমে খর্ব্ব হইয়া যাইবে, সে সংসারের কীট, বিষয়ের দাস হইয়া মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিবে, এই নিমিত্তই সেই সকল বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা

তৃতীয় আশ্রম অবলম্বন কাল।

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ।

মনু।

গৃহস্থ যখন আপনার দেহে চর্ম্মের শিথিলতা, কেশে পক্কতা ও পুত্রের পুত্র অবলোকন করিবে, তখন বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য বনে গমন করিবে।

শরীর লোলিত, কেশ পলিত এবং দন্ত স্খলিত হইবার এবং পৌত্র দৌহিত্রের মুখাবলোকন করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মেই সাংসারিক বহুবিধ সুখ-ভোগে মনু-

যোগ স্বভাবতই অসমর্থতা বা বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়। উপার্জ্জনশীল পুত্রাদি সংসার-ধর্ম্ম-প্রতিপালনের ভার গ্রহণে সমর্থ হইলে, ব্যক্তি সহজেই অবসর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই অনুকূল অবসর প্রাপ্ত হইলে, চির-সেবিত একবিধ বিষয়-সুখ পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিতচর্ব্বণ না করিয়া, শ্রেষ্ঠতম বিশুদ্ধতম দেব-ভোগ্য ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের জন্য অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য। যে ধন পরলোকের সম্বল, অনন্ত জীবনের উপজীবিকা, দৈহিক বন্ধনের শিথিলতার সঙ্গে বিষয়-বন্ধন উন্মোচন করিয়া, সাংসারিক উৎপাত উপদ্রব হইতে অপসৃত হইয়া, সেই অমৃত-ধন-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়াই প্রার্থনীয়। যেখানে সংসারের কোলাহল নাই, বিষয়ের উপদ্রব নাই, ইন্দ্রিয়-সুখ-কর বিলাস-দ্রব্যের প্রলোভন নাই, অথচ যে স্থান কেবল প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ, যে স্থানে ঈশ্বরের জ্ঞান-শক্তি-মহিমা জাজ্জ্বল্যমান, তাদৃশ পর্ব্বত-অরণ্য, নদ-নদী সরোবর, নির্ঝর উপত্যকা-সন্নিহিত নির্জ্জন নিভৃত প্রাকৃতিক-প্রভাব-যুক্ত ভূমি এবং যে সকল স্থান জলের উৎকর্ষতা নিবন্ধন বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ এবং সদ্বিদ্যাশালী চিন্তাশীল ধ্যানপরায়ণ ভগবৎ-ভক্ত সাধুগণের অবস্থান-জনিত পবিত্র, ঈদৃশ তীর্থ-স্থান সকলই বানপ্রস্থাশ্রমীর ধর্ম্মচিন্তার ও ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা সমাধি সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এই জন্যই ঈদৃশ তীর্থ-ভূমি পুণ্য-স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা

> প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা
> পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা

স্কন্দপুরাণ।

বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম সাধন জন্য গৃহী একাকী বা সস্ত্রীক গমন করিতে পারেন, ইহারও বিধি আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং বানপ্রস্থ-আশ্রমে প্রলোভনীয়-অন্নপান গ্রহণ, সুখকর বিলাস-পরিচ্ছদাদি ব্যবহার প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার স্পষ্ট আদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে। যে বিষয়-কামনা এবং ভোগ-লালসা খর্ব্ব করিবার উদ্দেশেই বানপ্রস্থ-আশ্রমের অবতারণা হইয়াছে, তথায় ভোগ-বিলাসের দ্রব্য সামগ্রী লইয়া গমন করিলে গৃহস্থাশ্রমের সঙ্গে আর কোন প্রভেদ পার্থক্য থাকে না, তজ্জন্যই এই অনুশাসন ও আদেশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যথা

> সন্ত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্ব্বঞ্চৈব পরিচ্ছদং।
> পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা॥

মনু।

বানপ্রস্থের কর্ত্তব্য। বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করিয়া যাহাতে শরীর শীতাতপাদি দ্বন্দ্বসহনশীল হয়, ভোগলালসা ও ইন্দ্রিয়-সুখ-কামনা খর্ব্ব হয়, ব্রহ্মজ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে উত্তরোত্তর অধিকতর আস্থা অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সর্ব্বদা ধর্ম্ম-গ্রন্থ অধ্যয়নে রত থাকিবে, শীতাতপাদি দ্বন্দ্ব সহনশীল হইবে, সকলের উপকার করিবে, মনের সংযমন করিবে, প্রতিদিন দান করিবে, কাহারও দান গ্রহণ করিবে না, সকল প্রাণির প্রতি দয়া করিবে, বানপ্রস্থ-আশ্রমীর প্রতি এই আদেশ ও অনুজ্ঞা। এই তাহার নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যথা

> স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ
> দাতা নিত্যমনাদাতা সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ॥

মনু।

বানপ্রস্থ-আশ্রমে মিতাহার মিতাচার দ্বারা ক্রমে যেমন ভোগ-স্পৃহা খর্ব্ব হয়, তেমনি শরীর মনের সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যগুণ বর্দ্ধিত হয়, অপ্রতিগ্রহ দ্বারা লোভের খর্ব্বতা এবং দয়া ও দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-প্রভাবে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য-সাধন জনিত অন্তরে আত্ম-প্রসাদের আধিক্য হইতে থাকে।

এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন, প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য্য অবলোকন ও সাধু-সঙ্গ সাধু-আচরণ দ্বারা পরব্রহ্মের সত্তা সন্নিকর্ষ হৃদয়ে সর্ব্বদা উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। বিষয়-সুখের কথা দূরে থাকুক, তখন স্বর্গ-ভোগ-স্পৃহাও নির্ব্বাণ হইয়া যায়, এবং আত্মার অনিমেষ জ্ঞান-নেত্র তদবস্থায় কেবল ব্রহ্মদর্শনজন্য সস্পৃহ-ভাবে অবস্থান করে। ব্রহ্মের সেই অতুলন সৌন্দর্য্য-ছটার আভাস মাত্র জ্ঞান-নেত্রে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলেই সাধক আপনা হইতেই স্তম্ভিত ও অবাক্ হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার আর কিছুই বলিতে বা অন্য কিছু করিতে ইচ্ছা হয় না। কেবল মুনি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, নিঃসঙ্গ হইয়া, তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান-শক্তি ধ্যানে অহর্নিশি নিমগ্ন থাকিয়া, অবশিষ্ট জীবন-কাল ক্ষেপণ করিতে সততই ইচ্ছা হইয়া থাকে। সাধকের এই অবস্থাই শেষ আশ্রমের অবস্থা।

চতুর্থ আশ্রম অবলম্বনকাল।

বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষোভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ।

মনু

পরমায়ুর তৃতীয়-ভাগ বনে বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করিয়া ও বিবিধ দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান দ্বারা বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইলে জীবনের চতুর্থ অংশে বিষয়-সঙ্গ পরিহার করত ঈশ্বরে মনঃসমাধান পূর্ব্বক পরিব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস-আশ্রমের অনুষ্ঠান করিবে।

যত্যাশ্রমীর কর্ত্তব্য। যত্যাশ্রমে থাকিয়া শরীর ও সংসারের অনিত্যতা এবং আত্মার নিত্যত্ব এবং অমৃতত্বের চিন্তা করিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস করিবে। সকল বিষয় হইতে হৃদয় মন আত্মাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্ম-ধ্যান-রত ও ব্রহ্মগতপ্রাণ হইয়া থাকিবে। "এইরূপে যখন তিনি সমুদায় কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গাদিতেও নিস্পৃহ হইয়া, আত্ম-সাক্ষাৎকারে তৎপর হইবেন ও ব্রহ্মে একান্তে মনঃসমাধান করিয়া পাপ-পরিত্যাগ করিবেন, তখন তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন।

এবং সংন্যস্য কর্ম্মাণি স্বকার্য্যপরমোঽস্পৃহঃ।
সংন্যাসেনাপহত্যৈনঃ প্রাপ্নোতি পরমাঙ্গতিং।

যথানিয়মে শরীর সুপোষিত হইলে যেমন বাল্যের পর কৌমার, কৌমারের পর যৌবন-জরা নিঃশব্দে পর্য্যায়ক্রমে সমাগত হয়; তেমনি ধর্ম্ম-জীবনের ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থাদি আশ্রমোচিত কার্য্যাদি যথাপদ্ধতি নিষ্পাদিত হইলে ব্রহ্মোপাসক সহজে জ্ঞানধর্ম্মে পরিপুষ্ট হইয়া এবং অল্পে অল্পে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা, আকর্ষণ প্রলোভন, পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমোন্নতিলাভ পূর্ব্বক পরব্রহ্মে গমন করেন।

অনেন ক্রমযোগেন পরিব্রজতি যোদ্বিজঃ।
স বিধূয়েহ পাপ্মানং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।

মনু।

গান।

রাগিণী আসাবরি টোড়ি—তাল তেওট।

দিন ত চলি গেল প্রভু বৃথা,
কাতরে কাঁদে হিয়া।
জীবন অহরহ হতেছে ক্ষীণ,
কি হল এ শূন্য জীবনে।
দেখাব কেমনে এই ম্লান মুখ
কাছে যাব কি লইয়া।
প্রভু হে যাইবে ভয়, পাব ভরসা,
তুমি যদি ডাক এ অধমে।

প্রীতি-তত্ত্ব।

প্রীতি-শব্দে সাধারণতঃ ভালবাসা বুঝায়। কিন্তু প্রীতি-শব্দের যেরূপ চলিত অর্থ তাহাতে অধিকাংশ-স্থলে প্রীতি-শব্দে কেবল সমানে সমানে ভালবাসাই বুঝায়—

ভক্তি স্নেহ প্রভৃতি বুঝায় না। আমরা পূর্ব্বোক্ত সাধারণ অর্থেই প্রীতি শব্দ ব্যবহার করিব—যেখানে বিশেষার্থে প্রীতি-শব্দের ব্যবহার আবশ্যক বোধ করিব সেখানে তাহা করিবার পূর্ব্বে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিব।

প্রীতি মনকে রঞ্জিত করে, এই জন্য তাহার এক নাম—অনুরাগ; প্রীতি হৃদয়ে হৃদয়ে জোড়া লাগাইয়া দেয়, এই জন্য তাহার আর এক নাম—আসক্তি। প্রীতির বলে লোকে যেমন ঠিক্ ঠাক্ অভীষ্ট কার্য্য সাধন করিতে পারে—শুদ্ধ কেবল বিদ্যার বলে সেরূপ পারে না। পথ দেখিয়া চলিবার জন্য জ্ঞান-চক্ষু যেমন আবশ্যক—প্রেম-চক্ষুও তেমনি আবশ্যক; অথবা—প্রেম-চক্ষুই চক্ষু, জ্ঞান তাহার আলোক; জ্ঞানালোক ব্যতিরেকে প্রেম-চক্ষু অন্ধবৎ হইয়া যায়, প্রেম-চক্ষু ব্যতিরেকে জ্ঞানালোক যে কার্য্যেরই হয় না। "ইহাতে ইহা হয়, উহাতে উহা হয়" ইহা জানাইয়া দিবার জন্য জ্ঞান-গুরুর প্রয়োজন,—কিন্তু জ্ঞানের প্রদর্শিত পথে আমাদিগকে হাত ধরিয়া লইয়া যায় কে?—প্রেম ভিন্ন আর কেহ তাহা পারে না। জ্ঞান-গুরু সন্ধান বলিয়া দেয়—জ্ঞান গুরু উপদেষ্টা, প্রেম-গুরু হাত ধরিয়া লইয়া যায়—প্রেম-গুরু নেতা। শুদ্ধ কেবল জ্ঞানে কিছুই হয় না;—ন্যায়-শাস্ত্র জানিলেই কিছু আর সুতার্কিক হওয়া যায় না, ব্যাকরণ শাস্ত্র জানিলেই কিছু আর সুলেখক হওয়া যায় না, সঙ্গীত শাস্ত্র জানিলেই কিছু আর সুগায়ক হওয়া যায় না,—তাহাতে বিশেষ ক্ষমতা অপেক্ষিত হয়;—সেই বিশেষ ক্ষমতাটি জ্ঞান-প্রধান নহে কিন্তু প্রেম-প্রধান—অনুরাগ-প্রধান—আসক্তি-প্রধান। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, অনুরাগ না থাকিলেও মনোযোগ দ্বারা, অভ্যাস দ্বারা, আলোচনা দ্বারা, লোকে বিদ্যা-বিশেষে বা কার্য্য-বিশেষে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, কিন্তু সেটি ভুল; যে বিষয়ে মনই নাই সে বিষয়ে মনোযোগ কিরূপে হইতে পারে—মনোযোগ না থাকিলে অভ্যাসই বা কি কার্য্যের হয়—আলোচনাই বা কি কার্য্যের হয়। যে বিষয়ে যাঁহার মন যায়, সেই বিষয়ই তিনি অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারেন; অগ্রে অনুরাগ পরে অভ্যাস ও আলোচনা—ইহার উল্টা হইলে চলে না। ইতর ভাষায় বলে কার্য্যে আটা থাকিলেই কার্য্য ভাল হয়, সে আটা কি সামগ্রী? প্রীতিই সেই আটা—অনুরাগই সেই আটা। প্রীতির আটাতেই লক্ষ্য বস্তুতে এবং মনেতে জোড়া লাগিয়া যায়—তাই সম্মুখের বিষয়ে মন নিবিষ্ট হয়;—প্রীতির আটাতেই স্মরণের সঙ্গে প্রত্যক্ষের সঙ্গে জোড়া লাগিয়া যায়—তাই মন প্রত্যক্ষের ভূমি হইতে কল্পনা-আকাশে উড্ডীয়মান হয়, প্রীতির আটাতেই হৃদয়ে হৃদয়ে জোড়া লাগিয়া যায় তাই মনুষ্য-হৃদয়ে সখ্য দাম্পত্য বাৎসল্য প্রভৃতি নানা রসের উদ্দীপন হয়।

প্রীতির কতকগুলি লক্ষণ আছে—যেমন আকর্ষণ একটি, প্রাণ-সঞ্চার একটি, ভাব-উদ্দীপন একটি, এবং বুদ্ধির স্থৈর্য্য একটি। (১) তাহার মধ্যে তাহার আকর্ষণ-লক্ষণটি মনুষ্য-জগৎ হইতে জড় জগৎ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে, (২) প্রাণ সঞ্চার লক্ষণটি উদ্ভিদ্ জগৎ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে, (৩) ভাবোদ্দীপন লক্ষণটি জীব-জগৎ ব্যাপিয়া আছে, (৪) বুদ্ধির স্থৈর্য্য কেবল মনুষ্য-মণ্ডলীর মধ্যেই দৃষ্টি-গোচর হয়। বুদ্ধির কার্য্য নিশ্চয়-ক্রিয়া—নিশ্চয়-ক্রিয়ার দুইটি অঙ্গ, (১) বিবেক বা বিবেচনা, অর্থাৎ লক্ষ্য-বস্তু হইতে লক্ষণ-বিশেষ বিবিক্ত করিয়া লওয়া, এবং (২) যুক্তি বা যোজনা, অর্থাৎ লক্ষ্য-বস্তুর সহিত লক্ষণ-বিশেষের যোজনা; তাহার মধ্যে [illegible]-টি

জ্ঞান-প্রধান—যুক্তিটি প্রেম-প্রধান। অশ্বের জাতি-সাধারণ লক্ষণ-গুলির মধ্য হইতে আমরা যদি আরব অশ্বের জাতীয় লক্ষণ-গুলি বাছিয়া লইয়া মনোমধ্যে স্থির করি যে "এই এই লক্ষণ-গুলি আরব অশ্বের নির্ব্বাচক" তবে সেইরূপ লক্ষণ-নির্ব্বাচনা বিবেচনা-শব্দের বাচ্য, তাহার পর যখন আমরা সেই নির্ব্বাচিত লক্ষণ-গুলিকে লক্ষ্য বিষয়েতে একযোগে আরোপ করি—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কিংবা মনঃকল্পিত আরব অশ্বে আরোপ করি—তখন সেইরূপ লক্ষণ-আরোপ বা লক্ষণ-যোজনা যুক্তি শব্দের বাচ্য। বুদ্ধির প্রথম অঙ্গটিতে (বিবেক অঙ্গটিতে) প্রীতির ব্যাঘাত উপস্থিত হয়; বিবেকের পূর্ব্বে যাহাতে মন সংযুক্ত থাকে, বিবেকের সময় তাহা হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করা আবশ্যক হয়, ইহাতেই প্রীতির ব্যাঘাত হয়; কিন্তু তাহার দ্বিতীয় অঙ্গটি (যুক্তি অঙ্গটি) প্রীতি-প্রধান, ইহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই প্রকাশ পাইবে; যথা, যুক্তি বা যোজনা-ক্রিয়া প্রত্যাহার-ধর্ম্মী নহে—মনোযোগ ধর্ম্মী,মনোযোগ প্রীতি-সাপেক্ষ;—বেদান্ত-দর্শন হইতে ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম;—আত্মার পরমানন্দতা উপলক্ষে পঞ্চদশীর গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন;—

> "মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
> নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা।
> ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ
> মা ন ভূবং হি ভূয়াসং ইতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে।
> স প্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবং অন্যার্থমাত্মনি।
> অতস্তৎ পরমং তেন পরমানন্দতাত্মনঃ।
> অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়-স্পৃহা।
> অতো ভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ॥
> অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থ পুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ।
> ভানেঽপ্যভানং ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে।"

মাস বর্ষ যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে—কিন্তু যে দর্পণে মাস-বর্ষ প্রভৃতি প্রতিভাত হইতেছে সেই স্বয়ম্প্রভা সম্বিৎ* উদয়ও হয় না—অস্তও হয় না। ইনিই আত্মা—সম্বিৎই আত্মা, ইনি পরম আনন্দ-রূপী যেহেতু ইনি পরম প্রেমের আস্পদ,—কিরূপে জানিলাম যে ইনি পরম প্রেমের আস্পদ? প্রথমতঃ ইঁহাকে প্রেমাস্পদ বলি কেন—না"আমি না থাকি ইহা যেন না হয়—আমি যেন থাকি" এইরূপ প্রেমের লক্ষণ আত্মাতে দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ যাঁহার বিচ্ছেদ কল্পনাতেও সহ্য হয় না—এবং যাঁহার অধিষ্ঠান পরম-প্রার্থনীয়—তিনি প্রেমাস্পদ নহেন তো আর কে প্রেমাস্পদ?) দ্বিতীয়তঃ ইঁহাকে শুধু কেবল প্রেমাস্পদ বলিয়াই ক্ষান্ত না হই কেন—পরম প্রেমাস্পদ বলি কেন—না আগে আপনার প্রতি আমাদের প্রেম থাকাতেই অন্যের প্রতি আমাদের প্রেম ধাবিত হয়, আগে অন্যের প্রতি প্রেম থাকাতে তাহারই গুণে কিছু-আর আপনার প্রতি প্রেম জন্মে না, অতএব আত্ম-প্রেম আর আর সকল প্রেম অপেক্ষাই অধিক, এই জন্য তাহা পরম প্রেম শব্দের বাচ্য। (অর্থাৎ যাহা অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে তাহা গোড়ায় আপনাকে প্রকাশ করে,—তাহার সাক্ষী দীপালোক; অপিচ যে আলোক অন্য বস্তুকে যত অধিক প্রকাশ করে সে আলোক আপনাকে তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রকাশ করে; এইরূপ দৃষ্টান্ত অনুসারে পাওয়া যায় যে, আত্মাতেই প্রেমের ভাণ্ডার ভরপুর রহিয়াছে সেইখান হইতেই তাহা অন্যত্র বিস্তারিত হয়, অতএব আত্মপ্রেমই—আধ্যাত্মিক প্রেমই—পরম-প্রেম শব্দের বাচ্য।) তাহাই যদি হইল, আত্মাই যদি পরম প্রেমাস্পদ হইল তবে কেন লোকে আত্মপ্রেম বিস্মৃত হইয়া বিষয়-স্পৃহার বশবর্ত্তী হয়,

---

* ইংরাজী ভাষায় বলিতে হইলে Self illuminating consciousness।

আত্মা তো সকলেরই আছে তবে কেন আত্মপ্রেম-নিবন্ধন পরমানন্দতা সকলেরই না হয়? তবে কি আত্ম-প্রেম আত্মার অবিচ্ছেদ্য ধর্ম্ম নহে? ইহার উত্তর এই যে আত্ম-প্রেম ও তন্নিবন্ধন পরমানন্দতা সকলেরই আত্মাতে বর্ত্তমান আছে কিন্তু প্রতিবন্ধকতা বশতঃ—প্রতিকূল অবস্থা বশতঃ—সকলের আত্মাতে সমানরূপে প্রকাশ পায় না,—সে কিরূপ? না কোন ব্যক্তির পুত্র যখন সহাধ্যায়ী ছাত্র-বর্গের সহিত একত্রে বেদাধ্যয়ন করিতেছে, তখন ঐ পিতা আর আর ছাত্রের কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে তাহার পুত্রেরও কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পায় বটে, কিন্তু অপরাপর কণ্ঠধ্বনির প্রতিবন্ধকতা বশতঃ তাহার পুত্রের কণ্ঠধ্বনি (যাহা তাহার অত্যন্ত শ্রবণ-প্রিয়) তাহা পৃথক্‌রূপে—স্পষ্টরূপে—শুনিতে পায় না, এ ব্যক্তি যেমন পুত্রের কণ্ঠধ্বনি শুনিতেছে অথচ শুনিতেছে না,—আর আর কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে সামান্য-রূপে শুনিতেছে কিন্তু বিশেষ-রূপে—অমিশ্র রূপে—শুনিতেছে না, তেমনি অধিকাংশ-স্থানে মোহরূপ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ আত্মার পরমানন্দতা প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পায় না—পরমানন্দতা নাই যে তাহা নহে।

উপরের উদাহরণটি-দ্বারা সুন্দর-রূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, মনোযোগ প্রীতি-সাপেক্ষ। উক্ত পিতার মন যেমন সকল প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া তাহার পুত্রের কণ্ঠধ্বনির প্রতি আকৃষ্ট হয়, একজন উদাসীন ব্যক্তির কখনই সেরূপ হইতে পারে না; উক্ত পিতা তাহার পুত্রের কণ্ঠধ্বনি একেবারেই চুনিয়া লইতে পারে,—যেখানে উক্ত পুত্রের আর কোন পরিচিত ব্যক্তি বিস্তর বিবেচনা ও বিচার করিয়া তবে যদি সে কণ্ঠধ্বনির ঈষৎ ছায়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়—সেখানে উক্ত পিতার শ্রবণেন্দ্রিয় কোন বিচার বিবেচনার অপেক্ষা না রাখিয়া আগে ভাগেই সেই কণ্ঠধ্বনিটিতে ঝম্প প্রদান করে। উপরে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত ধ্বনির প্রতি উক্ত পিতার মন আকৃষ্ট হয়—এই এক রূপ মনোযোগ; আবার উক্ত উদাসীন ব্যক্তি চেষ্টা-পূর্ব্বক উক্ত ধ্বনির প্রতি মনকে নিয়োগ করে—এ আর-একরূপ মনোযোগ; পূর্ব্বোক্ত প্রকার মনোযোগ বিবেচনার পূর্ব্ববর্ত্তী, শেষোক্ত প্রকার মনোযোগ বিবেচনার পরবর্ত্তী; আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এইটি আরো বিশদ করিয়া-দেওয়া আবশ্যক হইতেছে;—মনে কর, এক ব্যক্তি তাহার কোন এক জন প্রিয় ব্যক্তির পদ-শব্দ শুনিতে পাইল; শুনিবা মাত্রই তাঁহার মনে স্থির-সিদ্ধান্ত হইল যে, ইনি অমুক; কি যুক্তি অনুসারে এরূপ সিদ্ধান্ত হইল? মনে কর সেই ব্যক্তি তাহার আর এক জন সামান্য-পরিচিত ব্যক্তির পদ-শব্দ শুনিতে পাইল, এবং অনেক বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, এ ব্যক্তি অমুক; শেষোক্ত সিদ্ধান্তের যুক্তি সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে; হয় তো কোন কার্য্য উপলক্ষে অভ্যাগত লোকটির আসিবার কথা ছিল, সুতরাং তাহার গতি দ্রুত হওয়াই সম্ভব, তাহার পদ-শব্দও সেই ধরণের; ইহাতেই শ্রোতার বিবেচনা হইল যে, এ পদ-শব্দ ঐ ব্যক্তিরই; এখানে দেখা যাইতেছে যে লক্ষ্যের সহিত লক্ষণের যোজনা—যাহাকে যুক্তি কহা যায়—তাহা বিবেচনার পরবর্ত্তী; কিন্তু ঐ ব্যক্তি যখন ইতি-পূর্ব্বে তাহার প্রিয় ব্যক্তির পদশব্দ শুনিবা-মাত্রই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, এ ব্যক্তি অমুক, তখনকার যুক্তি কোন প্রকার বিবেচনার অপেক্ষা রাখে নাই। কেহ বলিতে পারেন যে, এস্থলেও যুক্তির পূর্ব্বাহ্নে কোন না কোন প্রকার বিবেচনা অন্ততঃ অজ্ঞাতসারেও কার্য্য করিয়াছে; ইহার উত্তর এই

যে, জ্ঞানের ধর্ম্মই এই যে, তাহা আপনি আপনাকে জানে, সুতরাং যে-কোন জ্ঞান-ক্রিয়া জ্ঞাতার অজ্ঞাত-সারে নিষ্পন্ন হয় তাহা জ্ঞান-ই নহে; বিবেচনা একটি জ্ঞান-ক্রিয়া মাত্র—তাহা কিরূপে অজ্ঞাত-সারে নিষ্পন্ন হইবে?—প্রশ্নকর্ত্তা যাহাকে বলিতেছেন "অজ্ঞাত-সারে বিবেচনা" তাহার অর্থ আর কিছুই নহে—সংস্কার; সংস্কারের মুখ্য কারণ অনুরাগ; যথা—যাহাতে যাহার অনুরাগ হয় বা অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়া হয়—তাহাতেই তাহার মনোযোগ হয় এবং সেই মনোযোগের আবৃত্তি হইতেই সংস্কার জন্মে।

জ্ঞানের গতি দুই প্রকার; নৈসর্গিক গতি কিম্বা যাহা একই কথা—প্রমুক্ত গতি, এবং নিয়ন্ত্রিত গতি। যে যুক্তি বিবেচনার পূর্ব্ব-বর্ত্তী তাহাই জ্ঞানের প্রমুক্ত গতি, এবং যে যুক্তি বিবেচনার পরবর্ত্তী তাহাই জ্ঞানের নিয়ন্ত্রিত গতি; শেষোক্ত যুক্তি বিচার শব্দের বাচ্য।* যে যুক্তি বিবেচনার পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে প্রীতির চিহ্ন স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জড় বস্তুর আকর্ষণ, বৃক্ষের প্রাণ, জীবের সংস্কার এবং মনুষ্যের বুদ্ধি, সকলের ভিতরেই প্রীতি লুকাইয়া লুকাইয়া কার্য্য করে। বুদ্ধির অভ্যন্তরেও যে, প্রীতি কার্য্য করে, এ বিষয়টি অনেকের কর্ণে নূতন ঠেকিবে, অতএব এ বিষয়টি ভাল করিয়া খুলিয়া বলা আবশ্যক।

সর্ব্বপ্রথমে যখন আমরা গোলাপ

---

* ইউরোপ-দেশীয় ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণের অবয়ব তিনটি—আমাদের দেশীয় ন্যায়শাস্ত্রে পাঁচটি; এ ভিন্ন উভয়ের মধ্যে আর কোন বৈসাদৃশ্য নাই। আমাদের দেশের ন্যায়-শাস্ত্রের অঙ্গ-বাহুল্যের কারণ এই যে, তাহাতে দুইরূপ যুক্তিকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে, (১) নির্ব্বিবেক বা সংস্কারমূলক যুক্তি এবং (২) সবিবেক যুক্তি কিম্বা বিচার যথা—

(১) প্রথম অবয়ব—প্রতিজ্ঞা
পর্ব্বত বহ্নিমান
(২) দ্বিতীয় অবয়ব—হেতু
যেহেতু ধূম উঠিতেছে
(৩) তৃতীয় অবয়ব—উদাহরণ
যেখানে যেখানে ধূম সেই-খানে সেইখানে বহ্নি
(৪) চতুর্থ অবয়ব—উপনয়ন
এই পর্ব্বতে ধূম দৃষ্ট হইতেছে
(৫) পঞ্চম অবয়ব নিগমন
অতএব এই পর্ব্বত বহ্নিমান্

এস্থলে, প্রথম দুইটি অবয়ব-দ্বারা নির্ব্বিবেক যুক্তি নিষ্পন্ন হয়, শেষের তিনটি অবয়ব দ্বারা সবিবেক যুক্তি বা বিচার নিষ্পন্ন হয়। প্রথম যুক্তিটি জ্ঞানের নৈসর্গিক গতি, এজন্য একজন অনভিজ্ঞ বালকও তাহা অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে; একজন বালক যদি দেখে যে, সম্মুখস্থিত কুটীরের চাল ভেদ করিয়া ধূম উঠিতেছে, তৎক্ষণাৎ সে বলিবে যে, ঐ কুটীরের অভ্যন্তরে বহ্নি আছে; তাহাকে যদি বলা যায় যে, "না ওখানে বহ্নি নাই" সে অমনি বলিবে "ধূম উঠিতেছে দেখিতেছ না?" বালক কিছু আর এরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হয় না যে, যে-যে স্থানে ধূম সেই সেই স্থানে বহ্নি, ঐ স্থানে ধূম, অতএব ঐ স্থানে বহ্নি; বালক তবে কি প্রকরণ দ্বারা অগ্নির সত্তা অনুমান করিল? সে ইতিপূর্ব্বে যতবার ধূম দেখিয়াছে ততবারই তাহার সহিত বহ্নি-সংযুক্ত দেখিয়াছে, এইরূপ ভূয়োদর্শন প্রভাবে তাহার মনে একটি দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে যে, ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকিতে চায়; এই সংস্কারটি সেই বালকের মনে এরূপ লুকাইয়া কার্য্য করে যে, কোথা-হইতে তাহা উৎপন্ন হইল সে বালক তাহার কিছুই জানে না—ধূম দেখিবা-মাত্র তাহার মনে বহ্নি আসিয়া উদয় হয়—ধূমের সঙ্গে বহ্নির ভাব যুক্ত হইয়া যায়—এই পর্য্যন্ত; ধূম-ভাবের সহিত বহ্নি-ভাবের এইরূপ যুক্ত-হওন যুক্তি তাহাতে আর ভুল নাই, কিন্তু সে যুক্তিকে এখনো বিচার বলিতে পারা যায় না; যেরূপ যুক্তি অনুসারে শিশু মাতাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া জানে, পত্নী পতিকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া জানে, উহাও সেইরূপ যুক্তি—বিবেচনা-শূন্য যুক্তি, শুদ্ধ কেবল সংস্কার-মূলক যুক্তি। বিচার অর্থাৎ বিবেচনা-মূলক যুক্তি পরে আসিতেছে, তাহা এইরূপ;—

"যেখানে যেখানে বহ্নি সেই-সেইখানে ধূম," কিম্বা যাহা একই কথা—"ধূমবান্ বস্তুমাত্রই বহ্নিমান্;" ইহাতে বহ্নি-সত্তা লক্ষণটিকে বাছিয়া লইয়া সেই লক্ষণটিকে ধূমবান্ বস্তুর জাতি-সাধারণ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল; এইরূপ করিয়া লক্ষ্য বস্তু হইতে তাহার জাতি-সাধারণ লক্ষণ বাছিয়া লওয়া বিবেচনা শব্দের বাচ্য; অতঃপর ঐ বিবেচনার—অর্থাৎ "ধূমবান্ বস্তু মাত্রই বহ্নিমান্" এই বিবেচনার—বলবর্ত্তী হইয়া আমরা ধূমবান্ পর্ব্বতের সহিত অগ্নিমত্তার যোগ অবধারণ করি—এইরূপ যোগ-অবধারণ বা যুক্তি পূর্ব্ব-কথিত যুক্তির ন্যায় বিবেচনার পূর্ব্ববর্ত্তী নহে কিন্তু বিবেচনার পরবর্ত্তী; এইরূপ যুক্তিই বিচার শব্দের বাচ্য।

ফুল দেখিয়াছিলাম তখন সেই গোলাপ ফুলটিতে আমাদের জ্ঞানের যোগ বা যুক্তি হইয়াছিল তাহাতে আর সংশয় নাই, কিন্তু তখন সে যুক্তির কেবল প্রীতি-চক্ষুই ফুটিয়াছে বিবেচনা-চক্ষু ফুটে নাই; তখন কেবল গোলাপ ফুলেই মন যুক্ত রহিয়াছে—গোলাপ ফুলের উপলব্ধি-রূপী জ্ঞান-ক্রিয়া তখন মনের অগোচর; এইরূপ যুক্তিকেই আমরা বলি—জ্ঞানের নৈসর্গিক গতি বা প্রমুক্ত গতি। পরে যখন আমাদের মনে এইরূপ তর্ক উপস্থিত হইল যে, এ ফুলটি গোলাপ ফুলই বা কিসে, যবা ফুল নয়ই বা কিসে, তখন আমরা গোলাপ ফুলের দর্শন-প্রীতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার তত্ত্ব-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম; জ্ঞানের নৈসর্গিক গতিকে রোধ করিয়া তাহাকে খুঁটিনাটিতে নিযুক্ত করিলাম—ইহাই জ্ঞানের নিয়ন্ত্রিত গতি; এইবার বিবেচনা দ্বারা স্থির করিলাম, যে যবা-ফুল অপেক্ষা গোলাপ-ফুল ছোটো, গোলাপ-ফুলের লোহিত বর্ণ অপেক্ষাকৃত ফিঁকে, গোলাপ-ফুলের পাপড়ি অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত; এইরূপ বিবেচনার পর আবার গোলাপ-ফুলের প্রতি ফিরিয়া চাহিলাম; এই তৃতীয়বারে, জ্ঞানের প্রথম-বারের প্রমুক্ত গতি এবং দ্বিতীয়-বারের নিয়ন্ত্রিত গতি, দুই মিলিয়া-মিসিয়া বিচার রূপে পরিণত হইল; সে বিচার-পদ্ধতি এইরূপ, যথা;—যে-ফুলের পাপ্‌ড়ি বদ্ধাঞ্জলি প্রায়, যাহার বর্ণ ঠিক্ লোহিত নয় কিন্তু আরক্ত, যাহার আয়তন মধ্যবিধ, যাহার আকৃতি অর্দ্ধ-গোলক-প্রায়, তাহাই গোলাপ-ফুল; সম্মুখস্থিত ফুলটির ঐ ঐ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; অতএব বিচার-নিষ্পত্তি হইল যে, ঐ ফুলটি গোলাপ ফুল। এখন বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের নৈসর্গিক গতি এবং জ্ঞানের নিয়ন্ত্রিত গতি দুয়ের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্তের লক্ষ্য বিষয়ে আমাদের মন সহজে আকৃষ্ট হয়, শেষোক্তের লক্ষ্য বিষয়ে চেষ্টা করিয়া মন দিতে হয়; ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জ্ঞানের নৈসর্গিক গতিতে প্রীতির হস্ত আছে; কেননা প্রীতিই আকর্ষণের মূল। শিশুর বিচার-বিবেচনা পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বে সে কেমন অনায়াসে ভাষা আয়ত্ত করে;—অধিক বয়সে সেই ভাষাকে সে যখন ব্যাকরণ-দ্বারা আয়ত্ত করিতে যায়, তখন তাহাকে কি পর্য্যন্ত না আয়াস স্বীকার করিতে হয়? যেখানে আয়াসের আধিক্য সেখানে প্রীতির অল্পতা, যেখানে আয়াসের অল্পতা সেখানে প্রীতির প্রভাব—ইহা স্পষ্টই পড়িয়া আছে। মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগিনীর প্রীতি-সিঞ্চনে শিশুর জ্ঞান প্রমুক্ত হইয়া যায়, তাই সে হাসিয়া-খেলিয়া সহজে ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলে;—শব্দের সংখ্যাধিক্য—বিশেষ বিশেষ স্থলের বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ—কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়ার যথাবিধি সন্নিবেশ—কিছুতেই তাহার জ্ঞানের গতি-রোধ হয় না;—তাহার নিকট কিছুই কঠিন নহে—সকলই সহজ। এই শিশুর সহজ জ্ঞানের ক্ষমতার প্রতি প্রণিধান করিলে প্রবীণ কূতার্কিক অনেক শিক্ষা-লাভ করিতে পারেন। শিশু কেমন নির্ব্বিচারে মাতা-পিতার স্নেহ বুঝিতে পারে, এবং সে যাহা বুঝে তাহা কেমন সত্য! এইরূপ, মনুষ্যের আত্মা যখন নির্ব্বিচারে পরমাত্মার প্রেম অন্তরে অনুভব করে তখন সে, পরম সত্য হাত বাড়াইয়া পায়।

আর-এক দিকে দেখা যায় যে, প্রীতি যেমন জ্ঞানের পক্ষে আবশ্যক, জ্ঞানও তেমনি প্রীতির পক্ষে আবশ্যক; উভয়ের কেহ কাহাকে ছাড়িয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে না। জ্ঞানের আলোক না পাইলে প্রীতি যেখানে অন্ধভাবে বিচরণ করে—জ্ঞা-

নের আলোক পাইলে প্রীতি সেখানে পথ-চিনিয়া চলিতে পারে। জ্ঞানের আলোকে প্রীতি কিরূপে পরিশুদ্ধ হয়, তাহা অতঃপর প্রদর্শিত হইতেছে।

জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে যখন কোন প্রিয় বস্তুতে আমাদের মন নিবিষ্ট হইয়া যায়, তখন আমাদের ভাল-মন্দ বিচার থাকে না, তখন লক্ষ্য বিষয়েতে আমাদের মন লীন হইয়া যায়;—ইহার নাম আসক্তি। তাহার পর "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ" আসক্তি হইতে বাসনা উৎপন্ন হয়। যখন সে বস্তু সম্মুখে দেখিতে না পাই তখন বাসনা বলবতী হইয়া সেই বস্তুকে মনোমধ্যে কল্পনা করিতে থাকে; আবার সেই বস্তু সম্মুখে উপস্থিত হইলে তবে আমাদের বাসনা পূর্ণ হয়। সে বস্তুর বিচ্ছেদে আমাদের অশান্তি হয় বলিয়া আমরা তাহাকে এরূপে জ্ঞানায়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করি—যাহাতে সে বস্তু অবিদ্যমানেও তাহাকে আমরা মানস-পটে কল্পনা করিতে পারি। এই অভিপ্রায়ে, তাহার কতকগুলি মুখ্য লক্ষণ, যাহা আমাদের ভাল বাসার উদ্দীপক, সেই গুলির প্রতি বিশেষ রূপে মনোযোগ করি। প্রথমে সমগ্র বস্তুটির উপর আমাদের মন পতিত হইয়াছিল—এখন আমরা মনকে তথা হইতে উঠাইয়া লইয়া সেই বস্তুর মুখ্য লক্ষণগুলির প্রতি নিবিষ্ট করি, এইখানে বিবেচনার সূত্রপাত; তাহার পর সেই মুখ্য লক্ষণগুলির সঙ্গে অবশিষ্ট লক্ষণগুলির এবং সমগ্র বস্তুর যোগ অবধারণ করি। ইহার পর, সেই বস্তুর অনুপস্থিতিতে তাহাকে কল্পনা করিবার সময় আমরা সেই মুখ্য লক্ষণগুলির প্রতি মনোনিবেশ করিলেই সেই বস্তুটি তাহার আর আর সমুদায় লক্ষণ সমভিব্যাহারে আমাদের মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। প্রথমে আমরা নির্ব্বিচারে ঐ বস্তুটিকে ভাল বাসিয়াছিলাম এখন উহার মুখ্য লক্ষণগুলির অনুরোধে উহাকে ভাল বাসিতেছি। প্রথম-বারের নির্ব্বিচার প্রেম এইরূপ যথা, "আমি ভাল বাসি এই মাত্র—কেন তাহা জানি না," কিন্তু এখন কেহ যদি আমাকে ভালবাসার হেতু জিজ্ঞাসা করে—তাহার আমি উত্তর দিতে পারি—বলিতে পারি যে, ঐ বস্তুর এই এই সুলক্ষণ আছে বলিয়া আমি উহাকে ভাল বাসি। ইতি পূর্ব্বে, ঐ বস্তু হইতে আমি তাহার সুলক্ষণগুলি বাছিয়া লইয়াছি, ইহাই বিবেচনা-ক্রিয়া, এবং সেই বস্তুকে এবং তাহার আর আর লক্ষণকে, উক্ত মুখ্য লক্ষণগুলির অধীনে নিয়োগ করিয়াছি— ইহাই যুক্তি-ক্রিয়া। এখন বুঝিতে পারা যাইবে যে, জ্ঞানের সহায়তা দ্বারা আমাদের প্রীতি কেমন করিয়া বিশুদ্ধি-ধামে যাত্রা করিতে পারে;—প্রথমে, উপস্থিত বস্তুর প্রতি আমাদের প্রীতি নিবিষ্ট হয়, জ্ঞান-প্রসাদে ক্রমে সেই বস্তুকে ছাড়িয়া তাহার সুলক্ষণ গুলির প্রতি—তাহার ভাবের প্রতি—আমাদের মন নিবিষ্ট হয়, এবং আমাদের জ্ঞানের সমুচিত পরিপক্বতা হইলে মূল-ভাবের প্রতি—আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের প্রতি আমাদের লক্ষ্য নিবিষ্ট হয়—এইরূপ ক্রমে আমাদের প্রীতির কলঙ্ক সকল ক্ষালিত হইয়া গিয়া তাহা প্রসন্ন সলিলের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া দাঁড়ায়। মোহ-মুগ্ধ আসক্তি এবং নির্ম্মল প্রীতি দুয়ের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ—নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে;—

একটি পোষা বাঘ প্রভুর পা চাটিতে চাটিতে রক্তের আস্বাদন পাইল—অমনি তাহার পিপাসার উদ্রেক হইল, "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ;" তাহার পরে ঐ মনুষ্য যেমন হাত টানিয়া লইতে যায়, অমনি সেই ব্যাঘ্রের ক্রোধোদয় হয়, "কামাৎ ক্রোধো ঽভিজায়তে;" তাহার পরেই আসিতেছে

"ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ" ক্রোধ হইতে মোহের উৎপত্তি হয়; পশুরা আজন্ম-কালই মোহগ্রস্ত—যাহাদের কোন কালেই জ্ঞান নাই তাহাদের জ্ঞান-লোপ হওয়া শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া মাত্র,—সুতরাং মোহের উৎপত্তি মনুষ্যের পক্ষেই খাটে। মনে কর যেন—মনুষ্য-ব্যাঘ্রের কথা বলা হইতেছে, ও রক্ত-পিপাসা মনে কর অর্থ-পিপাসা; এখন-আর ইহাতে ভুল নাই যে, ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ, ক্রোধ হইতে মোহের উদ্রেক হয়—জ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হইয়া যায়; তখন আর এ জ্ঞান থাকে না যে, "ইনি আমার প্রতিপালক," স্মৃতি তখন কলুষিত হইয়া যায় "সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ;" স্মৃতি না থাকিলে বুদ্ধি খেলিতে পায় না "স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধি-নাশঃ;" বুদ্ধিনাশ হইলেই সর্ব্বনাশ "বুদ্ধি-নাশাৎ প্রণশ্যতি।" এই যে আসক্তির কথা বলা হইল ইহা অবিশুদ্ধ প্রীতির পরাকাষ্ঠা। বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রীতি-সম্ভোগে ওরূপ অধীরতার পরিবর্ত্তে সুবিমল শান্তি এবং প্রসন্নতার উদ্রেক হয়; কেননা তাহা অস্থায়ী বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখে না—তাহার মূল আত্মার গভীরে প্রোথিত।

আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল এইটি দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছি যে, প্রীতি সকলেরই ভিতর লুকাইয়া লুকাইয়া কার্য্য করে,—এমন কি বুদ্ধি-বৃত্তি—যাহাকে অবিবেচক ভক্ত-সম্প্রদায় নীরস বলিয়া খোঁটা দেন—তাহার মধ্যেও প্রীতির হস্ত-চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি;—সমস্ত জগৎ জুড়িয়া যে, প্রীতির প্রভাব, এ বিষয়ে আর অধিক বাক্য ব্যয় করিবার আবশ্যকতা নাই—কেন না একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই পাঠকের তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে; এখন প্রীতির স্পষ্ট লক্ষণ যেখানে অভিব্যক্ত হয়—যেখানে প্রীতি ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করে—সেই স্থানে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যা'ক্—মনুষ্যের সংসার-ক্ষেত্রে একবার প্রণিধান করা যা'ক্—তাহা হইলেই প্রীতির সবিশেষ পরিচয় ... হইতে পারিব।

মনুষ্য মাতা-পিতার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে; মাতার স্নেহ-দৃষ্টির সহিত পিতার স্নেহ-দৃষ্টি একতানে মিলিয়া তাহার উপরে নিপতিত হয়; সেই যুগল স্নেহ-ধারায় শিশু পুষ্প-কলিকার ন্যায় অল্পে অল্পে বিকসিত হইতে থাকে। মাতা-পিতার প্রাণের টান শিশুতে গিয়া পড়ে—ও শিশুর প্রাণের টান মাতা-পিতাতে গিয়া পড়ে; মাতা-পিতা এবং শিশু তিন নহে কিন্তু এক,—গণনাতে তিন—ভাবে এক। শিশু কিছুই তো বোঝে না কিন্তু তাহার মন পিতা-মাতার স্নেহ বুঝিতে পারে; এবং সেই স্নেহ শিশুর মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া মাতা-পিতার প্রতি তাহার একটা গুরুতর আকর্ষণ জন্মাইয়া দেয়,—এবং কাল-ক্রমে সেই আকর্ষণ শ্রদ্ধা-ভক্তি রূপে পরিণত হয়। ভাল-লাগা এবং ভালবাসা এ দুয়ের মধ্যে যে, কি প্রভেদ, তাহা আমরা শিশুর নিকট হইতেও শিক্ষা পাইতে পারি;—অন্ন শিশুর ভাল লাগে কিন্তু শিশু মাতার হস্তে অন্ন খাইতে চায়—আর কাহারো হস্তে নহে; অন্ন শিশুর ভাল লাগে কিন্তু মাতৃ-হস্তের অন্ন আরো ভাল লাগে; অপর-ব্যক্তির হস্তে অন্ন খাইতে শিশু ভার-বোধ করে কেন? মাতার ভাল-বাসাটি সেখানে পায় না—এই তাহার কারণ। দেখ, ভালবাসার প্রতি শিশুর যত-টা আকর্ষণ—ভাল-লাগার প্রতি তত-টা নহে; অজ্ঞান শিশুর নিকটেও ভাল-লাগা অপেক্ষা ভাল-বাসার মূল্য অধিক! বালকের জ্ঞানোদয় হইলে ভালবাসার সহিত ভাল-লাগার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়,—তাহাতে ভাল-

বাসারই জিতিবার কথা; পিতার অনুশাসন অনেক সময় বালকের ভার-বোধ হয়,—অথচ পিতাকে ভাল-বাসে বলিয়া সে তাহা নির্ব্বিচারে পালন করে। অনভিজ্ঞ বালক ভাল-বাসার অনুরোধে—যাহা ভাল লাগে না তাহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করে,—ইহাই ত্যাগ-স্বীকার।

পিতা এবং মাতা উভয়েরই স্নেহ দৃষ্টি সমান—কিন্তু তাহার মধ্যেও ভাবের ভিন্নতা আছে। পিতার লক্ষ্য সমস্ত জীবনের কুশল,—মাতার লক্ষ্য প্রতি মুহূর্ত্তের কুশল। পিতার ভাব এই যে, পুত্র এখন একটু ক্লেশ পায় পা'ক্—পরে তাহার ভাল হইবে;—কিন্তু মাতার প্রাণে পুত্রের সে ক্লেশ-টুকুও সহ্য হয় না; ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, পিতৃ-স্নেহ অপেক্ষা মাতৃ স্নেহের গাঢ়তা অধিক—মাতৃ স্নেহ অপেক্ষা পিতৃ-স্নেহের বিস্তৃতি অধিক। পিতা অনেক সময়ে বালকের ভাবী কুশল বাঁচাইতে গিয়া, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার স্কন্ধে এরূপ ভার চাপাইয়া দেন যে, তাহাতে তাহার ভাবী মঙ্গলের মূল শিথিল হইয়া যাইতে থাকে; তেমনি আবার মাতা অনেক সময়ে পুত্রের প্রতি-মুহূর্ত্তের কুশল রক্ষা করিতে গিয়া তাহার চির-জীবনের কুশল নষ্ট করিয়া ফেলেন। পিতার স্নেহ যেমন কালে বিস্তৃত—পিতার কার্য্য তেমনি দেশে বিস্তৃত,—পিতার প্রধান কার্য্য-ক্ষেত্র গৃহের বহিঃপ্রদেশ; মাতার স্নেহ যেমন কালে সঙ্কীর্ণ—মাতার কার্য্যও সেইরূপ দেশে সঙ্কীর্ণ—সঙ্কীর্ণ কিন্তু প্রগাঢ়, মাতার প্রধান কার্য্য-ক্ষেত্র গৃহের অভ্যন্তর প্রদেশ; এই দুই বিরোধীভাব গৃহে প্রতিবিম্বিত হইয়া অন্তঃপুর এবং বহির্ব্বাটীর সৃষ্টি হইয়াছে। পিতা বাহির হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অথবা দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া আনিয়া মাতার হস্তে সমর্পণ করেন, মাতা সেই সমস্ত ভোজ্য-সামগ্রী গৃহের অভ্যন্তরে পতি-পুত্র-কন্যাগণের মধ্যে যথাপরিমাণে বণ্টন করিয়া দেন; পিতার কার্য্য আহরণ—মাতার কার্য্য পরিবেষণ; গড়ে বলা যাইতে পারে যে, পিতা আয়ের কর্ত্তা—মাতা ব্যয়ের কর্ত্রী;—ব্যয়-শব্দে এখানে মুখ্য ব্যয় বুঝিতে হইবে;—আয়কে বজায় রাখিবার জন্য যে সকল ব্যয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহা প্রকৃত ব্যয় নহে তাহা আয়েরই সামিল,—তাহা পিতারই অধিকার-স্থিত; কিন্তু অর্জ্জিত ধনের চরম-ব্যয়—খাওয়ানো দাওয়ানো প্রভৃতি—মাতারই অধিকারস্থিত*।

উপরে দেখানো হইয়াছে যে পুরুষের কার্য্য-ক্ষেত্র গৃহের বহিঃপ্রদেশ, স্ত্রীর কার্য্য-ক্ষেত্র গৃহের অভ্যন্তর প্রদেশ। কার্য্য ক্ষে-

* মাতা শব্দের মূল অর্থ লইয়া মহাত্মা মাক্স মূলারের সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ মতের অনৈক্য হইতেছে;—মাতা-শব্দের মূল অর্থ মাক্স্ মূলার বলেন—নির্ম্মাতা, আমরা বলি—পরিমাতা। মাতার পরিমাণ-কার্য্য কি রূপ? না পতি-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি সমস্ত গৃহজনকে পরিমাণানুসারে ভোজ্য সামগ্রী বাঁটিয়া দেওয়া, বাঁটিয়া দেওয়া এবং To mete out এ দুয়ের মধ্যে অর্থ-সাদৃশ্য দেখ, —আর mete, measure, এবং পরিমাণ, এ তিনের অর্থ-সাদৃশ্য দেখ—ও mete এবং মাতৃ এ দুয়ের শব্দ-সাদৃশ্য দেখ—এ সমস্তই আমাদের মতের পোষকতা করিতেছে; তাহার পর আমাদের দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি পাত কর,—পঞ্চ পাণ্ডব ভোজ্য সামগ্রী আহরণ করিয়া কুন্তীর ভাগ পৃথক্ রাখিয়া অবশিষ্ট ভাগ আপনারাই তো আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইতে পারিতেন,—কিন্তু তাহা করিলেন না—কেন না তাহা আচার-বিরুদ্ধ। অতএব দেশাচার ধরিতে গেলে—পরিমাণ-অনুসারে খাদ্য-সামগ্রী বণ্টন করিয়া দেওয়া মাতারই কার্য্য। মাক্স্ মূলার বলেন যে, পুরাকালে দুগ্ধ দোহন করাই কন্যার কার্য্য ছিল—এ জন্য কন্যার নাম হইয়াছে দুহিতা, পালন করা—শত্রুবর্গ হইতে রক্ষা করা এবং গোধনাদি উপার্জ্জন করা—জনকের কার্য্য ছিল, এজন্য জনকের নাম হইয়াছে পিতা,—কিনা পাতা—পালন-কর্ত্তা; দুহিতা এবং পিতা দুই নামই—লোকাচার মূলক গার্হস্থ্য কার্য্যের পরিচায়ক; আমরা বলি যে, মাতা-শব্দও সেইরূপ গার্হস্থ্য কার্য্যের পরিচায়ক—প্রসব-ক্রিয়া-প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনার পরিচায়ক নহে;—নৈসর্গিক ঘটনা ব্যক্ত করিবার জন্য—পিতা মাতার স্থানে জনক জননী এবং দুহিতার স্থানে সুতা—এইরূপ অন্যবিধ নাম অনেক রহিয়াছে।

ত্রের এই যে বিভিন্নতা—ইহার মূল কি? নব্য সম্প্রদায়েরা বলিবেন—ইহার মূল লোকাচার; আমরা বলি, ইহার মূল—স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতি-ভেদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আয়-কার্য্যে পুরুষেরই বিশেষ অধিকার, ব্যয়-কার্য্যে স্ত্রীরই বিশেষ অধিকার। ইহার হেতু বুঝিতে হইলে স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতি-ভেদের প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক। আয়-কার্য্য অনেকটা সংগ্রাম-সাপেক্ষ; অর্থের প্রতি সকলেরই লক্ষ্য,—নির্ব্বিবাদে অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে না; যাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করেন—তাঁহারা অন্যের হস্ত হইতে অর্থ ছিনাইয়া লইয়া আপনার ভাণ্ডার পূরণ করেন। জনসাধারণের অর্থ—অনেকে সদ্‌গুণ দ্বারা হরণ করেন, অনেকে অসদ্‌গুণ-দ্বারা হরণ করেন; যাহাই হউক্ না—হরণ-কার্য্য এবং রক্ষণ-কার্য্য উভয়ই বল-সাপেক্ষ,—এ জন্য ইহা অবলা-জাতির কার্য্য হইতে পারে না; কিন্তু হৃত ধন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ব্যয় করা বল-সাপেক্ষ নহে—প্রীতি-সাপেক্ষ,—ইহাতেই অবলা-জাতির বিশেষ অধিকার। গৃহ একটি কেন্দ্র এবং স্বদেশ সেই কেন্দ্রের পরিধি; পুরুষ পরিধি-হইতে কেন্দ্রে অর্থ আনয়ন করে—স্ত্রী কেন্দ্র হইতে পরিধিতে অর্থ বিকীর্ণ করে। অর্থের সৃষ্টি-স্থিতি-কার্য্যে পুরুষেরই বিশেষ অধিকার—তাহার প্রলয়-কার্য্যে স্ত্রীরই বিশেষ অধিকার; এজন্য স্ত্রীর নৈসর্গিক হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যদি পুরুষের শক্তি-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়—তবে স্ত্রী-বুদ্ধি সত্য-সত্যই প্রলয়ঙ্করী হইয়া উঠে। দম্পতি-প্রেমের আদর্শ কিরূপ এখন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে;—

নব্য-সম্প্রদায়ের অনেকে মনে করেন যে, স্ত্রী-পুরুষের অধিকার-ভেদ সমস্তই কৃত্রিম, তাহার মূল আর কিছুই নহে—কেবল—দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের অত্যাচার। ইঁহারা অভিমান করেন যে, পুরাকালে রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Political economy) বলিয়া কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্র ছিল না—এ শাস্ত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন উদ্ভাবনা সুতরাং নব্যেরাই এ শাস্ত্রের সবিশেষ মর্ম্মজ্ঞ; কিন্তু পুঁথি-গত বিদ্যাকে কার্য্যে খাটাইতে হইলেই তাঁহাদের বিষম বিভ্রাট্ উপস্থিত হয়;—রাজনৈতিক ব্যবস্থার ইহা একটি জাজ্বল্যমান সিদ্ধান্ত যে, কার্য্য-বিভাগ দ্বারা যেমন কাজ ভাল হয়—কার্য্য-সঙ্কর দ্বারা কখনই তেমন হইতে পারে না;—পুঁথি-গত বিদ্যাজারির সময় যাঁহারা এই সিদ্ধান্তের বড়াই করেন, তাঁহারাই কাজের বেলায় বলেন যে, স্ত্রী-পুরুষের অবিকল সমান অধিকার হইলেই ভাল হয়; বলেন—"স্ত্রী-সৈন্য, স্ত্রী রাজমন্ত্রী, স্ত্রী এঞ্জিন্-চালক, হইলে তো হয়—তাহাতে ক্ষতি কি?" ইহাদের জানা উচিত যে, নৈসর্গিক অধিকার অতিক্রম করিলেই লোককে তাহার ফল-ভোগ করিতে হইবে;—আমাদের নিজের শাস্ত্র অনুসারে যদি স্ত্রীলোকের শরীর মন পুরুষের অপেক্ষা কোমল ও দুর্ব্বল হইত—তাহা হইলে সে শাস্ত্রকে তুমি স্বচ্ছন্দে জলে নিক্ষেপ করিতে পারিতে, তাহাতে তোমাকে কোন দায় ভোগ করিতে হইত না; কিন্তু, এ প্রকৃতির শাস্ত্র, তোমার আমার মনগড়া শাস্ত্র নহে—স্বয়ং বিধাতার শাস্ত্র, এ শাস্ত্র অবমাননা করিয়া যদি সবলের কার্য্য-ভার অবলার হস্তে সমর্পণ কর, তবে তাহার ফল তোমাকে হাতে হাতে পাইতে হইবে। দেহের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিবার জন্য অগ্নিকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করিলে—অথবা দেহের উষ্ণতা-সাধন করিবার জন্য শীতল জলকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করিলে

যেরূপ ফল ফলে—পুরুষোচিত কার্য্যের ভার স্ত্রীলোকের হস্তে সমর্পণ করিলেও তাহাই হয়—সে কার্য্যের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার ফল ফলিতে থাকে;—যিনি সেরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন তিনি যদি ঠেকিয়া শেখেন এবং অন্যেরা দেখিয়া শেখেন—তাহা হইলেই ভাল, নচেৎ সেরূপ কার্য্য যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজে প্রচলিত হয়, তবে সমাজের আপাদ-মস্তক বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে, এবং অচিরাৎ সমাজের প্রলয়-দশা উপস্থিত হইবে। কেহ যেন ভুল না বোঝেন—আমরা এরূপ কথা বলিতেছি না যে, স্ত্রীলোকের একেবারেই ঘরের বাহিরে পদার্পণ করিতে নাই কিম্বা পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতে নাই—ইত্যাদি; আমরা কেবল এই চাই যে, স্ত্রী-লোকের বিশেষ অধিকার এবং পুরুষের বি-শেষ অধিকার, দুইকে যেন রীতিমত রক্ষা করা হয়; স্ত্রী যেন অন্তঃপুরকেই আপনার মুখ্য কার্য্য-ক্ষেত্র বলিয়া জানেন—এবং পুরুষ যেন বাহির অঞ্চলকেই আপনার মুখ্য কার্য্য-ক্ষেত্র বলিয়া জানেন; কখন কখন যে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে অধিকার-বিনিময় হয়,—পত্নীর দেহ অসুস্থ হইলে লোকাভাবে পতি ধাত্রীর কার্য্য করে ও পতি রোগাক্রান্ত হইলে লোকাভাবে পত্নী পুরুষোচিত কর্ত্তৃত্ব করে, এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। অতএব ইহাতে আর ভুল নাই যে, স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি যেমন ভিন্ন—উভয়ের অধিকারও সেইরূপ ভিন্ন;—দম্পতি-প্রেমের আদর্শ নিরূপণ করিতে হইলে—সেই প্রকৃতি-ভেদ এবং অধিকার-ভেদ উভয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা আবশ্যক;-

পতি অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতি-পালন করিতেছেন; অর্থ উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু উপার্জ্জন করিতেছেন, বন্ধু উপার্জ্জন করিতেছেন, বাহিরের নানা লো-কের সহিত নানা প্রকার সম্বন্ধে জড়িত হই-তেছেন; কার্য্য-ক্ষেত্র হইতে কখনো বা আ-নন্দে উৎফুল্ল হইয়া—হয় ত বা দুই এক জন বন্ধু সমভিব্যাহারে—নয় তো একাকী—গৃহে প্রত্যাগমন করেন, কখন বা ভাবিত অন্তঃ-করণে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, কখন বা শ্রম-ভারে আক্রান্ত হইয়া গৃহে আসিয়াই শয্যা-শায়ী হইয়া পড়েন, পতি এইরূপ কঠোর কার্য্যে দিনপাত করেন; পত্নী সহজে সহজে নির্ব্বিবাদে অন্তঃপুরের কার্য্য সকল যথা-বিধি নির্ব্বাহ করেন—তাঁহাকে কঠোর বিঘ্ন-বিপ-ত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হয় না। পত্নীর মনে কত কি সাধ যায়—কত কি খুঁটি নাটি উপস্থিত হয়—পতির মনে সে সকল দখলই পায় না,—ইনি অর্থের চিন্তাতেই ব্যতিব্যস্ত; সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের—ইটি না হইলে নয়—উটি না হইলে নয়—এ সমস্ত ইঁহার মনেই আসে না। পত্নীর এই একটি প্র-কৃতি-গত অভাব যে, তিনি ব্যাপক কোন-কিছুই বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারেন না, পতির এই একটি প্রকৃতি-গত অভাব যে, তিনি খুঁটি নাটি আয়ত্ত করিতে পারেন না; পতি-পত্নী দম্পতি-প্রেমে আবদ্ধ হইয়া, উভয়ের ঐ যে দুইরূপ বিসদৃশ অভাব, উ-ভয়ে তাহা পূরণ করেন। মনকে নিয়মিত করিবার ভাব পতির নিকট হইতে পত্নী শিক্ষা করেন—মনকে মুক্ত করিবার ভাব পত্নীর নিকট হইতে পতি শিক্ষা করেন,—এইরূপ পতির কেন্দ্রানুগ ভাব এবং পত্নীর কেন্দ্রাতিগ ভাব দুয়ের সামঞ্জস্যে সুচারু রূপে সংসার চলিতে থাকে।

পিতৃ-ভক্তি উচ্চগামী, পুত্র-স্নেহ নিম্ন-গামী, দম্পতি-প্রেম মধ্য-গামী। দম্পতি-প্রেমে দেখা যায় যে, উপর হইতে ভক্তি নাবিয়া আসিয়া এবং নীচে হইতে স্নেহ উপরে উঠিয়া উভয়ে সখ্যে সম্মিলিত হইয়া

দম্পতি-প্রেম যেমন মনুষ্যকে কুল হইতে ঘরের দিকে টানিয়া রাখে, ভ্রাতৃ-স্নেহ সেই রূপ মনুষ্যকে দেশ-হইতে কুলের দিকে টানিয়া রাখে। দম্পতি-প্রেম কুল-প্রেম এবং দেশ-প্রেম—এ তিনের প্রত্যেকেরই চতুর্দ্দিকে এক-একটি গণ্ডি দেওয়া আছে, অথচ প্রথম হইতে দ্বিতীয়-পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় পর্য্যন্ত একটি ক্রমান্বয়ের ভাব নিরবচ্ছেদে প্রবাহিত রহিয়াছে। গার্হস্থ্য কৌলীন্য এবং লৌকিকতা বা সামাজিকতা—তিন-ই পরস্পরের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ-রূপে সম্বদ্ধ যে, একটিতে আঘাত লাগিলে তিনটিতেই আঘাত লাগে;—তাহার মধ্যে গার্হস্থ্যের কেন্দ্র দম্পতি-প্রেম, কৌলীন্যের কেন্দ্র ভ্রাতৃ-স্নেহ, এবং সামাজিকতার কেন্দ্র স্বদেশানুরাগ। গার্হস্থ্য এবং সামাজিকতা যদিও দুই প্রান্ত-সীমায় অবস্থিতি করে তথাপি দুয়ের একটি আরেকটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; কেন না, বিবাহ, যাহা গার্হস্থ্যের প্রধান অঙ্গ, তাহা সমাজ ব্যতিরেকে চলিতে পারে না। আবার বিবাহের সময় উপস্থিত হইলেই সৎকুলের খোঁজ পড়ে; উপযুক্ত কুলের উপযুক্ত পাত্র এবং পাত্রী বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইলে কুলের কৌলীন্য শুধু যে রক্ষিত হয় তাহা নহে—বর্দ্ধিত হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, গার্হস্থ্য, কৌলীন্য এবং সামাজিকতা, তিনই কার্য্য-কারণ-সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে; এইরূপ বন্ধনের গুণে ভ্রাতৃস্নেহ সহোদর-বর্গ হইতে আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি-কুটুম্বের মধ্য দিয়া দেশে এবং রাজ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। গৃহের সম্বন্ধে যেমন গৃহ-পতি, কুলের সম্বন্ধে তেমনি কুলপতি, দেশের সম্বন্ধে তেমনি স্বদেশীয় রাজা, জগতের সম্বন্ধে তেমনি জগৎপতি। গার্হস্থ্য-প্রেম হইতে ঈশ্বর-প্রেম পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রেম-প্রবাহ নিরবচ্ছেদে প্রবাহিত হইবে—এইরূপ উপকরণে মনুষ্য গঠিত হইয়াছে—এইরূপ অভিপ্রায়ে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে;—ইহাই মনুষ্যের অমরত্বের নিদান।

উপরে যত প্রকার ভালবাসার কথা বলা হইল, তাহা প্রীতি ভক্তি এবং স্নেহ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ইহার মধ্যে, প্রীতি এবং ভক্তি, উভয়ই স্বাধীনতাকে অপেক্ষা করে,—স্বাধীন ব্যক্তির প্রতিই স্বাধীন ব্যক্তির প্রীতি-ভক্তি সম্ভবে; কিন্তু স্নেহের আকর্ষণ অধীন ব্যক্তির প্রতিই সবিশেষ স্ফূর্ত্তি পাইতে দেখা যায়। স্বাধীন ব্যক্তির প্রতি কাহারো স্নেহ না হয় এমন নহে,—কিন্তু মাতৃস্নেহ, যাহা স্নেহের জ্বলন্ত আদর্শ, তাহার প্রথম উদ্দীপক একান্ত অধীন একটি শিশু। মনুষ্য স্বাধীন বলিয়াই সে ঈশ্বরকে প্রীতি ভক্তি করিতে সমর্থ; এবং ঈশ্বর-প্রীতিই মনুষ্যের আত্মার অনন্ত উপজীবিকা—অনন্ত জীবন—অনন্ত আনন্দ। এই আনন্দ মনুষ্যকে উপভোগ করাইবেন বলিয়া ঈশ্বর মনুষ্যের আত্মাকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বাধীনতা কেবল স্বাধীনতার জন্য নহে—তাহা বিশুদ্ধ প্রেম উপভোগের জন্য। যে ব্যক্তি সাংসারিক প্রেমেও বঞ্চিত, ঈশ্বর-প্রেমেও বঞ্চিত, সে ব্যক্তির স্বাধীনতা এক প্রকার ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ। যে ব্যক্তি বিষয়ের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হ'ন এবং স্বাধীনতার মধ্য দিয়া ঈশ্বর-প্রেমে উপনীত হ'ন তাঁহার স্বাধীনতাই সার্থক স্বাধীনতা। যাঁহারা বিবেক বৈরাগ্যের অভ্যাস দ্বারা মনকে বিষয়ের আকর্ষণ হইতে উঠাইয়া লইয়াছেন তাঁহাদের অবলম্বন কি? শুধু কি স্বাধীনতা-মাত্র? অবশ্য তাঁহারা এমন কোন কিছুর আস্বাদ পাইয়াছেন যাহাতে তাঁহাদের মন উদাস হইয়া গিয়াছে—তাহাতেই তাঁহারা প্রভুত্ত বিষয়-রাজ্য-হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন;

প্রকৃতির যবনিকার অন্তরালে উঁহারা ঈশ্বরের মুখ-জ্যোতি দেখিয়াছেন—তাঁহার মধুর আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়াছেন—তাঁহার অমৃত প্রেমরসের আস্বাদন পাইয়াছেন—তাই তাঁহারা আর বিষয়-রাজ্যে থাকিতে চাহেন না—তাই তাঁহারা প্রিয়তম পরমাত্মার অন্বেষণ করিতেছেন—তাই তাঁহাদের বৈরাগ্য—ঔদাস্য—বিষয়ের শৃঙ্খল-ছেদন—স্বাধীনতা। এরূপ স্বাধীনতা, যাহা পরমাত্মা-ধামে প্রবেশ করিবার দ্বার, তাহার অর্থ পাওয়া যায়; অন্য কোন স্বাধীনতার অর্থ পাওয়া যায় না।

ঈশ্বর প্রেমই প্রেমের পরম আদর্শ এবং তাহাই মনুষ্যের আত্মার চরম ফল। ঈশ্বরের প্রেম—মনুষ্যের প্রেমকে নিগূঢ় রূপে আকর্ষণ করে। কিন্তু বিকর্ষণ-ব্যতিরেকে আকর্ষণ সম্ভবে না, আকর্ষণ ব্যতিরেকেও বিকর্ষণ সম্ভবে না; জড় জগতে দেখ—এক দিকে গ্রহাদির কেন্দ্রানুগ প্রবৃত্তি, আর এক দিকে কেন্দ্রাতিগ প্রবৃত্তি; উদ্ভিদ্-জগতে দেখ—বৃক্ষ এক দিকে মৃত্তিকা-ভেদ করিয়া চলিতেছে, আর একদিকে শাখা প্রশাখা আকাশে প্রক্ষিপ্ত করিতেছে; জীব-জগতে দেখ—জীবেরা জড়-রাজ্য হইতে মনোরাজ্যে এবং মনোরাজ্য হইতে জড়-রাজ্যে পর্যায় ক্রমে আন্দোলিত হইতেছে—সংস্কার হইতে কার্য্যে এবং কার্য্য হইতে সংস্কারে আন্দোলিত হইতেছে; মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর—মনুষ্য জ্ঞান-প্রেম হইতে কার্য্যে এবং কার্য্য হইতে জ্ঞান-প্রেমে নিয়ত দোলায়মান হইতেছে; এইরূপ, সকল জগতেই আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ দুয়ের যুগল আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার যদি নিগূঢ় অর্থ জানিতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি একবার প্রণিধান কর;—প্রথমে আত্মা স্বভাবতই পরমাত্মাতে বিলীন ছিল—তবে কেন তাহা পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌ভূত হইল? না, এই যে বিকর্ষণ ইহা আকর্ষণের পূর্ব্ব সূচনা; পৃথিবী ও গ্রহাদি যদি সূর্য্য হইতে বিক্ষিপ্ত না হইত তবে সূর্য্য কাহাকে আকর্ষণ করিত? আত্মা যদি পরমাত্মা-হইতে পৃথক্‌ভূত না হইত তবে ঈশ্বর-প্রেমের আকর্ষণ কাহার উপর কার্য্য করিত? সমস্ত জগৎ ঈশ্বরেরই প্রেমের উচ্ছ্বাস এবং মনুষ্যই তাহা বুঝিতে পারে—এবং বুঝিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হইতে পারে। কি সে আশ্চর্য্য মন্ত্রোচ্চারণ যাহাতে সূর্য্য চন্দ্র এবং অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র মহা শূন্যে বিধৃত রহিয়াছে; কি সে মন্ত্রোচ্চারণ যাহাতে পৃথিবী বন অরণ্যে, এবং বন অরণ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গে, উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে; কি সে পরমাশ্চর্য্য মন্ত্রোচ্চারণ যাহাতে প্রকৃতির মধ্যে কোথা হইতে আত্মা আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়া প্রকৃতির প্রতি সবিস্ময়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং প্রকৃতির নিয়ম সকল একে একে জ্ঞানে আয়ত্ত করিয়া প্রকৃতিকে আপনার অভীষ্টসাধন-কার্য্যে নিয়োগ করিল! কেহ বলেন যে, সেই প্রশান্ত মধুর গম্ভীর ধ্বনি, যাহা অনন্ত আকাশ ভরিয়া সমস্ত জগৎকে প্রেমে আকৃষ্ট বিকৃষ্ট করিতেছে, যাহার মহাশ্চর্য্য প্রভাবে জড়ের অভ্যন্তরে প্রাণ—প্রাণের অভ্যন্তরে মন—মনের অভ্যন্তরে আত্মা নিশ্বসিত হইতেছে, তাহা ওঁকার; কিন্তু আসল কথা এই যে, তাহা পরমাত্মার প্রেমের উচ্ছ্বাস—তাহা বাক্যের গম্য নহে মনের গম্য নহে—তাহা মনুষ্য নিস্তব্ধ হইয়া আত্মার অভ্যন্তরে উপলব্ধি করে এবং সেই প্রেমামৃত পানে সমস্ত পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যের প্রেম যখন ঈশ্বর-প্রেমে আকৃষ্ট হয়—তখন সেই দুই প্রেমের যোগ অমৃতের উৎস হইয়া উঠে—আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে তখন আর ব্যবধান থাকে

না—আত্মার তখন চক্ষু ফুটিয়া যায়—আত্মা তখন সত্য সত্যই আত্মা হয়—আত্মা আপনার চরম সার্থক্য লাভ করে।

গান।

রাগিণী টোড়ি—তাল ঢিমাতেতালা।

ভব কোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে এসেছি হে।
জুড়াব হিয়া তোমায় দেখি,সুধা রসে মগন হব হে।

রাগিণী খট্—তাল একতালা।

আঁধার রজনী পোহাল
জগত পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত কিরণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।
জগত নয়ন তুলিয়া,
হৃদয় দুয়ার খুলিয়া
হেরিছে হৃদয়নাথেরে
আপন হৃদয় আলোকে।
প্রেমমুখহাসি তাঁহারি,
পড়িছে ধরার আননে,
কুসুম বিকশি উঠিছে,
সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে,
দশদিক্ ফুটে উঠিছে—
জননীর কোলে যেন রে
জাগিছে বালিকা বালকে।
জগত যে দিকে চাহিছে
সে দিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী
হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে,
নবীন আশায় মাতিছে
নবীন জীবন লভিয়া
জয় জয় উঠে ত্রিলোকে।

মহিমাধর্ম্ম।*

"সত্য, শান্তি, দয়া ক্ষমা।
—চারি ধর্ম্মের মহিমা।"

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইল মুকুন্দ দাস নামক জনৈক বাবাজি পুরী নগরে বাস করিতেন। তিনি ধূলীতে শয়ন, ধূলীতে উপবেশন ও ধূলীর দ্বারা অঙ্গরাগ করিতেন এই জন্য লোকে তাঁহাকে "ধূলা বাবাজি" বলিত। প্রায় ৩২ বৎসর গত হইল মহাত্মা ধূলা বাবাজি, পুরী নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঢেঙ্কানাল রাজ্যের অন্তর্গত কপিলাস পর্ব্বত-শৃঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কপিলাস-শৃঙ্গ ঢেঙ্কানাল ও আটগড় রাজ্য মধ্যে অবস্থিত। এই শৃঙ্গ প্রায় ১৪০০ হস্ত উচ্চ। ইহার শিখরদেশ বিস্তৃত ও কমনীয়। তাহাতে মহাদেবের এক মন্দির আছে। মহাদেবের নামানুসারেই এই শৃঙ্গ কপিলাস আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কপিলাসের জল বায়ু অতি উৎকৃষ্ট।

মুকুন্দ দাস বা ধূলা বাবাজি কপিলাস মহাদেবের মন্দিরপার্শ্বে এক কুটীর নির্ম্মাণ করত বাস করিতেন। তথায় দ্বাদশ বৎসর তিনি কেবল ফলাহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। তখন লোকে তাঁহাকে "ফলাহারী বাবাজি" বলিত। তৎপরে জল ও দুগ্ধ পান করিয়া আরও দ্বাদশ বৎসর জীবিত ছিলেন, সেই সময় তিনি "ক্ষীরনীরপায়ী" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

কপিলাসে অবস্থানকালে লোকে মুকুন্দ দাসকে শৈব বলিয়া বিবেচনা করিত। মুকুন্দদাস মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ফল ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা কপিলাস দেবের সেবা পূজার—নিঃস্বার্থ ভাবে তত্ত্বাবধান করিতেন।

---

* মহিমা সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে কুম্ভি পটীয়া সম্প্রদায়ই প্রধান। এই জন্য কেহ কেহ ইহাদিগকে সাধারণত "কুম্ভিপটীয়া" বলিয়া থাকেন। উড়িষ্যা ও মধ্য ভারতের দুই এক জন ইংরাজ রাজপুরুষ ও খৃষ্টান মিসনরি সামান্য রূপে "কুম্ভিপটীয়াদিগের বিবরণ" লিখিয়াছেন। দুই এক জন বঙ্গীয় লেখক "কুম্ভিপটীয়া" শব্দ ইংরেজি হইতে বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিতে যাইয়া একবারে "কুম্ভপাত্য" বা কুম্ভপাতিয়া শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু অক্ষয়কুমার দত্তও এই বিকৃত নামটী গ্রহণ করিয়াছেন। (উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ ৩৩১ পৃষ্ঠা।)

প্রতি বৎসর মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে প্রায় ১০০০০ দশসহস্র যাত্রি কপিলাসে উপস্থিত হইয়া থাকে। অন্যান্য সময়ে তীর্থযাত্রিগণ অল্প বা অধিক পরিমাণে কপিলাস দর্শনার্থ গমন করিয়া থাকে। মুকুন্দদাস তীর্থযাত্রিদিগের যথোচিত যত্ন করিতেন। বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়া কপিলাসে আশ্রয় গ্রহণ করিত মুকুন্দদাস প্রাণপণে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। কপিলাসের জল বায়ু ও মুকুন্দদাসের শুশ্রূষায় তাহারা অচিরে আরোগ্য লাভ করিত। কিন্তু সাধারণ লোকে ইহা বুঝিতে না পারিয়া মুকুন্দদাসকে মহাদেবের প্রিয় সহচর স্থির করিয়াছিল। ঢেঙ্কানালের মৃত মহারাজের মাতা মুকুন্দদাসকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং তিনি নিজ ব্যয়ে তাঁহার আহার যোগাইতেন।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে মুকুন্দদাস কপিলাস পরিত্যাগ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া "মহিমাধর্ম্ম" প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মের মুল "ঈশ্বর নিরাকার" "তিনি সর্ব্বশক্তিমান" "তিনি সর্ব্বব্যাপি" "তিনি অলক্ষ্য" "তিনি মহামহিম," হিন্দুদিগের উপাস্য দেব দেবী কাষ্ঠ ও প্রস্তর খণ্ড ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই সময় মুকুন্দদাস কৌপীন পরিত্যাগ পূর্ব্বক "কুম্ভি" নামক বৃক্ষের বল্কল (পট) পরিধান করেন, সেই হেতু লোকে তাঁহাকে "কুম্ভিপটীয়া বাবাজি" বলিত। মুকুন্দদাস সর্ব্বদাই "প্রভু আলেখ" (অলক্ষ্য) ও "প্রভু মহিম" শব্দ উচ্চারণ করিতেন এইজন্য তিনি সর্ব্বসাধারণ দ্বারা "আলেখস্বামী" ও "মহিমাস্বামী" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কিছুকাল ভ্রমণ করিয়া মুকুন্দদাস পুনর্ব্বার পুরীতে গমন করেন। তথা হইতে তিনি দারুঠেং * নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথায় এক "টুঙ্গি" (আশ্রম) নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করত খুর্দ্দাবাসীদিগের মধ্যে স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রথমত গোবিন্দ দাস তৎপরে নরসিংহদাস তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অনেক লোক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। তাহার শিষ্যগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা "কুম্ভিপটীয়া" "কণাপটীয়া" ও "আশ্রিত"। যাহারা কুম্ভিপট (অর্থাৎ বল্কল) পরিধান করে তাহারা কুম্ভিপটীয়া ও যাহারা কণা অর্থাৎ ছিন্ন বস্ত্রের কৌপীন পরিধান করে তাহারা কণাপটীয়া নামে পরিচিত। যাহারা গৃহবাসে থাকিয়া মহিমাধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহারাই আশ্রিত আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

উড়িষ্যার গড়জাত মহাল মধ্যে বাঙ্কী নামে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। বাঙ্কীর অন্তর্গত মলবেহারপুরেই মুকুন্দদাসের দ্বিতীয় টুঙ্গি নির্ম্মিত হইয়াছিল। গড়জাত মহাল মধ্যেই এই ধর্ম্মের প্রথম উন্নতি দেখা গিয়াছিল। ক্রমে তাঁহার শিষ্যগণের যত্নে সম্বলপুর, গঞ্জাম, পুরী ও কটক জেলাগুলির নিম্ন শ্রেণীর অধিবাসীদিগের মধ্যে এই ধর্ম্ম বিলক্ষণরূপে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহাদের সংখ্যা ৫০ হাজারের ন্যূন হইবে না। বরং অধিক হওয়াই সম্ভব। যদিচ তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা মহিমাধর্ম্ম কিঞ্চিৎ বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে তথাপি আমরা মুকুন্দ দাসকে প্রকৃত একেশ্বরবাদী ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে একেশ্বরবাদ বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি, কারণ একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক উপাসনাই মহিমা-ধর্ম্মের মূল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ঢেঙ্কানালের অধীন জকা নামক স্থানে মহিমাধর্ম্মের একটী প্রকাণ্ড "সঙ্গম" হইয়াছিল। যাহারা এই সঙ্গমে উপস্থিত ছিল লেখক তাহাদের

* দারুঠেং খুর্দ্দার অন্তর্গত একটী পল্লিগ্রাম।

নিকট শ্রুত হইয়াছেন যে এই সময়ে মহাত্মা মুকুন্দ দাস প্রায় বিংশতি সহস্র টাকা মূল্যের নানাবিধ দ্রব্যের উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিবার জন্য ঢেঙ্কানালের মহারাজকে অনুরোধ করেন। মহারাজ তাহাতে অসম্মত হইলে তিনি সেই সকল দ্রব্য ধুনিতে নিক্ষেপ করিলেন, ক্রমে সেই সকল ভস্ম হইয়া গেল। ইহার অল্পকাল পরেই প্রথমতঃ গোবিন্দ দাস তৎপরে মহাত্মা মুকুন্দদাস মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার শিষ্যগণ বলিয়া থাকেন যে তিনি যদিচ আমাদের নিকট অদৃশ্য হইয়াছেন তথাপি তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন নাই, আবশ্যক হইলে তিনি পুনর্ব্বার লোকসমাজে প্রকাশিত হইবেন

উড়িষ্যার অন্তর্গত অনেক পল্লীতেই মহিমাধর্ম্মাবলম্বীদিগের টুঙ্গি বা আশ্রম আছে। সেই সকল দর্শন করিলে অবশ্যই তাহাকে "শান্তি কুটীর" আখ্যা প্রদান না করিয়া বিরত হওয়া যায় না। প্রবন্ধলেখক উড়িষ্যায় অবস্থানকালে পরগণে হরিহরপুরের অন্তর্গত কুয়ামহাঙ্গা গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। তথায় কুম্ভিপটীয়াদের একটী টুঙ্গি আছে। সেই টুঙ্গিতে দুই জন কুম্ভিপটীয়া বাবাজির সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছিল। লেখক তাহাদের নিকট যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছেন তাহা যত্নের সহিত অদ্য পাঠকদিগকে উপহার অর্পিত হইল।

সেই টুঙ্গিতে বসিবার জন্য কোনও প্রকার আসন নাই। রাজা প্রজা সকলের জন্যই মৃত্তিকাসন। বাবাজিগণও মৃত্তিকাতেই শয়ন ও উপবেশন করিয়া থাকেন। তাহাদের সম্পত্তি দুই খানি কুম্ভি বৃক্ষের বল্কল বা পট ও এক খানা বেতের বড় রকমের লাঠী, আর টুঙ্গি গৃহ মধ্যে একটী ধুনি আছে। এই ধুনিটী আশ্রয় করিয়া তাহারা ষড় ঋতু অতিবাহিত করিয়া থাকে। বাবাজিগণ ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেন। কিন্তু কোন গ্রামে এক দিবা রাত্রের অধিক বাস করিবার জন্য মহিমাস্বামীর নিষেধ আছে।

সেই টুঙ্গি গৃহে লেখকের সহিত যে দুই জন বাবাজির দেখা হইয়াছিল তাঁহারা বিশেষ লেখা পড়া জ্ঞাত নহেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের প্রতি লেখকের ভক্তির উদয় হইয়াছিল। তাহারা যথার্থই ঈশ্বরপ্রেমিক, জগতে প্রেমই ধর্ম্মের মূল; যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, তিনি অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন হইলেও ধর্ম্মরাজ্য হইতে অনেক দূরে থাকেন।

এজন্যই জনৈক ভক্ত গাইয়াছিলেন—

> আমায় দে মা পাগল করে।
> আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।
>
> *   *   *   *
>
> তুই প্রেমে উন্মাদিনী, (ও গো মা)
> পাগলের শিরোমণি, প্রেমধনে
> কর মা ধনী কাঙ্গাল প্রেম দাসেরে।

সেই দুই জন বাবাজিকে তাহাদের ধর্ম্মের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করায় তাহারা লেখককে একটী কবিতা শুনাইয়াছিলেন। সেই কবিতাটী এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন

> সেতেক বিষ্ণু যোনি জন্ম।
> সে কাষ্ঠ হেবে ব্রহ্মে লীন॥
> যে যোগী ব্রহ্মকে পরছে।
> যো পুনি থাই তাঙ্ক পাছে॥
> অন সাধনা যোগী জন।
> গোপনে করন্তি ভোজন॥
> ঠুল শূন্য কু লয় দেই।
> মহিমা হৃদে ভাব থাই॥
> সন্ধ্যাবেলা নমস্কার।
> পশ্চিমে করে দশবার॥
> ভূমিরে করই শয়ন।
> ধূনিকি দেই থাই ধ্যান॥

ন খাই বেদ মন্ত্রে মন।
অন সাধনা মনে মন॥
ন থাই মালা গলে ভরি
তুলসী মালা দূরে করি।
প্রাতঃকালের নমস্কার।
পূর্ব্বকু করহি পোনর॥
সষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হোই।
পরি থাই যে তলে সুই॥
উঠিবে শিরে কর দেই।
রহিবে পাদ ঠেকি দেই॥
সূর্য্য অস্তে ন ভুঞ্জিবে ভাত।
তুণ্ডরে কহথিব সত্য॥
গুরুকু আজ্ঞা শিরে ধরি।
পাদুক থিব প্রাস করি॥
সে মোর ব্রহ্মে লীন হোই।
মো তাঙ্কু শরীরে লভই॥
ভোজন যাহার দ্বারে হেব।
সে ঠাকু বেগে চলি জিব॥
এমন যেবে ন জানহি।
যোগী হইলে মাগি খাই॥
মাটি খাপরারে ভুঞ্জই।
পরকু উচ্ছিষ্ট দেহই॥
মিথ্যাকু যোগী হই খাই।
কুকুর যেন ঝুটা খাই
সে যোগী তেমন্ত হই।
আবার সুয়রি আটই॥
দেহ ছাড়িলে নরক যাই।
তাহাকু পরিত্রাণ নাহিঁ॥
আপনা ব্রহ্ম হেতু দিলে॥
চিন্না চৈতন্য চিনি থিলে॥
চেতারে যেবে আগি থাই।
তেহুটী অমর বোলাই॥
খর্গে ছেদিলে ন ছিড়ই।
অপোড়া ভূমি তা অঠই॥
ব্রহ্মের নাহি নাসা কর্ণ।
আঠারে নাহি না শ্রবণ॥
নাহি তাহার পাদ পাণি।
যে অবা হেতু দ্বারা আনি॥
নাহি তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ।
সর্ব্ব ঘটরে সে আপন॥
নাহি তাহার যোনি অণ্ড।
সে ব্রহ্ম পুরিছি ব্রহ্মাণ্ড॥
অগ্নি তেজ গরু টান।
পানিরে পাতল সে জন॥
ন পোড়ে অগ্নি যে জালিলে।
পবন জ্যোতি রে মিলিলে॥
ইহাকু যেবে ধরি পারু।
এ মায়া ঘোর ভেবে তরু॥

অর্থ—বিষ্ণুযোনিজাত সকলই কেন ব্রহ্মে লীন হইবে? যে যোগী ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন, আমি সর্ব্বদাই তাঁহার পাছে থাকি। "অন সাধনা" (বাসনা বর্জ্জিত?) যোগীগণ যোগমন-উপযুক্ত পথে ভোজন করিয়া থাকে। মূল শূন্যে (নিরাকারে) মন স্থাপন পূর্ব্বক হৃদয়ে ঈশ্বর-মহিমা ও একাক্ষর মন্ত্র (ওঁ) জপ করিবে। সন্ধ্যাবেলা পশ্চিমদিকে দশবার প্রণাম করিবে। একমাত্র ধুনি অবলম্বন করিয়া ভূমিতে শয়ন করিবে। বেদমন্ত্রে মনোনিবেশ না করিয়া মনে মনে বাসনা বর্জ্জন করিবে (বা আধ্যাত্মিক উপাসনা করিবে)। তুলসীমালা দ্বারা গলা পূর্ণ না করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিবে। প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিকে পোনর বার নমস্কার করিবে। ভূমিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে, এবং শিরে কর দিয়া ভূমি হইতে উঠিবে। সূর্য্যাস্ত হইলে আহার করিবে না। মুখে সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে। গুরুর আজ্ঞা শিরে ধারণ ও তাঁহার পাদোদক পান করিবে। (এই সকল সদাচারী) ব্যক্তি ব্রহ্মে লীন হইবে, আমি তাহাকে শরীরে গ্রহণ করিব। যাহার দ্বারে আহার করিতে হইবে তথায় বেগে চলিয়া যাইবে।

এই সকল তত্ত্ব অনবগত ব্যক্তি যোগী হইলেও ভিক্ষুক মাত্র। তাহারা মাটির খাপরায় ভোজন করে ও পরকে উচ্ছিষ্ট দেয়, মিথ্যা যোগী বলিয়া পরিচয় দেয় ও কুকুরের ন্যায় উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে। এই সকল ব্যক্তি জন্মান্তরে বরাহ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ও পরলোকে নরকে গমন করিয়া থাকে, তাহাদের পরিত্রাণ নাই।

যিনি আপনাকে ব্রহ্মসম্ভূত বলিয়া জানেন তিনি চিৎচৈতন্যকে চিনিতে পারেন।

যাহার চিত্তে এরূপ ধর্ম্মভাব জাগরিত, তিনিই অমর। তাহাকে খড়্গ দ্বারা ছেদন করা যায় না, অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না।

ব্রহ্মের নাসা কর্ণ নাই, তাঁহার শ্রবণ নাই, তাঁহার হস্ত পদ নাই, কেবল হেতু দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ নাই। সর্ব্ব ঘঠে তিনিই অধিষ্ঠান। তাঁহার যোনি কিম্বা অণ্ড নাই, সেই ব্রহ্ম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার তেজ অগ্নি হইতে শ্রেষ্ঠ, তিনি জল হইতে তরল। পবন ও জ্যোতিতে মিশ্রিত হইলেও তাঁহার লয় হয় না, আগুণ জ্বালাইয়া তাঁহাকে পোড়াইতে পারা যায় না। তাঁহাকে যদি ধরিতে পার, তাহা হইলে এই মায়াময় সংসার হইতে উদ্ধার পাইবে।

এই কবিতা পাঠ করিয়া স্বতঃই মনে একটী প্রশ্নের উদয় হয় যথা মাহিমাধর্ম্মাবলম্বীগণ কৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন কি না। কিন্তু তাহা তাঁহারা করেন না। তাঁহারা প্রাতঃকালে অর্থাৎ অরুণোদয় সময়ে পূর্ব্ব দিকে পোনর বার ও সূর্য্যাস্ত কালে পশ্চিম দিকে দশ বার প্রণাম করিয়া থাকেন। এজন্য কেহ কেহ তাঁহাদিগকে সূর্য্যোপাসক বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে আমরা জড় পদার্থের উপাসক নহি, "যে অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতির কণিকা মাত্র প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য জগৎদগ্ধকারি জ্যোতি বিস্তার করিয়া থাকে আমরা প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেই অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়কে প্রণাম করিয়া থাকি।"

ক্রমশঃ।

গান।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালী।

আঁখিজল মুছাইলে জননি,
অসীম স্নেহ তব, ধন্য তুমি গো,
ধন্য ধন্য তব করুণা।
অনাথ যে, তারে তুমি মুখ তুলে চাহিলে,
মলিন যে তারে বসাইলে পাশে,
তোমার দুয়ার হতে কেহ না ফিরে,
যে আসে অমৃত পিয়াসে।
দেখেছি আজি তব প্রেমমুখহাসি,
পেয়েছি চরণচ্ছায়া,
চাহি না আর কিছু পুরেছে কামনা,
ঘুচেছে হৃদয় বেদনা।

রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল।

ডুবি অমৃত পাথারে,—
যাই ভুলে চরাচর,
মিলায় রবি শশি।
নাহি দেশ, নাহি কাল,
নাহি হেরি সীমা,
প্রেমমূরতি হৃদয়ে জাগে
আনন্দ নাহি ধরে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

অসীম কাল সাগরে ভুবন ভেসে চলেছে
অমৃত ভবন কোথা আছে তাহা কে জানে ;
হের, আপন হৃদয় মাঝে ডুবিয়ে,
এ কি শোভা ; অমৃতময় দেবতা সতত
বিরাজে এই মন্দিরে, এই সুধা নিকেতন।

রাগিণী আসাবরি—তাল চৌতাল।

এখনো আঁধার রয়েছে, হে নাথ,
এ প্রাণ দীন মলিন, চিত্ত অধীর,
সব শূন্যময়।
চারি দিকে চাহি পথ নাহি নাহি,
শান্তি কোথা, কোথা আলয়।
কোথা তাপহারী পিপাসার বারি
হৃদয়ের চির আশ্রয়।

রাগিণী বেলাবলী—তাল কাওয়ালি।

দেখা যদি দিলে ছেড়োনা আর,
আমি অতি দীন হীন।
নাহি কি হেথা পাপ মোহ
বিপদ রাশি?
তোমা বিনা একেলা
নাহি ভরসা।

কালনা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে
যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার
সার মর্ম্ম।

দেশভেদে, জাতিভেদে, অবস্থাভেদে, মানসিক প্রবৃত্তিভেদে ধর্ম্মের যে কত প্রকার মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সত্য ধর্ম্মের রূপ "একমেবাদ্বিতীয়ম্", সত্য ধর্ম্ম একই। প্রকৃত ধর্ম্ম চির কালই এক ও এক ভাবে অবস্থিত। প্রাচীন ঋষিগণ বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্ররূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া বহু ক্লেশে বহু যত্নে যে অমৃতময় ফল উত্থাপিত করিয়াছেন তাহাই সত্য ধর্ম্ম, তাহাই বিশ্বজনীন সনাতন ধর্ম্ম, তাহা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম উচ্চ স্বরে উপদেশ দিতেছেন যে, হৃদয় পবিত্র করিয়া দৃঢ়তর বিশ্বাসের সহিত অটল ভক্তি সহকারে সেই করুণাময় পর ব্রহ্মের উপাসনা কর। তাহা হইলে, অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়া অনন্তকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।" ইহা ভিন্ন মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

যদি ভারতবর্ষ কখন সুখসূর্য্যের মুখ দেখিতে পায়, এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মই তাহার এক মাত্র নিদান। এই সত্য ধর্ম্ম ব্রাহ্ম ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ কর, ইহলোকে ও পরলোকে অতুল আনন্দ উপভোগ করিবে। এই সত্য ধর্ম্মের উদার ভাব যাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত সুখী, তিনিই মানব বলিয়া গণ্য ও তাঁহারই জীবন ধন্য। এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিতে ভ্রমান্ধকার বিনষ্ট হয়, কুসংস্কার সকল বিদূরিত হয়, হৃদয়ের সঙ্কোচভাব তিরোহিত হইয়া উদার ভাবের আবির্ভাব হয়, সত্যানুরাগ উদ্দীপিত হইয়া হৃদয়কে রঞ্জিত করে। এই সত্য ধর্ম্মের প্রভাবে মনুষ্য প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হন। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন ভারতের দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে, আপনার উদার ভাব, আপনার মহত্ত্ব প্রচার করিবেন, যখন নরনারীগন পিপাসাকুল হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত এই সত্য ধর্ম্মকে মানবগণের প্রকৃত হৃদয়ের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, যখন সমগ্র ভারতবাসী এক ভাবে এক হৃদয় হইয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহামন্ত্র সাধন করিতে থাকিবেন, যখন ভারতের চতুর্দ্দিকে ব্রহ্ম নাম প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে, যখন পরম পিতার স্তুতিগীতে ভারতের আকাশ পরিপূর্ণ হইবে, তখন ভারতের সুখসূর্য্য উদিত হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিবে, তখন সকলের হৃদয়যন্ত্র একতানে বাজিতে থাকিবে, তখন পরস্পর সহানুভূতি অনুভূত হইয়া সকলের প্রতি সমান ভাবে স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিতে থাকিবে, তখন পরস্পরের বিদ্বেষ ভাব একবারে বিদূরিত হইয়া যাইবে, তখন জাতিগত পার্থক্য ভাব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন প্রকৃত ভ্রাতৃভাব সমুদ্ভূত হইয়া সমস্ত ভারতবাসীকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিবে, তখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রকৃত মহিমা চারিদিকে প্রচারিত হইতে থাকিবে, তখন ভারতের সুখসূর্য্য পুনরায় সমুদিত হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবে।

হে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ আসুন, আমরা সকলে

এই শুভ দিনে একতান মনে সেই হৃদয়ের অধীশ্বর পরমকারুণিক জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া জীবন সার্থক করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে গত মাসে আমরা নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকা গুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.

No VIII for 1884.

Bibliotheca Indica. Published by the Asiatic Society of Bengal.

N. S. No 514, 515 (Akbornamha.)
N. S. No 519 (Katha Sarit Sagara.)
N. S. No 511 (Nitisara.)
N. S. No 512 (তত্ত্বচিন্তামণি।)
N. S. No 513 (স্ববিরাবলীচরিত্রপরিশিষ্ট।)
N. S. No 516 (চতুর্বর্গ চিন্তামণি।)
N. S. No 517 (সভাষাবৃত্তি-নিরুক্তম।)
N. S. No 518 (চতুর্বর্গ চিন্তামণি।)

সাধন-বিন্দু—শ্রীসীতানাথ দত্ত প্রণীত।
ভাব-সংগীত—শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্ত প্রণীত।
নিবাধই ইযংমেন্স লাইব্রেরির কার্য্য বিবরণ।
হিন্দু ধর্ম্ম কাহাকে বলে।
প্রচার। প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা।
নব্যভারত। দ্বিতীয় খণ্ড ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা।
আলোচনা। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা।
আর্য্যদর্শন। দশম খণ্ড, কার্ত্তিকের সংখ্যা।
ভারতী। অষ্টম ভাগ। সপ্তম সংখ্যা।
বামাবোধিনী পত্রিকা। ২৩১ সংখ্যা।
হানিমান। দ্বিতীয় ভাগ, ৭ম সংখ্যা।
Thieosophist. Vol 6, No 2.
পতাকা। নূতন সাপ্তাহিক সংবাদ ও সাময়িক পত্র।
"ব্রাহ্মধর্ম্মকে ব্যাখ্যান। হিন্দী অনুবাদ" দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা।
রবার্ট মেকেয়ার বা ইংলণ্ডে ফরাসী দস্যু।

আয় ব্যয়।

ভাদ্র ও আশ্বিন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৫।

আদি ব্রাহ্মসমাজ

আয়	... ...	১১৯৪।৶০
পূর্ব্বকার স্থিত		২৭৮৩৲
সমষ্টি	...	৩৯৭৭।৶০
ব্যয়	... ...	৮৪৩৸ ৬
স্থিত	... ...	৩১৩৩৸৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৯৬৸৶৫
দান প্রাপ্তি।	
শ্রীযুক্ত রায় রমণীমোহন চৌধুরী বাহাদুর (ভুষভাণ্ডার)	২৫৲
,, বাবু তারকনাথ দত্ত	১০৲
,, ,, শিবচন্দ্র নন্দী	৮৲
,, ,, কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নড়াল)	৫।০
,, ,, শ্রীনাথ মিত্র	৩৲
,, ,, কাশীনাথ দত্ত	২৲
,, ,, রামকৃষ্ণ আঢ্য	২৲
,, ,, হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ফিরোজপুর)	১।৶০
,, ,, কানাইলাল পাইন	১৲
	৫৮৶০
পরলোক গত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট কাগজের সুদ	২০৲
দানাধারে দান প্রাপ্তি	১।০
পুরাতন দ্রব্যাদি বিক্রয়	১৭।০
	৯৬৸৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৫৬৸ ৬
পুস্তকালয় ...	১৯ ৶৬
যন্ত্রালয় ...	৬৩৪।৷ ৯
গচ্ছিত ...	৫ ৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৯২৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	৯০৲
সমষ্টি	১১৯৪।৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৮৪৷ ৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৬৮৷০
পুস্তকালয়	৩২৸৶৩
যন্ত্রালয়	৩০৬৸৶৯
গচ্ছিত	২২৸৶৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৮৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	৯০৲
সমষ্টি	৮৪৩৸ ৬

সম্পাদক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

পঞ্চপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ

১১ মাঘ শুক্রবার প্রাতঃকাল ৭।।০ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহে উপাসনা হইবে।

ঐ দিবস মধ্যাহ্ন হইতে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে পাঠ, আলোচনা ও সংকীর্ত্তন হইয়া ৩ টার সময়ে উপাসনা আরম্ভ হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

আদর্শ।

কে জানে সে কত বর্ষ হয়েছে অন্তর
মানবের খোঁজ হারা অরণ্য ভিতর
পাষাণে খোদিয়া আনা মূর্ত্তির মতন
মহাধ্যানে মহামুনি মুদিয়া নয়ন।
ঈষদ্ হাস্যের রেখা ওষ্ঠ দুটি চিরে
আত্মার সম্বাদ তার আনিল বাহিরে—
ভুলিয়া গিয়াছে ঋষি বাহ্য পরকাশ
নাহি চন্দ্র নাহি সূর্য্য সাজায়ে আকাশ
কোথায় আছেন ঋষি? কোথা বসুন্ধরা
অরণ্য প্রান্তর গিরি তৃণ গুল্ম ভরা?
বহিতে অনিল নাই জ্বলিতে অনল,
সকলি অদৃশ্য আজি, সকলি নিশ্চল!
দিক্ কি দিগন্ত নাই; বিন্দুতে মিশিয়া
রয়েছে অনন্ত শূন্য স্তম্ভিত হইয়া।
কেবল একটি প্রাণ অবাত-কম্পিত
আপনা আপনি আছে হ'য়ে জাগরিত।
আনন্দ সেখানে ধীর শুভ্র পরকাশ,
তাই আচম্বিতে হেরি ঋষির উল্লাস।

(আলোচনা।)

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

২ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৫

আচার্য্যের উপদেশ।

মনুষ্যের কি প্রেম—কি দুঃখ। যাহার প্রেম নাই তাহার দুঃখ নাই; পৃথিবীতে যদি প্রেম না থাকিত তবে কাহারো ভ্রাতৃ-বিয়োগ হইত না, বন্ধুবিয়োগ হইত না, মাতৃ-বিয়োগ হইত না, পিতৃ-বিয়োগ হইত না,—কাহারো সংসার কখন অন্ধকার হইত না। মনুষ্যের দুঃখ মনুষ্যই জানে,—সে দুঃখ নিবারণের জন্য কত শত মহাত্মা অকুতোভয়ে বক্ষ পাতিয়া দিয়া দারুণ দুঃখকে আলিঙ্গন করিয়াছেন—মনুষ্যের দুঃখ মোচনের জন্য মনুষ্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছে। মনুষ্যের মৃত্যু পৃথিবীর উপরে কি নিদারুণ বজ্রাঘাত—তাহাতে পশু পক্ষী তরু-লতা পর্য্যন্ত শোকে আকুল হয়।

মনুষ্যের এত যে দুঃখ তাহা কিসের জন্য? প্রীতিই সে দুঃখের মূল এবং প্রীতিই সে দুঃখের ঔষধ। পৃথিবীর উত্তাপ যেমন আকাশের অশ্রুধারা আকর্ষণ করে—আত্মার দুঃখ-তাপ সেইরূপ পরমাত্মার প্রসাদ-বারি আকর্ষণ করে। স্বয়ং ঈশ্বর মনুষ্যের দুঃখের মোচনকর্ত্তা,—এবং তিনি যাহার দুঃখ মোচন করেন—সেই ব্যক্তিই অন্যের দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ। ঈশ্বরের অমৃত প্রেম-ভাণ্ডার হইতে যাহার সকল অভাবের পরিসমাপ্তি হইয়াছে—সেই ভাগ্যবান্ পুরুষই মনুষ্যের হৃদয়াভ্যন্তরে ঈশ্বর-প্রেমের উৎস খুলিয়া দিতে পারে; সে উৎস খুলিয়া গেলে অনন্ত উৎসবের দ্বার খুলিয়া যায়,—তাহার প্রবল স্রোতে দুঃখ তাপ ভয় বিভীষিকা কোথায় কোন্ পাতাল-গহ্বরে নিমগ্ন হইয়া যায়; তখন আর আত্মায় আত্মায় প্রাচীরের ব্যবধান থাকে না; মনুষ্যে মনুষ্যে দেখা হইলে পরস্পরের নয়ন শরীরের বন্ধন না মানিয়া পরস্পরের আত্মার অন্তঃপুর-ধামে প্রবেশ করে, এবং সকল আত্মা মিলিয়া পরমাত্মার প্রেম-রসে দ্রবীভূত হইয়া আর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে চাহে না। মনুষ্যের এই এক মহৎ দুঃখ যে, কেন এই স্বর্গের দ্বার পৃথিবীতে একেবারে রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে;—মনুষ্য দুঃখের উপর দুঃখ পাইতেছে—জানিতেছে—দেখিয়া শিখিতেছে—ঠেকিয়া শিখিতেছে, তবুও কেন আবার পুনঃ পুনঃ কণ্টকময়-পথে বিচরণ করে,—একবারও শান্তি-ধামের দিকে ফিরিয়া চাহে না। ইহাকেই বলে মোহ—ইহাকেই বলে অবিদ্যা—ইহাকেই বলে মায়া,—ইহাই যত কিছু কু—সমস্তেরই মূল। বন্য হরিণকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া কোন দয়ার্দ্র ব্যক্তি যদি ভালবাসিয়া তাহাকে তৃণ পত্র খাওয়াইতে যায়, তবে সে হরিণ পলাইয়া যায় কেন? যদি সে ঐ ব্যক্তির প্রদত্ত ভক্ষ্য গ্রহণ করিত—তাহা হইলে তাহার ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইত এবং কত আদর পাইত; তাহা তাহার ভাগ্যে ঘটিল না—শুধু শুধু সে কেবল ভয়েই অস্থির। সেই হরিণের মধ্যে এবং সেই মনুষ্যের মধ্যে কি একটা মিথ্যা প্রাচীর দণ্ডায়মান হইল—এ প্রাচীরের কিছুই আবশ্যকতা ছিল না—এ প্রাচীরের পত্তন-ভূমি মিথ্যা একটা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই রূপ একটা অলীক ভ্রম-কে প্রস্তর-ময় দুর্গ মনে করিয়া আমরা তাহার সীমা লঙ্ঘন করিতে কিছুতেই সাহস পাই না;—ঈশ্বরের নিকটে গেলেই আমাদের সকল অভাব দূরে যায়—যাহা আমরা চাহিতেছি তাহাই আমরা পাই—ইহা জানিয়াও আমাদের সেই সাধের দুর্গ-হইতে এক পা বাহিরে যাইতে হইলে আমাদের প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। হরিণ মুগ্ধ জীব—সে মৃগ-তৃষ্ণায় ভুলিতে পারে,—

কিন্তু আমরা মনুষ্য হইয়া—জ্ঞানবান্ জীব হইয়া—মৃগতৃষ্ণিকা-নদী পার হইতে কেন যে, এত ডরাই, তাহা বুঝিতে পারা যায় না—আমরা জানিতেছি যে সেই মায়া-মরীচিকার পর পারে ঈশ্বরের অতুল প্রেম-ঐশ্বর্য্য আমাদের জন্য অবারিত রহিয়াছে—তথাপি আমাদের নিজের মনঃকল্পিত সেই মায়া-নদী উল্লঙ্ঘন করিতে আমরা নিজেই ভীত হই—এই এক আশ্চর্য্য বিভীষিকা। স্বপ্নের কাল্পনিক ব্যাঘ্রকে সম্মুখে দেখিয়া আমরা এত ভয় পাই যে, সেই ভয়ে আমরা বাস্তবিক প্রাণত্যাগ করি।

কত-শত পর্য্যটক কত-শত নদনদী পর্ব্বত—মারী দুর্ভিক্ষ—রাক্ষসাচারী অসভ্য লোকদিগের শত্রুতা—অতিক্রম করিয়া নাইল্-নদীর মূল উৎস আবিষ্কার করিবার জন্য—কত-শত দিন অনাহারে অনিদ্রায় যাপন করিয়াছেন—বিষাক্ত মশক দংশনে জ্বর-যাতনা অনুভব করিয়াছেন—পৈশাচিক আচার ব্যবহার দর্শনে অন্তর্দাহে দগ্ধ হইয়াছেন—প্রাণকে তুচ্ছ-বোধ করিয়াছেন—প্রিয় আত্মীয় স্বজনের মুখ-জ্যোতি হইতে আপনাকে জন্মের মত নির্ব্বাসিত করিয়াছেন—তথাপি স্বীয় অভীষ্ট সাধন হইতে এক বিন্দুও পরাঙ্মুখ হ'ন নাই; নাইল্-নদীর উৎস আবিষ্কার করিবার জন্য যদি মনুষ্য এত বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে—তবে আত্মার অভ্যন্তরস্থিত অমৃত-প্রেমের উৎস আবিষ্কার করিবার জন্য আমরা কি এটুকুও পারিব না যে, মোহ-নদী যাহা মরীচিকা-মাত্র—আমাদের মনের কল্পনা-মাত্র—সেই নদী-উত্তরণে যত্ন নিয়োগ করি;—আমাদের নিজের ছায়াতে যদি আমরা নিজে ভীত হই, তবে আমাদের মনুষ্য-জন্ম বৃথা। এই মোহ-মরীচিকা আমাদিগকে কি পর্য্যন্ত না প্রতারিত করিতেছে—পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে অধিষ্ঠান করিতেছেন অথচ মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছি—তাই আমরা মনে করি যে, আমাদের প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা আমাদের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন; তথাপি সময়ে সময়ে যখন আমরা সংসারারণ্যের চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমাদের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে; তখন আমাদের মন হইতে এইরূপ কাতর ধ্বনি উত্থিত হয়—"কোথায় আমরা তাঁহার দর্শন পাইব?" আমরা দেব মন্দিরে গেলেই দেবতার দর্শন পাই,—কোথায় গেলে পরমাত্মার দর্শন লা'ভ করিতে পারি—তাঁহার পূজা করিতে পারি? ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহার এই উত্তর দিতেছেন যে, "শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" সাধক শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন। শান্ত দান্ত হইয়া অর্থাৎ সংযত-চিত্ত হইয়া, উপরত হইয়া অর্থাৎ বিষয়াকর্ষণ হইতে মুক্ত হইয়া, তিতিক্ষু হইয়া অর্থাৎ দুঃখসহিষ্ণু হইয়া, সমাহিত হইয়া অর্থাৎ একাগ্র-চিত্ত হইয়া, সাধক আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন। মনের শান্তি হইতে একাগ্রতা পর্য্যন্ত যাত্রা করিতে হইবে—ইহাই ব্রাহ্মের তীর্থ-যাত্রা। সেই খানে উপস্থিত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, আত্মাই ব্রাহ্মের দেব-মন্দির-পরমাত্মাই ব্রাহ্মের উপাস্য দেবতা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-পথিকের প্রথম বিরাম-স্থান শান্তি; তিনি প্রথমে মনকে শান্ত করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতে কহেন? না "সম্যক্‌প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়" সম্যক্‌প্রশান্তচিত্ত শমান্বিত ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে; ব্রাহ্মধর্ম্ম কিরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতে উপদেশ দেন—না "তদেতৎ ব্রহ্মা-

পূর্ব্বং এতদমৃতমভয়ং শান্ত উপাসীত” সেই এই অনাদি পরব্রহ্মকে—এই অমৃত-স্বরূপকে —অভয়-স্বরূপকে—শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। কি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু—কি ব্রহ্মের উপাসক—শান্তি উভয়েরই পাথেয় সম্বল। পথিকের নানাবিধ পাথেয় সম্বল আবশ্যক— কিন্তু তাহার মধ্যে অন্নই সর্ব্ব-প্রধান—যেহেতু তাহা না হইলেই নয়; সেইরূপ—ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ-যাত্রীর পাথেয় সম্বলের মধ্যে শান্তিই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সঙ্গীত-সাধকের পক্ষে যেমন সা-রে-গা-মা শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক—সাহিত্য-সাধকের পক্ষে যেমন ব্যাকরণ-শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক—ধর্ম্ম-সাধকের পক্ষে সেইরূপ শান্তিশিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক। শান্তি যে কি অমূল্য বস্তু তাহা আমরা জানি না— আমাদের দেশের পূর্ব্বতন ঋষিরা তাহা জানিতেন। একটু সম্পদেই আমরা হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠি—একটু বিপদেই আমরা বিষাদে নিমগ্ন হই; এই আমরা আকাশে উড্ডীয়মান হইতেছি—ক্ষণপরে পাতালে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছি; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইতেছে। শিশু যেমন নূতন চলিতে শিক্ষা করিয়া এই চলিতেছে— এই পড়িয়া যাইতেছে—এই উঠিয়া দাঁড়াইতেছে—আবার চলিতেছে—ব্রাহ্মধর্ম্ম-পথে আমরা সেই ভাবে চলিতেছি। আমরা যদি কিয়ৎ সপ্তাহ ধরিয়া শুদ্ধ কেবল মনকে প্রশান্ত করিতে সচেষ্ট হই—তাহা-হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ আমাদের পক্ষে অনেক সুগম হইয়া যায়। পথ চলিবার পূর্ব্বে হাঁটিতে শেখা আবশ্যক—ধর্ম্ম-পথে চলিবার পূর্ব্বে মনকে প্রশান্ত করা আবশ্যক। শান্তির চরম আদর্শ এইরূপ,—“আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ” আপূর্য্যমান অচল-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রে যেমন জল-রাশি প্রবেশ করে, “তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী” সেইরূপ যাঁহাতে কামনা-সকল প্রবেশ করিয়া বিলীন হয়, তিনিই শান্তি লাভ করেন, যিনি কাম্য বিষয়-সকল কামনা করেন— তিনি নহেন।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-পথিকের প্রথম বিরাম-স্থান শান্তি—দ্বিতীয় বিরাম-স্থান দান্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন। যখন বিষয়ের প্রলোভন সম্মুখে উপস্থিত নাই—তখন আমরা নিভৃত স্থানে বসিয়া মনকে প্রশান্ত করিলাম;— কিন্তু তাহাতে আমরা কত দূর কৃত-কার্য্য হইলাম—তাহা পরীক্ষা-ব্যতিরেকে জানা যাইতে পারে না। তখনই আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব যখন আমরা দেখিব যে, বিষয়-রাজ্যে বিচরণ করিবার সময় ইন্দ্রিয়-অশ্ব নিয়ত আমাদের বশে থাকে—একবারও আমাদের নিয়ম-রশ্মি অমান্য করে না। যে আত্মার ইঙ্গিত-মাত্রেই ইন্দ্রিয়-অশ্ব কুপথ পরিত্যাগ করিয়া সুপথে ধাবিত হয় সেই আত্মাই আত্মা। সাধক নির্জ্জন স্থানে শান্তি অভ্যাস করিবেন এবং বিষয়ের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দান্তি অভ্যাস করিবেন তাহা হইলে ক্রমে তাঁহার আত্মাতে অজেয় বল উদ্ভূত হইবে।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-পথিকের তৃতীয় বিরাম-স্থান উপরতি। সাধক যখন দান্তি-শিক্ষায় পরিপক্বতা লাভ করেন—তখন তাঁহার মন বিষয়-বন্ধন হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পায়;—তখন তাঁহার নিকট প্রলোভনের প্রলোভনত্ব থাকে না—বিভীষিকার ভীষণত্ব থাকে না—মোহের আকর্ষণ থাকে না—তিনি তখন সংসারে লিপ্ত থাকিয়াও নির্লিপ্ত—নিবাসে থাকিয়াও প্রবাসী—প্রবাসে থাকিয়াও নিবাসী;—এইরূপ বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত ভাবকেই উপরতি কহে। উপরতি কি আরামের বস্তু।— উপরতিই আত্মার স্বাস্থ্য। অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া আরোগ্য লাভ করিলে

শরীরে যেমন আরাম বোধ হয়, ক্ষুধানল প্রজ্বলিত হয়—চক্ষু মুখ প্রসন্ন হয়,—অনেক দিনের সঞ্চিত মোহ-গরল আত্মা হইতে বিধৃত হইয়া গেলে আত্মা সেইরূপ আরাম উপভোগ করে—আত্মার শ্রী ফিরিয়া যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-পথিকের চতুর্থ বিরাম-স্থান—তিতিক্ষা। সাধক উপরতি-সোপানে উত্তীর্ণ হইলেও সাংসারিক উৎপাত তাহাকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে না—সে সমস্ত সহ্য না করিলে তাঁহার আর উপায়ান্তর নাই। অনেক ধর্ম্ম-শাস্ত্র এইরূপ দেখিয়া সাধককে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে পলাইতে উপদেশ দেন—কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এস্থলে সাধককে সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে উপদেশ দেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম পথিকের পঞ্চম বিরাম-স্থান—একাগ্রতা। ব্রাহ্ম সাধক পূর্ব্বোক্ত ঐ চারিটি সাধনে পরিপক্কতা-লাভ করিলে তাঁহার পথের কণ্টক সকল দূরীভূত হয়—তাহা হইলেই তাঁহার মন নির্বিঘ্নে একাগ্রতা-মঞ্চে উপনীত হয়। এইরূপ সাধন দ্বারা সাধকের মন যখন বিষয়-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মার দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়, তখন সেই সাধক আত্মার পবিত্র দেবালয়ে পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন,—দর্শন-মাত্রে আত্মা এত দিন ধরিয়া যাহার জন্য বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া রোদন করিয়াছে সেই অতুল্য অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হয়—যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ—যাঁহাকে পাইয়া অন্য কোন লাভকেই লাভ বলিয়া মনে হয় না;—ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই বলেন

"শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি। নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি বিপাপোবিরজোঽবিচিকিৎসোব্রাহ্মণোভবতি।

শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া সাধক আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন; পাপ ইহাঁকে অতিক্রম করিতে পারে না ইনি সমুদায় পাপকে অতিক্রম করেন; পাপ ইহাঁকে দহন করিতে পারে না—ইনি সমুদায় পাপকে দহন করেন; ইনি নিষ্পাপ নির্ম্মল এবং নিঃসংশয় হইয়া ব্রাহ্মণ হ'ন। "স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা"—আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাইয়া তাঁহার আর আনন্দ রাখিবার স্থান থাকে না—"তরতি শোকং" তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হ'ন "তরতি পাপ্মানং" তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন—"গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতোভবতি" সমস্ত হৃদয়-গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হ'ন।

হে পরমাত্মন্, আমাদের আত্মাকে তুমিই তোমার দেবালয়রূপে প্রস্তুত করিয়াছ—যাহাতে সেই স্থানে গিয়া তোমার দর্শন লাভ করিতে পারি ও তোমার পূজা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি—আমাদের সকলকে সেই পথ প্রদর্শন কর;—কত দিন আমরা তোমা হইতে—অমৃতের প্রস্রবণ হইতে—দূরে দূরে পরিভ্রমণ করিয়া সংসার দাবানলে দগ্ধ হইতে থাকিব;— তুমি তোমার প্রেমামৃত বর্ষণ কর যে, আমাদের শুষ্ক হৃদয় বিকসিত হইবে—আমাদের মলিন মুখ উজ্জ্বল হইবে—আমাদের সকল দুঃখ অবসান হইবে; তোমার প্রেমমুখ আমাদের নিকট প্রকাশিত কর এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তত্বে উচ্ছ্বাস

বিভো কত দূরে যাই তব সনে।
ঈথর স্পন্দনে কাঁপিতে কাঁপিতে
জ্যোৎস্না রেখা পথে নাচিতে নাচিতে
যাই কত দূরে কে করে সীমা।

স্থান-ব্যবধান কাল-অন্তরাল
নাহি রোধে মম অবিরাম গতি।
উন্মোচিত প্রাণে অনন্ত আকাশে
ফিরি দূরান্তরে মনের সাথে।

জ্যোতির তরঙ্গে উঠিতে পড়িতে
দূর শূন্য পথে ত্বরিত গতিতে
কত কি নেহারি অনন্ত মহিমা:
কিন্তু কোথা তব আদি অন্ত হে?

জ্যোতির মাঝারে আঁধার যে হেরি,
আনত মস্তকে নেত্রনীরে তিতি;
বচন ফুরতি পায় কি তখন
মহান! সে তব মহিমার্ণবে?

মনেতে ভরসা—আমি ক্ষুদ্রমতি,
অপার অবোধ তোমার প্রকৃতি।
এই কি আমার নহে পুরস্কার
দেব!—ছুটিতেছি অনন্ত পথে?

কত না আনন্দ ভুঞ্জি হে তোমাতে!
হওনা অবোধ্য হওনা অনন্ত
হই না অবোধ ক্ষুদ্র পারমিত
কিবা আসে যায় আমার তায়।

মোহ কারাগার করি পরিহার
গভীর অনন্তে পারিত ডুবিতে।
জ্ঞানোন্মুখ চিতে তৃণ মূলে বসি
জানিত রোদিতে সরল হৃদে।

ক্ষীণ মাথা রাখি অনন্ত বক্ষেতে
ক্ষুদ্রত্ব পাশরি অনন্তে মিশাই।
ভুলি সব জ্বালা শোক দুঃখ তাপ
প্রদীপ্ত হৃদয় হয় শীতল।

বিমুক্ত শরীরে প্রমুক্ত হৃদয়ে
অবিশ্রান্ত পদে একাগ্র অন্তরে
ছুটি ছুটি ধাই অনন্ত বিমানে
মরি কি আনন্দ প্রাণেতে পাই।

দুটি বাহু তুলে প্রমত্ত পরাণে
অনন্ত অস্তিত্বে করি আলিঙ্গন।
আর কি, আর কি, হে অনন্তদেব!
ক্ষুদ্র জীব রাখে প্রাণে বাসনা।

সটীক তত্ত্বসমাম্নায়-সাংখ্য সূত্রের অনুবাদ।

পুরাকালে কোন এক ব্রাহ্মণ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তিন প্রকার দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া তন্নিবারণের উপায় জিজ্ঞাসু হইয়া সাঙ্খ্যবক্তা মহর্ষি কপিল ঋষির শরণাগত হইলেন। আপনার অধ্যয়ন ও বিবিধ শাস্ত্র সংবাদ নিবেদন করিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই সমুদায়ের মধ্যে উৎকৃষ্টতম বস্তু কি? সত্যই বা কি? কি করিলেই বা মনুষ্য কৃতকৃত্য হইতে পারে? এই সমুদায় আপনি আমাকে উপদেশ করুন। মহর্ষি কপিল বলিলেন, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই বলিয়া সেই আদিজ্ঞানী ঋষিসত্তম কপিল, জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণকে প্রথমতঃ একটী সূত্রের দ্বারা, সর্ব্বতোমুখ সংক্ষিপ্ততম সূচক বাক্যের দ্বারা, এই দৃশ্যমান জগতের আট প্রকার প্রকৃতির বা আট প্রকার উপাদান কারণের উপদেশ করিলেন। বলিলেন,—

অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ॥ ১ ॥

জড়জগতের উৎপত্তির উপাদান কারণের নাম প্রকৃতি, তাহা সর্ব্বসমেত আট প্রকার।

মহর্ষি কপিল, এই অত্যল্প কথার দ্বারা অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের, অনেক অর্থের, উপদেশ করিয়াছেন। বহু অর্থের সূচক বলিয়া ঐ কএকটী কথার নাম "সূত্র।" কেমন করিয়া তাহা বুঝুন*। আট প্রকার প্রকৃতি, এই কথায়

* "স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ সর্ব্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদোবিদুঃ ॥"

অবশ্যই আকাঙ্ক্ষা হইতেছে যে, তাহা কি কি। ইহার সিদ্ধান্ত হইবে যে, অব্যক্ত ১ বুদ্ধি ২, অহংতত্ত্ব ৩, আর পাঁচ প্রকার তন্মাত্র ৫, এই আট প্রকার তত্ত্ব জড়জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উৎপত্তি কারণ। এই আট্ প্রকার পদার্থ হইতে এই প্রকাণ্ড বিশ্বমণ্ডল জন্মিয়াছে। অব্যক্ত কি? এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত কথা ভিন্ন অন্য কোন কথা উপস্থিত হয় না।

এই ঘট, ঐ বন, এই শয্যা, এই ধন, সেই কাম্য দ্রব্য,—এ সকল যেমন প্রব্যক্ত, বিস্পষ্ট, অব্যক্ত পদার্থটী সেরূপ নহে। জড় জগতের সেই মূল (First cause) ঘটপটাদির ন্যায় প্রব্যক্ত পদার্থ নহে; তৎকারণে আমরা তাহাকে "অব্যক্ত" এই নাম দিয়াছি। অতএব "অব্যক্ত" এই নাম দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে, যাহা এই জড়জগতের মূল, যাহার অন্য নাম মূলা প্রকৃতি, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত অথচ তাহা জগদুৎপত্তির প্রথম কারণ First cause তাহা অব্যক্ত। তাহা এক প্রকার কারণ শক্তি এইরূপে অনুভবারূঢ় কর। তাহার আদি নাই, সে জন্মে নাই, সে চিরনিত্য ও আদ্যন্ত-রহিত, সুতরাং তাহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। আদি মধ্য অন্ত না থাকায়, নিত্যতা ও অতীন্দ্রিয়তা বিধায় তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য। কেবল বহিরিন্দ্রিয় নহে, মনও তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। যাহা এই জগতের মূলতত্ত্ব, যাহা এই জগতের সূক্ষ্ম শরীর, যাহা এই জগতের আদি বীজ, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ তাহাকে "প্রধান" নামে ব্যবহার করেন। তাহা অশব্দ অর্থাৎ শব্দবর্জ্জিত। যদি তাহাতে কোনরূপ শব্দ থাকিত, তাহা হইলে লোক তাহাকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা বোধগম্য করিতে পারিত। কিন্তু তাহাতে তাহা নাই, তাহা অশব্দ অর্থাৎ শব্দবর্জ্জিত। শব্দগুণ তাহার অধস্তন নবম পুরুষের ধর্ম্ম, তাহার নহে। তাহার রূপও নাই। রূপ থাকিলে অবশ্যই তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইত, রূপ না থাকাতেই তাহা চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হয় না। তাহার কোন রস নাই, গন্ধও নাই। সেই জন্যই তাহা রসনেন্দ্রিয়ের ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গম্য হয় না। অথচ তাহা অব্যয় (অবিনাশী) অক্ষয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সকল পদার্থের মূল, কারণের কারণ বা আদিকারণ। ইন্দ্রিয়ের অগম্য বলিয়া সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র বলিয়া নহে। জনক নাই বলিয়া অলিঙ্গ, সত্ত্বা নাই বলিয়া নহে। চেতনা নাই বলিয়া অচেতন, আদি নাই বলিয়া অনাদি, বিনাশ নাই বলিয়া অনিধন। প্রসব করা তাহার স্বধর্ম্ম। আত্মবিকাশ দ্বারা বিচিত্রাকার বস্তু উৎপাদন করা তাহার স্বভাব। সেই পদার্থই আপন আত্মগুণে বিচিত্র জগৎ প্রসব করিয়াছে। ঈদৃশ মূল তত্ত্বের কোন প্রকার অবয়ব নাই, অংশ নাই, অথচ তাহা সাধারণ অর্থাৎ তদুৎপন্ন সকল পদার্থেই তাহার অন্বয় বা সত্ত্বা আছে। এবম্ভূত প্রধান এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়। কথিত প্রকারের একটী মাত্র দুর্নিরূপ্য বস্তু হইতে সমস্ত জড় জগৎ জন্মিয়াছে, এইরূপ অবধারণ কর। এতাদৃশ মূল প্রকৃতির বা আদিকারণের নাম অব্যক্ত (১), প্রধান (২), ব্রহ্ম (৩), গুরু (৪), বহ্বাত্মক (৫), অক্ষর (৬), ক্ষেত্রজ্ঞ (৭), তমঃ (৮) এবং প্রভূত (৯)। এক্ষণে বুদ্ধি কি তাহা বলিতেছি, শুনুন।

প্রোক্তলক্ষণাক্রান্ত প্রকৃতির প্রথমস্ফুরণের নাম বুদ্ধি; তাহার অন্য নাম "মহত্তত্ত্ব।" প্রকৃতি যখন সৃষ্ট্যুন্মুখী হন, তখন তাঁহাতে প্রথমতঃ বুদ্ধি-নামক স্ফূর্ত্তিবিশেষ প্রকটিত হয়। সেই বুদ্ধি আবার "অহং" এই আকার ধারণ করে, সুতরাং তাহাও প্রকৃতি অর্থাৎ অহংতত্ত্বের মূল কারণ। এতাদৃশ বুদ্ধিতত্ত্ব বুঝিবার জন্য, ব্যষ্টি-বুদ্ধির প্রতি, অর্থাৎ

অস্মদাদির আন্তঃকরণিক প্রথম স্ফুরণের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হয়। ব্যষ্টি-বুদ্ধির বা ব্যক্তিগত বুদ্ধির স্বভাব বা স্বরূপ কিরূপ তাহা অতি সাবধানে লক্ষ্য করিতে হয়। তৎসাদৃশ্যে অনায়াসেই বুদ্ধিতত্ত্বের স্বরূপ বা ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে।

আমরা আমাদের অধ্যবসায়-নামক পরিস্কার স্ফুরণকে বুদ্ধি বলি। শাস্ত্রীয় ভাষাতেও নিশ্চয়াত্মক মনোবৃত্তি নামে বুদ্ধি অভিহিত হয়। অন্তঃকরণের পরিস্ফুরণ আর নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি তুল্য কথা। কোন বস্তু ইন্দ্রিয়সন্নিহিত হইলে, তদুপলক্ষ্যে যে প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞান-নামক আন্তঃকরণিক প্রস্ফুরণ হয়, ইহা এই, উহা অমুক, ইত্যাকার বিকাশ বা স্ফূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাই আমাদের বুদ্ধি, তাহাই আমাদের ব্যষ্টি মহত্তত্ত্ব। এটী গো, অশ্ব নহে, এটী স্থাণু (মুড়ো গাছ), পুরুষ নহে, এরূপ নিরবশেষ স্ফুরণ বা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বুদ্ধির জন্ম হওয়া স্বীকার্য্য নহে। অতএব, নিরবশেষ স্ফুরণ আর নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি তুল্যার্থ। যাবৎ না আমাদের অন্তঃকরণ নামক প্রকৃতিতে তদ্রূপ স্ফূর্ত্তি বা উক্ত রূপ বিকাশ উপস্থিত হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত সমস্তই অন্ধকার, সমস্তই অসৎ, থাকা না থাকা সমান, ইহা অত্যল্প চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে। অতএব, দ্রব্যসন্নিধান উপলক্ষ্যে যেমন ব্যষ্টি-প্রকৃতির অর্থাৎ অন্তঃকরণের নিরবশেষ প্রথম স্ফূর্ত্তি হয়, মূলপ্রকৃতি হইতেও তদ্রূপ চিৎ-শক্তি সন্নিধান উপলক্ষ্যে নিরবশেষ জগদ্বীজরূপ নির্ম্মল স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ (এক প্রকার প্রকাশ) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তাহারই এক নাম বুদ্ধি, অন্য নাম মহত্তত্ত্ব। তাহারই প্রাদেশিক বিভাগ এক্ষণে অন্তঃকরণ নামে বিখ্যাত হইয়া উল্লিখিত হইতেছে।

অন্তঃকরণের প্রথম স্ফুরণের নাম বুদ্ধি, মূল প্রকৃতির প্রথম বিকারের নামও বুদ্ধি। বুদ্ধির মধ্যে, প্রাকৃতিক প্রথম স্ফুরণের ও আন্তঃকরণিক প্রথম স্ফুরণের মধ্যে, আট প্রকার অংশাংশিভাব আছে। অর্থাৎ, বুদ্ধির আট প্রকার রূপ বা বিভাগ আছে। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এই চারি প্রকার রূপ সাত্ত্বিক অর্থাৎ প্রকৃতিগত সত্ত্বাংশের স্ফুরণ। বেদবিহিত, স্মৃতিপ্রতিপাদিত ও সাধুসম্মত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান দ্বারা শুভজনক শক্তিবিশেষ উৎপন্ন হইলে তাহা ধর্ম্ম, তত্ত্বের বা বস্তুযাথাত্ম্যের সম্বোধ হইলে তাহা জ্ঞান; শব্দাদি বিষয়ে অপ্রবৃত্তি জন্মিলে তাহা বৈরাগ্য, এবং অণিমাদি অষ্ট মহাগুণ বা ক্ষমতাবিশেষ আবির্ভূত হইলে তাহা ঐশ্বর্য্য।* বুদ্ধির এবম্বিধ কলা চতুষ্টয় বা স্ফুরণ চতুষ্টয় সাত্ত্বিক অর্থাৎ উহারা বুদ্ধিনিষ্ঠ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষতা হইতেই জন্মিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, বুদ্ধির আর চারি প্রকার রূপ আছে, তাহা তামস অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ তমোভাগের উদ্রেক মাত্র। বুদ্ধির তমোভাগ প্রবল থাকিলেই অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য নামক বুদ্ধিবিশেষ জন্মিতে থাকে। যে বুদ্ধির নাম ধর্ম্ম, তাহার বিপরীত বুদ্ধির নাম অধর্ম্ম সুতরাং শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান হইতে যে ভবিষ্যৎ অশুভের বীজ সঞ্চয় হয় তাহারই সাঙ্কেতিক নাম অধর্ম্ম। এই মাত্র যে জ্ঞান-লক্ষণ ব্যক্ত করিলাম, অজ্ঞান-লক্ষণ তাহারই বিপরীত জানিবে। বস্তুতত্ত্ব না বুঝাই অজ্ঞানের প্রথম লক্ষণ। বুদ্ধির নিরবশেষ স্ফুরণ না হইলেই লোকের সংশয়, বিপর্য্যয় (ভ্রম) ও

---

* এই উপদেশের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অণিমাও লঘিমা প্রভৃতি মহাসিদ্ধি সকল বুদ্ধিরই শক্তি, বুদ্ধিরই ধর্ম্ম, বুদ্ধিবলেই ঐ সকল ক্রিয়া সাধিত হইত। বস্তুতঃ কর্ত্তব্য বিষয়ে নিরবশেষ বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে, মনুষ্য তাহা সম্পন্ন করিতে পারে, অন্যথা পারে না।

অজ্ঞতা জন্মে। সেই জন্যই আমরা বুদ্ধিমালিন্যকে অর্থাৎ বুদ্ধির অধঃস্ফুরণকে অজ্ঞান নাম দিয়া থাকি। অবৈরাগ্যও বৈরাগ্যের বিপর্যয়। বাহ্য বিষয়ে অপ্রবৃত্তির নাম বৈরাগ্য এবং তাহাতে আসক্ত থাকার নাম অবৈরাগ্য। অতএব বৈরাগ্য অবৈরাগ্য উভয়ই বুদ্ধির তত্ত্বের গুণ বা বিকার। ঐশ্বর্য্যের বিপরীত অনৈশ্বর্য্য অর্থাৎ অণিমাদি মহাগুণের অনুদয় থাকার অন্য নাম অনৈশ্বর্য্য ; ইহা বোধ হয় সকলেই বিদিত আছেন।

ধর্ম্মবৃদ্ধি হইতে জীবের বা আত্মার ক্রমিক উৎকর্ষ হয়। অর্থাৎ ধর্ম্মরূপ নিমিত্তের দ্বারা বা শক্তিবিশেষের দ্বারা জীব সুখপ্রবাহভোগযোগ্য শরীর, স্থান ও অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহারই অন্য নাম ঊর্দ্ধগতি, ও আত্মোৎকর্ষ। জ্ঞান হইলে তদ্দ্বারা আত্মা মোক্ষ অর্থাৎ জড়সম্বন্ধ রাহিত্য কিম্বা প্রকৃতিসংযোগ রহিত * হইয়া নিত্য নির্ব্বিকার অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৈরাগ্যের শেষ ফল প্রকৃতি লয়। বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠায় বা চরম প্রান্তে যাইতে পারিলে, দেহপাতের পর তাহার লিঙ্গশরীর প্রকৃতি-প্রবিষ্ট হইয়া যায়, স্বর্গ বা মোক্ষ হয় না। ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাব হইলে, তদ্দ্বারা অব্যাহত গতি ও ঐহিক অসাধারণ ক্ষমতা ভিন্ন অন্য কোন সুফল লাভ হয় না। ঐশ্বর্য্যের ফল ইহলোকেই ভোগ হয় ; পরলোকের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই বলিলেও বলা যায়। এবম্প্রকার আট বিভাগ বা রূপ থাকায় বুদ্ধিতত্ত্বটী আট প্রকার। আট প্রকার কি কি তাহা ব্যাখ্যাত হইল, এক্ষণে বুদ্ধির শাস্ত্রীয় নাম গুলি শুনুন।

মন (১), মতি (২), মহান্ বা মহত্তত্ত্ব(৩), ব্রহ্মা (৪) বা হিরণ্যগর্ভ্ভ পূর শব্দ হইতেই পূরুষ ও পুরুষ শব্দ হইয়াছে) (৫), বুদ্ধি (৬), খ্যাতি (৭), ঈশ্বর (৮), প্রজ্ঞা (৯), শ্রুতি(১০), ধৃতি (১১), সম্বিৎ (১২) ও স্মৃতি (১৩)।

এতাদৃশী বুদ্ধিতে, অভিমানের স্ফুরণ হইলে তাহা অহঙ্কার নামে অভিহিত হয়। আমি শব্দ করিলাম, আমি স্পর্শ করিলাম, আমি দেখিলাম, নিরূপণ করিলাম, আমি স্বাদ গ্রহণ করিলাম, আমি গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছি, আমি স্মরণ করিতেছি, আমি কর্ত্তা, আমি প্রভু, আমি ইহাকে বিনাশ করিয়াছি, আমি শত্রু বিনাশ করিব, অন্যকেও শাসন করিব, ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্যবিধ অহংগর্ভ্ভ প্রত্যয়-প্রতীতির নাম অহঙ্কার, ইহা বুদ্ধিরই স্ফুরণ, বুদ্ধিরই বিকার, অগ্রে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ তাহা আত্মসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া উক্ত আকারে পরিণত হয়। সুতরাং অহংতত্ত্বটী বুদ্ধির স্ফুরণ, বুদ্ধিরই অন্য এক প্রকার বিকাশ এবং তাহা অন্যান্য বহুল প্রত্যয়ের বীজ বা প্রকৃতি। অন্তঃকারণ নামক ব্যষ্টি মূল প্রকৃতি না থাকিলে বুদ্ধি জন্মিত না, বুদ্ধি জন্ম না হইলেও আমি ও আমার, আমি করিতেছি ও করিব, ইত্যাদি প্রকার বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিত না।

প্রোক্ত লক্ষণাক্রান্ত অহঙ্কার-তত্ত্বের পর্য্যায় অর্থাৎ নাম অনেক। যথা ঃ—অহঙ্কার, বৈকারিক, তৈজস, তামস, ভূতাদি, সানুমান ও নিরনুমান। আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি স্থলে নিরনুমান এবং আমি ধার্ম্মিক, আমি স্মর্ত্তা, ইত্যাদিস্থলে সানুমান

* যেরূপ চলিলে, যেরূপ বলিলে, যেরূপ কার্য্য করিলে, শুভজনক বুদ্ধির স্ফুরণ হইতে পারে, আত্মার উৎকর্ষ হইতে পারে, বুদ্ধিতত্ত্বে ঐশ্বর্য্য শক্তির আবির্ভাব হইতে পারে, ঋষিরা তাহা উত্তমরূপে বোধগম্য করিয়া অবধারণ করিয়া, পরীক্ষা করিয়া লোকহিতার্থে উপদেশ করিয়া ছিলেন। এক্ষণে সেই সকল উপদেশ শাস্ত্র (বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি) নামে প্রসিদ্ধ সুতরাং শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান গুলির নাম ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং তাহা করিতে করিতে ভবিষ্যৎ কালে বুদ্ধিস্ফুরণ হইবে তাহা শুভজনক সুতরাং তাহা ধর্ম্ম।

কেন-না। সুখ দুঃখ মনের সাক্ষাৎ বৃত্তি, ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার অনুমেয় বৃত্তি। সুখ দুঃখ যেমন প্রত্যক্ষ হয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম সেরূপ প্রত্যক্ষ হয় না।

পঞ্চ তন্মাত্র। শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র,—এই পাঁচ তন্মাত্র নামক তত্ত্ব বা প্রকৃতি আছে। যে কিছু জ্ঞানময় সৃষ্টি—সমস্তই বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইতে জন্ম লাভ করে এবং যে কিছু স্থূল দৃশ্য—সমস্তই এই পাঁচ প্রকার তন্মাত্র পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। "তন্মাত্র" এই নাম দ্বারা 'কেবল তাহাই' অর্থাৎ যাহার কোন বিশেষ বা ভেদভাব নাই, এরূপ এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। যাহা শব্দ তন্মাত্র, তাহা সূক্ষ্ম, অনুমেয় ও অবিশেষ অর্থাৎ তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, ষড়জ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ,—এই সমস্ত ধ্বনি তাহারই বিশেষ বা স্থৌল্য ইহা অবধারণ করিবে। এই সকল বিশেষ বা ভেদভাবপ্রাপ্ত ধ্বনি সকল সেই এক মাত্র শব্দতন্মাত্র হইতে আবির্ভূত হয়। যে কোন প্রকার শব্দ হউক,সমস্তই শব্দ তন্মাত্র হইতে প্রস্ফুরিত বা অভিব্যক্ত হয়। এই যে, আকাশ দেখিতেছ শব্দতন্মাত্রের ঘনপুঞ্জন বা নিবিড় সংঘাত ভিন্ন ইহা অন্য কোন পৃথক্ বস্তু নহে। শ্রূয়মাণ শব্দের কাষ্ঠা প্রাপ্ত সূক্ষ্মতাই আমাদের আকাশ; আকাশই আঘাতপ্রাপ্ত বায়ুর দ্বারা অভিভূত ও বিশেষভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণযোগ্য হয়, স্থূল হয়, ষড়জাদিরূপে বিভিন্ন ও পরিপুষ্ট হয়, সুতরাং আমরা আকাশের তন্মাত্রাবস্থা জানি না,অবিশেষ অবস্থা বুঝি না,বিশেষ অবস্থাই বুঝি বা অনুভব করি।

স্পর্শতন্মাত্র-নামক দ্বিতীয় তত্ত্বকেও উক্ত রূপে বুদ্ধ্যারূঢ় করিবে। যাহা স্পর্শতন্মাত্র, তাহাও সূক্ষ্ম, অনুমেয় ও অবিশেষ। মৃদুত্ব, কঠিনত্ব, কর্কশত্ব, পিচ্ছিলত্ব, শীতলত্ব, উষ্ণত্ব,—এ সমস্তই সেই কারণীভূত সূক্ষ্ম স্পর্শতন্মাত্রের বিশেষ, বিভিন্ন বিস্পষ্ট বা স্থৌল্য অবস্থা। যাহাকে আমরা বায়ু বলিয়া উল্লেখ করি,তাহা কি? না স্পর্শ-মাত্রের ঘনপুঞ্জন বা নিবিড় সংঘাত। স্পৃশ্যমান বায়ু পরম সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইলে, ত্বগিন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেই স্পর্শ তন্মাত্রা আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

যাহা রূপতন্মাত্রা, তাহাও ঐরূপ। তাহাও সূক্ষ্ম, চক্ষুর অগ্রাহ্য ও অবিশেষ। শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত, হরিত, মাঞ্জিষ্ঠ,—এ সকল প্রভেদ বা বিশেষভাব তাহাতে লক্ষ্য হইবে না। জ্যোতিঃপদার্থ মাত্রেই রূপতন্মাত্রের বিকার বা স্থৌল্য।

যাহা রসতন্মাত্র, তাহাও ঐরূপ। আস্বাদ্যমান স্থূল রস যখন তন্মাত্র অবস্থায় থাকে, তখন তাহাতে কটুত্ব, তিক্তত্ব, কষায়ত্ব, মধুরত্ব, অম্লত্ব, লবণত্ব, এ সকল বিশেষ বা প্রভেদযুক্ত স্থৌল্য কিছুই থাকে না বা কেবল মাত্র শক্তিরূপেই থাকে। তাহা সূক্ষ্ম (রসনেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য) সুতরাং তাহা অনুমেয়। এই যে জল দেখিতেছ, ইহা সেই রসতন্মাত্র-নামক প্রকৃতির অভিব্যক্তি বা প্রবিভক্ত বিকার ভিন্ন অন্য কোন পৃথক্ বস্তু নহে। আস্বাদ্যমান আদিসৃষ্টিকালে রসতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, এখনও তাহা বিশেষ বিশেষ রসের আকর অর্থাৎ জল হইতেই বিবিধ রসভেদ হইয়া থাকে।

মহিমাধর্ম্ম।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

মহিমাধর্ম্মাবলম্বীগণ পৌত্তলিকতার দারুণ বিরোধী। পৌত্তলিকতার মূল উৎপাটন মানসে ইহারা একবার পুরীতে যাইয়া এক ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত করে। জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি বিনষ্ট করিবার জন্য

তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল। তথায় জগন্নাথের পাণ্ডা ও অনুচরদিগের সহিত তাহাদের এক দাঙ্গা হয়। মহিমাধর্ম্মাবলম্বীগণ তাহাতে পরাজিত হইয়া সেই অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তাহারা তুলসীকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে।

মহিমাস্বামীর আদেশানুসারে তাঁহার অনুচরগণ, মিথ্যা বলা, চুরি করা প্রভৃতি দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছে। ইহা দ্বারা উড়িষ্যা গঞ্জাম ও মধ্য ভারতবর্ষের নিম্ন শ্রেণীর দুষ্ক্রিয়াসক্ত মানবগণের চরিত্র বিশেষ সংশোধিত হইয়াছে। আশ্রিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা একের অধিক বিবাহ করিতে পারে না এবং তাহাদের প্রতি মাসান্তে একবার মাত্র স্ত্রী-সহবাসে মহিমা-স্বামীর আদেশ রহিয়াছে। মহিমাস্বামী তাঁহার অনুচরদিগকে সত্যবাদী, সুশীল, দয়ালু, সংযমী করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তিনি অনেক দূর কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা গঞ্জাম, উড়িষ্যা ও মধ্য ভারতের পশ্বাচার মানবগণের চরিত্র সুন্দর রূপে গঠিত হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

উড়িষ্যার করদ রাজ্য সমূহ মধ্যে অনুগুল রাজ্যটী গবর্ণমেণ্টের কুক্ষিগত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সেই রাজ্যের একজন শাসনকর্ত্তা বা তহসীলদার আছেন। ঐ রাজ্যবাসী দুর্দ্দান্ত "পাণ" জাতিকে লক্ষ্য করিয়া তহসীলদার মহাশয় লিখিয়াছেন,

The new faith of Mahima has wrought a change for the better on the Pans of that Killah, notorious for their thieving proclivities Those who have accepted the new faith regard theft with abhorrence.

কুম্ভিপটীয়া ও কণাপটীয়া সম্প্রদায় জাতিভেদ স্বীকার করে না। রাজা, ব্রাহ্মণ, রজক, হাড়ি ও বেশ্যা ব্যতীত অন্য সকল জাতির অন্ন ইহাঁরা নিরাপত্তে গ্রহণ করিয়া থাকে। রাজা তাহার রাজ্যের সমস্ত পাপকার্য্যের দায়ী। ব্রাহ্মণ, পাপী ও অশুচি ব্যক্তির দানাদি গ্রহণ করিয়া অপবিত্র হইয়াছেন। রজক সর্ব্বপ্রকার লোকের বস্ত্র পরিষ্কার করে। হাড়ি সর্ব্বদা অপবিত্র কার্য্য করে। বেশ্যার জীবন চির পাপময়। অতএব এই সকল ব্যক্তিই জগতের সর্ব্বপ্রধান পাপিষ্ঠ বলিয়া মহিমাধর্ম্মাবলম্বীগণ ইহাদের অন্নগ্রহণ করে না।

ঢেঙ্কানালের অন্তর্গত জোরণ্ডা নামক স্থানে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে "মহিমাস্বামী" পরলোক গমন করেন। এ জন্য উক্ত স্থান মহিমাধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষে পূজনীয় হইয়াছে। কুম্ভিপটীয়া সম্প্রদায়ের ইহাই মূলস্থান হইয়াছে। মহিমাস্বামীর দ্বিতীয় শিষ্য নরসিংহ দাস মহালপাড়া নামক স্থানে বাস করিতেছেন। কণাপটীয়া সম্প্রদায়ের মহালপাড়া মূলস্থান হইয়া উঠিয়াছে।

ভীম ভূঁই নামে কন্দজাতির এক জন্মান্ধ ব্যক্তি মহিমাস্বামীর শিষ্য ছিলেন। এ ব্যক্তি উড়িয়া মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অন্যের দ্বারা পাঠ করাইয়া সর্ব্বদাই যত্নের সহিত শ্রবণ করিতেন। ক্রমে এই সকল গ্রন্থ তাঁহার এতদূর আয়ত্ত হইয়াছিল যে তিনি তাহা অনর্গল আবৃত্তি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই অসাধারণ শক্তি দ্বারা তিনি মহিমাধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

মহিমাধর্ম্মাবলম্বীগণ সন্ধ্যোপাসনার পর সকলে মিলিয়া ভজন-সঙ্গীত করিয়া থাকে। এই সকল ভজন-সঙ্গীত প্রায় সমস্তই ভীমভূঁইর রচিত। গীতগুলি সুন্দর ভাব ও নিরাকার ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা পরিপূর্ণ। নিরাকার ঈশ্বরের স্তব-পরিপূর্ণ অনেক কবিতা ভীম ভূঁই দ্বারা রচিত হইয়াছে।

স্মারকতা শক্তির প্রভাবে ভীমভুঁই, মহিমাস্বামীর মৃত্যুর পর, তাঁহারই ন্যায় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে মহিমাস্বামীর অবতার বলিয়া জ্ঞান করিত। ভীমভুঁইর শিষ্যসংখ্যা ক্রমে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি তিন বৎসরের অধিক স্বীয় সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। স্বীয় চরিত্র-দোষে তিনি সেই সম্মান বিনষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ শিষ্য তাঁহাকে ভণ্ড ও কপট ধার্ম্মিক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। ভীম প্রতিভার কৃপায় উন্নতি-শেখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, রিপু-দমনে অক্ষম হইয়া এক মুহূর্ত্ত মধ্যে অতল গহ্বরে পড়িয়া গেলেন। যেখানে প্রেমের সহিত প্রতিভার দৃঢ় সংযোগ নাই সেখানে এই দশা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। অদ্যাপি ভীমভুঁইর শিষ্যগণ তাঁহার পাদপদ্ম দুগ্ধ দ্বারা ধৌত করাইয়া সেই দুগ্ধ পান করেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকেই সেই অলেখ স্বামীর অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। তিনি স্বয়ংও এইরূপ পরিচয়ের প্রশ্রয় দান করিয়া থাকেন।

ভজন গীত।

অ মন মন্দিরকু কর গমন।
মায়ারে পড়ি বায়া নহ অজ্ঞান ॥ ধুয়া ॥

অলক্ষ মন্দিরকু ফিটিচি বাট।
জীব পরমর অছে জহিরে ভেট॥
ভব সিন্ধুরে ভাসি জিবার হেউ অছি।
নাব আনি কৈবর্ত্ত তীররে থটাইছি।
পারিহো নাবরে নিজ মহিমা বাছি।
তাঁহিরে মূল কৌড়ি কিছি ন লাগঅছি।
দুয়ারি অগি অছি গলি না পারি যাছি।
সত্য কপাট লাগি মুদ্রা পরিছি কঁচি।
হস্তরে ন ফিটই অনভাব ফিটয়ছি।
ষড় বেদ পড়ে বান্ধিছি আসন। ১।

একাক্ষর হৃদে নিয়ত জপ।
ফুকা বন্দ পরে নৃত্য নয়নে দেখ।
বাজরি নাদ সুন শুভিছি ঘন ঘন।
সেরূপ মুনিগণ ধ্যান্তি অনুক্ষণ।
যারদিব পূর্ব্ব সুকৃত কমন। ২।

বজাই তাল মৃদঙ্গ বিনা ছন্দরে।
গহ গহ নিত্য হুল রাস মধ্যরে।
ঢোল, ডমা, টমক, চাঙ্গু, নিসান ভেরী।
শঙ্খ, সিঙ্গান, ফেরী, মোহরী বীর তুরী।
নৃত্যরে উন্মাদরি ষোল সহস্র কুমারী।
কম্পোছি বসুন্ধরী শব্দে ঘণ্টী ঘুঙ্গুরী।
দেখ দ্বাদশ বক্ষে তহি কুন্তলী। ৩।

অন্তর্য্যামি কর্ত্তা সে আপে নির্ব্বাণ।
ভকত অনঙ্ক ধন মন জীবন।
যাহার রোম মূলে মাল মাল মেদনী।
বনি নাহন্তি যাহাঙ্কু সারদা সিদ্ধমুনী।
যা গর্ভে পুরিয়াছি সপ্ত দ্বীপা ধরণী।
গঙ্গা যমুনা নদী বহোয়ছি ত্রিবেণী।
জ্ঞানী যনে ন চিনি মুগঙ্ক কাহি পুনী।
হেলে হেব পছে পণ্ডিত সুজ্ঞান। ৪।

তাহির মহিমা কেতে কহিবে কিস।
যহি চারি বেদ হোই আছি পছের।
ঋক বেদের বিন্দু মহী সপত সিন্ধু।
শ্যাম বেদ চরিত্র শূন্যে মকত কান্দু।
অথর্ব্ব বেদামৃত দ্বাদশ দিগচন্দ্র।
যজুর্ব্বেদ সমাযুক্তেক হেলা অর্দ্ধ।
শিশু বেদ আস্তান অনাম দীনবন্ধু।
ভকত ভাবে বসিয়া করুণা কৃপাসিন্ধু।
শ্বেত শুক্ল বর্ণ রূপ উদ্যান। ৫।

কুজ্ঞানী কি বিষ ভকতজন কুরশ।
সুজ্ঞানি কি অনুভবে চিত্তে আদর্শ।
ভনে ভীম অরক্ষিত সেধন সারস্বত।
গুরুযো অবধুত আনন্তি তদ গত।
কারণ গতি মুক্ত সে প্রভুঙ্ক মর্য্যাদ।
অতি নিগম পথে গমিবাকু সামর্থ।
দিবিব যে রে মোর পূর্ব্বজন্ম সুকৃত।
অনুসরি বহন সাধুজন পশ্চাৎ।
(আহে) ভাগ্যে থিলে জিবি অলক্ষ্য ভুবন। ৬।*

* ওহে মনমন্দিরে গমন কর। মায়াতে পড়িয়া ক্ষেপা জ্ঞান হারাইও না।

অদৃশ্য মন্দিরের রাস্তা খুলিয়াছে। অন্তকালে জীবের যে স্থানে পরমের সহিত সাক্ষ্যাত হয়।

ভব সিন্ধুতে তোমার যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

ধম্মপদ।

(বৌদ্ধগ্রন্থ)

১। পালী। ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি
পাপকারী উভয়ত্থ সোচতি।
সো সোচতি সো বিহঞ্ঞতি
দিস্বা কম্ম কিলিট্ঠমত্তনো।

১। সংস্কৃত। ইহ শোচতি প্রেত্য শোচতি
পাপকার্য্যুভয়ত্র শোচতি।
স শোচতি স বিহন্যতে
দৃষ্ট্বা কর্ম্ম ক্লিষ্টমাত্মনঃ

অর্থ। পাপকারী ব্যক্তি ইহ লোকে শোক করে পরলোকে শোক করে, উভয় লোকেই শোক করে সে আপনার অবিশুদ্ধ কর্ম্ম দেখিয়া শোক করে এবং বিনষ্ট হয়।

২। পা, ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি
কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ মোদতি।
সো মোদতি সো পমোদতি
দিস্বা কম্ম বিসুদ্ধিমত্তনো।

২। সং ইহ মোদতে প্রেত্য মোদতে
কৃতপুণ্য উভয়ত্র মোদতে।
স মোদতে স প্রমোদতে
দৃষ্ট্বা কর্ম্মবিশুদ্ধিমাত্মনঃ।

অর্থ। কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোকে আনন্দিত হন পরলোকে আনন্দিত হন, উভয় লোকেই আনন্দিত হন। তিনি আপনার বিশুদ্ধ কর্ম্ম দেখিয়া আমোদিত ও প্রমোদিত হন।

ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি
পাপকারী উভয়ত্থ তপ্পতি
পাপং মে কতন্তি তপ্পতি
ভিয়্যো তপ্পতি দুগ্গতিং গতো

৩। সং ইহ তপ্যতে প্রেত্য তপ্যতে
পাপকার্য্যুভয়ত্র তপ্যতে।
পাপং ময়া কৃতমিতি তপ্যতে
ভূয়স্তপ্যতে দুর্গতিং গতঃ॥

অর্থ: পাপকারী ইহলোকে সন্তপ্ত হয়, পরলোকে সন্তপ্ত হয়, উভয় লোকেই সন্তপ্ত হয়। আমি পাপ করিয়াছি বলিয়া সন্তপ্ত হয় এবং দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া আরও সন্তপ্ত হয়।

৪। পা, ইধ নন্দতি পেচ্চ নন্দতি
কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ নন্দতি।
পুঞ্ঞং মে কতন্তি নন্দতি
ভিয়্যো নন্দতি সুগ্গতিং গতো।

৪। সং ইহ নন্দতি প্রেত্য নন্দতি
কৃতপুণ্য উভয়ত্র নন্দতি।
পুণ্যং ময়া কৃতমিতি নন্দতি
ভূয়ো নন্দতি সুগতিং গতঃ।

কৈবর্ত্ত নৌকা আনিয়া তীরে লাগাইয়াছে। স্বীয় মহিমা বাহিয়া নৌকা দ্বারা পার হও। তাহাতে মূল্য কড়ি কিছু লাগে না। দ্বারি জাগিয়া রহিয়াছে। মাছিও প্রবেশ করিতে পারে না। সত্যের কবাটে চাবি পড়িয়া বন্ধ হইয়াছে। হাতে খুলে না, অনুভবে খুলিয়া থাকে। ষড় বেদোপরি আসন বেন্ধেছি। ১।

একাক্ষর হৃদয়ে নিয়ত জপ কর। শূন্য কৌশলে নৃত্য নয়নে দেখ। বংশীরব ঘন ঘন হইতেছে শ্রবণ কর। সেইরূপ মুনিগণ অনুক্ষণ ধ্যান করেন। মন, যাহার পূর্ব্ব সুকৃতি থাকিবে। ২

বিমাচ্ছন্দে মৃদঙ্গে তান বাজিতেছে। রাসমণ্ডল মধ্যে থেই থেই নৃত্য হইতেছে। ঢোল, ঢাক, টমক, ভেরী, শঙ্খ, শিঙ্গা, ভেরী, মোহরী, বাবু ভবী (বাজিতেছে) ষোল সহস্র কুমারী উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। ঘুঙ্গুর ও ঘণ্টা শব্দে বসুন্ধরা কাঁপিতেছে। কাঙিনী দ্বাদশ প্রকার কৌশলের নৃত্য দেখ। ৩

অন্তর্যামীস্বামী তিনি স্বয়ং নির্ব্বাণ। ভক্তবৃন্দের ধনমান ও জীবন। যাঁহার লোমকূপে অনন্ত অনন্ত পৃথিবী (রহিয়াছে) যাঁহাকে সারদা (উড়িয়া মহাভারত লেখক) মুনি বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যাঁহার গর্ভে সপ্তদ্বীপা ধরণী পূর্ণ রহিয়াছে। গঙ্গা যমুনা ত্রিবেণী নদী বহিতেছে। জ্ঞানী জনে চিনিতে পারে না, মূর্খের ত কথাই নাই। হইলেও সুজ্ঞানী পণ্ডিত হইতে পারে। ৪

তাঁহার মহিমা কি প্রকারে কত বর্ণনা করিব। চারি বেদ যাহার সোপান। সপ্তসিন্ধু পৃথিবী ঋক বেদের এক বিন্দু মাত্র। সাম বেদের চরিত্র শূন্যে মরুতস্বরূপ। অথর্ব্ব বেদামৃত দ্বাদশ দিকের ছত্র স্বরূপ। যজুর্ব্বেদ সমাযুক্ত অর্দ্ধেক হইল। করুণা কৃপাসিন্ধু, স্থানহীন, নামহীন দীনবন্ধু ভক্তের ভাবে শিশুবেশে আবির্ভূত। নির্ম্মল শ্বেতবর্ণরূপ উদ্যান। ৫

কুজ্ঞানীর বিষ স্বরূপ, ভক্ত জনের অমৃত স্বরূপ। সুজ্ঞানী অনুভব দ্বারা চিত্তে তাহার আদর্শ প্রাপ্ত হন। সেধনসার পুত্র নিরাশ্রয় ভীম বলিতেছে। আমার গুরু অবধৌত তদগত সব জানেন। কারণ প্রভুর মর্য্যাদাই গতি মুক্তি। অতি দুরূহ পথও যাইতে সক্ষম। আমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি দেখিব। সুজনের পশ্চাৎ অনুসরণ করিব। জন্য ক ভুবন অদৃষ্টে থাকিলে যাইব। ৬

অর্থ। কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোকে আনন্দিত হন, পরলোকে আনন্দিত হন, উভয় লোকেই আনন্দিত হন। আমি পুণ্যকর্ম করিয়াছি বলিয়া আনন্দিত হন এবং সুগতি প্রাপ্ত হইয়া আরও আনন্দিত হন।

সম্বিৎ ও CONSCIOUSNESS.

গতবারের পূর্ব্ববারের পত্রিকাতে জ্ঞান-রক্ষ নামে যে একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়, তাহার একস্থানে লিখিত হইয়াছে—"সং = con, বিৎ = sciousness, সং + বিৎ = con + sciousness," এবং এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, consciousness শব্দের দেশীয় প্রতিশব্দ—সম্বিৎ। তদুপলক্ষে আমাদের দেশের এক জন কৃতবিদ্য গ্রন্থকার এইরূপ আপত্তি করিতেছেন,—

"Consciousness-শব্দের অবিকল অনুবাদ 'সম্বিৎ' তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি কিন্তু তাই বলিয়া পাশ্চাত্য ন্যায়ে consciousness যে অর্থে ব্যবহার হয়—consciousness শব্দ ব্যবহার করিবা-মাত্র এক জন ইংরেজ পণ্ডিতের মনে যে অর্থ উপস্থিত হয় "সম্বিৎ" শব্দের সেই অর্থ আছে কি ?"

ইহার উত্তর এই যে, সম্বিৎ শব্দের ঠিক্ সেই অর্থই আছে,—কিন্তু "সম্বিৎ" শব্দ আধুনিক সাহিত্যাদিতে ততদূর প্রচলিত নাই ; সংজ্ঞা-শব্দ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচলিত আছে; অমুক ব্যক্তির সংজ্ঞা-লোপ হইয়াছে—ইহার অবিকল অর্থ এই যে, he has lost his consciousness বিক্রমোর্ব্বশীর প্রথম অঙ্কে দেখ,—

"চিত্রলেখা ! আশ্চর্য্যং উচ্ছ্বসিতমানসস্যাপি জীবিতাধনাপি সংজ্ঞামেষা ন প্রতিপদ্যতে।"

"অদ্যাপি সংজ্ঞামেষা ন প্রতিপদ্যতে" ইহার অবিকল ইংরাজী অনুবাদ এই যে, She has not yet recovered her consciousness

এখন বক্তব্য এই যে, জ্ঞান এবং বিৎ—উভয়ের মধ্যে অতি অল্পই প্রভেদ ; জ্ঞেয় বিষয় বলিলে যাহা বুঝায়, বেদ্য বিষয় বলিলে ঠিক্ তাহাই বুঝায় ; জ্ঞাত-অজ্ঞাত বলিলে যাহা বুঝায়, বিদিত-অবিদিত বলিলে অবিকল তাহাই বুঝায়। অতএব সংজ্ঞা এবং সম্বিৎ অবিকল সমান। যদি বল যে, সম্বিৎ শব্দের দার্শনিক প্রয়োগ দেখাও, তবে, পঞ্চদশী নামক বেদান্ত-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় খুলিয়া দেখ,—

"শব্দস্পর্শাদয়োবেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্ ততো বিভক্তা তৎসম্বিৎ ইত্যাদি"

শব্দ-স্পর্শাদির ইংরাজী অনুবাদ হ'চ্চে Sound touch &c. এবং তৎসম্বিৎ শব্দের অর্থ Consciousness of sound touch &c; এখানে যদি Consciousness শব্দের পরিবর্ত্তে perception শব্দ ব্যবহার করি, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কেননা Perception (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) Consciousness-এরই প্রকার-ভেদ ; কিন্তু ইহাতে একটা দোষ হয়,—শব্দ-স্পর্শাদির বেলায় যেন আমি perception-শব্দ ব্যবহার করিতে পারিলাম, কিন্তু সুখ-দুঃখের বেলায় কি করিব ? তখন আর perception-শব্দ চলিবে না। পঞ্চদশীর তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, শব্দ-স্পর্শাদি বলিতে কেবল শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বুঝিতে হইবে, ইহাই তাহার তাৎপর্য্য যে, শব্দ স্পর্শাদি বলিতে জ্ঞেয়-বিষয় মাত্রই বুঝিতে হইবে—ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ এ সমস্তই বুঝিতে হইবে। এ অবস্থায় সম্বিৎ-শব্দের Perception মাত্র অর্থ করিলে চলিতে পারে না—সুতরাং তাহার অর্থ যে, Consciousness, ইহাতে আর সংশয় নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের সম্মানাস্পদ আপত্তিকারী নিম্ন-লিখিত তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন

"সম্বিৎ অর্থ জ্ঞান, কাজে কাজেই সর্ব্বপ্রকারের জ্ঞানকেই সম্বিৎ বলা যাইতে পারে। জ্ঞান যাহার বাহ্য জগতে কোন

পদার্থ হইতে উৎপত্তি হয় নাই তাহাও "সম্বিৎ", আবার বাহ্য জগতের কোন পদার্থ হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি তাহাও "সম্বিৎ"—অর্থাৎ আমার সুখ-দুঃখও* সম্বিৎ আমার চেতনা জনিত জ্ঞানও সম্বিৎ, আমার বুদ্ধি-বৃত্তি-জনিত জ্ঞানও সম্বিৎ; কারণ "সম্বিৎ" অর্থ জ্ঞান।"

সুবিখ্যাত দর্শনকার Hamilton এ বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন,—Hamilton বলিতেছেন

"We require different words not only to express objects and relations different in themselves, but to express the same objects and relations under the different points of view in which they are placed by the mind, when scientifically considering them. Thus, in the present instance, consciousness and knowledge are not distinguished by different words as different things, but only as the same thing considered in different aspects. এই হিসাবে সম্বিৎ, জ্ঞান, এবং বোধ, এ তিন শব্দের লক্ষ্য বস্তু একই, কিন্তু তাহা বলিয়া, প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বা সুখ-দুঃখ-জ্ঞান বা অন্য কোন শাখা-জ্ঞান সম্বিৎ-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না,—মূল-জ্ঞানই সম্বিৎ শব্দের বাচ্য। সম্বিৎ এবং সম্বিতের শাখা-বৃত্তি, এ দুয়ের মধ্যে যে, প্রভেদ আছে, আপত্তিকারী মহাশয় তাহার প্রতি নিতান্তই উপেক্ষা-করিয়া এই রূপ বলিতেছেন যে, "Consciousness-শব্দের যদি মূল ধরিয়া অর্থ করা যায়, তাহা-হইলে Consciousness-শব্দের মধ্যে Emotions Intellect এবং will আসিয়া পড়ে তাহার সন্দেহ নাই, কারণ এ ত্রিবিধ মানসিক ভাব আমি জানিতে না পারিলে আমার পক্ষে নাই বলিলেও বলিতে পারি।"

কিন্তু এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ দেখা যায় না; কেননা Consciousness-এর বিষয়-সমস্তের মধ্যে কিম্বা শাখা-বৃত্তি-সমূহের মধ্যে যতই কেন প্রভেদ থাকুক না—সে প্রভেদ স্বয়ং Consciousness-কে স্পর্শ করিতে পারে না। সম্বিৎ যে, কিরূপ জ্ঞান, পঞ্চদশীর গ্রন্থকার তাহা এক কথায় যথেষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "স বোধোবিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ" সেই যে জ্ঞান (অর্থাৎ সম্বিৎ) সে জ্ঞান বিষয়-হইতে ভিন্ন কিন্তু জ্ঞান-হইতে ভিন্ন নহে।

Hamilton বলেন যে, It (i. e. consciousness) always resembles itself, differing only in the degree of its intensity; পঞ্চদশী বলেন 'স বোধোবিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ' সেই যে জ্ঞান (অর্থাৎ সম্বিৎ) তাহা বিষয়-হইতে ভিন্ন কিন্তু জ্ঞান-হইতে ভিন্ন নহে; পঞ্চদশীর এই উক্তি এবং Hamilton-এর এই উক্তি যে consciousness always resembles itself এ দুইটি উক্তির মধ্যে কি একবিন্দুও প্রভেদ আছে? অথচ পঞ্চদশী প্রাচীন এবং প্রাচ্য ও Hamilton আধুনিক এবং পাশ্চাত্য। Consciousness-এর বিষয় নানা প্রকার, Consciousness কোন-না-কোন বিষয়ের সহিত জড়িত থাকিবেই থাকিবে—হয় সুখ-দুঃখের সহিত, নয় প্রযত্নের সহিত, নয় বহির্বিষয়ের সহিত জড়িত থাকিবে,—তাহা একেবারেই বিষয়-হইতে পৃথক্কৃত (Separated) হইতে পারে না, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে তাহা তাহার বিষয় হইতে বিবিক্ত—অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে লক্ষিত-Distinguished—হইতে পারে না। এই কাগজের এক পৃষ্ঠ আছে আর এক পৃষ্ঠ নাই—এরূপ হইতে পারে না,—এক পৃষ্ঠ আর এক পৃষ্ঠকে ছাড়িয়া পৃথক্ থাকিতে পারে না—কিন্তু এক পৃষ্ঠ আর-এক পৃষ্ঠ হইতে সচ্ছন্দে বিবিক্ত (অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে লক্ষিত) হইতে পারে। এখানেও এইটি দেখা অতীব আব-

* স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সুখ-দুঃখ-জ্ঞানই এখানে সুখ-দুঃখ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শাক যে, Consciousness যদিও নানা অবস্থায় নানা বৃত্তির সহিত জড়িত হইয়া পড়ে, তথাপি Consciousness সে-সকল বৃত্তি হইতে অনায়াসে বিবিক্ত হইতে পারে; কাজেই Consciousness বলিতে সে সকল বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তি বুঝায় না, সাধারণ জ্ঞানই বুঝায়; স্বর্ণ বলিতে যেমন স্বর্ণের বলয় বা স্বর্ণের ঘটি-বাটি বুঝায় না কিন্তু সাধারণতঃ স্বর্ণ বুঝায়, সেইরূপ Consciousness বলিতে কোন বিশেষ প্রকারের Consciousness (particular mode of consciousness যেমন perception) বুঝায় না কিন্তু সাধারণতঃ Consciousness বুঝায়। Consciousness-এর শাখা-বৃত্তি-সকল বহুবিস্তীর্ণ, কিন্তু স্বয়ং Consciousness এক ভিন্ন দুই নহে। আপত্তি-কারী মহাশয় আর-একরূপ বলেন, তিনি বলেন যে, "Consciousness শব্দের মৌলিক অর্থ এইরূপ বহু-বিস্তীর্ণ হইলেও (অর্থাৎ বহু-বিধ শাখা-বৃত্তি হইলেও) ব্যবহারের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া অনেক সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে (অর্থাৎ তাহার অর্থ একমাত্র মূল-জ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।")

এখানে বলা বাহুল্য যে স্বর্ণের মৌলিক অর্থ স্বর্ণের অলঙ্কারও নহে, স্বর্ণের পাত্রাদিও নহে, তাহা যদি হইত, তবে স্বর্ণের অর্থ এত বিস্তীর্ণ হইত যে, তাহাকে আয়ত্ত করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত হইত; তাহা হইলে স্বর্ণ বলিতে কেবল যে, বর্ত্তমান কালের স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি বুঝাইত তাহা নহে কিন্তু ভবিষ্যৎ কালে যেখানে যত প্রকার স্বর্ণালঙ্কার রচিত হইবে, সমস্ত গুলিকেই স্বর্ণের অর্থের মধ্যে স্থান দেওয়া আবশ্যক হইত। কিন্তু বাস্তবিক স্বর্ণের অর্থ ওরূপ বহু-বিস্তীর্ণ নহে, স্বর্ণের অর্থ স্বর্ণালঙ্কারাদি নহে, কিন্তু সেই স্বর্ণালঙ্কারাদির মুখ্য উপাদান। consciousness-এর অর্থও বহু-বিস্তীর্ণ নহে—Perception প্রভৃতি নহে,—তবে যদি কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি এক শব্দের পরিবর্ত্তে আর এক ভিন্নার্থ-সূচক শব্দ ব্যবহার করে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে; যদি একজন শিশু কিম্বা বিদেশীয় ব্যক্তি বলিতে চায় "ঐ মোহর-টি আমাকে দেও," কিন্তু বলে যে, "ঐ সোণাটি আমাকে দেও," তবে তাহাকে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, সোণা-শব্দে সাধারণতঃ সকল সোণাই বুঝায়, ঐ বিশেষ প্রকারের স্বর্ণ-খণ্ডটি মোহর শব্দের বাচ্য। এইরূপ যদি কোন ব্যক্তি perception এর স্থানে Consciousness, কিম্বা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের স্থানে সম্বিৎ বা সংজ্ঞা, ব্যবহার করিয়া বসেন, তবে "সম্বিৎ" শব্দ বা Consciousness শব্দ তাহার জন্য দায়ী নহে—যাঁহার ভ্রম তিনিই তাহার জন্য দায়ী; তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, সম্বিৎ বা Consciousness বলিতে সাধারণতঃ জ্ঞান বুঝায়, কিন্তু তুমি যাহার কথা উল্লেখ করিতেছ তাহা একটি বিশেষ প্রকারের জ্ঞান—তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে—Perception বলে।

আপত্তি-কারী অতঃপর বলিতেছেন যে, "চেতনা দ্বারা আমি বাহ্য জগতের যাহা কিছু জানিতে পারি তাহা যখন জ্ঞান তখন Consciousness শব্দের মৌলিক অর্থ ধরিলে তাহাকে (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে) Consciousness বলিয়া বিবৃত করিতে পারা যায় তাহার সন্দেহ নাই। (কিন্তু) বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে Consciousness-শব্দ Sensation Perception Emotions Intellect and Will হইতে সম্যক্ প্রভিন্ন।"

এখানে বক্তব্য এই যে, Consciousness শব্দে বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতেরা যাহা বুঝেন সম্বিৎ-শব্দে ঠিক্ তাহাই বুঝায়—Consciousness-এর বিশেষ বিশেষ শাখা-বৃত্তি বুঝায় না; পঞ্চদশীর গ্রন্থকার সম্বিৎ শব্দ উল্লেখ করিয়া তাহার পরেই বলিতেছেন যে, "স বোধোবিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ"

অর্থাৎ সে যে জ্ঞান—তাহা বিষয় হইতেই ভিন্ন—জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে; এখানে পঞ্চদশীর গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ইহা নহে যে, হস্তি-জ্ঞান অশ্ব-জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে—তাঁহার অভিপ্রায় কেবল এইমাত্র যে, যে জ্ঞান হস্তী জানিতেছে সেই জ্ঞানই অশ্ব জানিতেছে,—হস্তী জানিবার বেলা আমারই জ্ঞান—অশ্বজানিবার বেলাও আমারই জ্ঞান—একই জ্ঞান—কার্য্য-বিশেষে ব্যাপৃত হইতেছে। হস্তি-জ্ঞান একটি বিশেষ জ্ঞান, অশ্বজ্ঞানও একটি বিশেষ জ্ঞান; ও দুই জ্ঞানের মধ্য হইতে এবং সকল প্রকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের মধ্য হইতে যে এক-জ্ঞান (পৃথক্কৃত নহে কিন্তু) বিবিক্ত হইতে পারে, সেই জ্ঞানই সম্বিৎ শব্দের বাচ্য। অতঃপর আপত্তিকারী বলিতেছেন যে, ইংরাজীতে Consciousness-শব্দের ব্যাবহারিক এবং বৈজ্ঞানিক দুইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,—মানিলাম ইহা সত্য। সংজ্ঞা-শব্দেরও দুই তিন প্রকার অর্থ আছে। কিন্তু দর্শনের আলোচনা-স্থলে দার্শনিক অর্থটিই গ্রহণ করিতে হইবে—অন্য অর্থ অগ্রাহ্য করিতে হইবে,—এ প্রথা সর্ব্বত্রই প্রচলিত। দর্শন-শব্দে দৃষ্টিও বুঝায়—শাস্ত্র-বিশেষও বুঝায়; Speculation-শব্দে বাণিজ্য-ব্যবসায়ও বুঝায়—দার্শনিক বিষয়ে মস্তিষ্ক-চালনাও বুঝায়; যেখানে সে-টির যে অর্থ সংলগ্ন হয়, সেইখানে সেইটির সেই অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে; অতএব Consciousness-শব্দের দার্শনিক অর্থই এখানকার আলোচ্য ইহাতে-আর কাহারো ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পরন্তু সম্বিৎ-শব্দ একেবারেই দোষশূন্য; কেননা সংজ্ঞা-শব্দ যদিও কখন-কখন পরিভাষা-অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু 'সম্বিৎ' শব্দের ভিতরে কোন দ্ব্যর্থই প্রবেশ করিতে পারে না; সম্বিৎ-শব্দে বিজ্ঞানোক্ত Consciousness ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না। তবে যে, তন্ত্রে সম্বিৎ-শব্দে সিদ্ধি—অলি-শব্দে মদ্য—বুঝায়,শব্দের অর্থ-বিপর্য্যয়ই তাহার এক মাত্র উদ্দেশ্য সুতরাং তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। আবার পঞ্চদশীতে আছে 'সম্বিদেষা স্বয়-প্রভা' এই সম্বিৎ স্বয়ম্প্রভা; স্বয়ম্প্রভা-শব্দ Consciousness ব্যতিরেকে আর কোন মনোবৃত্তির সহিত সংলগ্ন হয় না; কেননা Perception প্রভৃতি বিশেষ-বিশেষ জ্ঞান-বৃত্তি Consciousness হইতেই প্রভা প্রাপ্ত হয় সুতরাং ইহারা স্বয়ম্প্রভা নামের অযোগ্য।

পঞ্চদশীর গ্রন্থকার, যিনি কোন ইংরাজী-গ্রন্থের সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন নাই, তিনি যেমন সাধারণ অপরিণামী জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া সম্বিৎ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আধুনিক সুবিখ্যাত দর্শনকার হামিলটন ঠিক সেই অর্থে Consciousness শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যথা,—

"I know,—I desire,—I feel. What is common to all these? knowing and desiring and feeling are not the same and may be distinguished. But they all agree in one fundamental condition. Can I know, without knowing that I know? Can I desire without knowing that I desire? Can I feel without knowing that I feel? This is impossible. Now this knowing that I know or desire or feel,—this common condition of self knowledge, is precisely what is denominated consciousness. অর্থাৎ "আমি জানিতেছি" "আমি সুখদুঃখ ভোগ করিতেছি" "আমি ইচ্ছা করিতেছি" এইরূপ মনোবৃত্তি-সকলের সাধারণ ভিত্তি-মূল যে আত্মজ্ঞান ইহাই Consciousness শব্দের বাচ্য। এই বিবেচনায় পঞ্চদশী সম্বিৎকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন 'ইয়ংআত্মা' ইনিই আত্মা। Hamilton পুনশ্চ বলিতেছেন

"In taking a comprehensive survey of the mental phoenomena, these are all seen to comprise one essential element, or to be possible only under one necessary condition. This element or condition is consciousness, or

the knowledge that I,—that the Ego exists, in some determinate state

এখানে কেহ মনে করিতে পারেন যে, তবে বুঝি "Ego in some determinate state consciousness শব্দের বাচ্য, কিন্তু সেটি তাঁহার ভুল,—The Ego in some determinate state নহে কিন্তু The knowledge that the Ego exists in some determinate state ইহাই consciousness শব্দের বাচ্য। পুনশ্চ

In this knowledge they (i. e. the mental phoenomena) appear, or are realised as phoenomena and with this knowledge they likewise disappear, or have no longer a phoenominal existence, So that consciousness may be compared to an internal light by means of which, and which alone, what passes in the mind is rendered visible.

এই light এবং "সম্বিদেবা স্বয়ম্প্রভা" এই দুয়ের কেমন চমৎকার সৌসাদৃশ্য ইহা দেখিয়া কে আর এরূপ কথা মুখে আনিতে পারেন যে, সম্বিৎ consciousness নহে।

Hamilton বলিতেছেন যে, Consciousness cannot be defined,—We may be ourselves fully aware what consciousness is, but we cannot, without confusion, convey to others a definition of what we ourselves clearly apprehend. The reason is plain. Consciousness lies at the root of all knowledge. Consciousness is itself the one highest source of all comprehensibility and illustration,—how then can we find aught else by which consciousness may be illustrated or comprehended?

Hamilton যে-ভাবে ঐ কথা বলিতেছেন, পঞ্চদশী অবিকল সেই ভাবে এই কথা বলিতেছেন

"বোধেঽপ্যনুভবো যস্য ন কথঞ্চন জায়তে।
তং কথং বোধয়েৎশাস্ত্রং লোষ্টং নরসমাকৃতিং॥
জিহ্বামেঽস্তি ন বেত্যুক্তি র্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা।
ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোধব্য ইতি তাদৃশী॥"

বোধে * (অর্থাৎ সম্বিতে) যাঁহার অনুভব জন্মে না, সেই নরাকৃতি লোষ্টকে শাস্ত্র কিরূপে চেতন দান করিবে। আমার জিহ্বা আছে কি নাই, এরূপ উক্তি যেমন বক্তার পক্ষে লজ্জাকর (অর্থাৎ তাঁহার এ বোধ নাই যে, জিহ্বা না থাকিলে তিনি ও-কথা উচ্চারণ করিতেই পারিতেন না,) ইহাও সেইরূপ যে, বোধ যে কি, তাহা বুঝি না—আমাকে তাহা বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ তোমার যদি বোধকে জানা না থাকিত তবে তুমি যে, বোধকে বুঝিতেছ না, তোমার এ-বোধ-টুকুও তোমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইত না।) এখানে স্পষ্টই সম্বিৎ-অর্থে বোধ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ নানা দিক্ দিয়া—উলটিয়া পাল্‌টিয়া দেখা যাইতেছে যে, সম্বিৎ Consciousness এর অবিকল প্রতি-শব্দ।

* Hamiltion বলিয়াছেন "Consciousness and knowledge are not distinguished by different words as different things, but only as the same thing considered in different aspects. ঠিক এইরূপ বিবেচনায় পঞ্চদশীর গ্রন্থকার প্রথমবারে যদিও সম্বিৎশব্দের উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়াছেন, কিন্তু বারান্তরে তিনি সম্বিৎ—জ্ঞান—বোধ—এ তিন শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই।

গান।

বেহাগ—একতালা।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথ পানে
কত বাধা পায় পায় হে।
চারিদিকে হেরে ঘিরেছে কা'রা
শত বাঁধনে জড়ায় হে,
আমি, ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে।
দাও ভেঙ্গে দাও এ ভবের সুখ,
কাজ নেই এ খেলায় হে,
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মত
বেলা বহে তত যায় হে।
হান তব বাজ হৃদয়-গহনে,
দুখানল জ্বাল' তায় হে,
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে
সে জল দাও মুছায়ে হে।
শূন্য করে দাও হৃদয় আমার
আসন পাত' সেথায় হে,
তুমি এস এস নাথ হ'য়ে বস,
ভুলো না আর আমায় হে।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১, শকাব্দা ১৮০২।

১ আষাঢ়—অদ্য বৈকালে ধাড়ওয়া নদীর বান দেখিতে যাওয়া যায়। এই নদী এত শুষ্ক ছিল; হঠাৎ পর্ব্বত হইতে বান আসিয়া তাহা জলে পরিপূর্ণ হইল। স্রোত কি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে! এইরূপে ঈশ্বরানুগ্রহে ঈশ্বরপ্রেম শুষ্ক মনে প্রবল বেগে আসিয়া তাহাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। এইরূপ প্রবলবেগে ঈশ্বরপ্রেমে পরিপূর্ণ মনসকল পাপও সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহার সত্য প্রচারে প্রবৃত্ত হয়।

৩ আষাঢ়—অদ্য শেষ সংখ্যক বান্ধব পাঠ করি। "মানিনী ও অভিমানিনী" প্রস্তাবটি অতিউৎকৃষ্ট হইয়াছে। বিলাতের পত্র চিন্তাশীলতা কিন্তু স্বদেশের প্রতি বিরাগিতা প্রকাশ করিতেছে। এই বিরাগতা অতীব শোচনীয়।

৬ আষাঢ়। অদ্য পাপচিন্তা ও সাংসারিক দুঃখে অধৈর্য্য দুর্দ্দমনীয় ইহা মনে করিয়া মন অতিশয় ব্যথিত হইল। "ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ, বিবেক ও বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ আশ্রয় হে।"

৯ আষাঢ়—অদ্য 'Statesman' কাগজে James Thomson's City of the Dreadful Night শিরস্ক কবিতার সমালোচন পাঠ করি। ইহা পাঠ করিয়া বোধ হইল যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম Pessimism অর্থাৎ বিশ্বনৈরাশ্যবাদের আকারে ইউরোপ খণ্ডে প্রবেশ করিতেছে। ঐ কবির আর একটি কবিতা হইতে নিম্নস্থ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

"He knew the blood-red sweetness of the vine
Yet did not at the revel sit;
But, straining out the very wine of wine,
Lived calm and pure and glad in drunkenness divine."

"তিনি দ্রাক্ষার রক্তাভ মধুরতা বিষয়ে অবগত ছিলেন তথাপি মদ্যপায়ীদিগের উল্লাসক্ষেত্রে উপবিষ্ট থাকিতেন না কিন্তু সুরার সুরা নিঙড়াইয়া পান করত দেবতাদিগের মত্ততাতে পূর্ণ হইয়া প্রশান্ত পবিত্র ও আনন্দচিত্ত থাকিতেন।" ঈশ্বরমত্ত (God-intoxicated) ব্যক্তি প্রেমসুরা পান করিয়া সর্ব্বদা প্রশান্ত ও পবিত্র ও আনন্দচিত্ত থাকেন; আর দ্রাক্ষার সুরা পান করিয়া লোকে অশান্ত অপবিত্র ও নিরানন্দ হয় এই জন্য হাফেজ বলিয়াছেন"প্রকৃত প্রেমের মত্ততা তোর মস্তকের ভিতর নাই, তুই আমার নিকট হইতে চলিয়া যা, যেহেতু তুই দ্রাক্ষারসে মত্ত!"

ক্রমশঃ।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে গত মাসে আমরা নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকা গুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No IX. for 1884.
Journal Asiatic Society of Bengal. Vol. LIII. Part I. No II.
Theosophist, Vol. VI. No III.
বান্ধব। অষ্টমখণ্ড, ৬, ৭ সংখ্যা।
নবজীবন। প্রথম খণ্ড পঞ্চম সংখ্যা।
আর্য্যদর্শন। দশমখণ্ড, ৮ম সংখ্যা।
ভারতী। অষ্টম ভাগ, অষ্টম সংখ্যা।
প্রচার। প্রথমখণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা।
ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা।
আলোচনা। প্রথমভাগ, চতুর্থ সংখ্যা।

গুপ্ত সম্রাট বংশাবলী।

এবারকার এসিয়াটীক সুসাইটীর জর্ণালে নয়জন গুপ্ত সম্রাটের নামাঙ্কিত মুদ্রা বিষয়ক একটী সুদীর্ঘ ও উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ এবং আলাহাবাদ ও ভিটারি—লাট প্রস্তরলিপি, কোহান, ইরাণ ও আপসহর প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসন প্রভৃতি হইতে গুপ্তসম্রাটদিগের নিম্নলিখিত তালিকা সংগৃহীত হইল। ইহাঁরা সাধারণতঃ মগধের রাজা ছিলেন। পাটলীপুত্র নগরী তাঁহাদের রাজধানী ছিল। গুপ্ত সম্রাটদিগের প্রবল উন্নতির সময়ে বঙ্গীয় নরপতিগণ তাঁহাদের সামন্তরাজশ্রেণীতে পরিগণিত ছিলেন। শকাব্দের পূর্ব্ব হইতে এই রাজবংশের শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। জেনারেল কনিংহাম সাহেব বলেন, গুপ্ত বংশীয় তৃতীয় নরপতি মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সিংহাসন আরোহণ করিয়া যে অব্দ প্রচলিত করেন তাহাই "শকাব্দ" নামে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে।" উড়িষ্যায় কেশরী-বংশীয় রাজগণ তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

চীন পরিব্রাজক হিয়েনসাঙ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে "মকিওতা" (মগধ) সাম্রাজ্যের বিবরণ লিখিয়াছেন; তাহাতে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ জন মগধেশ্বরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত তালিকায় শক্রাদিত্য হইতে বজ্র পর্য্যন্ত যে পাঁচ জন নরপতির নাম প্রকাশিত হইয়াছে। পরিব্রাজক বিকৃত ভাবে তাঁহাদের নামই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। হিয়েনসাঙের লিখিত পাঁচজনের মধ্যে তিন জন রাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা তাঁহার লিখিত বাক্যের সত্যতা দৃঢ় ভাবে পোষণ করিতেছে। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য হইতে মহাশিব গুপ্ত পর্য্যন্ত নরপতিগণ সকলেই বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন; কেবল তাঁহারাই সম্রাটপদবাচ্য হইতে পারেন। প্রয়াগের লাট প্রস্তরলিপিতে মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্রগুপ্তকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে যে "বিদ্বজ্জনোপজীব্যানেক কাব্যক্রিয়াভিঃ প্রতিষ্ঠিতকবিরাজশব্দস্য" ইত্যাদি পণ্ডিতপ্রবর লাসেন সমুদ্রগুপ্তের এই কয়েকটী বিশেষণ দর্শন করিয়া তাঁহাকেই মহাকবি কালিদাসের আশ্রয়দাতা লিখিয়াছেন। সমুদ্রগুপ্তের সভামণ্ডপ নবরত্ন দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছিল কি না তাহা স্থির রূপে বলা যাইতে পারে না। দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা শ্রীধর্ম্মাশোকের পর সমুদ্রগুপ্তের নাম গৌরবের সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি গুপ্ত বংশের গৌরবভাস্কর। হিমালয় হইতে রামেশ্বর, ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত মদনদী চালিত বিস্তৃত ভূভাগ তাঁহার গৌরব-প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

মহারাজ শ্রীগুপ্ত।
,, ঘটোৎকচ।
মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।
,, সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রম।
,, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রম।
,, কুমারগুপ্ত (সিংহ বিক্রম) মহেন্দ্র।
,, স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।
,, মহেন্দ্রগুপ্ত।

* *

,, নরগুপ্ত বালাদিত্য।
,, প্রকাশাদিত্য।

* *

,, শ্রীশিবগুপ্ত।
,, শ্রীমহাভবগুপ্ত।
,, শ্রীমহাদেবগুপ্ত।
,, শ্রীমহাশিবগুপ্ত।

* *

,, দেবগুপ্ত।
,, চন্দ্রাপীড়।

* *

,, শক্রাদিত্য।
,, বুধগুপ্ত।
,, তথাগুপ্ত।
,, বালাদিত্য।
,, বজ্র।

* *

,, কৃষ্ণগুপ্ত।
,, হর্ষগুপ্ত।
,, জীবিতগুপ্ত।
,, কুমারগুপ্ত।
,, দামোদরগুপ্ত।
,, মহাসেনগুপ্ত।
,, মাধবগুপ্ত।

* *

,, হর্ষগুপ্ত।
,, আদিত্য সেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

অধ্যক্ষ সভার বিশেষ অধিবেশন।

৩০ই অগ্রহায়ণ ব্রাঃ সঃ ৫৫ (১৮০৬ শক) রবিবার

অপরাহ্ণ ৪॥ টা।

উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজারাম মুখোপাধ্যায় সভাপতি।
,, ,, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
,, ,, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়
,, পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী } অধ্যক্ষ।
,, বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
,, ,, শ্রীনাথ মিত্র
,, ,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যক্ষ ও সম্পাদক।

উপস্থিত অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু রাজারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় অদ্যকার অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি স্থির হইল।

আগামী ১১ মাঘ প্রাতঃকাল ৭॥ ঘণ্টার সময় আদি ব্রাহ্ম-সমাজ গৃহে উপাসনা হইবে।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত শ্রীমৎ মহর্ষি প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তনাদি হইবে।

সাধারণের জন্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ মহর্ষি প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর মধ্যস্থ প্রাঙ্গণে ১১ মাঘ সন্ধ্যার পর সাম্বৎসরিক উৎসব হইত। কিন্তু তথায় স্থান সঙ্কুলন না হওয়ায় প্রতি বৎসর উপাসনার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। অতএব অবধারিত হইল যে এবার শ্রীমৎ মহর্ষি প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃ-প্রাঙ্গণে সাধারণের জন্য অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় উপাসনা হইবে।

২। সমাজ সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যে অধ্যক্ষদিগের অধিকার আছে, অবগত হইয়া, তদনুসারে কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে, তাহার একটী বিজ্ঞাপনী প্রস্তুত করিয়া আগামী অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর উপস্থিত করিবেন।

৩। "আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে দুঃখী অনাথদিগকে কোন রূপ দান সাহায্য করা হয় না, এক্ষণে তদ্বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত" শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রস্তাব উত্থাপিত করায়, অবধারিত হইল যে, আগামী অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে এতৎ-সম্বন্ধে আ-লোচনা হইবে।

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্র-নাথ ঠাকুর বলেন যে অনাথা হিন্দু বিধবাদিগের সাহায্য জন্য তিনি মাসিক ২৫৲ পঁচিশ টাকা সমাজে দান করিতে প্রস্তুত আছেন।

৪। পুস্তক বিক্রয় সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি অবধারিত হইল।

(১) ব্রাহ্মধর্ম্মের "ব্যাখ্যান" ১ম ও ২য় প্রকরণ এবং মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ, তিন খণ্ড একত্র লইলে ৷৷০ আট আনা মূল্যে দেওয়া যাইবে। পৃথক লইলে প্রতিখণ্ড ।০ চারি আনা মূল্যে দেওয়া হইবে।

(২) Leonard's History of the Brahma Samaj." পুস্তক ১১। ১২। ১৩ মাঘে ১৷০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইবে।

(৩) প্রতি বৎসরের পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (এক এক ভাগ) ঐ তিন দিবস ২৲ দুই টাকা মূল্যে বিক্রীত হইবে।

৫। সমাজের কার্য্যের সুবিধার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আবশ্যকমত বেঞ্চ ধার দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন বলিয়া অধ্যক্ষ সভা হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

সভাপতি।

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাঃ শ্রীরাজারাম মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ই মাঘ শুক্রবার রাত্রি ৭॥০ টার সময় আমাদি-গের বাটিতে ব্রহ্মোৎসব হইবে। উৎসব-ক্ষেত্রের সংকীর্ণতা বশত টিকিটের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ৫০০ টিকিট এখনও উদ্বৃত্ত আছে, যাঁহার উৎসবে যোগ দিবার ইচ্ছা হইবে তিনি আমার নিকট প্রার্থনা করিলে টিকিট প্রাপ্ত হইতে পারি-বেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পঞ্চপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

মাঘোৎসব উপলক্ষে

১১ মাঘ শুক্রবার প্রাতঃকাল ৭॥০ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহে উপাসনা হইবে। এবং ঐ দিবস মধ্যাহ্ন হইতে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে পাঠ, আলোচনা ও সংকীর্ত্তন হইয়া ৩ টার সময়ে উ-পাসনা আরম্ভ হইবে; উপাসনান্তে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন হইতে থাকিবে। এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য সর্ব্বসাধারণকে সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

সৃষ্টি।

১

প্রথমে—কিছুই নাহিক কোথায়
মহিমা রয়েছে ঢাকা মহিমায়,
জ্যোতিতে বিলীন রয়েছে জ্যোতি-

২

নিরবদ্য দেব ব্রহ্ম সনাতন
আপন সৌন্দর্য্যে হইয়া মগন
প্রেমের আনন্দে আছেন মাতি।

৩

সৌন্দর্য্যের সনে প্রেমের বাতাস
লাগিতে লাগিতে উঠিল উচ্ছ্বাস
মহাতেজ তাহে বহিয়া গেল,

৪

সে তেজে আগুন হইল বিকাশ
ঘোর রক্ত রঙে ছাইল আকাশ
প্রলয়ের যেন প্রলয় এ'ল।

৫

ক্রমে সে আগুন কি যেন ইঙ্গিতে
খণ্ড খণ্ড হয়ে লাগিল ভাঙ্গিতে
কোটি ঠাঁই কোটি ভাতিল রবি।

৬

আকাশ ভাবিল হইয়া বিস্ময়,
"আজিগে পিতার সৃষ্টি বুঝি হয়,
নহিলে কে এরা, কিসের ছবি?"

৭

ব্রহ্মের মহিমা অগম্য অপার
ভাবিতে ভাবিতে দেখিল আবার
ফুটিয়া উঠিল অযুত গ্রহ।

৮

সৌন্দর্য্যে ফুটিল চন্দ্রমা তপন,
সৌন্দর্য্যে ফুটিল নদী গিরি বন,
সৌন্দর্য্যে ফুটিল মানব দেহ।

৯

সৌন্দর্য্য ভাসিল স্রোতস্বতী নীরে,
সৌন্দর্য্যে ভাতিল লতা পুষ্পে ধীরে,
সৌন্দর্য্যে জগৎ হইল পূর,

১০

সৌন্দর্য্যে তাবৎ হলো মধুময়;
প্রেম আসি' নর নারীর হৃদয়
পূরিয়া অভাব করিল দূর।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৭ পৌষ রবিবার ৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ

আচার্য্যের উপদেশ।

পরব্রহ্মকে লাভ করা এবং পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করা এ দুয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ইতর-বিশেষ আছে। আমাদের জ্ঞানে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে যে, সকল জগতের অভ্যন্তরে এবং প্রতিজনের অভ্যন্তরে পরমাত্মা বর্ত্তমান আছেন—তিনি জ্ঞানময় আনন্দময় এবং মঙ্গলময়, কিন্তু তাহা হইলেই কিছু-আর পরব্রহ্মকে লাভ করা হয় না। আত্মা যখন সমুদায় প্রীতির সহিত পরমাত্মাতে নিবিষ্ট হয়—তখনই সে পরমাত্মাকে লাভ করে। আত্মা যখন পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানের অনুশীলন করে, শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, এবং আনন্দের আস্বাদন করে, তখনই পরমাত্মা আত্মাতে সুস্পষ্ট বিরাজ করেন, তখনই বলা যাইতে পারে যে সাধক পরব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন। যদি কোন শুভ মুহূর্ত্তে ক্ষণকালের জন্যও পরমাত্মার সহিত আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, তবে তাহা সাধকের পরম লাভ। কিন্তু যিনি পরমাত্মাকে সমুদায় আত্মা সমর্পণ করিয়া অনন্ত কালের অনন্ত জীবনের মত তাঁহাকে আত্মাতে প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইহজীবনেই তিনি অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় ধামে উপনীত হইয়াছেন—তিনিই ধন্য। আত্মার এই চরম ফল লাভ করিতে হইলে কিরূপে আত্মাকে প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মে কথিত হইয়াছে; জ্ঞান-উপার্জ্জন করিতে হইবে—কিন্তু কেবল জ্ঞানে কিছুই হইবে না, সর্ব্বাগ্রে এইটি আবশ্যক যে দুশ্চরিত হইতে বিরত হইতে হইবে—শান্ত সমাহিত হইতে হইবে—মনস্কামনা শান্ত করিতে হইবে

জ্ঞান লাভ করিতে হইলে লোকে যেমন

শান্ত সমাহিত হইয়া গুরুর নিকটে গমন করেন—এবং গুরুর শরণাপন্ন হ'ন ; ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে সেইরূপ শান্ত-সমাহিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট গমন করা এবং তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া সাধকের প্রথম কর্ত্তব্য ; কেন না, তাঁহার জ্ঞান এবং তাঁহার সাধন যেমন আমরা তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করিতে পারি—এমন আর কাহারো নিকট হইতে নহে।

যে-টুকু ঈশ্বর-জ্ঞান সকলেরই থাকা আবশ্যক সে-টুকু ঈশ্বর জ্ঞান সকল ব্যক্তিরই আছে, সাধক সেই-টুকু অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে গমন করিবেন, এবং তাঁহাকে আপনার পরম গুরু জানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে তাহা যে সমান মাত্রায় বর্ত্তমান আছে তাহা নহে।—ভিন্ন ভিন্ন আধারে তাহা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বর্ত্তমান আছে ; যে ব্যক্তিতে যে মাত্রায় বর্ত্তমান আছে, সে ব্যক্তির তাহাই প্রথম পক্ষে অবলম্বনীয়।

এমন কত শুনা গিয়াছে যে, জ্ঞান-শিক্ষার্থী শিষ্য কত বৎসর ধরিয়া এক মনে গুরুর সেবা শুশ্রূষায় জীবন অর্দ্ধাবসান করিলে তবে গুরু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বিদ্যা দান করিয়াছেন ;—আমাদের দেশের এই যে, পূর্ব্বতন প্রথা,—অগ্রে আত্ম-সংযম-শিক্ষা—পরে জ্ঞান-শিক্ষা—ইহার অর্থ অতি গভীর। বুদ্ধি-বৃত্তি আত্মার একটি অঙ্গ-বিশেষ—মনে কর তাহা আত্মার চক্ষু। শুদ্ধ কেবল বুদ্ধির চালনা করিলে আত্মার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইতে পারে—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু আত্মসংযম সমুদায় আত্মার ব্যায়াম স্বরূপ ; শরীরের সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যায়াম যেমন শরীরের পক্ষে মহোপকারী, সেইরূপ আত্ম-সংযম আত্মার পক্ষে মহোপকারী ; কিন্তু যদি শরীরের কেবল একাঙ্গেরই বল সাধন করা যায় তবে অবশিষ্ট অঙ্গ-সমূহের বল অপহরণ করিয়া সেই একটি অঙ্গেরই পুষ্টি-সাধনে তাহাকে নিযুক্ত করা হয়—ইহাতে শরীরের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করা হয় ; সেইরূপ যদি কেবল-মাত্র বুদ্ধি-বৃত্তিকেই অতিরিক্ত-মাত্রায় পরিপুষ্ট করা যায়, তবে আত্মার অন্যান্য বৃত্তি ক্রমশ ক্ষীণ-বল হইয়া পড়ে ; এই কারণ-বশত আমাদের দেশে আত্ম-সংযমের দৃঢ় ভিত্তি-ভূমির উপরেই বিদ্যাশিক্ষার মূল-পত্তন শ্রেয় বলিয়া পরিগণিত হইত।

প্রথমতঃ আত্মসংযম যাঁহার অভ্যস্ত হইয়াছে তাঁহার অন্তঃকরণ-ক্ষেত্রে জ্ঞানবীজ যেমন সুচারুরূপে অঙ্কুরিত এবং ফলিত হইতে পারে, অসংযত চিত্তে কখনই সেরূপ সম্ভবে না ; অসংযত চিত্তে জ্ঞান-বৃক্ষ রোপিত হইলে, তাহাতে কণ্টকের ভাগই অধিক পরিমাণে ফলিত হয়, ফল পুষ্পের তেমন শ্রী সৌন্দর্য্য খুলিতে পায় না। অসংযত-চিত্ত ব্যক্তিকে ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রদান করিলে, তাহা হইতে ক্রমশই কুতর্ক, সংশয়, প্রভৃতি তীক্ষ্ণ কণ্টক-সকল বিকীর্ণ হইতে থাকে, প্রেম, ভক্তি, শান্তি, প্রসন্নতা, আত্ম-জ্যোতি, ব্রহ্মানন্দ, এ সকল ফল-ফুলের কোন চিহ্নই তাহাতে পরিস্ফুট হয় না। কিন্তু কে বিদ্যার উপযুক্ত পাত্র, কে-ই বা অনুপযুক্ত পাত্র, ইহা স্থির করিয়া-উঠা মনুষ্য-গুরুর পক্ষে অতীব দুষ্কর। কাহার অন্তঃকরণ কিরূপ এবং কিমাত্রা বিদ্যালাভের উপযুক্ত তাহা জানিতে পারা সহজ ব্যাপার নহে। স্বয়ং ঈশ্বরই তাহা জানেন। ঈশ্বর স্বয়ং গুরু হইয়া যাঁহাকে যে-কোন জ্ঞান প্রদান করেন—তাঁহাকে তাহার উপযুক্ত পাত্র জানিয়াই প্রদান করেন ; সুতরাং স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট হইতে যিনি যে টুকু ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন—

তিনিই তাহার উপযুক্ত পাত্র। জ্ঞানই হোক্—আর যে কোন বিষয়ই হোক্—ঈশ্বরের নিকট আমরা যখন যাহা কিছু প্রার্থনা করি, তাহার ফল ঈশ্বর আমাদিগকে যাহা-কিছু প্রদান করেন—তাহারই আমরা উপযুক্ত, এইটি যেন আমাদের মনে থাকে; তাহা হইলেই ঈশ্বরের নিকট প্রসাদ প্রার্থনা করিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকিব না—এক দিকে যেমন আমরা তাহার প্রসাদ প্রার্থনা করিব, আর একদিকে তেমনি তাঁহার প্রসাদ-লাভের উপযুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিব।

পিতা যেমন পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—পরমাত্মা সেইরূপ আত্মার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এই জন্য পরমাত্মার নিকট গমন করিতে হইলে আত্মাকে তাঁহার সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত করা আবশ্যক। আমাদের সাধ্যানুসারে আমরা আত্মাকে স্বচ্ছ নির্ম্মল ও উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিব—আমাদের যাহা সাধ্যাতীত ঈশ্বর স্বয়ং তাহা পূরণ করিবেন; মাতা কিছু আর বালকের মলিন মুখ মুছাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হ'ন না,—ঈশ্বর কি তাঁহার অনুরক্ত ভক্তের পাপ-মলিনতা মুছাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবেন—কখনই না। আমরা যদি শুদ্ধ কেবল কপটতা, ছদ্ম-বেশিতা ও প্রগল্‌ভতার আবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া সরল ভাবে তাঁহার নিকট গমন করি, তবে তিনি স্বীয় প্রসাদ-বারি দ্বারা—কৃপা-বারি-দ্বারা—আমাদের সমস্ত মলিনতা প্রক্ষালন করিয়া দেন; কিন্তু আমরা আমাদের সেই পুত্র-বৎসল পিতার নিকট—ভক্তবৎসল গুরুর নিকট—দীন-বৎসল প্রভুর নিকট—প্রাণ-বল্লভ বন্ধুর নিকট—গমন করি না,—আমরা আপনারাই আত্মার দ্বার রুদ্ধ করিয়া মনে করি যে ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার শান্তি-নিকেতনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা আপনারা ভগবৎ-নিকেতনের প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ করিয়াছি—সে দ্বার উদ্ঘাটন করা আমাদের আপনাদেরই কার্য্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা আপনারাই ঈশ্বরকে চাহি না—ঐশ্বর্য্যকে চাই, ইহাতেই ঈশ্বর-নিকেতনের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়; কিন্তু যদি আমরা তদ্গত প্রাণে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করি তবে সেই দ্বার পুনর্ব্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। নির্ম্মল সরল অন্তঃকরণে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করাই ভগবৎমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করা। আমরা যখন তাঁহাকে প্রার্থনা করিব তখন তাহার মধ্যে যেন কোন প্রকার পার্থিব অভিসন্ধি লুক্কায়িত না থাকে। যাহা আমাদের প্রয়োজন তাহা তিনি আমাদিগকে দিবেনই—তাহার জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না,—প্রত্যুত আমরা যখন তাঁহাকে প্রার্থনা করি তখন যেন তাঁহাকেই আমরা প্রার্থনা করি, আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করি। যিনি দুশ্চরিত হইতে বিরত হইয়া শান্ত-সমাহিত চিত্তে—একান্ত মানসে তাঁহাকে প্রার্থনা করেন তাঁহার সে প্রার্থনা কখনই বিফল হয় না; ঈশ্বর তাঁহাকে অচিরাৎ দর্শন দেন—তখন তাঁহার প্রার্থনা হৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাসে পরিণত হয় এবং অশ্রুধারা আনন্দধারায় পরিণত হয়।

হে পরমাত্মন্! তোমার প্রসাদ-বারির প্রত্যাশায় আমরা সবান্ধবে অদ্য এখানে সমাগত হইয়াছি—আমরা যেন শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া না যাই। তোমার করুণা মাতৃস্তনে দুগ্ধ—ভারতবর্ষে ভাগীরথী—ভক্ত হৃদয়ে শান্তি-বারি! তোমার করুণা-বারিতে অবগাহন করিয়া পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইব, এবং নিষ্পাপ নির্ম্মল চিত্তে তোমার চরণে প্রীতি-পুষ্প প্রদান করিয়া জীবনকে সার্থক করিব, এই অভিপ্রায়ে আমরা এখানে সম্মি-

লিত হইয়াছি—তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তত্ত্বে উচ্ছ্বাস।

(৩)

ফিরিব কি তবে, অবোধ্য যে তুমি ?
ধরিতে পারিনা ছুঁইতে পারিনা,
বুঝিবারে যাই ফিরি ফিরি আমি
ডাকি ডাকি স্বর নীরব হয়।

কুহেলিকা জালে আবৃত স্বরূপ
রহিবে কি দেব। যেমন আছিল ?
সে গূঢ়াবরণ করি উম্মোচন
না পাবে বিকাশ কভু সে জ্যোতি ?

তুমিও আঁধারে আমিও আঁধারে।
পরিচয় জ্ঞান হোক অসম্ভব,
বুদ্ধির অতীত হওনা হে তুমি,
ছাড়িতে তোমারে তবু কি পারি ?

প্রাণের গভীর নিভৃত কন্দরে
যে ইচ্ছার বেগ অহর্নিশ জ্বলে
ধ্রুবতারা সম ; নিভিবে যেদিন
আমিও সেদিন বিরত হব।

অগম্য অস্তিত্বে ডুবিবার সাধ,
অনন্ত প্রকৃতি করিতে ধারণা,
অতৃপ্ত জ্ঞানের প্রবল পিপাসা
মিটিবে যে দিন, ফিরিব তবে।

(৪)

পারি কি ভুলিতে সে সম্বন্ধ দেব।
অতি ক্ষুদ্রতম অসার অস্তিত্ব
আসিতেছে কোথা—কেজানে কোথায়—
অকূল অনন্ত ব্যাপ্তি সাগরে।

চারিভিতে মম, যে দিকে নেহারি—
প্রকাণ্ড বিকাশ প্রহেলিকা রাজি।
অচিন্ত্য জ্ঞানের অগণ্য লহরী
ভ্রান্ত প্রাণে হেরি কাঁদিয়া ফেলি।

সভয়ে বিস্ময়ে কম্পিত হৃদয়ে
একটুকু হয়ে কোথায় কোথায়
উঠিতে ভাসিতে যাই মিশাইয়ে
কি জানি কোথায় পড়িয়া রই।

পাপ-অহঙ্কারে পারে কি কখন
করিতে আমারে আমার নয়নে
ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে এতটুকু বড় ?
অতিতম ক্ষুদ্র আমি যে বিভো।

তোমার মহত্ত্ব বারেক স্মরণে
আমি যে কাঁদিয়ে ধূলিপারা হই।
ভুলিনা সজ্ঞানে—তুমি যে মহান্।
না ভুলি জীবনে—আমি অসার।

অশোকের অনুশাসন।

"দেবানাম্পিয় পিয়দশী" রাজা শ্রীধর্ম্মাশোক অভিষেকের সপ্তবিংশতিতম বৎসরে কতকগুলি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। পর্ব্বতগাত্রে ও প্রস্তর-স্তম্ভ-লিপিতে সেই সকল আদেশ খোদিত হইয়াছিল। অদ্যাপি কাবুলমধ্যস্থিত কপর্দ্দ গিরি, গুর্জ্জর দেশস্থ গিরিনগরে (গির্ণার) ও উড়িষ্যার অন্তর্গত ধউলী পর্ব্বত-অঙ্গে এবং প্রয়াগ ও দিল্লী নগরস্থ প্রস্তরস্তম্ভে সেই সকল আদেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রোক্ত আদেশলিপি সমূহের সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১। যজ্ঞার্থে কিম্বা উদরপরিতোষ জন্য পশু ও পক্ষীর বধ নিষেধ।

২। মনুষ্য ও পশুর জন্য ঔষধালয় সংস্থাপন ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিবে এবং পথপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ ও কূপ খনন করিবে।

৩। প্রত্যেক পঞ্চম বর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের নৈতিক আদেশ সমূহ প্রচার করিতে হইবে।

৪। পূর্ব্ব অবস্থার সহিত বর্ত্তমান রাজ-শাসনাধীন সুখের অবস্থা তুলনা করিবে।

৫। ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্বদেশী ও বিদেশী অধিবাসীদিগকে—ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিতে হইবে। *

৬। প্রজাবর্গের আচার, ব্যবহার, রীতি-নীতি অনুসন্ধান জন্য ও শিক্ষার জন্য নীতি-পরিদর্শক ও (ধর্ম্মের)-পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করিতে হইবে।

৭। ধর্ম্মের একতা ও সাম্য সংস্থাপনের একান্ত ইচ্ছা।

৮। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের অনুমোদিত পাশব বা ইন্দ্রিয়-পরিতোষ-জনিত সুখের সহিত বর্ত্তমান রাজশাসনাধীন পবিত্র সুখের বিপরীত সম্বন্ধ।

৯। ধর্ম্মেতেই প্রকৃত সুখ, ধর্ম্ম আমাদিগকে পুণ্য কর্ম্মে মতি দেয়। ধর্ম্ম সদনুষ্ঠান-সাপেক্ষ। সদনুষ্ঠান মধ্যে, দয়া, বদান্যতা, পবিত্রতা ও সত্যতাই প্রধান। ধর্ম্মাচরণেই প্রকৃত সুখ লাভ হয় এবং ধর্ম্মাচরণেই স্বর্গীয় সুখ ভোগ করা যায়, ইত্যাত্মক সত্য প্রচার।

১০। ইহ সংসারের সুখের অনিত্যতা এবং অসারতার সহিত ভবিষ্যৎ পুরস্কারের বিপরীত সম্বন্ধ।

১১। ধর্ম্মোপদেশদানই সর্ব্বাপেক্ষা গরিষ্ঠ দান।

১২। অবিশ্বাসীদিগকে উপদেশ দান

১৩। (অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট।)

১৪। সমুদয় উপদেশ গুলির একত্র সন্নিবেশ।

* মহারাজ অশোকের সময়ে বৌদ্ধদিগের তৃতীয় মহাসঙ্গম হইয়াছিল। এই সঙ্গমের উপদেশানুসারে অশোক ধর্ম্মপ্রচার মানসে—মজ্ঝান্তিক নামক স্থবিরকে কাশ্মীর ও গান্ধারে, মহাদেব নামক স্থবিরকে মহিষ মণ্ডলে, স্থবিররক্ষিতকে বনবাসীতে, যোনধর্ম্মরক্ষিত স্থবিরকে অপরান্তকে, স্থবির মহাধর্ম্মরক্ষিতকে মহারাষ্ট্র দেশে, মহারক্ষিত স্থবিরকে যোনানীমণ্ডলে; মজ্ঝিম স্থবিরকে হিমবন্ত প্রদেশে, সোন ও উত্তর নামক স্থবির দ্বয়কে সুবর্ণভূমিতে (পিগু ও ব্রহ্মদেশে), এবং মহামহেন্দ্র ও তাহার শিষ্য ইত্তেয়, উত্তেয়, সম্বল ও ভদ্রসাল নামক পঞ্চ স্থবিরকে লঙ্কা দ্বীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাবংশ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। Turner's. Mahawanso. page 71.)

গান।

রাগিণী দেশ—তাল একতালা

তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে বলে
হের গো কি দশা হয়েছে।
মলিন বদন মলিন হৃদয়
শোকে প্রাণ ডুবে রয়েছে।
বিরহীর বেশে এসেছি হেথায়
জানাতে বিরহ-বেদনা।
দরশন নেব তবে চলে যাব
অনেক দিনের বাসনা।
নাথ নাথ বলে ডাকিব তোমারে
চাহিব হৃদয়ে রাখিতে,
কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে
আর কি পারিবে থাকিতে।
ও অমৃতরূপ দেখিব যখন
মুছিব নয়নবারিহে।
আর উঠিব না, পড়িয়া রহিব
চরণতলে তোমারি হে

সাংখ্য সূত্রের অনুবাদ।

গন্ধতন্মাত্রকেও ঐরূপে অনুভবারূঢ় করিবে। গন্ধ যখন তন্মাত্র অবস্থায় ছিল বা থাকে, তখন তাহাতে সুরভিত্ব অসুরভিত্ব

কিছুই ছিল না বা থাকে না। সুতরাং তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতা বিধায় অনুমেয়। এই যে পৃথিবী দেখিতেছ, ইহাই সেই গন্ধতন্মাত্রের ঘনসংঘাত। সেই জন্যই পার্থিবাণু হইতে বিবিধ গন্ধ প্রকটিত হয়। পার্থিবাণু আর প্রকট গন্ধ তুল্য কথা বলিয়া জানিবে*।

এবম্প্রকারে পঞ্চতন্মাত্র পদার্থ ব্যাখ্যাত হয়। ঈদৃশ তন্মাত্রপঞ্চকের পর্য্যায়-শব্দ অর্থাৎ নামমালা এই।—

পঞ্চতন্মাত্র, অবিশেষ, মহাভূত, জড় প্রকৃতি, অণু (পরমাণু), শান্ত, ঘোর ও মূঢ়।

এতদূরে অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র-নামক প্রকৃতি অষ্টকের ব্যাখ্যা বা বর্ণনা সমাপ্ত হইল। ইহাদিগকে প্রকৃতি বলিবার হেতু এই যে, ইহারাই সমুদায় জগৎ নির্ম্মাণ করে, ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রব্যক্ত করে, এই আট পদার্থ হইতেই এই অচিন্ত্য বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে জ্ঞান নামক প্রকাশাত্মক অংশের প্রকৃতি বুদ্ধি ও অহঙ্কার, আর অপ্রকাশস্বভাব জড় অংশের প্রকৃতি পঞ্চতন্মাত্র। বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইতে অসংখ্য প্রত্যয় সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে এবং তন্মাত্রপঞ্চক হইতে ভূত ভৌতিক জড় সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে।

এত গেল প্রকৃতির কথা। এক্ষণে বিকৃতির কথা শুনুন।

ষোড়শবিকারাঃ ॥ ২ ॥

সমুদায়ে ১৬ ষোল প্রকার বিকার আছে। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত, এই ষোল প্রকার মাত্র বিকার অর্থাৎ এই ষোল প্রকার তত্ত্ব পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার প্রকৃতির পরিণাম-সম্ভূত।

শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ, এই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বুদ্ধিজন্মে বা বুদ্ধিবিকাশের প্রধান উপলক্ষ্য, এ নিমিত্ত ইহারা বুদ্ধীন্দ্রিয়। শ্রোত্র শব্দপ্রভেদ বুঝিবার, ত্বক স্পর্শ-প্রভেদ বুঝিবার, চক্ষু রূপ-প্রভেদ বা বিশিষ্ট বর্ণ বুঝিবার, রসনা রসভেদ বা বিশিষ্ট-অনুভব করিবার, এবং ঘ্রাণ গন্ধ ভেদ বা গ্রহণ করিবার প্রধান উপকরণ। ইহারা পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিতত্ত্বের সাত্ত্বিকাংশে সার স্বরূপ বা শক্তি বিশেষস্বরূপ।

বাক্‌যন্ত্র, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় ক্রিয়া নিষ্পত্তি করিবার, কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার স্বরূপ বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে খ্যাত। বাক্ বাক্য উচ্চারণ করিবার, হস্ত গ্রহণ ও ত্যাগ করিবার; পদ বিচরণ অর্থাৎ ভ্রমণাদি করিবার, পায়ু মল পরিত্যাগ করিবার এবং উপস্থ শুক্রত্যাগ করিবার বা আনন্দ বিশেষ উৎপাদন করিবার প্রধান উপকরণ (যন্ত্র)। দেহস্থ এই কএকটী ইন্দ্রিয় পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিতত্ত্বের রজোভাগপ্রসূত। মনও ইন্দ্রিয়; পরন্তু উহা উভয়াত্মক। উহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বলা যায়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বলা যায়। ইনি স্বয়ং সংকল্পবিকল্পাত্মক ও জ্ঞানাত্মক বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রেরক বা সাহায্যকারী বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়। মনের প্রেরণা, মনের সাহায্য, মনের সংযোগ না হইলে কোন ইন্দ্রিয়ই কার্য্য করিতে পারে না, স্ব স্ব কর্ত্তব্যে ব্যাপৃত হইবে না। এতদ্বিধ একাদশ ইন্দ্রিয়ের পর্য্যায় অর্থাৎ নাম এই;—

ইন্দ্রিয়, বোধাত্মক, বৈকারিক, নিপাতন, উপাদান, নিকারক, অক্ষ ও খ। এখন পঞ্চ মহাভূত কি কি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই

* কারণের গুণ কার্য্যে অনুক্রান্ত হয়, এতন্নিয়মে শব্দতন্মাত্রজাত শব্দই প্রধান গুণ, স্পর্শতন্মাত্রপ্রভব বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, রূপতন্মাত্রজাত জ্যোতিঃ পদার্থের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনগুণ, রসতন্মাত্রপ্রসূত জলভূতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিগুণ, গন্ধতন্মাত্রজন্মা পৃথিবীর শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচ গুণ আছে। এতদ্ভিন্ন ইহাদের অন্যান্য গুণও আছে তাহা অবান্তর-সংসর্গ প্রভব।

পাঁচ প্রকার মাত্র মহাভূত আছে। ইহারা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্বের বিকার বা পুত্র। এতন্মধ্যে পৃথিবী নামক মহাভূত স্থিতিভার-ধারিণী, আশ্রয় বা আধার স্বরূপ হইয়া অবশিষ্ট ভূতচতুষ্টয়ের উপকার করিতেছে। বায়ু বহমান, প্রেরক, পরিচালক ও পরিস্পন্দক থাকিয়া অন্যান্য ভূতের উপকার বা কার্য্য-সাহায্য করিতেছে। আকাশ অবকাশ দান দ্বারা প্রত্যেক ভূতের উপকার সাধন করিতেছে।

পৃথিবীভূতের প্রধান গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। জলভূতের প্রধান গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। তেজোভূতের শ্রেষ্ঠগুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। বায়ুভূতের প্রধান গুণ শব্দ ও স্পর্শ। আকাশ-ভূতের প্রধান গুণ শব্দ। পঞ্চ মহাভূতের ব্যাখ্যা এইরূপ, তাহাদের পর্য্যায় অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নাম এই ;—

ভূত, বিকার, অপ্রকৃতি, তনু, বিগ্রহ, শান্ত, ঘোর ও মূঢ়। ষোল প্রকার বিকার ও তত্ত্বাবতের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল। ১৬ বিকার আর ৮ প্রকৃতি, এই ২৪ তত্ত্ব বলা হইল, এক্ষণে পুরুষ-নামক পঞ্চবিংশ তত্ত্বের বর্ণনা শুনুন।

পুরুষঃ ॥ ৩ ॥

পুরুষ, ইহা একটী পৃথক্ এবং তত্ত্ব, ইহা পঞ্চবিংশ। চব্বিশ তত্ত্বের পরপারে অবস্থিত। ইহার লক্ষণ কিরূপ তাহা বলা যাইতেছে।

পুরুষ অনাদি, সুসূক্ষ্ম, সর্ব্বগত, চেতন, নির্গুণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, ক্ষেত্রবিৎ, অমলা ও অপ্রসব-স্বভাব।

যেহেতু ইতি পুরাণ অর্থাৎ চিরনিত্য, দেহ-নামক পুরমধ্যে অথবা বুদ্ধি-নামক পুরমধ্যে শয়ন বা বাস করেন, উপলব্ধিযোগ্য হন, প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশমান হন, সেই হেতু ইনি পুরুষ।

পুরুষের আদি নাই, অন্তও নাই, উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই, সুতরাং তিনি অনাদি। তাঁহার কোন অবয়ব নাই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিভাগ নাই, দর্শনযোগ্য স্থূলতা নাই, সংঘাতভাব নাই, তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয়কে বা সমুদায় ইন্দ্রিয়শক্তিকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন। এই কারণে তাঁহাকে সূক্ষ্ম বলা যায়। সূক্ষ্ম বলিলে লোকে ক্ষুদ্র বুঝে, অল্প বা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বুঝে ; পরন্তু পুরুষ-পক্ষে তাহা না বুঝাই উচিত। পুরুষ সে-ভাবের সূক্ষ্ম নহে। এজগতে ও অন্য জগতে যে কিছু মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত বস্তু আছে, সমুদায়ের সহিত তাঁহার সংযোগ বা ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ আছে। কুত্রাপি ইহাঁর অভাব বা অপ্রাপ্তি নাই। তাঁহার গমন নাই, গমন করিবার স্থানও নাই, কেন না তিনি পরিপূর্ণ, কাযে কাযেই তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত বলা যায়। তাঁহাকে চেতন বলি কেন? না তিনি নিজে নিজে উপলব্ধি-স্বরূপ, প্রকাশক বা উদ্ভাসক। তিনি প্রকাশমান সুখ দুঃখাদির প্রকাশক মাত্র। তিনি আছেন বা সংযুক্ত আছেন বলিয়াই আন্তঃকরণিক সুখাদি প্রকাশ পায়। যে প্রকাশ করে, যে সুখ দুঃখ অনুভব করায়, উপলব্ধি রূপে প্রকাশিত করায়, সেই বস্তুকে আমরা চেতয়িতা চেতন ও চৈতন্য বলি। ইহাঁরই আবেশে জড়স্বভাব বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ চেতন-তুল্য ও সুখাদিউপলব্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাঁকে নির্গুণ বলিবার কারণ এই যে, ইহাঁতে সত্ত্ব, রজ ও তম, এই গুণত্রয় নাই। প্রকাশ যেমন অন্ধকারে থাকিতে পারে না, চৈতন্যে তেমনি জড় গুণ থাকিতে পারে না। আলোক ও অন্ধকার যেমন এক হইতে পারে না, চৈতন্য ও অচৈতন্য তেমনি এক হইতে পারে না। সত্ত্বাদি গুণ যখন জড়, অচেতন, তখন তাহা সর্ব্বচেতয়িতা চৈতন্যে থাকিবার সম্ভাবনা কি?

সম্ভাবনা নাই বলিয়াই আমরা পুরুষকে বা চৈতন্যকে নিগুর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করি।

নিত্য বলিবার কারণ এই যে, ইনি কৃতক অর্থাৎ জন্য নহেন। ইনি জন্মেন নাই, কিছু জন্মেনও না। যে জন্মায়, যাহা হইতে কিছু উৎপন্ন হয়, সে অনিত্য। বীজ বৃক্ষ জন্মায়, তাই সে অনিত্য। তিনি অকর্ত্তা অর্থাৎ কাহারো কর্ত্তা নহেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি প্রাকৃতিক বিকার সমূহকে দেখেন মাত্র, সুখ দুঃখ মোহাদির উপলম্ভক বা প্রকাশক মাত্র, অথচ তাহাতে তিনি লিপ্ত কি বিকৃত কিছুই হন না। উদাসীন বা নির্লিপ্ত থাকেন। (বস্তুতঃ সুখ দুঃখাদিসমুদ্ভবকালে চৈতন্যের কিছু মাত্র ক্ষতি হইতে দেখা যায় না।) সুতরাং তিনি প্রাকৃতিক পরিণামের দ্রষ্টা, দর্শক বা সাক্ষী, কর্ত্তা নহেন। যেহেতু তিনি চেতন, সেই হেতু তিনি সুখ দুঃখ জানেন। জানেন বলিয়া তিনি ভোক্তা; সুখ দুঃখ তাঁহাতে ভোগ (প্রতিবিম্বিত) হয় বটে; কিন্তু সুখ দুঃখ তাঁহাতে উৎপন্ন হয় না; সংযুক্তও হয় না। তিনি ক্ষেত্রবিৎ। কেন না তিনি ক্ষেত্রস্থ (অন্তঃকরণস্থ) হইয়া ক্ষেত্রের দ্বারা সত্ত্বাদি গুণ জ্ঞাত হন। ইহাঁর শুভাশুভ কর্ম্ম নাই। ইনি মনঃকৃত শুভাশুভে লিপ্ত হন না বলিয়া অমল। ইনি কাহারও বীজ নহেন, উৎপাদক নহেন, ইহাঁ হইতে কিছুই প্রসূত হয় না; তাই ইহাঁকে অপ্রসবধর্ম্মা নামে ব্যাখ্যা করে। সাংখ্যজ্ঞদিগের পুরুষ বা আত্মা যেরূপ তাহা ব্যাখ্যাত হইল। এবম্বিধ পুরুষতত্ত্বের নাম বা পর্য্যায় এই:—

পুরুষ, আত্মা, পুমান্, জন্তু, জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, নর, কবি, ব্রহ্ম, অক্ষর, প্রাণ, কু, অজ্ঞ, যৎশব্দ বাচ্য যে, কিংশব্দ বোধ্য কে, বা কোন্, তৎশব্দ বোধ্য সে, এতৎশব্দ লক্ষ্য এই। সাঙ্খ্যসম্মত এবম্প্রকার পঞ্চবিংশতিসংখ্যক তত্ত্ব; এতন্মধ্যে আট তত্ত্ব প্রকৃতি, ষোড়শ তত্ত্ব বিকৃতি, আর প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে, এরূপ একটী তত্ত্ব পুরুষ, সমুদায়ে পঁচিশটী মাত্র তত্ত্ব আছে।

সাঙ্খ্যনিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞ নর সন্ন্যাসে গার্হস্থ্যে বা বানপ্রস্থে, যে কোন আশ্রমে থাকুন, সন্ন্যাসে থাকিয়া মুণ্ডিতমস্তক হউন, বনে থাকিয়া জটা বল্কল ধারণ করুন, গার্হস্থ্যে থাকিয়া শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করুণ, দেহপাতের পর তিনি নিশ্চিত মুক্ত হইবেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে যে, পুরুষ কর্ত্তা কি অকর্ত্তা। শুভাশুভ কর্ম্ম কে করে? পুরুষ করে কি পুরুষাধিষ্ঠিত মনঃই করে। যদি তিনি কর্ত্তা হন, যদি তাঁহার কর্ত্তৃত্ব গুণ থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, শুভাশুভ কর্ম্ম তিনিই করেন। মনোমধ্যে এরূপ প্রশ্ন হইলে, তাহার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ের জন্য, নিম্নলিখিত বিচারের আশ্রয় লইতে হয়। কর্ত্তৃত্বশক্তিটী গুণবৃত্তি অর্থাৎ গুণাশ্রিত। গুণই বিবিধ বিকার জন্মায়, সুতরাং গুণই কর্ত্তা, পুরুষ তাহার ভোক্তা বা দ্রষ্টা মাত্র, কর্ত্তা নহেন। লোকের সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ মনোবৃত্তি বা গুণবিকার, তাহার মূল অনুভব করিয়া দেখিলে গুণেরই কর্ত্তৃত্ব নিশ্চয় হয়, চৈতন্যের নহে। গুণের সাত্ত্বিকী বৃত্তি কি কি তাহা শুন।

ধর্ম্মউৎপাদনের জন্য, জ্ঞান লাভের জন্য, আত্মোৎকর্ষ বা আধ্যাত্মিক শুভোন্নতির উদ্দেশে, প্রতিদিনই সংযম ও নিয়মতৎপর থাকার প্রবৃত্তি, প্রসংখ্যান, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, অনাত্মপদার্থে বিরাগ, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক সাত্ত্বিকী বৃত্তি আছে। রাগ বা বিষয়াসক্তি, ক্রোধ, লোভ, পরনিন্দা, উগ্রতা, রৌদ্রভাব, অসন্তোষ, বিকৃতাকৃতি (মুখখিচান প্রভৃতি) নৈষ্ঠুর্য্য ও অন্যান্য

কর্কশ ব্যবহার (মার পীট্ ও গালিগালাচ) প্রভৃতি অশান্তি প্রবৃত্তি মাত্রেই রাজসী বৃত্তি বা রজোগুণের উদ্রেক। উন্মত্ততা, মনঃক্ষোভ, ভ্রম, বিষাদ, নাস্তিকতা, স্ত্রীপ্রসঙ্গিতা, নিদ্রা, আলস্য, কর্ম্মবৈগুণ্য (ভালরূপে কার্য্য করিতে না পারা,) নির্ঘৃণতা এবং অশুচিত্ব (শৌচাচার বিরুদ্ধ) প্রভৃতি প্রবৃত্তি নিচয় তামসীবৃত্তি মধ্যে গণ্য। এই ত্রিবিধ বৃত্তি গুণ হইতে বা বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হয়, ইহা দেখিয়া গুণই কর্ত্তা, ইহা সুসিদ্ধ হয়। অন্য এক যুক্তি আছে, তদ্দ্বারাও পুরুষের অকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধি হয়। যথা—

প্রকৃতি যখন প্রবর্ত্তমানা হন, কার্য্যোন্মুখী হন, তখনই তিনি উল্লিখিত গুণের আশ্রয়ে বা সাহায্যে কার্য্য করেন। রজ ও তমঃ এই দুই গুণের সাহায্য বা অঙ্গাঙ্গীভাব প্রাপ্ত হইয়া বিকৃতা হন। বিপরীত জ্ঞান বা বুদ্ধিমোহবশতঃ অর্থাৎ ঠিক্ বুঝিতে পারে না অথবা ও উল্টা বুঝে বলিয়া নির্ব্বোধ মনুষ্য আমি করি, এইরূপ বিবেচনা করে; বস্তুতঃ সে কিছুই করে না, তাহার আশ্রিত প্রকৃতিই (বুদ্ধিই) সমুদায় করে। যে ব্যক্তি একটা যৎসামান্য তৃণকেও (প্রকৃতির বিনা সাহায্যে) বাঁকাইতে পারে না, সে ব্যক্তি যে আমি অমুক করিলাম এবং আমিই এ সমুদায় করিয়াছি ও করিতেছি বলিয়া অভিমান করে,ইহা তাহাদের দোষ ও ভ্রম। মিথ্যা আরোপ বা মিথ্যা অভিমান বশতঃ তাহারা উন্মত্তের ন্যায় বা পাগলের ন্যায় ঐরূপ (আমি করিয়াছি ও করিতেছি এইরূপ) অভিমনন করিয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে শাস্ত্র আছে যে, প্রকৃতির গুণের (রজস্তমঃ সত্ত্বের) দ্বারাই সমস্ত কার্য্য ক্রিয়মাণ হয়, নির্ব্বাহ হয়, কিন্তু অহঙ্কার বিমূঢ় অর্থাৎ অহং অভিমানে সমাচ্ছন্ন আত্মা তাহাতে "আমি কর্ত্তা" "আমিই করিতেছি" এইরূপ অভিমনন করেন। যেহেতু তিনি অনাদি ও নির্গুণ; সেই হেতু তিনি শরীরস্থ হইলেও অর্থাৎ শরীর রূপ উপাধির দ্বারা উপহিত (আশ্রিত প্রায়) হইলেও অব্যয় অক্ষয় অর্থাৎ বিক্রিয়াবর্জ্জিত থাকেন; সুতরাং তিনি কিছুই করেন না, লিপ্তও হন না। যে কোন কর্ম্ম বা কার্য্য—সমস্তই প্রকৃতিকর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ হয়, যে নর ইহা বুঝিতে পারে, সেই নরই আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিতে পারে, অন্যে পারে না।

"পুরুষ শরীরস্থ" এই প্রসঙ্গাগত কথায় হয়-ত এরূপ প্রশ্ন উঠিবে যে, তিনি প্রতিক্ষেত্রে বা প্রতিশরীরে এক? কি অনেক? এক আত্মার বহুশরীর? কি যত শরীর তত আত্মা? এ সম্বন্ধে যাহা উপদেশ ও অনুভব আছে, তাহা বলিতেছি, শুন।

সুখ, দুঃখ, মোহ, সংস্কার, জন্ম, মরণ, এই সকল জীবধর্ম্ম যখন নানা অর্থাৎ শরীরভেদে ভিন্ন, তখন অবশ্যই তদাশ্রয় পুরুষ বা আত্মা বহু; অর্থাৎ শরীরভেদে ভিন্ন। লোকের (ভোগ্যস্থানের) নানাত্ব, আশ্রমের নানাত্ব ও বর্ণের (ব্রাহ্মণাদি জাতির) নানাত্ব, এই সকল নানাত্বই পুরুষনানাত্বের অনুমাপক। পুরুষ এক, কিন্তু তাহার শরীর নানা, ইহা সত্য হইলে একের বন্ধনে অপরের বন্ধন, একের মুক্তিতে অন্যের মুক্তি, একের সুখ দুঃখে অন্যের সুখ দুঃখ, একের মরণে অন্যের মরণ, ইহা অবশ্যই হইত। তাহা যখন হয় না, তখন বিবেচনা করিতে হইবে, নিশ্চয় করিতে হইবে, যে, পুরুষ বা আত্মা এক নহে, বহু। শরীর বহু, শরীরের ধর্ম্মাদি বহু এবং তদধিষ্ঠাতা পুরুষও বহু। নিম্নলিখিত হেতুর দ্বারাও পুরুষবহুত্ব অনুমিত হয়। যথা—আকৃতি, গর্ভ, আশয়, ভোগ, শরীর, ভগ ও লিঙ্গ,—এ সমস্ত যখন বহু, তখন অবশ্যই তদ্ব্যঙ্গ্য পুরুষও বহু। সাম্খ্যায়ন, কপিল, আ-

সুরি, বোঢু ও পঞ্চশিখ প্রভৃতি সাঙ্খ্যাচার্য্য-গণ কথিতপ্রকারে পুরুষবহুত্বের উপদেশ করিয়া থাকেন; পরন্তু হরি, হর, ব্রহ্মা ও ব্যাস প্রভৃতি বেদবাদী আচার্য্যগণ ঐকাত্ম্যবাদের উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "এ সমস্তই এক অদ্বিতীয় পুরুষের বিভূতি।" "পুরুষ হইতে পৃথক্, এরূপ পদার্থ নাই।" "তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, তিনিই শুক্র, অর্থাৎ শুদ্ধস্বভাব, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জল এবং তিনিই প্রজাপতি।" "তিনিই সত্য, তিনিই অমৃত পুরুষ, তিনিই মোক্ষ, তিনিই এ সমুদায়ের চরম গতি।" "তিনিই অক্ষয় (অনশ্বর), তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তিনিই সমস্ত এবং শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয়। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নাই। "তাঁহা অপেক্ষা সূক্ষ্মও নাই, বৃহৎও নাই।" "সেই এক অদ্বিতীয় তত্ত্বই স্বর্গে বৃক্ষের ন্যায় উচ্ছ্রিত আছে।" "সেই পবিত্র পূর্ণপুরুষের দ্বারা এ সমস্তই প্রপূরিত।" "যত হাত, সমস্তই তাঁহার, যত পদ, সমুদায়ই তাঁহার, যত চক্ষুঃ সমুদায়ই তাঁহার চক্ষু, যত মস্তক, যত মুখ, যত শ্রবণ, সমুদায়ই তাঁহার। লোক ও লোকস্থ যে কিছু—সমস্তই তিনি,—তাঁহা কর্ত্তৃক এ সমস্তই আবৃত। তিনি চরাচর বিশ্ব আবরণ করিয়া বিদ্যমান আছেন।" "তিনি নিরিন্দ্রিয় হইয়াও ইন্দ্রিয় রূপে, নির্গুণ হইয়াও গুণাভাস রূপে, সকলের প্রভু ও নিয়ামক রূপে এবং সকলের আশ্রয় ও রক্ষক রূপে বিরাজ করিতেছেন।" "তিনিই সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তু, তিনিই নিত্য কাল সকল তত্ত্বের সম্ভূতি স্থান, তাঁহাতেই সমুদায় লীন হয়, মুনিগণ তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন।" "যেমন এক চন্দ্র জল রূপ আধারে ভিন্ন ভিন্ন লোকের দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ, সেই এক পুরুষ বা আত্মা প্রত্যেক ভূতে (শরীরে) বিবিধরূপে অবস্থিত থাকিয়া কাহারও নিকট এক, এবং কাহারও নিকট বহু বলিয়া প্রতীয়মান হন।" "সেই এক মহান পুরুষ বা পরমাত্মাই স্থাবর জঙ্গম সমুদায় ভূতে বিরাজিত এবং তিনিই এই দৃশ্য জগতে পরিব্যাপ্ত।" "জগতে একই আত্মা কিন্তু প্রকৃতি তাঁহাকে বহুপ্রকার তুল্য করিয়া রাখিয়াছেন। সেই জন্যই অজ্ঞ মানব তাঁহাকে পৃথক্ বা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া জানে, কিন্তু জ্ঞান হইলে, প্রকৃতি সাক্ষাৎকার হইলে, আত্মযাথাত্ম্য সাক্ষাৎকার হইলে, সেই বিবেকজ প্রজ্ঞা হইতে পুনশ্চ তাঁহার একত্ব সিদ্ধি হয়।" "পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণে, কৃমি কীটে, চণ্ডালে, কুক্কুরে, হস্তিতে পশুতে ও গো শরীরে, দংশে ও মশকে, তাঁহারই স্বরূপ অনুভব করিয়া থাকেন।" "যেমন একই সূত্র স্বর্ণমালায়, মুক্তামালায়, মণিমালায় ও প্রবালমালায়, মৃত্তিকায় ও রজতে অনুস্যূত থাকে, তদ্রূপ, সেই একই আত্মা পশুতে, মনুষ্যশরীরে, সিংহদেহে ও মৃগাদি দেহে বিরাজিত, ইহা জ্ঞান করিতে হইবে। সেই একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন আকারে (অবিবেকীগণের দৃষ্টিতে) দৃষ্ট হন। বেদবাদিদিগের আত্মোপদেশ এইরূপ, সাংখ্যাচার্য্যদিগের আত্মজ্ঞান ইহা হইতে পৃথক্। পৃথক্ হইলেও উভয় প্রস্থানের ফল সমান।

ক্রমশঃ।

প্রাপ্ত

হিন্দুধর্ম্মের সার।

প্রথম প্রস্তাব।

হিন্দুধর্ম্ম অবিনাশী, মনুষ্যের যে ধর্ম্ম তাহাই হিন্দু ধর্ম্ম; সেই হিন্দুধর্ম্ম অর্থাৎ মানবধর্ম্ম কখন লোপ হইবার নহে। উহার হিন্দু নাম আরোপ মাত্র। যদি কোন কোন লক্ষণ

ধরিয়া হিন্দুদিগের যে ধর্ম্ম তাহাই হিন্দু ধর্ম্ম, এরূপ নিরূপণ কর, তবু ও দেখা যাইবে হিন্দু-ধর্ম্ম ক্ষীণজীবী নহে। হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম ধর্ম্ম। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া শতবিধ আন্দোলন সহ্য করিয়া যদি ইহার প্রকৃতির, ইহার হিন্দু নামের, ইহার জীবনী শক্তির ব্যাঘাত হয় নাই, তবে আজি কেন যে এ ধর্ম্মের স্থায়িত্বের সংশয় করিতে হইবে. 'হিন্দুধর্ম্ম কত পরিমাণে গেল, কত পরিমাণে রহিল' কেন যে এরূপ বিচার হয়, কেন যে ইহার বিনাশের ভয় করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। হিন্দু-ধর্ম্মের রক্ষার বিষয়ে কোন শঙ্কা নাই; তবে ইহাতে যে সংস্কার প্রয়োজন, তাহা শতবার স্বীকার করা হইয়াছে এবং শতবার স্বীকার করিতে হইবে। শতবার এই ধর্ম্মাবলম্বীদের আচার ব্যবহার দূষিত হইয়াছে; শতবার তাহার সংশোধন জন্য ঘোরতর আন্দোলন হইয়াছে; এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য অন্য সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে; এক শাস্ত্রের বিরুদ্ধে অন্য শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। যুগে যুগে হিন্দুধর্ম্মের অধীশ্বর ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত এবং অধর্ম্ম বিনাশের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বিশেষরূপে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন।

এক সময়ে যজ্ঞবিঘ্নকারী অসুরগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ঋষিগণ কুলপতি বা রাজসন্নিধানে গিয়া জানাইতেন—ধর্ম্ম লোপ উপস্থিত; অসুরেরা যজ্ঞ করিতে দিতেছে না। সে কাল গিয়াছে। এখন অসুরেরা নাই; ঋষিরাও আর যজ্ঞ করেন না; তবু হিন্দু ধর্ম্মের লোপ হয় নাই।

কালান্তরে অসুরদিগের উৎপাত অপেক্ষা জ্ঞান-খড়্গে যাগযজ্ঞের অধিক বিনাশ হইল। প্রজ্ঞাবান্ উপনিষৎকার ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন, যাগযজ্ঞ নিরর্থক, অথবা উহা কেবল স্বর্গফলপ্রাপ্তিসাধক; স্বর্গফলে পুনর্জন্ম; তাহাতে ক্লেশের নিবৃত্তি নাই। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান সাধনই কর্ত্তব্য। ইহাতে যাগযজ্ঞের প্রচার খর্ব্ব হইল। অবশেষে কতকগুলি গৃহ্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াতে উহা বদ্ধ রহিল।

জ্ঞানের উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিতে করিতে জ্ঞানীগণ পার্থিব সম্বন্ধ ও আত্মস্মৃতি ছাড়াইয়া উঠিলেন। জ্ঞান অপেক্ষা তর্কবুদ্ধিতে জ্ঞানের আলোচনা কার্য্যই শ্রেয় বোধ হইল। জ্ঞানগিরির অত্যুচ্চ শৃঙ্গে উঠিয়া তাঁহারা সকলই শূন্য দেখিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বই ভালরূপে নির্ণয় হয় না। এই জ্ঞানী অর্থাৎ দর্শনকারদিগের কৃত আন্দোলনে উপনিষৎকার এবং যাজ্ঞিক ঋষিগণ সকলেই পর্য্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে বেদবিদ্বেষী বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল।

এ পর্য্যন্ত সরলান্তঃকরণের চেষ্টায় ও সুক্ষ্মদর্শনসহকৃত গবেষণায় যে সকল ফল সমুৎপাদিত হইল, তাহার কিছুই ব্যর্থ হইল না। মনুষ্যেরা উত্তমরূপে বুঝিয়া স্বস্ব শক্তি অনুসারে যাহা গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ করিল, যাহা গ্রহণ করিবার নয় তাহা ভবিষ্যতের সাবধানতার জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠে অঙ্কিত রহিল।

বৌদ্ধগণের চেষ্টায় 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' হিন্দুদিগের শিরায় শিরায় বিদ্ধ হইল। হিন্দুগণ তাহা গ্রহণ করিলেন। আর কিছু গ্রহণ করিলেন না*। বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্থানান্তরিত হইল। কিন্তু যে গৃহ ঝড় খাইয়াছে, যাহার মধ্যে বন্যার জল ঢুকিয়া স্থানে স্থানে নষ্ট করিয়াছে, সে গৃহে বাস করিতে সকলের প্রবৃত্তি হয় না। এক পার্শ্বে কতকগুলি হিন্দু একত্রিত হইয়া তন্ত্রশাস্ত্রের রচনা ও তাহার প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা

* লেখকের এই স্থলে আমরা মত দিতে পারিলাম না। সং

বৈদিক যাগ যজ্ঞের কিছু লইলেন না, কিন্তু উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিলেন। তান্ত্রিকদিগের চেষ্টা হইল, আমরা স্বতন্ত্র কর্ম্মপদ্ধতি প্রচলিত করিব। তাহাতে ব্রাহ্মণের আধিপত্য থাকিবে না; জাতিভেদ ক্রমে লোপ হইবে; বহু আড়ম্বর-বিশিষ্ট ক্রিয়াকলাপ চলিবে না। সহজে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিবার সুযোগ হইবে।

তন্ত্রকারদিগের এরূপ স্পর্দ্ধা অপর হিন্দু-দিগের সহ্য হইল না। সনাতন বেদশাস্ত্র একবারে অগ্রাহ্য হইবে; এত কালের হিন্দু-সমাজকে আধুনিক নব্যদল নূতন বিধিতে অধিকার করিবে, ইহা তাঁহারা শ্রেয়স্কর মনে করিলেন না। তন্ত্রকারেরা শিবরূপের বিস্ময় ব্যক্ত করিয়াছেন। অপরাপর হিন্দুগণ ঈশ্বরের বহুল রূপের আবির্ভাব প্রকাশ করিয়া এক এক শাস্ত্র রচনা করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের নাম দিলেন—পুরাণ। এখনকার এক প্রকার পরিত্যক্ত বহুকালের প্রাচীন বেদ লইয়া লোকে হয়ত চলিবে না, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে নূতন পথ আশ্রয় করাও হইবে না; অতএব তাঁহারা প্রাচীন কোন কোন কাহিনী অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি ও মন্বন্তরাদি হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত সমস্ত কালের বিবরণ-সম্বলিত শাস্ত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার "পুরাণ" এই নাম দিলেন। ইহাতে বলা হইল, ইহা বেদের সমকালবর্ত্তী, বেদের অনুরূপ। ইহাতে বৈদিক আচার ব্যবহার অনেক রক্ষিত হইল। অধিকন্তু বর্ত্তমান কালোপযোগী কতকগুলি নূতন দেবতার আরাধনা ও কতকগুলি ব্রতের সৃষ্টি হইল।

পুরাণকারদিগের এই চেষ্টায় তান্ত্রিক-গণের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া গেল। তাঁহারা লোকবন্ধনের নিমিত্ত তান্ত্রিকী দীক্ষা শক্ত করিয়া তুলিলেন। ইহাতে গুরুর মাহাত্ম্য অতিশয় বৃদ্ধি হইল; তান্ত্রিকী মন্ত্র অতি গোপনে রাখা হইল; গুরুত্যাগের প্রতি অত্যন্ত ভয় জন্মান হইল; জাতিনাশ করিয়া লোকদিগকে এক চক্রে আনিবার অতিশয় লোভজনক ব্যবস্থা প্রচলিত হইল। কিন্তু তাহাতে তান্ত্রিকদিগের স্বার্থপরতা ও বিবিধ অধর্ম্ম পরিস্ফুট হওয়াতে পৌরাণিক মতের প্রতিই লোকের মন আকৃষ্ট হইল।

এদিকে পুরাণকর্ত্তারা বিশেষ বুদ্ধির কার্য্য করিলেন। তাঁহারা উদারতা সহকারে আপনাদের দেবতাশ্রেণীর মধ্যে তন্ত্রের দেবতা শিব ও পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে পুরাণ ও তন্ত্রের সম্মিলন হইল। এই সম্মিলিত শাস্ত্রে বেদের ব্রহ্মা, পুরাণের বিষ্ণু এবং তন্ত্রের শিব একত্রিত হইলেন। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানও ইহাতে মধ্যে মধ্যে স্থান পাইল; দর্শনের প্রকৃতি পুরুষ, সগুণ নির্গুণ জড় ও চৈতন্য, ব্রহ্ম ও মায়া—এসকলেরও পরিচয় পুরাণে রাখা হইল। সুতরাং পুরাণ সমগ্র হিন্দুমণ্ডলীর শ্রদ্ধাভাজন ও অবলম্বনীয় হইয়া উঠিল।

এইরূপে হিন্দু ধর্ম্মের যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তদপেক্ষা এক্ষণে নূতন এমন কি হইয়াছে যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের বিনাশের ভয় করিতে হইবে। এক্ষণে অনেক হিন্দু কোন শাস্ত্র মানে না, এই যদি ভয়ের বিষয় হয়, তাহা হইলে আমরা দেখাইব, যে এখন লোকেরা শাস্ত্রকে যেমন মান্য করে, প্রাচীন লোকেরাও তাহাই করিতেন। নতুবা এত বিরুদ্ধ শাস্ত্রের রচনা ও তাহার প্রচার হইত না। যিনি যে শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তিনি সেইটীকে একমাত্র অবলম্বনীয়, চতুর্ব্বর্গফল-প্রদ, সনাতন ও অনুত্তম শাস্ত্র বলিয়া বর্ণন করেন। কেহ কেহ বা অপর কোন শাস্ত্রের বিশেষ নিন্দাবাদ করিয়া আপনার শাস্ত্রকে উচ্চ মঞ্চে স্থাপিত করেন। এইরূপে শাস্ত্র-

কারেরা শাস্ত্র রচনা করিলেন কিন্তু গৃহীতারা মর্ম্ম বুঝিয়া যাহা গ্রহণ করিবার তাহাই গ্রহণ করিল—হংসোযথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং।

আমরা হিন্দু শাস্ত্র সকলের রচনার যেরূপ ক্রম প্রদর্শন করিলাম তাহাতে বিদিত হইবে পুরাণ শাস্ত্র সকল সর্ব্বশেষে রচিত। পুরাণ কলিযুগের শাস্ত্র। পুরাণ সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্মবোধক। পুরাণে এমন কি বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত ব্যবস্থাও নিয়মিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণ সকলে কি আছে? বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে হিন্দুসমাজে চিরদিনের ধর্ম্ম-বিরোধের যে স্রোত চলিয়া আসিতেছিল, পুরাণ সকলে তাহাই একত্রীভূত হইয়াছে। অথচ পুরাণের চেষ্টা যে তদনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম-বিরোধ না থাকে। এজন্য পুরাণ সকলের স্বর অতি উচ্চ—অতি প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক। পুরাণ বিচিত্র কথা কহেন, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন বিচার বা অর্থ সঙ্কলন করিতে দেন না। পুরাণ বালকের ন্যায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে এবং স্তব স্তুতি করিতে বলেন, কিন্তু ধ্যান, চিন্তা, তপস্যা ও তদুপযোগী দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য করিতে দেন না। পুরাণ ভিন্ন ভিন্ন পথ-প্রদর্শক; কিন্তু উগ্রভাবে বলেন, যে ব্যক্তি যে পথে আছে, সেই পথেই থাক্, তাহাতেই মুক্তি পাইবে। পুরাণ নিত্য ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিতে পারেন না; কিন্তু ফলশ্রুতিতেই সকলকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন। পুরাণের মর্য্যাদা এই যে সকল শাস্ত্রের সার ও মীমাংসা ইহাতে আছে; কিন্তু তাহা কিরূপ হইয়াছে, দেখ। বেদে যে সকল দেবতার নাম আছে, পুরাণে তাহার কতক আছে, কতক নাই, তদ্ভিন্ন ইহাতে আরো বহু দেবতার নাম হইয়াছে। বেদে যেরূপ অর্চ্চনার নিয়ম, পুরাণে দেবার্চ্চনার নিয়ম তদপেক্ষা জটিল। বেদে যেরূপ প্রার্থনা হইত, পুরাণের প্রার্থনা তদপেক্ষা অসরল, মৌখিক ও পরস্পর-বিরুদ্ধ। উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, দর্শনকারদিগের যে বিচার, পুরাণে সে সকলের পরিচয় মাত্র আছে, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। স্মৃতিকারদিগের মত পুরাণে আছে, কিন্তু তাঁহাদের যে উদারতা ছিল, পুরাণে তাহা নাই। এইরূপে পুরাণ সকলে প্রাচীন শাস্ত্রের আংশিক ধর্ম্ম সকল সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অদ্ভুত ইতিহাস, বিচিত্র ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, অসাধারণ ও অলৌকিক ধর্ম্মফল পুরাণের প্রাণ। এই সকলের প্রাচুর্য্য থাকাতে পুরাণ স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধু—অর্থাৎ ইতর সাধারণ লোকের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অধিকন্তু পুরাণ গুলি আপনাদের গৌরব আপনারা এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, আপনাদের মাহাত্ম্য এরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, তাহাদের কথার উপরে কাহারো দ্বিরুক্তি করিবার যো নাই। পুরাণের বিষয়ে তর্ক চলে না, বিচার চলে না, চিন্তা চলে না। যে সকল পুরাণ পরস্পর-বিরোধী তোমাকে তাহার সকলকেই মানিতে হইবে। পুরাণের মধ্যে প্রাচীন বৈদিক ঔপনিষদিক বা দার্শনিক যে সকল বিরুদ্ধ মত সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার সকলই তোমাকে মান্য করিতে হইবে। পুরাণ-বাক্যে তুমি সংশয় করিতে পারিবে না; তাহাতে যে সকল ইতিহাস ব্যক্ত আছে, তাহার বাস্তবিকতার প্রমাণ চাহিতে পারিবে না, শ্লোকের সংখ্যা যদি ঠিক না হয়, বুঝ যে অনেক লোপ হইয়াছে। এমন কি শাস্ত্র না পড়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। পুস্তক লিখিয়া গৃহে রাখিলেও যথেষ্ট ফল হইবে।

পরন্তু সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের শিক্ষা সেরূপ নহে। শাস্ত্র সকলের বিরোধিতা স্বীকার করা আছে এবং শাস্ত্রবিরোধস্থলে কিরূপে

মীমাংসা করিবে তাহার বিধি আছে। পুরাণের বিরোধস্থলে স্মৃতির বাক্য মান্য করিতে হইবে। স্মৃতির বিরোধস্থলে শ্রুতির বাক্য মানিতে হইবে। সর্ব্বথা যুক্তি ও বিচার দ্বারা এবং সাধু লোকের দ্বারা ধর্ম্মমীমাংসা হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য যে বেদ, সেই বেদার্থের যিনি প্রধান সঙ্কলনকর্ত্তা, সেই মনু এই বলিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভি র্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতোযোধর্ম্মস্তন্নিবোধত॥ ২। ১।

রাগদ্বেষবিহীন সাধু বিদ্বানেরা যাহা হৃদয়ে অঙ্গীকার করেন এবং নিত্য যাহার সেবা করেন, সেই ধর্ম্ম; তাহা শ্রবণ কর।

ইহাতে বিদিত হইবে যে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা তাঁহার উক্ত কোন আদেশ-বাক্য বা কোন বিশেষ শাস্ত্র বা কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া-পদ্ধতি হিন্দুধর্ম্মের নিয়ামক নহে। সাধু বিদ্বান্ ব্যক্তির চিত্তে যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতার পথ পরিষ্কৃত। সাধুদিগের হৃদয়ে যে ধর্ম্ম শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়, তাহা ধর্ম্ম—এই লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কার্য্যকারী হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষার্থীর পক্ষে ফলোপধায়ী হইবে না। যেহেতু এই অনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম তাহাদের তরল চিত্তকে আরো চঞ্চল ও বিচারমূঢ় করিয়া তুলিবে। আর ইহা এক এক ব্যক্তির পক্ষে শ্রেয়স্কর হইতে পারে; কিন্তু ইহা সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। সমাজের শতবিধ প্রবৃত্তির লোক যে ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য পরস্পরের নিকট আপনার দায়িত্ব অঙ্গীকার করিবে, সে ধর্ম্ম উক্ত প্রকার অনির্দ্দেশ্য রূপে থাকিলে চলে না। এই আপত্তিকারীর প্রতিবাদমুখেও স্বীকার করা হইল যে উপরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত যে ধর্ম্ম তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ আত্মার অবলম্বন ও উন্নতির জন্য যথেষ্ট। তাহাই মুখ্য ধর্ম্ম। পরন্তু শিক্ষার্থীর উপযোগী ও সমাজের যোগ্য ধর্ম্মও প্রয়োজনীয়। ইহাও অযথার্থ নয়। এজন্য ভগবান্ মনু পরে কতিপয় শ্লোক দ্বারা ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বেদোঽখিলোধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥ ২। ৬

ধর্ম্মের মূল এই—সমুদায় বেদ; সেই বেদজ্ঞদিগের প্রণীত স্মৃতি ও তাঁহাদের শীল; সাধুদিগের আচার এবং আপনার অন্তঃকরণের তুষ্টি।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণং॥ ২। ১২

ধর্ম্মবক্তাগণ বলিয়াছেন, বেদ, স্মৃতি, সদাচার, এবং আপনার হৃদয়ের অভিমত কর্ম্ম, ধর্ম্মের এই চারি প্রকার লক্ষণ।

ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে যাহার চিত্তে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া অনুভূত হইবে, তাহাই যে তাহার পক্ষে ধর্ম্ম হইবে, তাহা নহে; বেদ স্মৃতি প্রভৃতি * প্রাচীনকালের শাস্ত্র এবং প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের সাধুদিগের আচরণ, এই সকলের সহিত মিলাইয়া এক একজনের হৃদয়ে ধর্ম্ম বলিয়া যাহা উপলব্ধ হয় তাহাই ধর্ম্ম। প্রথমোক্ত শ্লোকে যে বিদ্বৎ শব্দ আছে তাহারও ভাবার্থ বেদবিৎ। অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানে ধর্ম্মের নিরূপণ করিবে, ইহাই বিধি বটে; কিন্তু তৎপক্ষে তোমার কিছু অবলম্বন চাই এবং তোমার নিরূপিত ধর্ম্মের নিশ্চয়ার্থ তাহার প্রামাণ অর্থাৎ উহার সহিত কাহারো ঐকমত্য আ-

* চারিবেদ এবং স্মৃতি, পুরাণ, ন্যায়, ব্যাকরণাদি ছয়টী অঙ্গশাস্ত্র,—সমুদায়ে ১৪টী যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্ম প্রাপ্তির স্থান বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১। ৩

বশ্যাক। এ জন্য মনু আর এক শ্লোকে বলিয়াছেন।

সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতোবিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ। ২। ৮

বিদ্বান্ ব্যক্তি বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা জগতের সকল বিষয় সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া বেদপ্রমাণে স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিবে।

দর্পণ কলুষিত হইলে যেমন তাহাতে প্রতিফলিত ছায়াও বিকৃত দৃষ্ট হয়, সেই রূপ যাহার হৃদয় ক্রোধহিংসাদিতে কলুষিত তাহার হৃদয়ে হয়ত যথার্থ ধর্ম্মের উপলব্ধি হইবে না। এ জন্য মনু প্রথমোক্ত শ্লোকে অদ্বেষরাগিভিঃ অর্থাৎ দ্বেষরাগবিহীন এই বিশেষণ দিয়াছেন। দ্বিতীয়োক্ত শ্লোকে যে শীল শব্দ আছে তাহাতে সাধু-হৃদয়ের ত্রয়োদশ প্রকার লক্ষণ বুঝায়। যথা,—ব্রহ্মণ্যতা, দেবপিতৃভক্ততা, সৌম্যতা, অপরোপতাপিতা, অনসূয়তা, মৃদুতা, অপারুষ্য, মৈত্রতা, প্রিয়বাদিত্ব, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা, কারুণ্য, প্রশান্তি।

স্থানান্তরেও পাওয়া যায়—

যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণেচ নিবেশিতঃ।
তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চ যা॥

যাহার আত্মা পাপ হইতে বিরত এবং যে কল্যাণকর কার্য্যে বিনিবিষ্ট, সেই ব্যক্তি জানিতে পারে—প্রকৃতি কি এবং বিকৃতিই বা কি?

ইহাতে প্রতীয়মান হইবে যে হিন্দুধর্ম্মে স্বেচ্ছাচারিতার কোন পথ নাই, অথচ তাহাতে লোকের স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনের যথেষ্ট অবকাশ আছে। মনুষ্য প্রাচীন শাস্ত্র ও সাধুদিগের চরিতাদর্শের সহিত মিলাইয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে ধর্ম্মের বিচার করিয়া স্বাভীষ্ট মতে তাহার সেবা করিবে।

এমন অবস্থায় কোন ব্যক্তি কোন এক শাস্ত্রমতের কিছু অন্যথাচরণ করিলে তাহাকে অপরাধী গণ্য করিতে হইবে; কোন ব্যক্তির আচার ব্যবহার প্রচলিত রীতি হইতে একটু ভিন্ন হইলে সে অহিন্দু ও অধোগতি প্রাপ্ত হইবে,—ইহা সঙ্গত নহে। একটুকুতে হিন্দুধর্ম্ম গেল, এক টুকুতে রহিল, এরূপ বিচার করিলে হিন্দুধর্ম্মের বিগর্হিত আচরণ করা হয়। একটু স্খলনে একটু পরিবর্ত্তনে যদি হিন্দুধর্ম্মের না থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম নাই বলিতে হয়। তাহা হইলে বৈদিক কালের হিন্দুধর্ম্ম কোথায়? সে তো অনেক কাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এরূপ কথা ঠিক নহে। বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্ম এমন সঙ্কীর্ণ ও এমন ক্ষীণজীবী নহে। সহস্র সহস্র বৎসর যে ধর্ম্ম বিরাজমান আছে এবং কোটি কোটি লোককে যে ধারণ ও পোষণ করিয়া আসিতেছে সে ধর্ম্মের প্রাণও তেমনি বড় হইবে, সন্দেহ নাই

গান।

রাগিণী কাফি—তাল একতালা।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চির দিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে
তোমারে দেখিতে দেয় না।
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে
তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা হয় ভয়
হারাইয়া ফেলি চকিতে।
কি করিলে বল পাইব তোমারে,
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।
আর কারো পানে চাহিব না আর
করিব হে আমি প্রাণপণ,
তুমি যদি বল এখনি করিব
বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন।

ধম্মপদ।

১। পালী। অপ্‌পমাদো অমতপদং
পমাদোমচ্চুনোপদং।
অপ্‌পমত্তা ন মীয়ন্তি
যে পমত্তা যথা মতা।

সংস্কৃত। অপ্রমাদোঽমৃতপদং
প্রমাদোমৃত্যোঃ পদং।
অপ্রমত্তা ন ম্রীয়ন্তে
যে প্রমত্তা যথা মৃতাঃ।

অর্থ। অপ্রমাদ অমৃতের পদ, প্রমাদ মৃত্যুর পদ। প্রমত্তেরা যেমন মৃত্যুমুখে পড়ে অপ্রমত্তেরা সেরূপ নহেন।

২। পা, এতং বিসেসতো ঞত্বা
অপ্‌পমাদম্হি পণ্ডিতা।
অপ্‌পমাদে পমোদন্তি
অরিয়ানং গোচরে রতা।

২। সং এতদ্বিশেষতো জ্ঞাত্বা
অপ্রমাদে চ পণ্ডিতাঃ।
অপ্রমাদে প্রমোদন্তে
আর্য্যাণাং গোচরে রতাঃ।

অর্থ। পণ্ডিতেরা অপ্রমাদ বিষয়ে এইটী বিশেষ জানিয়া, আর্য্যদিগের মতস্থ হইয়া অপ্রমাদে আমোদিত হইয়া থাকেন।

৩। পা. উট্‌ঠানবতো সতীমতো
সুচিকম্মস্‌স নিসম্মকারিনো।
সঞ্ঞতস্‌স চ ধম্মজীবিনো
অপ্‌পমত্তস্‌স যসোভিবড্‌ঢতি।

৩। সং উত্থানবতঃ স্মৃতিমতঃ
শুচিকর্ম্মণো নিশম্যকারিণঃ
সংযতস্য চ ধর্ম্মজীবিনো
হ্যপ্রমত্তস্য যশোভিবর্দ্ধতে।

অর্থ। উদ্যমশীল স্মৃতিমান সৎকর্ম্মী সমীক্ষ্যকারী সংযত ধর্ম্মজীবি ও অপ্রমত্ত লোকের যশ বর্দ্ধিত হয়।

৪। পা, পমাদমনুয়ুঞ্জন্তি
বালা দুম্মেধিনো জনা।
অপ্‌পমাদঞ্চ মেধাবী
ধনং সেট্‌ঠংচ রক্খতি।

৪। সং প্রমাদমনুযুঞ্জন্তি
বালা দুর্ম্মেধসো জনাঃ।
অপ্রমাদং চ মেধাবী
ধনং শ্রেষ্ঠমিব রক্ষতি।

অর্থ। নির্ব্বোধ বালকেরা প্রমাদযুক্ত হয়। আর মেধাবী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায় অপ্রমাদকে রক্ষা করেন।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১, শকাব্দা ১৮০২।

১৪ আষাঢ়—অদ্য শেষ সংখ্যক ষ্যার্দদর্শন পাঠ করি। "অতীত ও বর্ত্তমান ভারত" শিরস্ক বিলক্ষণ ক্ষমতাসূচক প্রস্তাবে অতি সঙ্গত ও অতি অসঙ্গত মত সকলের বিমিশ্রণ পরিদৃষ্ট হইল। ইহাতে অতি অনর্থক মত সকলের মধ্যে সম্পত্তিসাম্য (Communism) এবং স্ত্রীলোকদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সমর্থিত হইয়াছে। যে সকল অভ্যুন্নত রীতি-নীতি বিলাতে এক্ষণে গ্রহণ করিতে অক্ষম লেখক তাহা ভারতবর্ষে চালাইতে চান। ইহার লাভ এই হইবে যে কোন সংস্কারই এখানে সুসিদ্ধি লাভ করিবে না। "Vaulting ambition overleaps itself."

১৫ আষাঢ়—অদ্য বেঙ্গলী (Bengalee)পত্রে দেখিলাম কলিকাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা ছয় বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা এক্ষণে অনেক মন্দ হইয়াছে। ইহার কারণ ঢাকা নাদাদা সম্পাদক এইরূপ মনে করেন।

১৬ আষাঢ়—অদ্য 'Progress' কাগজ পাঠ করি। "Progress" কাগজ মান্দ্রাজের মিসনরিদিগের দ্বারা প্রকাশিত। তাহার যে অংশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের গোঁড়ামি আছে তাহা বাদ দিলে তাহা অতি উৎকৃষ্ট কাগজ বলিতে হইবে। সদুপদেশ ও ভাল ভাল গ্রন্থোদ্ধৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে ও গল্পে পরিপূর্ণ।

১৯ আষাঢ়—অদ্য যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত "শরীর পালন" পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। আমাদিগের দেশের দরিদ্র লোক এই পুস্তকে বর্ণিত এরূপ সহজ উপায়ে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে ইহা আমি পূর্ব্বে মনে করিতে পারি নাই। কিন্তু গ্রন্থকার বার বার বলিয়াছেন যে প্রাচীন হিন্দুদিগের ব্যবস্থিত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন না করাতেই আমাদিগের বড় বিপদ ঘটিতেছে

২৩ আষাঢ়—অদ্য "বিশ্ববিষ চিকিৎসা" ও ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পার্সিদিগের বিষয়ে বক্তৃতা পাঠ করি। এই বক্তৃতাটি অতিশয় কৌতূহল জনক; তাহাতে পার্সিদিগের বিষয়ে বিবিধ সম্বাদ আছে। পুস্তিকাকার তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অসাধারণ ক্ষমতা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থেও প্রকাশ করিয়াছেন।

২৬ আষাঢ়—অদ্য প্র বাবুর বাসায় বসিয়া কথোপকথন করি। প্র বাবু সামান্য পদস্থ লোক কিন্তু বিশেষ বুদ্ধিমান ও সুরসিক লোক বলিয়া বোধ হইল। মহানগরের লোকে মনে করেন যে তাঁহাদিগের ন্যায় উৎকৃষ্ট লোক জগতে নাই। গ্রাম্য আত্মশ্লাঘা (Mofussil conceit) প্রসিদ্ধ কিন্তু যেমন গ্রাম্য আত্মশ্লাঘা আছে তেমনি নাগর আত্মশ্লাঘা (City conceit,) আছে।

১ শ্রাবণ—অদ্য ভারতবর্ষে প্রাপ্ত বয়সী সাহেবের শেষ সর্মন পাঠ করি তাহাতে লিখিত আছে—

"Oh! What a dull world would this be but for the light that lighteth every man that cometh inro the world, the light of conscience, the moral sense which demands first and foremort that the Judge of all the earth shall do what is right." 'যে আলোক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক মনুষ্যের পথ উজ্জ্বল করে, সেই বিবেকের আলোক, সেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান যাহা প্রধানতঃ ঘোষণা করে যে সমস্ত ভূমণ্ডলের বিচারপতি ঈশ্বর যাহা ন্যায় তাহাই করিবেন। এই বিবেকের আলোক যদি না থাকিত তবে পৃথিবী কি ঔৎসুক্য শূন্য স্থান হইত"। বয়সী সাহেবের কথা ঠিক। আমাদিগের বিবেক বৃত্তি পরিচয় দিতেছে যে ঈশ্বর যিনি ঐ বৃত্তি আমাদিগের হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছেন তিনি নিজে ন্যায়বান ও ধর্ম্মাবহ পুরুষ। এই বিশ্বাস না থাকিলে পৃথিবী কেবল ঘন বিষাদের আলয়।

১৭ শ্রাবণ—অদ্য "বঙ্গ দূতের" শেষ সংখ্যা পাঠ করি। তাহাতে প্রকাশিত "আধ্যাত্মিক তাড়িৎ" অথবা "ব্রহ্মতেজ" বিষয়ে প্রস্তাব উত্তম লেখা হইয়াছে। ব্রহ্মসহবাস নিয়ত করিতে করিতে মনের তেজস্বিতা অতিশয় বর্দ্ধিত হয় ইহা অতি যথার্থ কথা।

২১ শ্রাবণ—অদ্য ১ বাবু, প্র বাবু ও আমি আমরা হাজারিবাগের সরকারি উকিল শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। লোকটি বিচক্ষণ, গম্ভীর প্রকৃতি ও অমায়িক বলিয়া বোধ হইল। ইনি তথাকার ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ স্বরূপ। হাজারিবাগে বিলক্ষণ একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে।

২৩ শ্রাবণ—অদ্য শেষ সংখ্যক আর্য্যদর্শন পাঠ করি। "আর্য্যদর্শনে" "অতীত ও বর্ত্তমান ভারত" শিরস্ক প্রস্তাবের অনুবৃত্তি উত্তম লেখা হইয়াছে।

২৪ শ্রাবণ—অদ্য "আর্য্যদর্শনে" "রাজার ক্ষমতা কে দিল" এই প্রস্তাব পাঠ করি। ইহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় স্পষ্ট বুঝা যায় রাজার ক্ষমতা কে দিল?

২৮ শ্রাবণ অদ্য নূতন প্রকাশিত "পঞ্চানন্দ" পাঠ করি। এই নাম ইংলণ্ডের "পঞ্চ" হইতে লওয়া কেবল তাহাতে আনন্দ শব্দ যোগ করা হইয়াছে মাত্র কিন্তু ইংলণ্ডের "পঞ্চ" যেমন উৎকৃষ্ট ইহা সেরূপ নহে, ক্রমে হইবার সম্ভাবনা। উহার কোন কোন ঠাট্টা অনেক ভাবিয়া বুঝিতে হয়। ঠাট্টা ভাবিয়া বুঝিতে গেলে চলে না। আমাদিগের দেশে একটি রহস্যের কাগজ উত্তমরূপে সম্পাদিত হইলে তদ্দ্বারা দেশের অনেক সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মের দিকে নিয়োজিত বিশুদ্ধ রসিকতার প্রভাব অনেকে বুঝেন না।

২৯ শ্রাবণ—অদ্য একটি ভাব মনে উদিত হয়। "সুরসিকতা জীবনের চাট্নি।" বিশুদ্ধ হুলবিহীন রসিকতা প্রতিপদে পদে আবশ্যক করে; উহা এই বিষাদময় জীবনকে উজ্জ্বল করে। সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতে ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। ঈশ্বর নির্দোষ হাস্যের ঈশ্বর। তিনি দিবালোক ও আশার ঈশ্বর। সরস্য সাধু জীবনই সুখের এক মাত্র কারণ।

২৪ ভাদ্র—অদ্য ভারতবর্ষে প্রাপ্ত বয়সী সাহেবের শেষ সর্মন পাঠ করি তিনি তাহাতে Theism অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। "A fresh influx of heavenly light, new and glorious thoughts of God and of human destiny, a hope that maketh not ashamed, a hope unstained by solfishness and pride that all man of all ages, races and climes shall be enfolded at last in the everlasting Arms, blest and taught, enriched and comforted by the divine love." "স্বর্গীয় জ্যোতির নবীন আগম, ঈশ্বর এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় নব নব মহৎ মহৎ ভাব, এমন আশা উদ্রেককর যে সে আশা বিষয়ে লজ্জিত হইতে হয় না, বিমদও অস্বার্থপর আশা, এই আশা যে সকল কালের সকল জাতির এবং সকল দেশের লোক পরিশেষে সেই শাশ্বত বাহু দ্বারা আলিঙ্গিত হইবে এবং ঐশী প্রেম দ্বারা অনুগৃহীত ও উপদিষ্ট, ও সমৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং আশ্বাসিত হইবে"।

সমালোচন।

আমরা শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত Memoir of "Raja Ram Mohun Roy" নামক ইংরাজি ভাষায় লিখিত উক্ত মহাত্মার জীবনচরিত খানি পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কিরূপ উচ্চ প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা বড় সহজ নহে। যিনি স্বদেশের প্রকৃত প্রেমিক ও হিতৈষী হইয়া সামাজিক রাজনৈতিক আধ্যাত্মিক-সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন—যিনি হিন্দু শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া এতদ্দেশের তাৎকালিক মূর্খতা ও অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়াছিলেন—যিনি সকলের ও সর্ব্বকালের উপজীব্য এক মাত্র পরব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া এই চির কুসংস্কারপূর্ণ দেশের উদ্ধার সাধন করিয়া গিয়াছেন—যিনি মৃত পতির অলক্ষিতায় জীবিতা স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক বিসর্জন করিতে দেখিয়া নিদারুণ সহমরণপ্রথার উচ্ছেদকল্পে কৃতপ্রতিজ্ঞ হয়েন ও অবশেষে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন—যিনি স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন, বহু বিবাহ নিবারণ, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন প্রভৃতি অনেকানেক মহৎ ও সদ্বিষয়ে আপনার সময় ধন ও ক্ষমতা বিনিয়োজিত করিয়াছিলেন—যিনি "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং" এই বাক্যের উদাহরণীভূত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকেই আপনার হিতৈষণার কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতেন, যিনি সর্ব্বদাই এই কথা বলিতেন, যে লোকের উপকার করাই ঈশ্বরের যথার্থ সেবা, তাঁহার জীবন-মহিমা ও গুণ-গরিমা সম্যক অনুভব ও বর্ণন করা দুরূহ বলিতে হইবে। কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি দীন বাবু এবিষয়ে এক প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ব, অধ্যবসায়, উদারতা, বিদ্যাবত্তা সত্যৈকনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণের অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি সত্যানুসরণ করিতে গিয়া নিদারুণ কষ্টে পতিত হইয়া কিরূপে স্বীয় অবলম্বিত সত্যব্রত পালন করিয়াছিলেন, স্বদেশে ও বিদেশে কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন কি কি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি বিষয়ও দীন বাবুর পুস্তকে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষাটী প্রাঞ্জল হইয়াছে। ভরসা করি উহা সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হইবে।

রামমোহন রায় সমদর্শী ছিলেন—কি হিন্দু কি মোসলমান কি খ্রিষ্টিয়ান সকলের শাস্ত্র হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ও উদার নীতি উদ্ধার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। দীন বাবু অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহা সমর্থন করিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের উপবীত ধারণ বিষয়ে দীন বাবু যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে আমাদের সহানুভূতি আছে। তিনি এসম্বন্ধে এবং জীবনের উপসংহার ভাগে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

"Ram Mohun is blamed in certain quarters for having maintained the Brahminical thread. On the contrary, he should be praised for it. The associations connected with the thread ennobles a Brahmin. It reminds him of his noble lineage. In fact, it leads him to his Maker. When he looks at it, he recollects the Vedic text, which says—সূচনাৎ সূত্র মিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদং। তৎ সূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ॥ It is called *Sutra* because it leads to knowledge, and the chief resting place of the soul, that is the Almighty Being, is the real *Sutra* or object of knowledge. He who has attained this knowledge is the real Vedic Brahmin. The three parts comprising the Brahminical thread, called (দণ্ডী) Dundees, tipify Bak Dunda (বাক্দণ্ড) Manodunda (মনোদণ্ড) and Indria Dunda (ইন্দ্রিয়দণ্ড) or the restriction of words, thoughts and actions. When a Brahmin thinks of the thread in this light, his mind glows with noble sentiments. He meditates on the laudable steps that were taken by his great ancestors to attain the knowledge of God, and is lost in wonder. The wearing of the thread is not a meaningless act of prejudice. It is our proud heritage. It is our great birth-right. Do not then, ye Brahmins! throw away this sacred thread which leads you to salvation and exhorts you to imitate the noble acts of your forefathers. But pray do not put it on as a mere custom. Shew by your actions that you deserve to wear it. It is not intended that this thread should remain as the heirloom of the descendants of the Brahmins of old. Let it be snatched away from those who do not deserve it, and given to the meritorious members of the lower classes. Let men like Viswa Mittra (বিশ্বামিত্র) arise from among the lower orders, and by the force of their meritorious conduct put on the Brahminical thread.

... ...

Some of our countrymen of the present

day judge of the actions of Ram Mohun from their own standard of religious belief. But it should be remembered that, Ram Mohun was a Hindu—a Brahmin in the proper sense of the term. He devoted his whole life to better the condition of the Hindus, he fought furiously with the British lion both in India and in England for the removal of the disadvantages under which they laboured, and he endeavoured to establish a national religion for them. He placed the real purport of the Hindu religion before the people. He considered image worship necessary for those only who could not grasp at the sublime idea of a spiritual Being: but, at the same time, he thought it necessary to give them proper instruction so as to lead them to the worship of the great God in spirit and in truth. And this led him to establish the Brahmo Samaj. This, it is gratifying to find, is the view of the Adi Brahmo Samaj of Calcutta. The secessaion of the Brahmos as a sect from the great body of the Hindus is a matter of great pity. It strikes at the very root of the Hindu nationality. Let the Brahmos call themselves monotheistic Hindoos, but let them not throw the Hindoo name into oblivion, and add another sect to those already existing, which have shattered the great nation. Let the catholic views which the great Ram Mohun inculcated be infused into the whole Hindu race, and let them be embodied in a national anthem and sung by the whole people throughout the length and breadth of India."

আয় ব্যয়।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৫।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	১০৭১ ৵৪
পূর্ব্বকার স্থিত			৩১৩৩৷৶৬
	...	...	৪২০৪৸ ১০
ব্যয়	...	...	১৩৪৩ ৺৭
স্থিত	...	...	২৮৬১৷/৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৪৩।/
দান প্রাপ্তি।			
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৲		
গিরীশচন্দ্র ঘোষ (খিদিরপুর)	২৲		
গোপালচন্দ্র মল্লিক	১৲		
পরলোক গত বাবু রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	২৬৲		
দানাধারে দান প্রাপ্তি	৯।/০		
	৪৩।/		
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	১৩৭॥০
পুস্তকালয়		...	২১৶০
যন্ত্রালয়		..	৮৭৲
গচ্ছিত		...	৪৬৬/৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন			১৬॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার			৭১৯॥ ১
সমষ্টি			১০৭১৶৪

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	১৭১॥/৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	..	...	১৬২॥৶৩
পুস্তকালয়	...	...	৬৭॥ ৬
যন্ত্রালয়	...	...	২১৩৷৵০
গচ্ছিত	...	...	।/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন			৮৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার			৭১৯॥১
সমষ্টি	...	...	১৩৪৩৶৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

স্থানাভাব বশত এবার আমরা পুস্তক ও পত্রিকা প্রাপ্তি স্বীকার করিতে পারিলাম না বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

ভ্রমসংশোধন।

১৯০ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ২৩ পংক্তির "সৌন্দর্য্যে" পরিবর্ত্তে "সৌন্দর্য্য" পাঠ করিতে হইবে।

গত মাসের পত্রিকায় (১৮৮ পৃষ্ঠায়) অধ্যক্ষ সভার বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ভ্রমবশত যথা স্থানে তাঁহার নাম প্রকাশ হয় নাই।

একাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
ফাল্গুন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৫
৪৯৯ সংখ্যা
১৮০৬ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৬ মাঘ রবিবার ৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

উপদেশ।

ঈশ্বর অনন্ত ও মহান, আর আমরা ক্ষুদ্র ও পরিমিত, তথাচ তাঁহাকে জানিতে আমাদের অন্তরের পিপাসা। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান সেই অগাধ অতলস্পর্শ গভীর সমুদ্রে নিমগ্ন হয়, কিন্তু খানিকটা গিয়া দিক্‌ভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় সচকিতে ফিরিয়া আইসে; তথাচ তাঁহাকে জানিতে আমাদের অন্তরের পিপাসা। কিন্তু আমরা দেখিতেছি আমাদের পাঁচটী মাত্র জ্ঞানলাভের দ্বার। তদ্দ্বারা আমরা রূপরসাদিরই জ্ঞান লাভ করিতে পারি। আবার দেখিতেছি, যে ভূতে যতগুলি ভৌতিক গুণ কম সেই ভূতই অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। পৃথিবীতে রূপাদি পাঁচটী গুণ আছে কিন্তু জলে গন্ধগুণ নাই, এজন্য জল পৃথিবী অপেক্ষা ব্যাপক। তেজে গন্ধ ও রস নাই এ জন্য তাহা পৃথিবী ও জল অপেক্ষা ব্যাপক। বায়ুতে গন্ধ রস ও রূপ নাই এজন্য তাহা পৃথিবী জল ও তেজ অপেক্ষা ব্যাপক। আকাশে কেবল শব্দ মাত্র আছে অথবা তাহাতে কোনও রূপ জড়ধর্ম্ম নাই এজন্য তাহা সমস্ত ভূত অপেক্ষা ব্যাপক। কিন্তু এই অনন্ত আকাশ যাঁহার উদর সেই অশব্দ অস্পর্শ অরূপের ব্যাপকতার সীমা কোথায়। তিনি কিছুতেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পারেন না। তিনি যদিও ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য কিন্তু আত্মার গ্রাহ্য। এই আত্মার গ্রাহ্য বলিয়া কি আমরা সেই অগাধ গম্ভীর সমুদ্রের তলস্পর্শ করিতে পারি? কখনই না।

ঈশ্বর আত্মার গ্রাহ্য, কিন্তু আত্মা নির্ম্মল ও স্থির না হইলে আমরা তন্মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। নির্ম্মল ও স্থির জলেই চন্দ্রবিম্ব সুস্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু আত্মাকে নির্ম্মল ও স্থির করা অতি কঠিন ব্যাপার। ইহাতে কঠোর তপঃসাধন চাই। আত্মার মধ্যে নিরন্তর দেবাসুরের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। অসুরগণ বলমদে উন্মত্ত ও দুর্নিবার। উহাদের মধ্যে যুদ্ধে যদি একটীরও জয় হয় তবে সকলেই সিংহবিক্রমে উত্থান করে। দেবতারা যদিও সমরপটু কিন্তু অসুরেরা বড় প্রবলপ্রতাপ। এই দেবাসুরের যুদ্ধে দেবগণের জয়সাধনই তপঃসাধন। কিন্তু তাহা অনন্তদেশব্যাপী অনন্ত-

দেবের প্রসাদ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। এই সাধনের বলে আত্মায় রজস্তমের অভিভব ও সত্ত্বের উদ্রেক হইবে। রজস্তমের সততই বহির্মুখপ্রবৃত্তি। ইহাতে আত্মা অস্থির হয়। কিন্তু সত্ত্বের সততই অন্তর্মুখ-প্রবৃত্তি। ইহাতে আত্মা স্থির হয়। এই-রূপ সত্ত্বের উদ্রেকে আত্মার স্থিরতা সম্পাদন করিতে পারিলে তবেই ঈশ্বর তাহার গ্রাহ্য হইবেন।

কিন্তু আত্মা স্থির হইলে মনে করিও না সেই পূর্ণস্বরূপকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে পারিবে। অজ্ঞান শিশু পূর্ণকল চন্দ্রমণ্ডল ধরিবার জন্য করপ্রসারণ করে। সে দেখিতেছে ঐ তো চন্দ্র, কেন ধরিতে পারিব না, কিন্তু চন্দ্রমণ্ডল তার বহু দূরে। সে ধরিতে পারিল না বটে কিন্তু হতাশ হয় না, সে স্বচক্ষে সুস্পষ্ট চন্দ্রকে দেখিতে পায়, চন্দ্রকিরণে উৎফুল্ল হয় এবং আবার ধরিবার চেষ্টা করে। আমাদের অবস্থাও ঠিক এই-রূপ। আমরা আত্মার চক্ষে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতেছি, তাঁহার সৌন্দর্য্যচ্ছটায় মোহিত ও বিমল জ্যোৎস্নায় উৎফুল্ল হইতেছি এবং তাঁহাকে ধরিবার জন্য শিশুর ন্যায় ক্ষুদ্র হস্ত পুনঃ পুনঃ প্রসারণ করিতেছি কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারিতেছি না, তিনি আমাদের বহু দূরে। কিন্তু ইহাতেও আমরা হতাশ হইতেছি না। আমরা দেখিতেছি তিনি আমাদের অন্তরের অন্তর, আমরা কেন তাঁকে ধরিতে পারিব না, উৎসাহের সহিত আবার হাত বাড়াইতেছি কিন্তু তিনি দূরাৎ সুদূরে। সম্ভবত আমাদের এইরূপ অবস্থাই স্থায়ী। আমরা শিশুর ন্যায় চির দিনই করপ্রসারণ করিব কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারিব না। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অনন্ত কাল ধরিয়া এত প্রসার হইবে না যে আমরা সম্পূর্ণরূপে সেই মহতো মহীয়ানকে ইহার আয়ত্ত করিতে পারিব। শিশু যত বাড়িবে চন্দ্র তার তত দূরে। আমরা যত বাড়িব ঈশ্বরও আমাদের তত দূরে সেই পূর্ণকল চন্দ্র আমাদের নেত্রচকোর পরিতৃপ্ত করিয়া চির দিনই সম্মুখে উদিত থাকিবেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে কখনই আমাদের আয়ত্ত হইবেন না।

বুদ্ধি তাঁহার নিকট পরাস্ত কিন্তু হৃদয় পরাস্ত হয় না। সে তাঁহাকে পাইয়াছে। সে আপনার উপর সেই রাজগণরাজের স্বর্ণসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বুদ্ধির অতৃপ্তি কিন্তু হৃদয়ের অতৃপ্তি নাই। সুরনদী মন্দাকিনী স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভেদ করিয়া অনন্ত স্রোতে অনন্ত পথে চলিয়াছে। ইহার আদি কোথায় অন্তই বা কোথায় কিছুই নির্ণয় হইবার নয়। হৃদয় সেই স্রোতে ভাসিয়াছে এবং তাহার অমৃত বারি পান করিয়া শীতল হইতেছে, এই তাহার তৃপ্তি। বুদ্ধি! নির্বোধ বুদ্ধি! যাহা পৃথিবীর ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর একটী বিন্দুকে অধিকার করিয়া আছে তুমি সেই সামান্য রেণুকে জানিতে পার না, কিন্তু 'যস্য ভূমিঃ প্রমা' পৃথিবীর যাঁর পদ, 'অন্তরীক্ষমুতোদরং' আকাশ যাঁর উদর, 'দিবং যশ্চক্রে মূর্দ্ধানং' দ্যুলোক যাঁর মস্তক, 'সূর্য্যশ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চক্ষুঃ' চন্দ্র সূর্য্য যাঁর চক্ষু, বেদ এইরূপ বিরাট রূপে যাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছে তুমি সেই সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানময় অসীম সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে চাও? কি ভ্রম। কি সাহস।

হৃদয়েই ঈশ্বরের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, এই ক্ষুদ্রে সেই অনন্ত ভার উপস্থিত। আমরা পৃথিবীর নির্য্যাতনে বারংবার উৎপীড়িত, রোগে কাতর, শোকে আকুল, আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘন বিষাদের অন্ধকার; সম্মুখে সমস্তই চঞ্চল ও অস্থির পদার্থ, আমরা সুখের প্রত্যাশায় পদে পদেই প্রতারিত হই, আমাদের

এত যে কষ্ট, এত যে ক্লেশ, ইহার মধ্যে এক মাত্র শান্তিস্থল ঈশ্বর। তিনি এই হৃদয়রূপ নিভৃত স্থানে সাক্ষীস্বরূপ থাকিয়া আমাদের সুখ দুঃখ সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আমরা ভ্রমিচক্রে দিক্‌ভ্রষ্ট হইলে তাঁহার ঘন ঘন আহ্বান-ধ্বনি শুনিতে পাই। পাপের বৃশ্চিক-জ্বালায় অস্থির হইলে তিনি সান্ত্বনা করেন। হৃদয়ের সমস্ত গূঢ় বেদনা জানাইলে তিনি তাহা শুনেন। ভক্তির সহিত প্রীতি-পুষ্প অর্পণ করিলে তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং অশব্দ বাক্যে আমাদের সহিত আলাপ করেন।

আমাদের এই যে হৃদয়-ব্যাপার ইহার অনুসরণেই বুদ্ধির তৃপ্তি। বুদ্ধি ও হৃদয় ইহার অন্যতরের অভাবে হয় অমানিশার অন্ধকার নয় মরুভূমির শুষ্কতা। বাহ্য জগতে প্রকৃতি পুরুষ, অন্তর্জগতেও প্রকৃতি-পুরুষ। ইহার একটীর অভাবে সৃষ্টি-বিলোপই সম্ভব। যিনি অপক্ষপাতে এই উভয়কে রক্ষা করেন ধর্ম্ম-জগতে তাঁরই পদ অটল।

জগদীশ্বর! আমরা যদিও দিশাহারা কিন্তু তুমি আমাদের ধ্রুবতারা। তুমি স্বরূপত কি তাহা না বুঝি কিন্তু তুমি কোটি সূর্য্যপ্রকাশে আমাদের অন্তরে বিরাজিত আছ। যখন তোমার প্রতি চাহিয়া দেখি তখন চক্ষু তোমার জ্যোতি সহিতে পারে না কিন্তু হৃদয় শীতল হয়। নাথ! আমরা তোমার দীন হীন মলিন সন্তান, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই, আমরাও যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মসম্মিলন।

৯ই মাঘ বুধবার প্রাতঃকালে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে উপাসনা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহার কার্য্যবিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিলাম

১। সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২। উদ্বোধন— „ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
৩। সঙ্গীত— „ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।
৪। সত্যং জ্ঞানমনন্তং—(সমস্বরে)
৫। উহারসংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা—শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
৬। নমস্তে সতে—(সমস্বরে পাঠ)
৭। অসতো মা সদ্গময়—(সমস্বরে)
৮। উহার বাঙ্গালা—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৯। সঙ্গীত— „ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।
১০। শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা „ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী
১১। প্রার্থনা— „ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
১২। শান্তিবাচন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৩। সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।
১৪। „ „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্মিলন উপলক্ষে

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ।

আমাদের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের মহিমা প্রত্যক্ষবৎ অবলোকন করি-

অবলোকন করিতেন, গ্রহতারার অভ্যন্তরে তাঁহারা ঈশ্বরকে অবলোকন করিতেন, চন্দ্রমার অভ্যন্তরে তাঁহারা ঈশ্বরকে অবলোকন করিতেন, অন্ধকারের অভ্যন্তরে তাঁহারা ঈশ্বরকে অবলোকন করিতেন, এবং তাঁহারা তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আপন আত্মার অভ্যন্তরে ঈশ্বরকে অবলোকন করিতেন। কোথায় ঈশ্বরকে অবলোকন করিতে হয়, কেমন করিয়া ঈশ্বরকে অবলোকন করিতে হয়, ঈশ্বরকে অবলোকন করিতে হইলে কাহার পর কি সোপান অবলম্বন করিতে হয়, ইহা আমাদের দেশের পূর্ব্বতন শাস্ত্রে যেমন সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে এমন আর

কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; পুষ্প-কলিকা যেমন যথাক্রমে যথা-নিয়মে বিকসিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরোপাসনা আমাদের দেশে যথাক্রমে যথানিয়মে অল্পে অল্পে বিকসিত হইয়া অদ্যকার এই কঠোর শৃঙ্খলের মধ্যেও আমাদের হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিতেছে—তাহাতেই আমরা সজীব রহিয়াছি; নহিলে আমাদের কি দুর্গতি হইত তাহা একবার ভাবিয়া দেখ; যদি আমাদের দেশ হইতে ব্রহ্মোপাসনা উঠিয়া যায়—মনে কর দেখি আমাদের দেশ কি ঘোর অন্ধকারের গর্ব্তে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু ঈশ্বরের করুণা নিশ্চয়ই আমাদিগকে সেরূপ দারুণ বিপদ-গ্রাসে পতিত হইতে দিবে না; আমাদের দেশ এত কঠিন প্রস্তর নহে যে, তাহাতে পড়িয়া আমাদের পুরাতন পিতৃপুরুষদিগের রোপিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ একেবারেই নিষ্ফল হইবে।

আমাদের পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি যে, আত্মাতেই পরমাত্মাকে অবলোকন করিবে; ইহা কি সার-গর্ভ বচন তাহা একবার ভাবিয়া দেখ! এক সূর্য্য অস্তমিত হইলে যেমন সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ এক কেবল আত্মার অবিদ্যমানে আমাদের সম্বন্ধে সমস্ত জগৎ একেবারেই কিছুই না হইয়া যায়; এ জন্য আমাদের নিকট আমাদের আত্মা জগৎ-প্রকাশের প্রদীপ-স্বরূপ,—"হবে কি হবে দিবা-আলোকে জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।" আমার আত্মা না থাকিলে যেমন আমার নিকট কিছুই প্রকাশ পাইত না—আমার আত্মা থাকাতেই আমার সমক্ষে জগৎ দেদীপ্যমান হইতেছে, সেইরূপ পরমাত্মা থাকাতেই জগৎ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তিয়া থাকিতেছে,—সমস্ত জগৎ পরমাত্মারই মঙ্গল-সূত্রে—প্রেম-সূত্রে—লম্বমান রহিয়াছে—সংগ্রথিত রহিয়াছে। পরমাত্মার মন্দিরের দ্বার অগণ্য;—কিন্তু দুই দ্বার সর্ব্বাপেক্ষা বিশাল, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা আমাদিগকে অসীম মহাকাশ দেখাইয়া দেয়—আত্মা আমাদিগকে অপরিবর্ত্তনীয় মহাকাল দেখাইয়া দেয়; এই দুই দ্বার দিয়া পূর্ব্বতন ঋষিরা পরব্রহ্মের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন; চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারাময় আকাশের মধ্যদিয়া তাঁহারা মহাকাশে ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত অর্চ্চনা করিতেন এবং আত্মার মধ্য দিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের ধ্রুব অপরিবর্ত্তনীয় শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ভাব—সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি—অবলোকন করিয়া তাঁহার সহিত সমস্ত কামনার ফল উপভোগ করিতেন। এইরূপে যাঁহারা অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই জ্ঞানময় প্রেমময় মঙ্গলময় পরমাত্মাকে অবলোকন করেন, তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা পরিসীমা নাই—তাঁহারা মুক্তভাবে স্বাধীনভাবে—জগতে বিচরণ করেন; অন্যেরা কারাবদ্ধ চোরের ন্যায় কুণ্ঠিতচিত্তে সংসারে বাস করে। সমস্ত জগৎ-সংসার ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তির নিজের আলয়,—সন্দিগ্ধচিত্ত—আস্থা-শূন্য শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির তাহাতে কোন অধিকার নাই। নিষ্পাপ শুদ্ধাচারী ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্যক্তি পিতার ভবনে বিচরণ করেন—মাতার ভবনে বিচরণ করেন—প্রিয়তম সুহৃদের ভবনে বিচরণ করেন—তাঁহার কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবার কথা নাই—ভীত হইবার কথা নাই—কিছুতেই সঙ্কোচ করিবার কথা নাই। যিনি ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ, যিনি কাহারো অনিষ্ট করেন না, মঙ্গলই যাঁহার ব্রত, যাঁহার আত্মা অপবিত্র বিষয়-ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছে, যাঁহার আত্মা আত্ম-প্রসাদে ধৌত এবং ব্রহ্মানন্দে উদ্দীপিত হইয়াছে, তাঁহার কিছুতেই ভয় নাই—

সঙ্কোচ নাই—গ্লানি নাই; এইরূপ মহাত্মাই জীবন্মুক্ত বলিয়া সকল শাস্ত্রে গীত হইয়াছেন। এইরূপ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।

হে পরমাত্মন্! কবে আমরা তোমার অজর অমর অভয় অমৃত নিকেতনের পথিক হইব। আমাদের দেশের দারিদ্র দুঃখ হাহাকার মারী দুর্ভিক্ষ রাজভয়—সমস্তই আমাদের সহ্য হয়, যদি তোমার অভয় বাণী আমাদের কর্ণপথে এই শুভ সমাচার আনয়ন করে যে, "তুমি যখন সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান আছ—তুমি যখন আমাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছ—তুমি যখন আমাদের পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষদিগের হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি উদ্দীপন করিয়া এখনো সমস্ত ভারতভূমি আলোকিত করিয়া রাখিয়াছ—তখন আমাদের আর ভয় নাই—তখন আমাদের রোগে ভয় নাই—শোকে ভয় নাই—জরাতে ভয় নাই—ইহলোকে ভয় নাই—পরলোকে ভয় নাই!"

হে পরমাত্মন্! তোমার এই অভয় বাণী শুনিয়া আমাদের মন তোমার পথ অন্বেষণ করিতেছে—আমাদের হৃদয় তোমার দর্শনের জন্য চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছে,—তোমার পথ তুমি আমাদিগকে দেখাইয়া দেও,—যাহাতে তোমার আনন্দ আমাদের আনন্দ হয়—তোমার অভিপ্রায় আমাদের অভিপ্রায় হয়—তোমার প্রিয় আমাদের প্রিয় হয়—তোমার কার্য্য আমাদের কার্য্য হয়—তুমি আমাদিগকে সেই আশীর্ব্বাদ প্রদান কর—তাহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পঞ্চপঞ্চাশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

১১ই মাঘ প্রাতঃকাল।

পূর্ব্বদিক উষারাগে রঞ্জিত, শীতল প্রাতঃসমীর মৃদুমন্দভাবে বহিতেছে, পক্ষি সকল কলরব করিয়া সর্ব্বত্র অরুণোদয়ের শুভ সম্বাদ প্রচার করিতেছে। আমরাও প্রাভাতিক স্নানাদি সমাপন করিয়া পবিত্রবেশে অভিমাত্র হর্ষ উল্লাসে সমাজগৃহে উপস্থিত হইলাম। আজ ব্রহ্মোৎসব! দেখিতে দেখিতে গৃহের চতুর্দ্দিক লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বালক বালিকারা উজ্জ্বল বেশে উপস্থিত হইয়া সভার অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি করিল। লোকাকীর্ণ বৃহৎ গৃহ নীরব। ইত্যবসরে গায়কেরা কলকণ্ঠে 'দেহজ্ঞান দিবা জ্ঞান' এই গানটী সমস্বরে গাইতে লাগিলেন। পরে আচার্য্যেরা বেদি গ্রহণ করিলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্ববক্তব্যের সহিত পূর্ব্বাচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের একটী সারগর্ভ উপদেশ পাঠ করিলেন।

"সৃষ্টির অতীত প্রদেশে দাঁড়াইয়া না দেখিলে সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছিল তাহা ঠিক বুঝা যায় না। কিন্তু সেইটী অসম্ভব। তাই আমরা ভূগর্ভের গভীরতম প্রদেশে গিয়া স্তর অনুসন্ধান করি। ইহাতে আমাদের দুইটী উদ্দেশ্য সফল হয়। প্রথম, প্রাচীন বস্তু পাইয়া অতীতের সহিত বর্ত্তমানের একটী যোগবন্ধন করি। দ্বিতীয়, কিরূপ উপাদান স্তরের উপর স্তর প্রস্তুত করিয়া এই প্রকাণ্ড ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছে ইহা উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হই। এই আদি ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টিতত্ত্বের কথাও আমাদের পক্ষে এইরূপ। আমরা সকলেই ইহার নিকট তরুণ। ইহার অতীত প্রদেশে দাঁড়াইয়া না দেখিলে বুঝিতে পারি না যে কিরূপে ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এখন সেইটী আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই আজ ইহার গভীরতম প্রদেশে গিয়া স্তর অনুসন্ধান করিতেছি। ইহাতে আমাদের লাভ এই যে, ইহা দ্বারা অতীতের সহিত বর্ত্তমানের একটী যোগবন্ধন করিতে পারিব এবং কিরূপ উপাদান স্তরের উপর, স্তর প্রস্তুত করিয়া

এই প্রকাণ্ড ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে তাহাও জানিতে পারিব।

আমি আজ যাহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে উঠিয়াছি তাহা এই বৃদ্ধ আদি ব্রাহ্মসমাজের শৈশবাবস্থায় যতগুলি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার অন্যতর। রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রাতঃসূর্য্য কিরূপে রক্তিম আভায় অল্পে অল্পে চতুর্দ্দিক রঞ্জিত করিতেছিল ইহাতে তাহারই নিদর্শন আছে। আদি-ব্রাহ্মসমাজ-সৃষ্টির গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিলে এই যে একটী স্তর পাওয়া যায় ইহা পরীক্ষা কর দেখিতে পাইবে যে, বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রে যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাই এই সমাজের উপাদান। যে জ্ঞান রাজর্ষি জনককে গৃহী এবং শুক সৌনকাদিকে উদাসী করিয়াছে, সর্ব্বত্র সাম্য যাহার বীজ মন্ত্র, অহিংসা ধৈর্য্য ক্ষমা ইত্যাদি যাহার লক্ষণ, সেই বেদোক্ত ধর্ম্মই ইহার উপাদান। আমাদের ঈশ্বর ঋষি সেবিত বৈদিক ঈশ্বর, আমাদের স্তুতি ঋষিপ্রণীত বৈদিক স্তুতি, আমাদের ধ্যান বেদোক্ত গায়ত্রী মন্ত্রে এবং আমাদের উপদেশ বেদ পুরাণ তন্ত্রে।

এখন বুঝিলাম এই আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাদান কি। এখন সৃষ্টিপরীক্ষার ফল অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যোগবন্ধনের কথা কিঞ্চিৎ বলি। আমরা দেখিতেছি ঋষির রক্তে আমাদের শরীর, ঋষির উৎকৃষ্ট জ্ঞানে আমাদের জ্ঞান, এবং ঋষির গৌরবেই আমাদের গৌরব। যদিও বর্ত্তমান সামাজিক বিপ্লব বল পূর্ব্বক একে একে আমাদের সমস্ত প্রাণের ধন কাড়িয়া লইতেছে কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের এই সমীচীন প্রাচীন দৃষ্টি কাড়িয়া লইতে পারে নাই। ইহার শৈশবে যে ভাব বিকশিত হইয়াছিল এখনও তাহার পূর্ণ প্রভাব। এই টুকুই ইহার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু 'কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ' কাল অনন্ত, এক শস্য পাকিয়া পড়িতেছে, আর এক শস্য তেজ ও লাবণ্যে ভূমি ভেদ করিয়া উঠিতেছে। কালের ক্রীড়া এইরূপই। আদি সমাজের এই যে পদাঙ্ক, আশা করি, ভবিষ্যৎবংশীয়েরা সযত্নে ইহার অনুসরণ করিবেন। ইহাতে নিজের মঙ্গল, বঙ্গদেশের মঙ্গল, এবং সমস্ত ভারতের মঙ্গল।

আমি অদ্য যাহা পাঠ করিব তাহা ১৭৫০ শকে বিবৃত আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপদেশ। তখন এই মাঘোৎসবের সৃষ্টি হয় নাই, এই বৃহৎ তৃতল গৃহও প্রস্তুত হয় নাই, তখন ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচারের বীজ নষ্ট করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে ক্ষারবৃষ্টি হইতেছিল। তখন ভয়ানক সামাজিক উপদ্রব। এমন অনেক ধর্ম্মপিপাসু লোক ছিলেন তাঁহারা সভয়ে গোপনে আসিয়া এই সারগর্ভ উপদেশ শুনিতেন এবং সভয়ে গোপনে ইহার আলোচনা করিতেন। এখন আর সে সামাজিক উপদ্রব নাই, এখন আর সে ভয় নাই, আমি সেই উপদেশ এই দীপ্ত দিবালোকে পাঠ করিতেছি, তোমরাও শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর।"

প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়

মুণ্ডকশ্রুতি

দর্পাদিদোষরহিত এবং ইন্দ্রিয়দমনে যত্নবান্ ব্যক্তি আত্মোপাসনার যোগ্য হন।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্। মনু

পূর্ব্বোক্ত বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরমাত্মার চিন্তনে ও ইন্দ্রিয়শাসনে এবং প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন।

পূর্ব্ব * * ব্যাখ্যানে যৎ তৎ শব্দের দ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছেন যে পরমেশ্বর তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব হয় ইহা

শব্দপ্রমাণ ও যুক্তিপ্রমাণ এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দ্বারা বিস্তারিত রূপে কহিয়াছি। এইক্ষণে সে উপাসনা কিরূপে কর্ত্তব্য তাহার বিবরণ কহিতেছি। ভগবান্ মনু চতুর্থাধ্যায়ে গৃহস্থ-ধর্ম্ম-প্রকরণে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ তিন প্রকার হন ইহা কহিয়া, তাহার চরম প্রকারকে ২৪ শ্লোকে কহিতেছেন।

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্তোতৈর্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা॥

ভগবান কুল্লুকভট্টসম্মত এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা তাহার ভাষা এই ; অন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা, গৃহস্থের প্রতি যে পঞ্চ যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে সে সকলকে কেবল জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, সে এই জ্ঞান যে তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু যে উপনিষৎ তাহার প্রমাণ দ্বারা জানেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পর ব্রহ্ম হন। এই রূপ চিন্তন দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা সেই সেই পঞ্চ যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন। এই প্রকরণের সমাপ্তিতে ভগবান্ কুল্লুকভট্ট লিখেন,

শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ।

এই তিন শ্লোকেতে বেদবিহিত-অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মত্যাগি যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ তাঁহাদের প্রতি এই সকল বিধি কথিত হইয়াছে। অতএব তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন এই রূপ চিন্তন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের আত্মোপাসনা হয়। আর ইন্দ্রিয়দমনে ও উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এই উপাসনার সাধন হইয়াছে যাহা পূর্ব্বলিখিত মনুবচনে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন যে যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে। ইন্দ্রিয়দমনের শক্তি পরমেশ্বর কেবল মনুষ্যকেই দিয়াছেন, পশ্বাদির সে শক্তি নাই, সুতরাং তাহারা ইন্দ্রিয়-প্রবলতার দ্বার আপনার বিঘ্ন ও পরের হানি পুনঃ পুনঃ করিতেছে, অতএব যে মনুষ্য ইন্দ্রিয়শাসনের শক্তি থাকিতেও ইন্দ্রিয়ের দমনে যত্ন না করে সে আপনাকে পশুর তুল্যতা প্রাপ্ত করায় এবং পরলোকে দুর্গতি ও রাজদ্বারে তিরস্কার ও লোকগ্লানি ও শরীরগত ক্লেশ ও মনের অস্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং পরমাত্মচিন্তনে অনধিকারী ও লোকযাত্রার উপদ্রব-জনক সে ব্যক্তি হয়। যেমন অগ্নিক্রীড়াতে (অর্থাৎ আতস্ বাজীতে) অপরাজিতা বৃক্ষ ও কদম্ব বৃক্ষ ইত্যাদির শাখা সকলের পরস্পর যে রূপ সম্বন্ধ সেই রূপ ইন্দ্রিয়-সকলের পরস্পর সম্বন্ধ জানিবে, অর্থাৎ এক শাখার অগ্নি সর্ব্বশাখাতে ব্যাপ্ত হইয়া ঐ অগ্নিক্রীড়ার বৃক্ষকে সমূলে দগ্ধ করে, সেই রূপ এক ইন্দ্রিয়ের দোষ সকল-ইন্দ্রিয়ে ব্যাপ্ত হইয়া পুরুষের নাশের কারণ হয়। প্রত্যক্ষ দেখ যে, শ্রবণে কোন সৌন্দর্য্য-বার্ত্তা শুনিয়া আকৃষ্ট হইলে, পশ্চাৎ দৃষ্টির লালসা হয়, র লালসার অনন্তরই স্পর্শের বাসনা জন্মে, তখন কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল অর্থাৎ হস্ত পদাদি তাহার অনুকূল হয়, সুতরাং এই সকলের দোষে পুরুষ আক্রান্ত হইয়া বিনাশকে প্রাপ্ত হয়। সেই রূপ ব্যক্তির কিম্বা বস্তুর সঙ্গের দ্বারা তাহার প্রাপ্তির কামনা জন্মে, সেই কামনার ভঙ্গ হইলে ক্রোধ উপস্থিত হয়, ক্রোধ হইলে হিতাহিত বোধ থাকে না, তখন অন্যের বধ আত্ম-হত্যা ইত্যাদি কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া ইহলোক পরলোক পরিভ্রষ্ট হয়।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
সতু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥
কঠশ্রুতি

সংসারী যে জীব তাহাকে রথী করিয়া জান, আর শরীরকে রথ ও বুদ্ধিকে সারথি জান, মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ অশ্ব চালাইবার নিমিত্ত সারথির হস্তস্থিত রজ্জু করিয়া জান, আর চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলকে অশ্ব করিয়া কহিয়াছেন, আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচ বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের পথ করিয়া জ্ঞান করহ, শরীর ও ইন্দ্রিয় ও মন এই সকল বিশিষ্ট যে জীব তাহাকে পণ্ডিতেরা ফলের ভোক্তা করিয়া কহেন। যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে চালাইতে অপটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে না পারে তাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে না, যেমন লৌকিক সারথির অশিক্ষিত অশ্ব সকল দুষ্টতা করে। আর যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে চালাইতে পটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার ইন্দ্রিয়-রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে, যেমন লৌকিক সারথির সুশিক্ষিত অশ্ব সকল বশে থাকে। বুদ্ধিরূপ সারথি যাহার অপটু হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে না থাকে সুতরাং সে সর্ব্বদাই দুকর্ম্মান্বিত থাকে; এমত সারথির দ্বারা জীবরূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন না, বরঞ্চ সংসাররূপ কষ্টকে প্রাপ্ত হন। যে বুদ্ধিরূপ সারথি নিপুণ হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে অতএব সে সর্ব্বদাই সৎকর্ম্মান্বিত হয়, এমত রূপ সারথির দ্বারা জীবরূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, যে পদকে প্রাপ্ত হইলে পুনরায় জন্ম হয় না।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং। মনু

ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণকারী যে বিষয় তাহাতে প্রবৃত্ত যে ইন্দ্রিয় সকল তাহার সংযমে বিদ্বান্ ব্যক্তি যত্ন করিবেন, যেমন সারথি রথবদ্ধ অশ্বের সংযমে যত্ন করে। যদ্যপিও অন্য অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বিধি আছে কিন্তু পূজা হোমাদি বহির্ব্যাপারের বাহুল্যরূপে বিধি দেন, ইন্দ্রিয়দমনের তৎসাহচর্য্যে বিধি দিয়াছেন। আর আত্মোপাসনাতে তাবৎ বহিঃসাধন না করিলেও বরঞ্চ হয় কিন্তু অন্তরঙ্গ বিধি যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তদ্ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই। পূর্ব্বোক্ত মনুবচনে দ্বিতীয় সাধন লিখিয়াছেন, যে, প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাস তাহাতে যত্ন করিবেন, যে হেতু মনুষ্যের অভ্যাসের দ্বারা অর্থাবগতি শব্দাবলম্বন বিনা হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব এবং একমেবাদ্বিতীয়ং ইত্যাদি শ্রুতির অবলম্বনের দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন।

ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ।
অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মচৈব প্রজাপতিঃ ॥ মনু

তাবৎ বৈদিক কর্ম্ম কি হবন কি যজন স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পায় কিন্তু প্রজাদের পতি যে পরব্রহ্ম তাঁহার প্রতিপাদক যে প্রণব ইহাঁর ক্ষয়, কি স্বভাবত কি ফলত হয় না। এবং

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ।

অর্থাৎ যাঁহার নিয়মে সূর্য্য অগ্নি বায়ু প্রভৃতি স্ব স্ব কার্য্যের লঙ্ঘন ক্ষণমাত্রও করিতে পারেন না, ও যিনি শ্বাস প্রশ্বাস ও ব্রীহিযবাদি সৃষ্টি করিতেছেন। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা অগ্নি সূর্য্য বায়ু ইহাঁরদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে ও ব্রীহিযব ওষধি ও ফলমূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে যে উপকার জন্মিতেছে তাহা সেই পরমেশ্বরকৃত জানিয়া তাঁহার উপকার স্বীকার করি-

বেন। সত্যমেব জয়তে নানৃতং ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ, অর্থাৎ সত্য বাক্যের দ্বারা ইহামুত্র জয়ী হয় মিথ্যা কথনে হয় না, ইহা মনন করিবেন অতএব সত্য বাক্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

যদ্যপিও ইন্দ্রিয়দমনে যত্নবান্ পুরুষের কদাচিৎ স্খলন হয় তবে তাহার শান্তির নিমিত্ত মনস্তাপ পূর্ব্বক দৃঢ় যত্ন করিবেন যে পুনরায় সেরূপ কর্ম্ম তাঁহা হইতে না হয়।

অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ কৃত্বা কর্ম্ম বিগর্হিতং।
তস্মাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ দ্বিতীয়ং ন সমাচরেৎ॥ মনু

অর্থাৎ অজ্ঞানপ্রযুক্ত কিম্বা মোহপ্রযুক্ত গর্হিত কর্ম্ম করিয়া তাহাতে গ্লানি বোধে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার উদ্দেশে পুনরায় সে গর্হিত কর্ম্ম করিবেক না।

এখন আপনাদের মতানুসারে প্রাচীন শ্লোকের দ্বারা এসভাস্থ প্রত্যেক আশীর্ব্বাদ পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

রাজহংসকে যিনি মনোরম শুক্লবর্ণ করিয়াছেন আর শুক পক্ষীকে মনোহর হরিত বর্ণ যিনি করিয়াছেন ও যিনি ময়ূরকে চিত্র বিচিত্র অলংকৃত করিয়াছেন তিনি তোমাদের প্রত্যেকের পালনকর্ত্তা হউন।

সংগীত।

রাগিণী মিশ্র বেলাবতী—তাল কাওয়ালি

ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয়
এ ধরা পানে চাও।
পতিত যে জন করিছে রোদন,
পতিত পাবন তাহারে উঠাও।
মরণে যে জন করেছে বরণ
তাহারে বাঁচাও॥
কত দুখ শোক, কাঁদে কত লোক,
নয়ন মুছাও।
ভাঙ্গিয়া আলয় হেরে শূন্যময়
কোথায় আশ্রয়,
(তারে) ঘরে ডেকে নাও।
প্রেমের তৃষায় হৃদয় শুকায়
দাও প্রেম সুধা দাও॥
হের কোথা যায় কার পানে চায়
নয়নে আঁধার।
নাহি হেরে দিক আকুল পথিক
চাহে চারি ধার।
সে ঘোর গহনে অন্ধ সে নয়নে
তোমার কিরণে আঁধার ঘুচাও।
সঙ্গহারা জনে রাখিয়া চরণে
বাসনা পূরাও॥
কলঙ্কের রেখা প্রাণে দেয় দেখা
প্রতিদিন হায়।
হৃদয় কঠিন হল দিন দিন
লজ্জা দূরে যায়।
দেহগো বেদনা করাও চেতনা,
রেখনা রেখনা এপাপ তাড়াও।
সংসারের রণে পরাজিত জনে
দাও নববল দাও॥

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় উৎসাহকর বাক্যে উদ্বোধন করিলে আবার এই সংগীত হইল।

রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল।

ডুবি অমৃত পাথারে,—
যাই ভুলে চরাচর,
মিলায় রবি শশি।
নাহি দেশ, নাহি কাল,
নাহি হেরি সীমা,
প্রেমমূরতি হৃদয়ে জাগে
আনন্দ নাহি ধরে।

রাগ ভৈরোঁ—তাল একতালা।

তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে?
চাহে না সে তুচ্ছ সুখ ধন মান।
বিরহ নাহি তার নাহিরে দুখ তাপ
সে প্রেমের নাহি অবসান।

স্বাধ্যায় সমাপ্তির পর এই সংগীত হইল

রাগিণী দেশী টোড়ি—তাল চিমা তেতালা।

তবে কি ফিরিব ম্লান মুখে সখা,
জর জর প্রাণ কি জুড়াবে না।
আঁধার সংসারে আবার ফিরে যাব ?
হৃদয়ের আশা পূরাবে না ?

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

অসীম কাল সাগরে ভুবন ভেসে চলেছে,
অমৃত ভবন কোথা আছে তাহা কে জানে।
হের, আপন হৃদয় মাঝে ডুবিয়ে,
এ কি শোভা! অমৃতময় দেবতা সতত
বিরাজে, এই মন্দিরে সুধা-নিকেতন।

অনন্তর ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

অদ্য এই পুণ্য মাঘের একাদশ দিবসের শুভ্র প্রাতঃকালে পরম করুণাময় পরমেশ্বর—আমাদের চিরন্তন পিতা মাতা সুহৃৎ—আমাদের সকলের প্রতি তাঁহার প্রেমের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আমাদিগকে এখানে একত্র করিয়াছেন। পক্ষী যেমন শাবকদিগের উপর পক্ষ বিস্তার করে সেইরূপ তিনি আমাদের উপর তাঁহার মঙ্গল ছায়া বিস্তার করিয়া এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অদ্য আইস আমরা এক মনে একপ্রাণে হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করি। আমাদের সকলের মন একমন হউক্—সকলের প্রাণ এক-প্রাণ হউক্—সকলের হৃদয় এক-হৃদয় হউক্ এবং সেই একতান মন-প্রাণের প্রজ্জ্বলিত অনুরাগ-শিখা পরমাত্মাতে সমর্পণ করি। অতলস্পর্শ আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হই। উদাত্ত সূর্য্যের সমক্ষে যেমন রজনীর ঘোর অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না, সেইরূপ সেই প্রেমময়ের প্রেমমুখের জ্যোতিতে—করুণা-সিন্ধুর করুণা-সমীরণে, সংসারের যতপ্রকার পাপ-তাপ-কুজ্ঝটিকা সমস্তই এখান হইতে তিরোহিত হইয়া যাউক্। অদ্য পরমাত্মার প্রেম-নিশ্বাসের সহিত আমাদের হৃদয়ের অভাব-নিশ্বাস চির-বিচ্ছেদ-জনিত সন্তাপ-বাষ্প—মিলিত হইয়া তাঁহাকে যখন আমাদের হৃদয়-ধামে আনয়ন করিবে, ইহজীবনে আর-যেন আমরা তাঁহাকে বিদায় দিবার অবসর না পাই, সংসারের মোহ-মরীচিকাতে আর যেন আমরা প্রতারিত না হই, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর-যেন আমরা শোকে তাপে ভয়ে বিহ্বল হইয়া দীন-ভাবে ক্রন্দন না করি। তিনি যখন জগতে আছেন তখন জগৎ আমাদের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল করিতে পারিবে না, আমাদের শত্রু-মিত্র সকলেই আমাদের উপর মঙ্গল বর্ষণ করিবে; তিনি যখন আমাদের হৃদয়ে আছেন তখন হৃদয়ের গভীর বেদনা ও আনন্দের উচ্ছ্বাস উভয়ই আমাদের মঙ্গল। ঈশ্বর আপন হস্তে আমাদিগকে যাহা দেন তাহাই অমৃত। যে ব্যক্তি তাঁহার করুণা জানে না সেই কেবল এ কথায় সংশয়ান্বিত হয়। মাতার প্রদত্ত অন্নের প্রতি বালকের সংশয় কি ভয়ানক! পতি-পত্নীর পরস্পারের প্রীতির প্রতি পরস্পরের সংশয় কি ভয়ানক। ঈশ্বরের প্রেমের প্রতি, মঙ্গল-ভাবের প্রতি, সংশয় তাহা অপেক্ষা অল্প ভয়ানক নহে, অধিক ভয়ানক! ঈশ্বর যদি আমাদের অমঙ্গল করেন, তবে আমাদের পলাইবার উপায় নাই,—তাহা হইলে এই দণ্ডে আমাদের বিনাশই শ্রেয়;—কিন্তু তাহা কি কখন সম্ভবে? মঙ্গল তাঁহার নাম, মঙ্গল তাঁহার ধাম, মঙ্গল তাঁহার কার্য্য, তিনি মঙ্গল-নিদান, অমঙ্গলের লেশ-মাত্রও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা যে, পরম করুণাময় পিতার স্নেহময় মাতার প্রেমময় বন্ধুর মঙ্গল-ভাবের প্রতি সংশ-

য়াম্বিত হই ইহাই অমঙ্গল, দ্বিতীয় অমঙ্গল জগতে নাই; এ অমঙ্গলের মূল ঈশ্বর নহেন, কিন্তু আমরা আপনারা। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এ অমঙ্গলের ঔষধ, ইহার দ্বিতীয় ঔষধ জগতে নাই। প্রাণ-স্বরূপ পরমাত্মা যদি আমাদের হৃদয়ে না থাকেন তবে আমরা মৃত, মৃত ব্যক্তির মঙ্গলই বা কি অমঙ্গলই বা কি? প্রাণ-স্বরূপ পরমাত্মা যদি আমাদের সমাজে না থাকেন তবে, এ সমাজ মৃত, মৃত সমাজের মঙ্গলই বা কি আর অমঙ্গলই বা কি? প্রাণ-স্বরূপ পরমাত্মা যদি আমাদের দেশে না থাকেন, তবে এ দেশ মৃত, মৃত দেশের মঙ্গলই বা কি আর অমঙ্গলই বা কি? প্রাণ-স্বরূপ পরমাত্মা যদি জগতে না থাকেন তবে এ জগৎ মৃত, মৃত জগতের মঙ্গলই বা কি আর অমঙ্গলই বা কি? কিন্তু প্রাণ-স্বরূপ পরমাত্মা যখন সমস্ত জগতে বর্ত্তমান আছেন এবং আমাদের প্রতিজনের আত্মাতে বর্ত্তমান আছেন, তখন আমাদের মঙ্গলের আর সীমা নাই, অমঙ্গলের তিলমাত্রও স্থান নাই, তাই আজ আমাদের মহোৎসব; অদ্য প্রাতঃকাল হইতে মঙ্গল-সঙ্গীত উত্থিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত ধ্বনিত করুক্ ও যাবৎ না রজনীর প্রশান্ত গম্ভীর হৃদয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া প্রসুপ্তির স্বর্গধামে বিলীন হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত আমাদের কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করুক্।

হে পরমাত্মন্! তোমার উৎসবের তুমিই অধিনায়ক, তুমিই অধিরাজ—অধিদেবতা; তুমি আমাদের হৃদয়ের উৎসব-সিংহাসনে অধিরোহণ কর, আমাদের সকল শুভ কার্য্যের নেতা হও। তুমি আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে আসীন হইলে আমাদের হৃদয়ের দুঃখ-রজনী অবসান হইবে, তুমি আমাদের দেশের সিংহাসনে আসীন হইলে আমাদের দেশ চির-রজনীর অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া আনন্দের বিমল প্রভাত অবলোকন করিবে; আমাদের এই দীন হীন নির্ব্বীর্য্য হৃদয়ে—দীন হীন নির্ব্বীর্য্য দেশে—তোমার করুণাই আমাদের একমাত্র সম্বল।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর এই সমস্ত সংগীত গীত হইল।

রাগিণী রামকেলী—তাল ঝাঁপতাল।

দুখ দূর করিলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ!
সপ্ত লোক ভুলে শোক তোমারে চাহিয়ে
কোথায় আছি আমি দীন অতি দীন।

রাগিণী বেলাবলী—তাল কাওয়ালি।

দেখা যদি দিলে ছেড়োনা আর,
আমি অতি দীন হীন।
নাহি কি হেথা পাপ মোহ
বিপদ রাশি?
তোমা বিনা একেলা
নাহি ভরসা।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

দাও হে হৃদয় ভরে দাও।
তরঙ্গ উঠে উথলিয়া সুধাসাগরে
সুধারসে মাতোয়ারা করে দাও।
যেই সুধারস পানে ত্রিভুবন মাতে
তাহা মোরে দাও।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

সখা মোদের বেঁধে রাখ প্রেম ডোরে।
আমাদের ডেকে নিয়ে চরণ তলে বাধ' ধরে।
বাঁধ হে প্রেম-ডোরে।
কঠোর পরাণে কুটিল বয়ানে
তোমার এ প্রেমের রাজ্য রেখেছি আঁধার করে।
আপনার অভিমানে দুয়ার দিয়ে প্রাণে
গরবে আছি বসে চাহি আপনা পানে।
বুঝি এমনি করে হারাব তোমারে
ধূলিতে লুটাইব আপনার পাষাণভারে।
তখন কারে ডেকে কাঁদিব কাতর স্বরে।

রাগিণী প্রভাতী—তাল একতালা।

এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,

প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।

চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে!

তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ,
অভাগা দেশেরে হয়োনা বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।

দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান
লাজে নতশির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান
লাজমান আর থাকে না!

হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া
তোমারেও তাই গিয়েছে ভুলিয়া,
দয়াময় বলে আকুল হৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না।

তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ হীনতা, পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এ দেশ থাকে না।

তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য ভবনে,
কি সৌরভ সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ গান উঠিত গগনে,
কি প্রতিভা-জ্যোতি জ্বলিত!

ভারত অরণ্যে ঋষিদের গান
অনন্ত সদনে করিত প্রয়াণ
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত!

আজ কি হয়েছে চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুখ ঘুচাও,
মোরা ত রয়েছি তোমারি সন্তান
যদিও হয়েছি পতিত।

এবার অপরাহ্নে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে ব্রহ্মোৎসব হইয়াছিল। এই সময় কীর্ত্তন ও ধর্ম্মালোচনা হয়। তৎকালে এক জন সুপণ্ডিত পরম হংস ঈশ্বরপ্রসঙ্গে দার্শনিক গভীর তত্ত্ব সকল অতি সরল ভাবে লোকের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেন। উপদেশ অতি সারগর্ভ ও হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল। ইহার পর কীর্ত্তন হয়। আমরা কীর্ত্তনের বিলক্ষণ পক্ষপাতী কিন্তু বর্ত্তমানে কীর্ত্তন সুরুচিসঙ্গত হয় না বলিয়া এত দিন তাহাতে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারের এই প্রাচীন প্রথা রক্ষা করা এবং তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা আবশ্যক। বলিতে কি, আমরা তদ্বিষয়ে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়াছি। এক জন সুপ্রসিদ্ধ প্রধান কবি পদ রচনা করিয়াছেন এবং এক জন উৎকৃষ্ট গায়ক তাহা গান করিয়াছিল। ফলত শ্রোতৃগণের মধ্যে কেহই এই হৃদয়হারী সুমধুর কীর্ত্তন শুনিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ইহার পর ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করা গেল।

“অন্ধকার জগতের যিনি আলোক, যিনি হৃদয়ের প্রিয়ধন—সন্তাপহরণ, তিনিই আমাদের উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহাকে লইয়াই আমাদের উৎসব। এই মৃত্যুর প্রতিকৃতি অধস্থ মর্ত্ত্যলোকে এমন কি পদার্থ আছে যাহাকে লইয়া আমরা প্রকৃত উৎসব করিতে পারি? এখানে যাহাকে লইয়া অদ্য মহামহোৎসব—কল্য তাহাকে লইয়াই অশ্রুপাত ও হাহাকার। এখানকার সম্পদ, বিপদে, ও সুখ, দুঃখে পরিণত হয়। “সম্পদ তড়িত-সমান, উন্মীলি নিমীলয়ে”। এখানকার কমল মুদিত হইবার জন্যই প্রস্ফুটিত

হয়। এখানে এক জন কত কষ্টে বিদ্যা উপার্জ্জন করিল, কঠোর হইতে কঠোরতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ধনসম্পদের মুখ দেখিল—স্ত্রী পুত্র পরিবারে পরিবৃত হইয়া সুখের উৎসব-ক্ষেত্রে যেমন অবতরণ করিল, অমনি হয়ত নৃশংস মৃত্যু আসিয়া তাহার সুখের সংসার হইতে তাহাকে অপসারিত করিল—তাহাকে তাহার পরিশ্রমের ফল-ভোগে বঞ্চিত করিল। এখানে কি ক্লেশেই জননী তাঁহার শিশু সন্তানকে মানুষ করেন! যে শিশু তাঁহার বক্ষের ধন—চক্ষের আলোক শোকে সান্ত্বনা—যাঁহার মুখশ্রীতে হয়ত তিনি তাঁহার পরলোকগত প্রিয়পতির মুখ-চ্ছবি দেখিতে পান—সেই প্রাণসম সন্তান-কেই নিষ্ঠুর কাল তাঁহার হৃদয় হই-তেই ছিন্ন করিয়া লইতেছে। হায় কি গভীর সে বিষাদ! জননী অন্ধ হইলেন। ঐ দেখ সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার প্রিয় স্বামীকে যত্নের সহিত আহার করাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিদায় দিয়া আশাপথ চাহিয়া রহিলেন—তাঁহার ভাগ্যে আর প্রিয়-সমাগম লাভ হইল না। দম্পতির কি ঘোর মনস্তাপ। সেই কুল-লক্ষ্মী যিনি গৃহের শ্রীস্বরূপা—সংসারের আলোক, যাঁহার মধুর বচনে ও প্রিয় ব্যবহারে সংসার স্বর্গধাম হইয়াছিল, হায়! নিমেষ মধ্যেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন রঙ্গভূমির আলোক নির্ব্বাণ হইল। সহসা সংসার যেন বিষাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। এখানে মনুষ্য রোগ দারিদ্রদুঃখ ও পরাধী-নতায়-কি ক্লেশই না অনুভব করে। যিনি দুঃখের দুঃখী, যাঁর হৃদয় আছে, তিনিই জা-নেন রোগ দারিদ্রদুঃখ ও পরাধীনতা পৃথি-বীর মুখকে কেমন ম্লান করিয়া রাখিয়াছে। এইত এই সংসার। তার উপরে এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যের প্রতি—এক জাতি অন্য জাতির প্রতি পিশাচবৎ ব্যবহার ও নানা প্রকার পাপাচার করিয়া পৃথিবীর মলিন মুখকে আরো মলিনতর করিয়া তুলিয়াছে। বল এ সংসারে এ কঠোর শিক্ষাস্থানে কাহাকে লইয়া উৎসব করিবে—কোথায় গিয়া শান্তি লাভ করিবে? আমাদের উৎসবের বস্তু বাহিরে নাই—অন্তরে। সংসারে নাই—সংসারের পরপার সেই ব্রহ্মধামে। সেই শান্তিপূর্ণ অমৃত নিকেতনে। পরমপিতা পরমেশ্বরই আমাদের অমৃত নিকেতন। তাঁ-হাকে ছাড়িয়া উৎসব কোথায়? আনন্দ কোথায়? "হা যাবে কোথা আর পিতা হোতে; আপন গৃহ ছেড়ে সুখ শান্তি পাইবে কোথা। সকলি সুধাময় যখন তাঁর সাথ, ভয় তাপ কি থাকে সে অমৃত নিকেতনে পা-ইলে, সংসার যাতনা সব ভুলে যাই।"

যদি যথার্থই ব্রহ্মোৎসব ভোগ করিতে চাও—শান্তির প্রয়াসী হও, তবে তাঁহার নিকটে চল—তাঁহার প্রেমে নিমগ্ন হও! ব্রহ্ম-প্রীতির অগ্নিতে সংসার-আসক্তিকে দগ্ধ কর। সেই প্রেম হৃদয়ে জাগিলেই আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে এবং সকল সুখই লাভ হইবে। আমরা কি সেই প্রেমের ভি-খারী হইব না? তাঁর নিকটে কি সেই পবিত্র স্বর্গীয় প্রেম ভিক্ষা করিব না? আমাদের প্রার্থনার কি বল নাই? "ব্রহ্মকৃপা হি কে-বলং" মন্ত্র কি আমরা জীবনে সাধনা করিব না? তাঁর কৃপায় কি না হইতে পারে? যেমন একটুকু বসন্তের বায়ু প্রবাহিত হইলে বহিতে পর্ব্বত-বক্ষেও কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হয়—তেমনি তাঁর কৃপা-পবন বহিবা মাত্রেই আ-মাদের পাষাণসমান হৃদয়েও প্রেমের কুসুম ফুটিয়া উঠে। তিনি আমাদিগকে প্রেম-দান করিবার নিমিত্ত নিয়তই আহ্বান করি-তেছেন—আমরা যেন তাঁর মধুর আহ্বানে বধির না হই। আমরা যাহাতে তাঁহার সেই প্রেম-রাজ্যে যাইতে পারি, তার জন্য

তিনি নিজেই সেতু স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। সে সেতুর ও পারে দিন রাত্রি যাইতে পারে না। কালের নিশ্বাসে তথায় প্রেমের কুসুম শুষ্ক হয় না। সেখানে জরা মৃত্যু শোকও উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে না।

"সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।
নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যু র্নশোকঃ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পরে আবার কীর্ত্তন হইতে লাগিল।

রাত্রি উপস্থিত। শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গৃহ দীপালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বৃহৎ প্রাঙ্গণের চতুঃসীমায় প্রত্যেক স্তম্ভে পত্র পুষ্পের নানা রূপ রচনা এবং প্রাঙ্গণের উপান্ত ভাগে নানা প্রকার বৃক্ষ অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। উচ্চ স্থানে আচার্য্যদিগের রক্তপট্টমণ্ডিত মাল্যশোভিত বেদি, এবং তাহার সম্মুখের সোপানে দুইটী বৃহৎ ধাতুময় স্তম্ভের শাখায় শাখায় আলোক। সোপানশ্রেণীর উভয় পার্শ্বে বিচিত্র পত্র ও পুষ্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ কৃত্রিম উদ্যানের শোভা বিস্তার করিয়াছিল। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে পত্রপুষ্পখচিত সুদৃশ্য সঙ্গীতবেদি। দেখিতে দেখিতে এই সভামণ্ডপ লোকারণ্য হইয়া উঠিল। সকলেই ব্রহ্মোৎসব উপভোগের জন্য একান্ত সমুৎসুক। ইত্যবসরে গায়কেরা এই সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

ডাকি তোমারে কাতরে, দয়া কর দীনে,
রাখহে রাখহে অভয় চরণে।
ধন জন তুচ্ছ সকলি সকলি মোহমায়া,
বৃথা বৃথা জানিছে, প্রাণ চাহে যে তোমা পানে।

অনন্তর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশটী পাঠ করিবেন।

জগৎ যদিও এক—কিন্তু দুই রূপ দৃষ্টিতে তাহার দুইরূপ মূর্ত্তি নয়নগোচর হয়। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে জগৎ একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র বলিয়া মনে হয়. ও মনে হয় যে, আমরা সকলেই—সকল জীব—সকল বস্তু—সেই এক মহাযন্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সকলই এক মহৎ সেই যন্ত্র-বলের তুমুল তাড়নায় বিভ্রান্ত হইয়া চলিতেছে। সে যন্ত্র এক মুহূর্ত্তও থামিয়া থাকে না,—অনাদি কাল হইতে তাহা চলিয়াছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাহা চলিবে। বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় যে, বাদ্য-যন্ত্র হইতে যেমন একে একে সুর বিনির্গত হয় সেইরূপ জগৎযন্ত্র হইতে প্রাণ মন বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম সমস্তই যথানিয়মে বিনির্গত হইতেছে। বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিলে জগতের কোন লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না—মনে হয় যে, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কেবল এক অন্ধ ভৌতিক আকর্ষণের উপর লম্বমান রহিয়াছে—যে আকর্ষণে পর্ব্বত হইতে হিমশিলা দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে নিম্নে নিপতিত হয়, সে সেই আকর্ষণ—তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। অন্তর্দৃষ্টিবিহীন দর্শক যতই চিন্তা করেন, ততই তাঁহার নেত্র-সমক্ষে বিশ্বসংসারের এক ঘোর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি জাগরুক হইয়া উঠে—সে মূর্ত্তি ভীষণ শ্মশানের মূর্ত্তি—কালের করাল মূর্ত্তি! সে মূর্ত্তির বিশাল বক্ষের উপর—পঞ্চভূতের উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য, শূন্যগর্ত্ত আমাদের গগনভেদী হোহো ধ্বনি, দুঃখশোকের হৃদয়ভেদী হাহাকার, বলবানের দর্প আস্ফালন তাড়না ভর্ৎসনা ও উৎপীড়ন, বলহীনের শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন চিত্ত ও সর্ব্বসহিষ্ণুতা—এই এক জাগ্রত দুঃস্বপ্ন নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে।

এই জগৎকে আবার অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে—জগতের অতি-এক সুন্দর পবিত্র আনন্দদায়িনী মূর্ত্তি আমাদের নয়নে আবির্ভূত হয়; তখন জগতের শত-কঠিন সহস্র-

কঠিন বন্ধন-সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়া সকল দিক্ হইতেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের অপ্রতিম আনন্দ-জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে; এবং সেই জ্যোতির অভ্যন্তরে যে এক মহত্তম শোভন দৃশ্য আবির্ভূত হয় তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন,

ওমিতি ব্রহ্ম সর্ব্বেহস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে"।

পরমাত্মা মধ্যস্থলে বিরাজমান এবং সকল দেবতা তাঁহার পূজা আহরণ করিতেছেন—সকল দেবতা তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। রিপুগণের কঠোর বন্ধন ও প্রবল তাড়না যাঁহাদের সহিয়া গিয়াছে, সেই জড়ের উপাসকেরা জগতের পূর্ব্বকথিত ভৌতিক মূর্ত্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা এই সংসারের বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও আত্মার অভ্যন্তরে এক বিন্দুও মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছেন, যাঁহারা সংসারের দারুণ বিভীষিকার মধ্যে থাকিয়াও আত্মার অভ্যন্তরে এক বিন্দুও মঙ্গলের জ্যোতি অবলোকন করিয়াছেন, যাঁহারা সংসারের ভ্রাম্যমাণ আবর্ত্তের মধ্যে থাকিয়াও আত্মার অভ্যন্তরে এক মুহূর্ত্তও শান্তি-নিকেতনের আশ্রয় পাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, পরমাত্মাকে ছাড়িয়া এ জগৎ কিছুই নহে, কেবল এক তুমুল কোলাহল—নিস্ফল আড়ম্বর—অমূলক উপন্যাস—নিরর্থক পণ্ডশ্রম—ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁহারা জগতের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া অন্তর্দৃষ্টিতে পরমাত্মাকে অবলোকন করেন, তাঁহাদের পিপাসু কর্ণে প্রস্তরপাষাণও গভীর জ্ঞানের বাক্য উচ্চারণ করে, তাঁহাদের তৃষিত নেত্রে বালুকাময় মরুভূমিও প্রেমানন্দে গলিয়া পরমাত্মার মুখচ্ছবির দর্পণ হইয়া উঠে। বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেম পবিত্রতা সত্য-মঙ্গল বিমল আনন্দ—ইহাই জগতের সারাংশ—ইহাই মনুষ্যত্বের সারাংশ, এবং পরমাত্মা ইহারই চিরপ্রস্রবণ। জগতের ভিতরকার এই সারাংশ ছাড়িয়া দিলে জগতের কি আর অবশিষ্ট থাকে—মনুষ্যত্বেরই বা কি অবশিষ্ট থাকে? জগতের ধূলিময় বাহ্য আবরণ এবং মনুষ্যের অস্থি-চর্ম্ম শোণিত-মজ্জা কিই এমন বহুমূল্য সামগ্রী যে, আত্মার বিনিময়ে—অনন্ত জীবনের বিনিময়ে—সেই সকল উপার্জ্জন না করিলেই নয়? আত্মার মূল্য কি এতই যৎসামান্য যে, তাহার বিনিময়ে পৃথিবীর ধূলি-রাশি ক্রয় করিতে কিছুমাত্র ক্ষতি-বোধ করিব না? আত্মা যে কি পদার্থ তাহার প্রতি কি এখনো আমাদের চক্ষু ফুটে নাই? মনুষ্যের ভিতরে যে এক জ্যোতির্ম্ময় মনুষ্য জাগিতেছে—সেই মনুষ্যই আত্মা;—সেই দিব্য মনুষ্যের পদতলে রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু দলিত-দলিত হইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে পড়িয়া রহিতেছে; তাঁহার সম্মুখে মুক্তির দ্বার—জ্যোতির্ম্ময় জীবনের পথ—শান্তির নিকেতন—উন্মুক্ত রহিয়াছে,—তাঁহার অন্তরে বিমল আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে। যদি তুমি জান যে, আমি অমর পুরুষ, তবে কি ইচ্ছা করিয়া—কিসের জন্য—শরীরের পশ্চাৎ জরা-জীর্ণ হইবে? অমৃত আত্মা কেন মৃত শরীরের সহিত তন্ময়ীভূত হইয়া দীন-ভাবে ক্রন্দন করিবে। শরীর জরা-জীর্ণ হইয়া ধূলি-সাৎ হইয়া যাউক্—আত্মার তাহাতে কি ক্ষতি? আত্মা অনন্ত জীবন লইয়া—অনন্ত উন্নতি ও উৎসাহ লইয়া—পরমাত্মার সহিত অনন্ত আনন্দ-সাগরে প্লাবিত হইবে। অতএব

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"।

উত্থান কর জাগ্রত হও, আচার্য্য-সমীপে গিয়া, জ্ঞান লাভ কর "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি" ক্রবিন্না

বলেন যে, সে পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষেরা আমাদিগকে সেই পথে আহ্বান করিতেছেন—শুন তাঁহারা কি বলিতেছেন।

"ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ।"

ওঁ বলিয়া পরব্রহ্মকে ধ্যান কর—তোমাদের মঙ্গল হউক—নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান-তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও।" এই মধুর আহ্বান ধ্বনি শুনিয়া কোন পাষাণ হৃদয় না উত্তেজিত হইবে? আমাদেরই জন্য আমাদের পিতৃপুরুষেরা হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে এই এক অবিনশ্বর আলোক জ্বালিয়া রাখিয়াছেন—

"ওঁ ইতি ব্রহ্ম সর্ব্বেস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি।"

ইনি ওঙ্কার ইনি ব্রহ্ম সকল দেবতা ইঁহার পূজা আহরণ করিতেছেন। অদ্যকার এই শতাব্দীতে এই আলোক পৃথিবীর প্রান্তস্থ ভূমির শত শত বিস্মৃত নেত্র আকর্ষণ করিতেছে,—এত নিকটের বস্তু যে, ভারতভূমি, তাহাই কি কেবল ঐ আলোকের স্বর্গীয় মাহাত্ম্যের প্রতি অন্ধ থাকিবে? কি দুঃখ—কি সাংঘাতিক বিকার। জান না কি—কে আমাদের নির্জীব কর্ণ-কুহরে এখনো এই জ্বলন্ত বাক্য ধ্বনিত করিতেছে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" উত্থান কর, জাগ্রত হও, আচার্য্য-সমীপে গিয়া জ্ঞান লাভ কর!" জান না কি কাহার এই শান্তি-ময় কল্যাণ-ময় স্নেহ-ময় আহ্বান-ধ্বনি "ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ" ওঁ বলিয়া পরমাত্মাকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান-তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও? জান না কি যে, এই স্নেহ-ময় কল্যাণ-ময় আহ্বান-ধ্বনি আমাদের আদিম পিতৃপুরুষদিগের বাষ্পগদ্গদ কাতর কণ্ঠ হইতে উদ্গীরিত হইতেছে! আর্য্যকুলের আবাস-ভূমি আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমি যদি সত্য-সত্যই ভারত-ভূমি হয়, আজ তবে অচেতন তরুলতা কাষ্ঠ পাষাণ পর্যন্তে তাঁহাদের সেই মঙ্গল-পূর্ণ আহ্বান-ধ্বনি দেশ দেশান্তরে প্রতি-ধ্বনিত করিবে; সমস্ত ভারত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিবে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" উত্থান কর জাগ্রত হও, তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" সেই এক পরমাত্মাকে জান—অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর—তিনিই অমৃতের সেতু। যখন সমস্ত ভারতবাসী একপ্রাণে এই সকল মৃতসঞ্জীবনী বাণী উচ্চারণ করিবে সেই শুভ-দিনের প্রতীক্ষায় ভারত-ভূমির হৃদয়-প্রাণ ক্রন্দন করিতেছে—ঈশ্বর করুন্ যে সেই আনন্দের দিন অচিরে ভারত-বাসীদের শোকাশ্রুবিন্দু-সকলকে প্রভাতকিরণে রঞ্জিত করুক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

সংগীত।

রাগিণী হাম্বীর—তাল চৌতাল।

এসেছে সকলে কত আশে, দেখ চেয়ে
হে প্রাণেশ, ডাকে সবে ঐ তোমারে।
এস হে মাঝে এস কাছে এস,
তোমায় ঘিরিব চারি ধারে।
উৎসবে মাতিবহে তোমায় লয়ে
ডুবিব আনন্দ পারাবারে।

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা

এ মোহ আবরণ খুলে দাও দাও হে।
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি, চাও হৃদয় মাঝে চাও হে।

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে!
ডাকিতে এসেছি তাই, চল' ত্বরা করে।
তাপিত-হৃদয় যারা মুছিবি নয়নধারা,
ঘুচিবে বিরহ তাপ কতদিন পরে।

আজি এ আকাশ মাঝে কি অমৃত বীণা বাজে।
পুলকে জগৎ আজি কি মধু শোভায় সাজে!
আজি এ মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে,
তাঁহার সে প্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে।

রাগিণী মিশ্র মল্লার—তাল রূপক।

চলেছে তরণী প্রসাদ পবনে,
কে যাবে এসহে শান্তি ভবনে।
এ ভব সংসারে ঘিরিছে আঁধারে,
কেনরে ব'সে হেথা ম্লান মুখ।
প্রাণের বাসনা হেথায় পুরে না,
হেথায় কোথা প্রেম কোথা সুখ!
এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল,
এ দুখ শোকানল দূরে যাক্,
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে
চলরে শুনে চলি তাঁর ডাক,
বিষয় ভাবনা লইয়া যাব না,
তুচ্ছ সুখ দুখ পড়ে থাক্।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে
তখন কার মুখ চাহিবে!
সাধের ধনজন দিয়ে বিসর্জ্জন,
কিসের আশে প্রাণ রাখিবে।

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

এ পরবাসে রবে কে হায়!
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে।
হেথা কে রাখিবে দুখ ভয় সঙ্কটে
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে, হায়রে।

রাগিণী কেদারা—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি ধন্য ধন্যহে, ধন্য তব প্রেম,
ধন্য তোমার জগত রচনা।
এ কি অমৃতরসে চন্দ্র বিকাশিলে,
এ সমীরণ পূরিলে প্রাণ হিল্লোলে।
এ কি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে,
কুসুমবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে।
এ কি গভীর বাণী শিখালে সাগরে,
কি মধুগীতি তুলিলে নদী কল্লোলে।
এ কি ঢালিছ সুধা মানব হৃদয়ে,
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে।

রাগিণী কামোদ—তাল ধামার

দুয়ারে বসে আছি প্রভু সারা বেলা,
নয়নে বহে অশ্রুবারি।
সংসারে কি আছে হে হৃদয় না পুরে,
প্রাণের বাসনা প্রাণে লয়ে,
ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে।
সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে
বিমুখ হোয়ো না দীন হীনে
যা' ক'র হে রব পড়ে।

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

"যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ"

কর্ম্মিরা বিষয়ানুরাগে যাঁহাকে জানিতে পারেন না।

শ্রৌত কর্ম্মে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা, অপ্রতিম ব্রহ্মের প্রতিমা করিয়া পূজা করা এবং নিরীশ্বর সংসারের সেবা করা একই কথা। এ সকলই প্রেয়ের কুটিল পথ—মোহের অনাবৃত দ্বার। যাঁহারা মুক্তির আকাঙ্ক্ষী, যাঁহারা জ্ঞানে প্রেমে এবং ব্রহ্মানন্দে আপনাকে পরিশোভিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা শ্রেয়ের পক্ষপাতী, তাঁহারা উক্ত ত্রিপথাবলম্বীদিগের মধ্যের কেহই নহেন। তাঁহারা উক্ত তিন প্রকার পথকেই পরিত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধ জ্ঞানে আপনার আত্মাতে পরমাত্মাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতি দ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন। ব্রহ্ম সাধনার বিষয়; তপস্যা ও আলোচনার দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হইলে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু মন্ত্রময়ী দেবতার উদ্দেশে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, অপ্রতিম ব্রহ্মের স্থানে কল্পিত দেবদেবীর প্রতিমার পূজা আত্মজ্ঞান লাভের প্রতিবন্ধক। নিরীশ্বর সাংসারিকেরা তো সর্ব্বাপেক্ষা কৃপাপাত্র। তাহাদের অনুরাগ কেবল পৃথিবীর সম্পত্তির উপর। তাহাদের

নিকট পরকাল প্রতিভাত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্ম যেমন আপন জীবনের তাবৎকার্য্যেই— তাঁহার বহিঃক্ষেত্রে, তাঁহার ভোজনে শয়নে, তাঁহার গমনে উপবেশনে, তাঁহার স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনে এক মাত্র ঈশ্বরেরই ইচ্ছা ও আদেশ দেখিতে পান এবং তাঁহার অধীনে থাকিয়া তাহা পালন করেন, তাহারা তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহারা একমাত্র ইন্দ্রিয়-সেবাকেই সুখ-প্রাপ্তির হেতু জানিয়া মহামোহে মুগ্ধ হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের গোচর যাহা, ইন্দ্রিয় তাহাই মনুষ্যকে আনিয়া দিতে পারে। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতে তাহার কি অধিকার? ইন্দ্রিয়গোচর এই যে বিষয়-সকল ইতস্তত নিরীক্ষণ করি, তাহা স্থূল ও পরিমিত। ইন্দ্রিয়াতীত যাহা তাহা অনন্ত, সত্য ও সুখস্বরূপ। তাহাই ভূমা পরমেশ্বর। যে মনুষ্য সেই সুখস্বরূপকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে চায়, হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে চায় এবং কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিতে চায়, সে কি ভ্রান্ত! সে জলভ্রমে মৃগতৃষ্ণিকার কণ্টকময় ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া আপনার বক্ষকে ক্ষত বিক্ষত করে। অতএব তপস্যা ও জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা সত্য-জ্ঞান-মঙ্গল স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান উপার্জ্জন করিবেক। ব্রহ্মজ্ঞানে অনুরাগশূন্য হইয়া ইহামুত্র কোন প্রকার বিষয়ানুরাগেই আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিবেক না। বেদে আছে "নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উকথশাসশ্চরন্তি" যাজ্ঞিকেরা অজ্ঞানরূপ নীহারে প্রাবৃত হইয়া এবং মিথ্যা জল্পনাতে গর্ব্বিত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন। রসনাতৃপ্তিকর অন্নপানে পুষ্ট হইয়া, নয়নসুখকর বস্ত্রাভরণে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহাদের প্রবৃত্তির যে বিশ্রাম হয় তাহাই তাঁহাদের প্রাণের তৃপ্তি। শত বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু লাভ, পুত্র পশু প্রভৃতি গৃহশ্রী, ধন ধান্য স্বর্ণ প্রভৃতি সম্পত্তি, দাস দাসী প্রভৃতি পরিচারক এবং মহারাজ্যের মহদায়তন প্রাপ্তি তাঁহাদের কামনার পরিসমাপ্তি। তাঁহাদের দৃষ্টি ঐশ্বর্য্যের প্রতি এবং এই ঐশ্বর্য্যের কামনা পূর্ণ করাই তাঁহাদের স্বর্গবাসের অভিসন্ধি। ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং ব্রহ্মানন্দ তাঁহাদের লক্ষ্য নহে।

যিনি যজ্ঞাদিকর্ম্মবিহীন হইয়া, বিষয়ানুরাগশূন্য হইয়া এবং প্রতিমায় ব্রহ্মবুদ্ধি না করিয়া স্বীয় আত্মাকে জানিতে পারেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া আপনার মুক্তির পথ পরিষ্কার করিতে পারেন এবং মঙ্গলময় ব্রহ্মের প্রসাদে অনন্ত জীবন লাভ করিয়া স্থায়ী সুখে, স্থায়ী আনন্দে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জন্মের সফলতা সম্পাদন করেন।

হে পরমাত্মন্। এই পৃথিবীতে মনুষ্যেরা মোহবশত সরল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যাইয়া তোমার অস্তিত্বে ও স্বরূপে নানা প্রকার সংশয় আনয়ন করিয়াছে। কেহ বা তোমার সত্য স্বরূপ একেবারে অস্বীকার করে। কেহ বা জড়ে ও প্রতিমাতে তোমার রূপ কল্পনা করিয়া সত্যের প্রতি মিথ্যার জল্পনা সমুত্থান করে। তোমার সকৃৎজ্যোতি, সনাতন সত্যজ্ঞান, সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সততই যে মনুষ্য-বুদ্ধিতে আগমন করিতেছে, ভ্রমান্ধ লোকেরা তাহা দেখিতে না পাইয়া দুঃখ বিষাদে জর্জ্জরিত হইতেছে। করুণাময় বিধাতঃ! তুমি আমাদের স্বজাতির এই দুর্দ্দশা মোচন করিয়া দাও। তোমার সত্য-জ্ঞান সমস্ত মোহ-অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া মনুষ্য-হৃদয়ে প্রকাশিত হউক। তোমার শান্তিতে সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া পৃথিবী শীতল হউক। তোমার মঙ্গলে প্রত্যেক গৃহ পরিপূর্ণ হউক। তুমি মনুষ্যের আত্মাতে জীবন্ত রূপে প্রকাশিত থাক, তোমার নিকটে আমাদিগের এই প্রার্থনা।

ব্রাহ্ম বন্ধুগণ! অদ্য আমাদের পঞ্চপঞ্চাশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবের দিন। আমরা অদ্য পর্য্যন্ত পঞ্চ পঞ্চাশ বার ঈশ্বরের প্রসাদে এই মহোৎসবে যোগ দিলাম। পঞ্চ পঞ্চাশ বার ঈশ্বরের অযাচিত করুণা, মঙ্গল-বারি আমাদের মস্তকে বর্ষিত হইল কিন্তু আমরা আমাদের সেই প্রাণসখার জন্য কত দূর প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিলাম? কত দূর স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে পারিলাম? তাঁহার নাম প্রচারে, স্বদেশের মঙ্গল সাধনে আমরা কত দূর সরল মনে শ্রম স্বীকার করিতে সক্ষম হইলাম? যদি একবার আমরা আমাদিগের নিজের প্রতি চক্ষু ফিরাই, আমরা আপন আপন ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িব। আমরা দেখিব যে, যে সত্য প্রচারের জন্য আমরা এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি সেই সত্য আমরা হয়তো আপন আপন জীবনে সম্পূর্ণ সাধন করি না। হয়তো পার্থিব ভাবের ছায়া আসিয়া আমাদের আত্মার মূলে বিরোধের তরঙ্গ উত্থিত করিয়াছে! তাহাতে আমাদের শক্তির খর্ব্বতা ও কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। সময়ের স্রোত বহিয়া যাইতেছে—জীবনের সন্ধ্যা আগমন করিতেছে, অবহেলা ঔদাস্যের এ সময় নয়। অতএব আসুন, আমরা এখনো আত্মকর্ত্তব্যে জাগ্রৎ হইয়া, ঈশ্বরের আদেশ স্মরণ করিয়া, প্রেমে ও প্রাণে এক হইয়া ব্রহ্মের পবিত্র নাম ভারতে প্রচার করি এবং হিন্দুকুল-গৌরব সেই প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পবিত্র বংশের পূর্ব্বনাম, পূর্ব্বস্মৃতি পুনরুদ্ধার করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সংগীত।

রাগিণী কাফি কানাড়া—তাল ঢিমা তেতালা।

বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়!
তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল হৃদয়!
তব প্রেমে কুসুম হাসে,
তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম হাসি তব ঊষা নব নব,
প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব,
তব প্রেম তরে ফিরে হা হা ক'রে উদাসী মলয়।
আকুল প্রাণ মম ফিরিবেনা সংসারে,
ভুলেছে তোমার রূপে নয়ন আমারি।
জলে স্থলে গগন তলে,
তব সুধা বাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে,
ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে,
আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময়, ও প্রেম আলয়।

রাগিণী দেশ খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

তোমায়, যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে।
প্রেম কুসুমের মধু সৌরভে
নাথ তোমারে ভুলাব হে।
তোমার প্রেমে সখা সাজিব সুন্দর,
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে।
আপনি আসিবে কেমনে ছাড়িবে আর?
মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদে।

রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল [illegible]।

সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।
প্রেম আলোকে প্রকাশ জগপতি হে!
বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে
সতত বিরাজ হৃদয় পুরে—
তোমাবিনে অনাথ আমি অতি হে।
মিছে আশা লয়ে সতত ভ্রান্ত,
তাই প্রতিদিন হতেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে—
নিবার' নিবার' প্রাণের ক্রন্দন
কাট হে কাট হে এ মায়া বন্ধন,
রাখ রাখ চরণে এ মিনতি হে।

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান।
এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি রেখোনারে ব্যবধান।
সংসারের ধূলা ধুয়ে ফেলে এস মুখে লয়ে এস হাসি,

হৃদয়ের থালে লয়ে এস তাই প্রেম ফুল রাশি রাশি।

নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে রহিলে তাঁহারে ভুলে,

অনাথ জনের মুখপানে আর চাহিলে না মুখ তুলে।

কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত ব্যথিলে পরের প্রাণ।

তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হল অবসান।

তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি আপনারে ভুলিবে না।

হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হৃদয় কি খুলিবে না।

লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি,

পিতার অসীম ধন রতনের সকলেই অধিকারী।

মহিলা সমাজ।

এবার শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃপুরে মহিলারা ব্রহ্মোৎসব করিয়াছিলেন। এই উৎসবে প্রায় শতাধিক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী উপাসনাকার্য্য সমাধা করেন, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ব্রাহ্মধর্ম্মের পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এই উপদেশ পাঠ করেন।

আমরা সুখদুঃখপূর্ণ নানা ঘটনার তরঙ্গে বারম্বার উত্থিত পতিত ও প্রবাহে নানাদিকে চালিত হইয়া পরম পিতার প্রসাদে আর এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিলাম। সুখ ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বসিয়া আমরা ঈশ্বরের সন্তানবৎসলা পরমস্নেহময়ী মাতার ভাব দেখিতে পাই। তখন মাতার আজ্ঞাবহ পবন মৃদু হিল্লোল উঠাইয়া, সুগন্ধ ছড়াইয়া আমাদের শরীর স্নিগ্ধ করে, বন্ধুবান্ধবের আদরের দোলায় আন্দোলিত হই, তাঁদের মিষ্ট হাসিমাখা মুখে মধুর কথা শুনি, পাখীরা উল্লাসের গান গায়, সমস্ত জগৎ পত্র পুষ্পে সজ্জিত, সুবর্ণ সুকোমল সূর্য্য-কিরণে রঞ্জিত দেখি, সকলে সুখ-উপহার হাতে লইয়া আইসে। দুঃখ দারিদ্র্যের কণ্টকময় পাষাণ-শয্যায় পড়িয়া আমরা ঈশ্বরের উপদেষ্টা গুরুর মূর্ত্তি দেখি। দয়া, মায়া, মমতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণগুলি দুঃখ কষ্টের নিকট হইতেই আমরা শিক্ষা পাই। পৃথিবীতে দুঃখ ক্লেশ না থাকিলে এই সুকোমল, মহান, দেবতানুরূপ গুণগুলিও থাকিত না। যে ব্যক্তি নিজে কখন কোন দুঃখ শোক ভোগ করে নাই সে কখনই পরের দুঃখ শোকের সময়ে তাহার প্রতি যথার্থরূপে মমতা করিতে পারে না। পুত্রশোক কথাটা শুনিলেই সকলেরি মনে হয় বটে যে, সে অতি ভয়ানক শোক, কিন্তু যে ব্যক্তি নিজে পুত্রশোক পাইয়াছে সে একজন পুত্রশোকাতুর ব্যক্তির অসহ্য মর্ম্মভেদী তীব্র যাতনা সমস্ত প্রাণের সহিত অনুভব করিয়া তাহাকে যেমন মমতা করিবে তেমন আর কেহই পারিবে না। শ্রাবণের ঘন অন্ধকার মেঘরাশি ও অবিরল ধারা ভেদ করিয়া পরিম্লান চন্দ্রকিরণ প্রকাশের ন্যায় সেই মমতার অতি মধুর স্নিগ্ধ আলোক ধারা অতি ধীরে ধীরে আকুল প্রাণেতে প্রবেশ করে, তাহার যাতনার তীব্রতা ক্রমে লাঘব হইয়া আইসে। মমতাময় হৃদয় যখন পরদুঃখে আত্মবিস্মৃত হইয়া একেবারে দ্রবীভূত হইয়া পড়ে সে কি সুন্দর দৃশ্য। মমতার মত খাঁটি নিঃস্বার্থ, বিশুদ্ধ স্বর্গীয় ভাব পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। কষ্ট না থাকিলে দয়া, মায়া, সহিষ্ণুতা শব্দের কোন অর্থই থাকে না। দয়া, মায়া, সহিষ্ণুতা না থাকিলে এই সংসারে কি ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা কি অনর্থপাত উপস্থিত হইত। যখনি কাহারও কেহ অনিষ্ট করিয়াছে, যে

ব্যক্তির যাহার উপরে রাগ হইয়াছে সে তখনি তাহাকে মারিতে কাটিতে উদ্যত, যে কোন প্রকারে হয় প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত, কেহ কাহাকে ক্ষমা করে না। এমন করিয়া সংসার কয়দিন টিকিতে পারে। তাহা হইলে সংসারের শোভা, সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য একেবারে চলিয়া যায়, দেবত্ব, মনুষ্যত্ব লোপ পায়, কেবল পশুত্ব রাজত্ব করিতে থাকে। আমরা দেখিতেছি সুখ, দুঃখ উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে আমাদের হিতসাধনে নিযুক্ত। সুখ, দুঃখ দুইই পরমেশ্বরের হাত হইতে পাইতেছি। জানি না কেনইবা এক সময়ে তিনি আমাদের নিকটে সুখ প্রেরণ করেন, কেনই বা আর এক সময়ে তিনি আমাদিগকে দুঃখ দেন। আমরা সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাদের এইরূপ বল দিন যে, তিনি সুখে রাখুন বা দুঃখে রাখুন, সকল অবস্থাতে সকল সময়ে আমরা যেন অবিচলিত চিত্তে তাঁর প্রতি নির্ভর, তাঁর প্রতি প্রীতি স্থাপন করিতে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে সমর্থ হই। ঈশ্বরেতেই যেন আমরা আমাদের ভালবাসার ভিত্তিভূমি স্থাপন করি তাহা হইলে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা সংসারের শোকতাপে অটল থাকিতে পারি। ঈশ্বরেতে আন্তরিক প্রীতি স্থাপন করিলে সেই প্রীতি আপনি সমস্ত জগতে প্রতিফলিত হইবে, তখন আমরা আগ্রহাকুল হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য ও জগতের হিতসাধনে ব্রতী হইব। প্রিয় পাত্রের প্রিয় কার্য্য ও হিতসাধন না করিয়া কে স্থির থাকিতে পারে। প্রিয়তমের প্রসন্নতা লাভের জন্য কিনা করা যায়, কি না দেওয়া যায়। তখন প্রতিদিন দিবাবসানে এই ভাবিব না যে, কে কবে আমার কি অনিষ্ট করিয়াছে, কে কোথায় আমার নামে কি বলিয়াছে, কি উপায়ে তাহার শোধ তুলিব। এ প্রকার চিন্তায় আর বৃথা সময় নষ্ট বা মনকে কলুষিত করিব না। এখন অন্যের দোষ আলোচনায় যে সময় অতিবাহিত করি তখন সেই সময়ে নিজের ত্রুটি অনুসন্ধান ও তাহা সংশোধনে নিযুক্ত থাকিব। তখন দিবাবসানে নির্জ্জনে বসিয়া এই ভাবিব যে, আমি কার্য্যেতে কি কথাতে কাহারও প্রতি কোনরূপ অন্যায় করিয়াছি কি না, আমার বুদ্ধি বিবেচনা ও সামর্থানুসারে আমার চতুর্দ্দিকস্থ সকলের উপকার ও সকলকে সুখী করিতে চেষ্টা পাইয়াছি কিনা। আমার প্রিয়তম সেই নিষ্পাপ পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রীতিভাজন ও তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য আমার হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ রাখিতে সর্ব্বদাই যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ঈশ্বরের নিকট হইতে আমরা সকলই পাইয়াছি, তাহার প্রতিদান স্বরূপ আমরা তাঁহাকে কি দিব। সেই দেবদেব মহাদেবকে দিবার যোগ্য বস্তু আমাদের কি আছে। আমাদের হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত ভালবাসাই একমাত্র তাঁহার যোগ্য দান। ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছার দান। ভালবাসা কেহ কাহারও নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে না, কোন সম্রাট ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমায় গিয়াও আজও পর্য্যন্ত এমন কোন আইন জারি করিতে পারেন নাই যদ্দারা অন্যের ভালবাসা বলপূর্ব্বক অধিকার করা যাইতে পারে। কোন ধর্ম্মের শাসন বা সামাজিক নিয়ম ভালবাসাকে গণ্ডিবদ্ধ করিতে পারে নাই। আমাদের ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিজস্ব, আমাদের হৃদয়ের সম্পত্তি। ভালবাসার মত নিজের অমূল্য দান আর কি আছে— ভালবাসার অধিক দেবতায় মনুষ্যকে, মনুষ্যে মনুষ্যকে কিম্বা মনুষ্য দেবতাকে আর কি দিতে পারে। এস ভগিনীগণ। আমরা আজ সকলে মিলিয়া আমাদের সেই অমূল্য নিজস্ব

সম্পত্তি—আমাদের হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত শ্রদ্ধা-ভক্তি-পূর্ণ ভালবাসা পরম পিতাকে উপহার দি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সংগীত।

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেক

আইল আজি প্রাণসখা, দেখরে নিখিল জন।
আসন বিছাইল নিশীথিনী গগন তলে,
গ্রহতারা সভা ঘেরিয়া দাঁড়াইল।
নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া,
থামাইল ধরা দিবস কোলাহল।

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) হৃদয় সমুদ্র তীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে;
কাতর পরাণ ধায় বাহু বাড়ায়ে।
(হৃদয়ে) উথলে তরঙ্গ চরণ পরশের তরে
(তারা) চরণ কিরণ লয়ে কাড়াকাড়ি করে।
মেতেছে হৃদয় আমার ধৈরজ না মানে,
তোমারে ঘেরিতে চায় নাচে সঘনে।
(সখা) ঐ খেনেতে থাক তুমি যেয়োনা চলে
(আজি) হৃদয় সাগরের বাঁধ ভাঙ্গি সঘনে!
কোথা হতে আজি প্রেমের পবন ছুটেছে
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে!
তুমি দাঁড়াও তুমি যেয়োনা—
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ আজি নেচে উঠেছে।

মিশ্র দেশ বাহার। ঝাঁপতাল।

শোন শোন আমাদের ব্যথা দেব দেব প্রভু দয়াময়,
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয়!
চিরদিন আঁধার না রয়,
রবি উঠে নিশি দূর হয়,
এ দেশের মাথার উপরে এ নিশীথ হবে না কি ক্ষয়,
চিরদিন ঝরিবে নয়ন? চিরদিন ফাটিবে হৃদয়?
মরমে লুকান' কত দুখ,
ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর কথা নাই শুধু ফাটে বুক!
সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ প্রাণ দশদিশি বিভীষিকাময়,
হেন হীন দীনহীন দেশে বুঝি তব হবে না আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন চিরদিন ফাটিবে হৃদয়!
কোন কালে তুলিব কি মাথা?—জাগিবে কি অচেতন প্রাণ?
ভারতের প্রভাত গগনে উঠিবে কি তব জয় গান?
আশ্বাস বচন কোন ঠাঁই
কোন দিন শুনিতে না পাই,
শুনিতে তোমার বাণী তাই
মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া!
বল প্রভু মুছিবে এ আঁখি চিরদিন ফাটিবে না হিয়া!

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে গত দুই মাসে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

Theosophist Vol. 6. Nos. 4, 5.

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No X. for 1884.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LII. part II.

সেন রাজগণ। (বাঙ্গালার ইতিহাসের একটী অধ্যায়।) শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত।

একতারক। কমল কলিকা কাব্য। শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রবাহিনী। ১২ সংখ্যা শ্রীবিপিনবিহারি চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

বামাবোধিনী পত্রিকা। ১২৯১। অগ্রহায়ণ ও পৌষ।

নবজীবন। প্রথমখণ্ড, ৬ সংখ্যা।

প্রচার। প্রথমখণ্ড ৬ ও ৭ সংখ্যা।

সংবঙ্গ। প্রথম ভাগ অষ্টম সংখ্যা।

আলোচনা। প্রথমখণ্ড, পৌষ।

মিত্র দর্পন গীতা বেণু গান। ৪ ও ৫ সংখ্যা।

বান্ধব। ৯ খণ্ড। ৮ সংখ্যা।

আর্য্যদর্শন। ১০ খণ্ড। ৯ সংখ্যা।

নব্যভারত। দ্বিতীয়খণ্ড ৯ ও ১০ সংখ্যা।

ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয়খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা।

বিজ্ঞান দর্পণ। তৃতীয় ভাগ ৬ সংখ্যা।

চিত্তরঞ্জিনী। দ্বৈমাসিক রহস্য, শিশির।

ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরোপাসনা বিধায়িনী বক্তৃতা। শ্রীমহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী প্রদত্ত।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৫.

৫০০ সংখ্যা — ১৮০৬ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৫ ফাল্গুন রবিবার ৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।
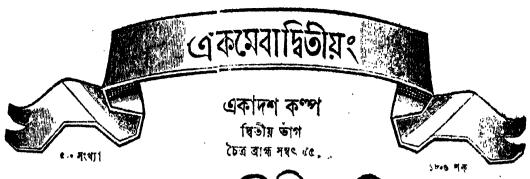
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা। যিনি আপনার আত্মার অন্তরতম নিকেতনে—পরম ব্যোমে—সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্মকে নিহিত জানেন তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদায় বিষয় উপভোগ করেন। আমরা যেমন ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য বস্তু সকল প্রত্যক্ষ করি, সেইরূপ আমরা একনিষ্ঠ সংশয়রহিত বুদ্ধি-দ্বারা পরব্রহ্মকে আত্মাতে উপলব্ধি করি। কোন কোন বস্তুকে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারাই উপলব্ধি করিতে পারি; এরূপ বস্তুকে যখন আমরা এক ইন্দ্রিয়-দ্বারা উপলব্ধি করি, তখন আমাদের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, আর এক ইন্দ্রিয়-দ্বারাও আমরা তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারি। তাহার বাস্তবিক সত্তা বিষয়ে আমাদের যদি কোন প্রকার সংশয় উপস্থিত হয়, তবে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করি। আর, যদি কোন বস্তু কেবল একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের গম্য হয়, তবে বিভিন্ন অবস্থায় সেই ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক একই বিষয়ের সাক্ষ্যপ্রদানকেই আমরা তাহার সত্যাসত্যের প্রমাণ বলিয়া অবধারণ করি। আমরা যদি স্বল্প অন্ধকারে প্রাচীরের মত বা কবাটের মত কোন একটি দৃশ্য অবলোকন করি, তবে হস্ত-দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাহার সত্যাসত্য অবধারণ করি; আর যদি দূর হইতে হস্তীর মত একটা জন্তু দেখি, তবে তাহার নিকটে অগ্রসর হইয়া তাহার মূল-গত সত্য-বৃত্তান্ত অবগত হই। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বহির্বস্তুর সত্তা যদি এক ইন্দ্রিয়-দ্বারা স্পষ্ট বোধগম্য না হয়, তবে আর এক ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা তাহার তথ্য নির্ণয় করি,—যদি কোন ইন্দ্রিয়ের এক অবস্থায় আমরা সম্মুখস্থিত বিষয়ের প্রতি সংশয়াম্বিত হই, তবে তাহার আরেক অবস্থায় আমরা প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হই। বহির্বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় এইরূপ প্রণালীতেই হইয়া থাকে; কিন্তু আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় ওরূপ

করিয়া সম্ভবে না। ইন্দ্রিয় অনেক কিন্তু আত্মা একমাত্র ; ইন্দ্রিয়-পরিচালনের বিস্তর প্রকার-ভেদ আছে,—আত্ম-সমাধানের একই ভাব। সেই এক-মাত্র আত্মার একমাত্র প্রকরণ-দ্বারা আমরা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে নিঃসংশয়রূপে অন্তঃকরণে উপলব্ধি করি ;—এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে "একাত্মপ্রত্যয়সারং" পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত এক আত্ম-প্রত্যয়ই কেবল সার। আত্ম-প্রত্যয়ের স্থান যদি সংশয় দ্বারা অধিকৃত হয়, তবে তাহা অতি ভয়ানক ; তবে সত্যের দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যায়। এক ইন্দ্রিয়ের সংশয় আর এক ইন্দ্রিয় দ্বারা দুরীকৃত হইতে পারে, মনের এক অবস্থার সংশয় আর এক অবস্থায় দুরীকৃত হইতে পারে, কিন্তু সকল মানসিক অবস্থার মূলস্থিত যে এক আত্মা তাহার সংশয় সে আপনি না নিবারণ করিলে আর কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারে না। মনুষ্য-শরীরে দুই আত্মা নাই যে, এক আত্মার সংশয় আর এক আত্মা নিবারণ করিবে ; আত্মা কোন দুই বৃত্তির মধ্যেকার এক বৃত্তি নহে যে, অন্যতর বৃত্তিদ্বারা তাহার সংশয় নিবারিত হইবে ;—প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ আত্মার অভ্যন্তরে সংশয়ের স্থান নাই—আলোকের অভ্যন্তরে অন্ধকারের স্থান নাই—সেখানে কেবলি প্রত্যয়—কেবলই আলোক ;—সে আলোককে কোথা হইতেও যাচিয়া আনিতে হয় না—সে আলোক আত্মা নিজেই। আত্ম-প্রত্যয় যাহা বলে তাহা যদি আমাদের পাপাসক্ত মনের সহস্রও প্রতিকূল হয়, তথাপি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত—একান্ত বিশ্বাসের সহিত—তদ্গত চিত্তে আমরা যেন তাহা শ্রবণ-মনন করি—"একাত্মপ্রত্যয়সারং" এই বাক্যটি যেন আমরা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখি। পরিপূর্ণ জ্ঞানালোকে আলোকিত সেই যে সকল সত্যের মূল সত্য পরব্রহ্ম—যেখানে জ্ঞান যিনি তিনিই সত্য এবং সত্য-যিনি তিনিই জ্ঞান—সেই অনন্ত পরব্রহ্ম—শুদ্ধ কেবল আত্মপ্রত্যয়ের গম্য—শ্রদ্ধা ভক্তি পরিপূর্ণ একনিষ্ঠ নিষ্পাপ নির্ম্মল আত্মপ্রত্যয়ের গম্য,—মনোবুদ্ধির গম্য নহেন।

এই যে অমূল্য আত্ম-প্রত্যয়—এই যে আমাদের তৃতীয় চক্ষু—ইহাতে শেল বিদ্ধ করিও না—ইহাকে প্রস্ফুটিত কর ;—তাহা হইলে যেমন স্পষ্টরূপে এই সমাজের বেদী দেখিতেছ, তেমনি স্পষ্টরূপে আত্মা দেখিতে পাইবে,—এবং আত্মা ভেদ করিয়া পরমাত্মাকে দেদীপ্যমান দেখিবে,—"দগ্ধেন্ধনমিবানলং"—যেমন ইন্ধনকে দগ্ধ করিয়া অগ্নি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ পরব্রহ্ম আত্মার পাপ-মলিনতা দগ্ধ করিয়া সাধকের আত্ম-প্রত্যয়ে নিঃসংশয়-রূপে আপনাকে প্রকাশ করেন—সত্যের মুখ অপাবৃত করিয়া দেন। তখন সাধক দেখিতে পান "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" ও তাঁহার অন্তঃকরণ বলিয়া উঠে "এযে আমি তোমার আনন্দরূপ অমৃতরূপ দেখিতেছি—দেবতারা যাহা নিয়ত দর্শন করেন সেইরূপ এখন দর্শন করিতেছি—এ কি সৌভাগ্য আমার আজ উদিত হইল।—গভীর সত্য যাঁহাকে আমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন মনে করিয়া ভীত হইয়াছিলাম—তাঁহাকে জ্ঞানের জ্যোতিতে প্রভাসিত দেখিতেছি—জ্ঞানের জ্যোতি যাহাকে নীরস মনে করিয়াছিলাম, তাহাকে অমৃত আনন্দে ভাষমান দেখিতেছি ;—আমি মুক্তির ইচ্ছুক হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। আমাকে বিশ্বাসের বল দেও যে তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি—প্রেমের বল দেও যে তোমাকে আপনার করিয়া রাখিতে পারি—নিষ্ঠার বল দেও যে, তোমার কার্য্যে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে

পারি।” শান্তংশিবমদ্বৈতং” এই বচনটি ব্রাহ্মধর্ম্ম-পথিকের আশ্রয়-যষ্টি ; পরব্রহ্ম শান্ত—তিনি আজ একরূপ কাল একরূপ নহেন—তাঁহাকে অবলম্বন করিলে এ বলিয়া ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে হয় না যে, “আমি মনে করিয়াছিলাম অটল ভিত্তি-মূলের উপর গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এখন দেখিতেছি তাহা বালির বাঁধ।” তিনি মঙ্গল-স্বরূপ,—তাঁহাকে অবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে এরূপ অনুতাপ করিতে হয় না যে “আমি তাঁহাকে আমার পরম হিতৈষী জানিয়া তাঁহার উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম এখন দেখিতেছি তিনি আমার পরম শত্রু।” তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহাকে অবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে এরূপ অনুতাপ করিতে হয় না যে, “যত দিন তাঁহার রাজত্ব ছিল তত দিন আমাদের সুখের সীমা ছিল না—এখন আমাদের সে রাজাও নাই সে সুখও নাই” এতএব “শান্তংশিবমদ্বৈতং বলিয়া পরমাত্মাকে আমরা যেমন অকুণ্ঠিত চিত্তে, অসংকোচে, নিরাতঙ্কে অবলম্বন করিতে পারি, এরূপ কোন পুত্র পিতাকে পারে না, প্রজা রাজাকে পারে না, বন্ধু বন্ধুকে পারে না, শিষ্য গুরুকে পারে না ; তিনি আমাদের সাক্ষাৎ অভয় স্বরূপ—সাক্ষাৎ মুক্তি-দাতা ; আমরা যদি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস ও প্রেম সহকারে তাঁহার নিকট গমন করি—তাহা হইলে তিনি আমাদের সমস্ত ভয় তাপ দূর করিয়া দেন, সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া দে'ন,—এরূপ আশ্রয়-দাতাকে যদি আমরা ভুলিয়া থাকি তবে আমাদের মনুষ্য জন্ম কিসের জন্য।

হে পরমাত্মন্। তুমি আমাদের আত্ম-চক্ষু পরিস্ফুট করিয়া আমাদের অন্তরে প্রকাশমান হও—তোমাকে দেখিয়া আমাদের নয়ন মন সার্থক হউক্। তুমি একবার আসিয়া আমাদের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান কর, তাহা হইলে আমরা বিশ্ববিজয়ী সত্যের বলে বলীয়ান হইব ; তুমি তোমার এক বিন্দু রশ্মি আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর, তাহা হইলে জ্ঞানের আলোকে আমাদের সকল সংশয় তিরোহিত হইয়া যাইবে ; ও তোমার অনন্ত অপার গম্ভীর জ্ঞান-প্রেমের দ্বার আমাদের হৃদয়ে উদ্‌ঘাটন কর, তাহা হইলে আমরা তাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সংসারের সমস্ত মোহবন্ধন তুচ্ছ করিতে পারিব ;—তোমার সত্যং জ্ঞানমনন্তং মূর্ত্তি আমাদের নিকট প্রকাশিত কর এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

রামমোহন

সাধারণতঃ আমরা প্রতিদিন গুটিকতক ছোট ছোট কাজ লইয়াই থাকি মাকড়সার মত নিজের ভিতর হইতে টানিয়া টানিয়া আমাদের চারিদিকে স্বার্থের জাল নির্ম্মাণ করি ও স্ফীত হইয়া তাহারই মাঝখানটিতে ঝুলিতে থাকি, সমস্ত জীবন দৈনন্দিন খুঁটি-নাটির মধ্যে সমাহিত হইয়া অন্ধকার ও সঙ্কীর্ণতার গর্ভে স্বচ্ছন্দসুখ অনুভব করি। আমাদের প্রতিদিন পূর্ব্বদিনের পুনরাবৃত্তি মাত্র, আমাদের ক্ষুদ্র জীবন একটি স্রোতোবাহী উন্নতির কাহিনী নহে। সেই প্রতি দিবসের উদরপূর্ত্তি প্রতিরাত্রের নিদ্রা—বৎসরের মধ্যে এই ঘটনা ও ইহারই আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলিরই তিন শ পঁয়ষট্টিবার করিয়া পুনরাবর্ত্তন এই ত আমাদের জীবন—ইহাতে আমাদের নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হয় না ; অহঙ্কার ও আত্মাভিমানের অভাব নাই বটে কিন্তু আপনাদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নাই। এক প্রকার নিকৃষ্ট জাতীয় জীবাণু আছে সে কেবল গতি-বিশেষ অবলম্বন করিয়া ঘুরিতেই

আনে, সে সমস্ত জীবন একই ঘুরন ঘুরিতেছে, তাহার সহিত আমাদের বেশী প্রভেদ দেখিতে পাই না। আমাদের আহ্নিক গতি আছে বার্ষিক গতি নাই—আমরা নিজের চারিদিকে ঘুরিতেছি নিজের নাভিকুণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছি কিন্তু অনন্ত জীবনের কক্ষপথে এক পা অগ্রসর হইতেছি না। এই পরম কৌতুকাবহ আত্ম-প্রদক্ষিণ-দৃশ্য চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে—সকলে মাটির উপরে বিন্দুমাত্র চিহ্ন রচনা করিয়া লাটিমের ন্যায় সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমির মধ্যেই জীবনের সুদীর্ঘ ভ্রমণ নিঃশেষ করিয়া দিতেছে। প্রতিদিন চারিদিকে ইহাই দেখিয়া মনুষ্যত্বের উপরে আমাদের বিশ্বাস হ্রাস হইয়া যায়—সুতরাং মনুষ্যত্বের গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন করিবার বল চলিয়া যায়। এই জন্য মহাত্মাদের প্রতি মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। মহাত্মাদের জীবন আলোচনা করিলে মনুষ্যত্ব যে কি তাহা বুঝিতে পারি, "আমরা মানুষ" বলিলে যে কতখানি বলা হয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারি, জানিতে পারি যে আমরা কেবল অস্থিচর্ম্মনির্ম্মিত একটা আহার করিবার যন্ত্র মাত্র নই, আমাদের সুমহৎ কুলমর্য্যাদার খবর পাইয়া থাকি। আমরা যে আমাদের চেয়ে ঢের বড়, অর্থাৎ মনুষ্য, সাধারণ মানুষদের চেয়ে যে অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ইহাই মনের মধ্যে অনুভব করিলে তবে আমাদের মাথা তুলিতে ইচ্ছা করে, মৃত্তিকার আকর্ষণ হ্রাস হইয়া যায়।

মহাপুরুষেরা সমস্ত মানবজাতির গৌরবের ও আদর্শের স্থল বটেন, কিন্তু তাঁহারা জাতিবিশেষের বিশেষ গৌরবের স্থল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গৌরবের স্থল বলিলে যে কেবলমাত্র সামান্য অহঙ্কারের স্থল বুঝায় তাহা নহে, গৌরবের স্থল বলিলে শিক্ষার স্থল বললাভের স্থল বুঝায়। মহাপুরুষদিগের মহৎকার্য্য সকল দেখিয়া কেবলমাত্র সম্ভ্রম-মিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হইলেই যথেষ্ট ফললাভ হয় না—তাঁহাদের যতই 'আমার' মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি যতই প্রেমের উদ্রেক হয় ততই তাঁহাদের কথা তাঁহাদের কার্য্য তাঁহাদের চরিত্র আমাদের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠে। যাঁহাদের লইয়া আমরা গৌরব করি তাঁহাদের শুদ্ধমাত্র যে আমরা ভক্তি করি তাহা নহে, তাঁহাদের 'আমার' বলিয়া মনে করি। এই জন্য তাঁহাদের মহত্ত্বের আলোক বিশেষরূপে আমাদেরই উপরে আসিয়া পড়ে, বিশেষরূপে আমাদেরই মুখ উজ্জ্বল করে। শিশু যেমন সহস্র বলবান ব্যক্তিকে ফেলিয়া বিপদের সময় পিতার কোলে আশ্রয় লইতে যায়, তেমনি আমরা দেশের দুর্গতির দিনে আর সকলকে ফেলিয়া আমাদের স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের অটল আশ্রয় অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তখন আমাদের নিরাশ হৃদয়ে তাঁহারা যেমন বলবিধান করিতে পারেন এমন আর কেহই নহে। ইংলণ্ডের দুর্গতি কল্পনা করিয়া কাব ওয়ার্ড্স্বার্থ পৃথিবীর আর সমস্ত মহাপুরুষকে ফেলিয়া কাতর স্বরে মিল্টনকেই ডাকিলেন, কহিলেন "মিল্টন, আহা তুমি যদি আজি বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে ইংলণ্ডের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে।" যে জাতির মধ্যে স্বদেশীয় মহাপুরুষ জন্মান নাই, সে জাতি কাহার মুখ চাহিবে তাহার কি দুর্দ্দশা। কিন্তু যে জাতির মধ্যে মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তথাপিও যে জাতি কল্পনার জড়তা হৃদয়ের পক্ষাঘাত বশতঃ তাঁহার মহত্ত্ব কোনমতে অনুভব করিতে পারে না তাহার কি দুর্ভাগ্য!

আমাদের কি দুর্ভাগ্য। আমরা প্রত্যেকেই নিজে নিজেকে মস্তলোক মনে করিয়া

নিজের পায়ে পাদ্য অর্ঘ্য দিতেছি, বাষ্পের প্রভাবে স্ফীত হইয়া লঘু হৃদয়কে লঘুতর করিয়া তুলিতেছি। প্রতিদিনকার ছোট ছোট মস্তলোকদিগকে, বঙ্গসমাজের বড় বড় যশবুদ্বুদদিগকে, বালুকার সিংহাসনের উপর বসাইয়া দুই দিনের মত পুষ্প চন্দন দিয়া মহত্ত্বপূজার স্পৃহা খেলাচ্ছলে চরিতার্থ করিতেছি, বিদেশীয়দের অনুকরণে কথায় কথায় সভা ডাকিয়া চাঁদা তুলিয়া মহত্ত্বপূজার একটা ভান ও আড়ম্বর করিতেছি। এজলাস হইতে জোন্স্ সাহেব চলিয়া গেলে হাটে তাহার ছবি টাঙ্গাইয়া রাখি, জেমস্ সাহেব আসিলে তাহার পায়ে পুষ্পমালা দিই। অর্থের বিনয়ের উদারতার অভাব দেখিতে পাই না। কেবল আমাদের যথার্থ স্বদেশীয় মহাপুরুষকেই হৃদয় হইতে দূরে রাখিয়া, তাঁহাকে সম্মান করিবার ভার বিদেশীদের উপরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিয়াছি ও প্রতিদিন তিনবেলা তিনটে করিয়া নূতন নূতন মৃৎপ্রতিমা নির্ম্মাণে নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া আছি।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাঁহার নির্ম্মিত ভবনে বাস করিতেছি। তিনি আমাদের জন্য যে কত করিয়াছেন, কত করিতে পারিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস জন্মিবে। আমাদিগকে যদি কেহ বাঙ্গালী বলিয়া অবহেলা করে আমরা বলিব রামমোহন রায় বাঙ্গালী ছিলেন।

রামমোহন রায়ের চরিত্র আলোচনা করিবার আর একটি গুরুতর আবশ্যক আছে। আমাদের এখনকার কালে তাঁহার মত আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা কাতর স্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি "রামমোহন রায়, আহা তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে। তোমাকে বঙ্গদেশের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বাক্পটু লোক—আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও! আমরা আত্মম্ভরী—আমাদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে শিখাও। আমরা লঘুপ্রকৃতি—বিপ্লবের স্রোতে চরিত্রগৌরবের প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা বাহিরের প্রখর আলোকে অন্ধ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ চিরোজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে ভালমন্দ নির্ব্বাচন করিতে ও স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও!"

রামমোহন রায় যথার্থ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে প্রগল্ভ রসনার এত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই সুতরাং তাহার এত সমাদরও ছিল না। কিন্তু আরেকটা কথা দেখিতে হইবে। একেকটা সময়ে কাজের ভিড় পড়িয়া যায়, কাজের হাট বসিয়া যায়, অনেকে মিলিয়া হোহা করিয়া একটা কাজের কারখানা বসাইয়া দেন, তখন কাজ করিতে অথবা কাজের ভান করিতে একটা আমোদ আছে। তখন সেই কার্য্যাড়ম্বর নাট্যরস জন্মাইয়া মানুষকে মত্ত করিয়া তুলে, বিশেষতঃ একটা তুমুল কোলাহলে সকলে বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া একপ্রকার বিহ্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে বঙ্গসমাজের সে অবস্থা ছিল না। তখন কাজেতে মত্ততাসুখ ছিল না, অত্যন্ত শান্তভাবে হইবার হাঁসফাঁস করিবার আনন্দ ছিল না, একাকী অপ্রমত্ত থাকিয়া ধীরভাবে সমস্ত কাজ করিতে হইত। সঙ্গীহীন সুগম্ভীর সমুদ্রের গর্ভে যেমন নীরবে অতি ধীরে ধীরে দ্বীপ নির্ম্মিত হইয়া উঠে, তাঁহার সঙ্কল্প তেমনি অবিশ্রাম নীরবে সুধীরে তাঁহার গভীর হৃদয়

পরিপূর্ণ করিয়া কার্য্য আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। ব্যস্ত-সমস্ত চটুল স্রোতস্বিনীতে যেমন দেখিতে দেখিতে আজ চড়া পড়ে কাল ভাঙ্গিয়া যায়,—সেরূপ ভাঙ্গিয়া গড়িয়া কাজ যত না হউক খেলা অতি চমৎকার হয়,—তাঁহাদের সে কালে সেরূপ ছিল না। মহত্ত্বের প্রভাবে হৃদয়ের অনুরাগের প্রভাবে কাজ না করিলে কাজ করিবার আর কোন প্রবর্ত্তনাই তখন বর্ত্তমান ছিল না। অথচ কাজের ব্যাঘাত এখনকার চেয়ে ঢের বেশী ছিল। রামমোহন রায়ের যশের প্রলোভন কিছুমাত্র ছিল না। তিনি যতগুলি কাজ করিয়াছিলেন কোন কাজেই তাঁহার সমসাময়িক স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে যশের প্রত্যাশা করেন নাই। নিন্দাগ্লানি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপরে অবিশ্রাম বর্ষিত হইয়াছে—তবুও তাঁহাকে তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারে নাই। নিজের মহত্ত্বে তাঁহার কি অটল আশ্রয় ছিল, নিজের মহত্ত্বের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের কি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ছিল, স্বদেশের প্রতি তাঁহার কি স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল। তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই; তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন, তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্ম্ম স্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীড়ন তাহাতেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কি না করিয়াছিলেন? শিক্ষা বল, রাজনীতি বল,' বঙ্গভাষা বল' বঙ্গসাহিত্য বল,' সমাজ বল,' ধর্ম্ম বল' কেবলমাত্র হতভাগ্য স্বদেশের মুখ চাহিয়া তিনি কোন্ কাজে না রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন? কোন্ কাজটাই বা তিনি ফাঁকি দিয়াছিলেন? বঙ্গসমাজের যে কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র। বঙ্গসমাজের সর্ব্বত্রই তাঁহার স্মরণস্তম্ভ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে; তিনি এই মরুস্থলে যে সকল বীজ রোপণ করিয়াছিলেন তাহারা বৃক্ষ হইয়া শাখা-প্রশাখায় প্রতিদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহারই বিপুল ছায়ায় বসিয়া আমরা কি তাঁহাকে স্মরণ করিব না?

তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, আবার তিনি যাহা না করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরও প্রকাশ পায়। তিনি যে এত কাজ করিয়াছেন কিছুরই মধ্যে তাঁহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নিজের অথবা আর কাহারও প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন চেষ্টা করিলে একাদশ অবতারের পদ সহজে অধিকার করিয়া বসিতে পারিতেন। তিনি গড়িয়া পিটিয়া একটা নূতন ধর্ম্ম বানাইতে পারিতেন তাহা না করিয়া পুরাতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তিনি নিজেকে গুরু বলিয়া চালাইতে পারিতেন তাহা না করিয়া তিনি প্রাচীন ঋষিদিগকে গুরু বলিয়া মানিলেন। তিনি তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহার প্রতিকূলতা করিয়াছেন। এরূপ আত্মবিলোপ এখনত দেখা যায় না। বড় বড় সংবাদপত্রপুট পরিপূর্ণ করিয়া অবিশ্রাম

নিজের নামসুধা পান করতঃ এক প্রকার মত্ততা জন্মাইয়া আমাদের কাজের উৎসাহ জাগাইয়া রাখিতে হয়,—দেশের জন্য যে সামান্য কাজটুকু করি তাহাও বিদেশী আকারে সমাধা করি, চেষ্টা করি যাহাতে সে কাজটা বিদেশীয়দের নয়ন-আকর্ষক পণ্য দ্রব্য হইয়া উঠে, ও তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তুচ্ছ নামটা বিলাতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করিবার সরঞ্জম করি। স্তুতি কোলাহল ও দলস্থ লোকের অবিশ্রাম একমন্ত্রোচ্চারণ শব্দে বিব্রত থাকিয়া স্থিরভাবে কোন বিষয়ের যথার্থ ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তিও থাকে না ততটা ইচ্ছাও থাকে না, একটা গোলযোগের আবর্ত্তের মধ্যে মহানন্দে ঘুরিতে থাকি ও মনে করিতে থাকি বিদ্যুৎবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি।

আমরা যে আত্মবিলোপ করিতে পারি না তাহার কারণ, আমরা আপনাকে ধারণ করিতে পারি না। সামান্য মাত্র ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইলেই আমরাই সর্ব্বোপরি ভাসিয়া উঠি। আত্মগোপন করিতে পারি না বলিয়াই সর্ব্বদা ভাবিতে হয় আমাকে কেমন দেখিতে হইতেছে। যাঁহারা মাঝারী রকমের বড় লোক, তাঁহারা নিজের শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে চান বটে কিন্তু তৎসঙ্গে আপনাকেও প্রচলিত করিতে চান। এ বড় বিষম অবস্থা। আপনিই যখন আপনার সঙ্কল্পের প্রতিযোগী হইয়া উঠে, তখন সঙ্কল্পের অপেক্ষা আপনার প্রতি আদর স্বভাবতই কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়ে। তখন সঙ্কল্প অনেক সময়ে হীনবল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সে ইতস্ততঃ করিতে থাকে। কথায় কথায় তাহার পরিবর্ত্তন হয়। কিছু কিছু ভাল কাজ সে করিতে পারে কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন কাজটি হইয়া উঠে না। যে আপনার পায়ে আপনি বাধাস্বরূপ বিরাজ করিতে থাকে সংসারের সহস্র বাধা সে অতিক্রম করিবে কি করিয়া? যে ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সংসারের মধ্যস্থলে নিজের শুভকার্য্য স্থাপন করে সে স্থায়ী ভিত্তির উপরে নিজের মঙ্গল সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠিত করে। আর যে নিজের উপরেই সমস্ত কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করে সেও যখন চলিয়া যায় তাহার অসম্পূর্ণ কার্য্যও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়, যদি বা বিশৃঙ্খল ভগ্নাবশেষ ধূলির উপরে পড়িয়া থাকে তবে তাহার ভিত্তি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রামমোহন রায় আপনাকে ভুলিয়া নিজের মহতী ইচ্ছাকে বঙ্গসমাজের মধ্যে রোপণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি না থাকিলেও আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা জীবন্ত ভাবে প্রতিদিন বঙ্গসমাজের চারিদিকে অবিশ্রাম কাজ করিতেছে। সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার স্মৃতি হৃদয়পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার সেই অমর ইচ্ছার বংশ বঙ্গসমাজ হইতে বিলুপ্ত করিতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি লঘু আত্মাই প্রবাহে ভাসিয়া উঠে ভাসিয়া যায়। যাঁহার আত্মার গৌরব আছে তিনিই প্রবাহে আত্মসম্বরণ করিতে পারেন। রামমোহন রায়ের এই আত্ম-ধারণাশক্তি কি রূপ অসাধারণ ছিল তাহা কল্পনা করিয়া দেখুন। অতি বাল্যকালে যখন তিনি হৃদয়ের পিপাসায় ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহার অন্তরে বাহিরে কি সুগভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল! যখন এই মহা নিশীথিনীকে মুহূর্ত্তে দগ্ধ করিয়া ফাটিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রখর আলোক দীপ্ত হইয়া উঠিল তখন তাহাতে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই। সে তেজ সে আলোক তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অন্ধকার অজ্ঞা-

য়ের খণিতে যদি বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে তবে সে কি কাণ্ডই উপস্থিত হয় ভূগর্ভ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তেমনি সহসা জ্ঞানের নূতন উচ্ছ্বাস কয়জন ব্যক্তি সহজে ধারণ করিতে পারে? কোন বালক ত পারেই না। কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত মহৎ ছিলেন এই জন্য এই জ্ঞানের বন্যায় তাঁহার হৃদয় অটল ছিল, এই জ্ঞানের বিপ্লবের মধ্যে মাথা তুলিয়া যাহা আমাদের দেশে ধ্রুব মঙ্গলের কারণ হইবে তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন। এ সময়ে ধৈর্য্য রক্ষা করা যায় কি? আজিকার কালে আমরাত ধৈর্য্য কাহাকে বলে জানিই না। কিন্তু রামমোহন রায়ের কি অসামান্য ধৈর্য্যই ছিল। তিনি আর সমস্ত ফেলিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপাকার ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন যে অগ্নি, ফুঁ দিয়া দিয়া তাহাকেই প্রজ্বলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি চমক লাগাইবার জন্য বিদেশী দেশালাই কাঠি জ্বালাইয়া বাহাদুরি করিতে চাহেন নাই। তিনি জানিতেন ভস্মের মধ্যে যে অগ্নিকণিকা অবশিষ্ট আছে তাহা ভারতবাসীর হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে নিহিত, সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে সে আর নিভিবে না। এত বল এত ধৈর্য্য না থাকিলে তিনি রাজা কিসের? দিল্লির সম্রাট তাঁহাকে রাজোপাধি দিয়াছেন কিন্তু দিল্লির সম্রাটের সম্রাট তাঁহাকে রাজা করিয়া পাঠাইয়াছেন। ভারতবর্ষে বঙ্গসমাজের মধ্যে তিনি তাঁহার রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তবে আমরা কি তাঁহাকে সম্মান করিব না?

রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দ্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। আকাশে মৃত্যু বিচরণ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মিথ্যা ও মৃত্যু নামক মায়াবী রাজাদের প্রকৃত বল নাই, অমোঘ অস্ত্র নাই, কোথাও তাহাদের দাঁড়াইবার স্থল নাই, কেবল নিশীথের অন্ধকার ও একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য বিভীষিকার উপরে তাহাদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অজ্ঞান আমাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই তাহাদের বল। অতিবড় ভীরুও প্রভাতের আলোকে প্রেতের নাম শুনিলে হাসিতে পারে, কিন্তু অন্ধকার নিশীথিনীতে একটি শুষ্ক পত্রের শব্দ একটি তৃণের ছায়াও অবসর পাইয়া আমাদের হৃদয়ে নিষ্ঠুর আধিপত্য করিতে থাকে। যথার্থ দস্যুভয় অপেক্ষা সেই মিথ্যা অনির্দ্দেশ্য ভয়ের শাসন প্রবলতর। অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন নিরুপায় যেমন অসহায় এমন আর কোথায়! রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের জীবন্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল, তাহার জীবন নাই অস্তিত্ব নাই কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র। সেই নিশীথে শ্মশানে সেই ভয়ের বিপক্ষে মাভৈঃ শব্দ উচ্চারণ করিয়া যিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মাহাত্ম্য আমরা আজিকার এই দিনের আলোকে হয়ত ঠিক অনুভব করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি সর্প বধ করিতে অগ্রসর হয় তাহার কেবলমাত্র জীবনের আশঙ্কা থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তুসর্প মারিতে যায় তাহার জীবনের আশঙ্কার অপেক্ষা অনির্দ্দেশ্য অমঙ্গলের আশঙ্কা বলবত্তর হইয়া উঠে। তেমনি রামমোহন রায়ের সময়ে হিন্দুসমাজের ভগ্নভিত্তির সহস্র ছিদ্রে সহস্র বাস্তু-অমঙ্গল উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধমান বংশপরম্পরা লইয়া প্রাচীনতা ও জড়তার প্রভাবে অতিশয় স্থূল-

কায় হইয়া উঠিতেছিল। রামমোহন রায় সমাজকে এই সহস্র নাগ-পাশ-বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই নিদারুণ বন্ধন অনুরাগ-বন্ধনের ন্যায় সমাজকে জড়াইয়াছিল, এই জন্য সমস্ত বঙ্গসমাজ আর্ত্তনাদ করিয়া রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করিল। আজি আমাদের বালকেরাও সেই সকল মৃত সর্পের উপরে হাস্যমুখে পদাঘাত করে, আমরা তাহাদিগকে নির্ব্বিষ ঢোঁড়া সাপ বলিয়া উপহাস করি—ইহাদের প্রবল প্রতাপ, ইহাদের চক্ষের মোহ আকর্ষণ, ইহাদের সুদীর্ঘ লাঙ্গুলের ভীষণ আলিঙ্গনের কথা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

একবার ভাঙ্গচুর করিতে আরম্ভ করিলে একটা নেশা চড়িয়া যায়। সৃজনের যেমন আনন্দ আছে প্রলয়ের তেমনি এক প্রকার ভীষণ আনন্দ আছে। যাঁহারা রাজনারায়ণ বাবুর "একাল ও সেকাল" পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, নূতন ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙ্গালী ছাত্রেরা যখন হিন্দুকালেজ হইতে বাহির হইলেন তখন তাঁহাদের কিরূপ মত্ততা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গুরুতর আঘাতে হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া তাহাই লইয়া প্রকাশ্য পথে আবীর খেলাইতেন। কঠোর অট্টহাস্য ও নিষ্ঠুর উৎসবের কোলাহল তুলিয়া তখনকার শ্মশানদৃশ্য তাঁহারা আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হিন্দুসমাজের কিছুই ভাল কিছুই পবিত্র ছিল না। হিন্দুসমাজের যে সকল কঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাদের ভালরূপ সৎকার করিয়া শেষ ভস্মমুষ্টি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া বিষণ্ণ মনে যে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের ততটুকুও শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কালভৈরবের অনুচর ভূতপ্রেতের ন্যায় শ্মশানের নর-কপালে মদিরা পান করিয়া বিকট উল্লাসে উন্মত্ত হইতেন। সে সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের ততটা দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম ভাঙ্গনের সময় এরূপই ঘটিয়া থাকে। একবার ভাঙ্গিবার দিকে মন দিলে প্রলয়ের আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে। সে সময়ে একটা খারাপ লাগিলেই সমস্তটা খারাপ লাগে, বাহিরটা খারাপ লাগিলেই ভিতরটা খারাপ লাগে। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে বিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস সর্ব্বপ্রথমে যিনি উৎসারিত করিয়া দিলেন—সেই রামমোহন রায়—তাঁহাতে এরূপ মত্ততা জন্মে নাই। তিনি স্থিরচিত্তে ভালমন্দ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি তখনকার অন্ধকার হিন্দুসমাজে আলোক জ্বালাইয়া দিলেন কিন্তু চিতালোক জ্বালান নাই। ইহাই রামমোহন রায়ের প্রধান মহত্ত্ব। কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান জীবনহীন তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যে জীবন্তে সমাহিত হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিলেন। যে মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম্ম দিন দিন অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল, যে জড় পাষাণস্তূপে পিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম অচেতন হইয়া পড়িতেছিল, সেই মৃতভার সেই জড়স্তূপে রামমোহন রায় প্রচণ্ড বলে আঘাত করিলেন, তাহার ভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহার আপাদমস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। হিন্দুধর্ম্মের বিপুলায়তন প্রাচীন মন্দির জীর্ণ হইয়া প্রতি দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, অবশেষে হিন্দুধর্ম্মের দেব-প্রতিমা আর দেখা যাইতেছিল না, কেবল মন্দিরেরই কাষ্ঠলোষ্ট্র ধূলিস্তূপ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার গর্ভের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল, ছোট বড় নানাবিধ সরীসৃপগণ গুহা নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহার ইতস্ততঃ প্রতিদিন কণ্টকাকীর্ণ গুল্ম সকল

উদ্ভিন্ন হইয়া সহস্র শিকড়ের দ্বারা নূতন নূতন বন্ধনে সেই পুরাতন ভগ্নাবশেষকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুসমাজ দেবপ্রতিমাকে ভুলিয়া এই জড়স্তূপকে পূজা করিতেছিল ও পর্ব্বতপ্রমাণ জড়ত্বের তলে পড়িয়া প্রতিদিন চেতনা হারাইতেছিল। রামমোহন রায় সেই ভগ্ন মন্দির ভাঙ্গিলেন, সকলে বলিল তিনি হিন্দুধর্ম্মের উপরে আঘাত করিলেন।

তিনিই হিন্দুধর্ম্মের জীবন রক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এই জন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। কি সঙ্কটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন! তাঁহার একদিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর এক দিকে বিদেশীয় সভ্যতা-সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হইতেছিল, রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন খৃষ্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মত মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।

এইখানে রামমোহন রায়ের উদারতা সম্বন্ধে হয়ত দুয়েকটা কথা উঠিতে পারে। ভস্মস্তূপের মধ্যে ঋষিদের হৃদয়জাত যে অমর অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল ভস্ম উড়াইয়া দিয়া তিনি তাহাই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি এত ভাষা জানিতেন, এত ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছিলেন এবং সকল ধর্ম্মের সত্যের প্রতিই তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল—তিনি ত বিদেশ হইতে অনায়াসে ধর্ম্মাগ্নি আহরণ করিতে পারিতেন, তবে কেন তিনি সঙ্কীর্ণতা অবলম্বন করিয়া অন্য সকল ধর্ম্ম ফেলিয়া ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিলেন? তাহার উত্তর এই—বিজ্ঞান দর্শনের ন্যায় ধর্ম্ম যদি কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার লাভ করিবার সঞ্চয় করিবার বিষয় না হইত, ধর্ম্ম যদি গৃহের অলঙ্কারের ন্যায় কেবল গৃহভিত্তিতে ঝুলাইয়া রাখিবার সামগ্রী হইত, আমাদের সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজের প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক না হইত তাহা হইলে এরূপ না করিলেও চলিত। তাহা হইলে নানাবিধ বিদেশী অলঙ্কারে গৃহ সাজাইয়া রাখা যাইত। কিন্তু ধর্ম্ম না কি হৃদয়ে পাইবার ও সংসারের কাজে ব্যবহার করিবার দ্রব্য, দূরে রাখিবার নহে, এই জন্যই স্বদেশের ধর্ম্ম স্বদেশের জন্য বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম। অন্য কোন দেশের লোকে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, ব্রহ্ম বলিতে আমরা ঈশ্বরকে যেরূপ ভাবে বুঝি, ঈশ্বরের অন্য কোন বিদেশীয় নামে বিদেশীয়েরা কখনই তাঁহাকে ঠিক সেরূপ ভাবে বুঝে না। বুঝে বা না বুঝে জানি না, কিন্তু ব্রহ্ম বলিতে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইবে ঈশ্বরের অন্য কোন বিদেশীয় নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনই উদয় হইবে না। ব্রহ্ম একটি কথার কথা নহে, যে ইচ্ছা পাইতে পারে না, যাহাকে ইচ্ছা দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের পিতামহদের অনেক সাধনার ধন, সমস্ত সংসার বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়া নিভৃত অরণ্যে ধ্যানধারণা করিয়া আমাদের ঋষিরা আমাদের ব্রহ্মকে পাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী। আর কোন জাতি ঠিক এমন সাধনা করে নাই, ঠিক এমন অবস্থায় পড়ে নাই, এই জন্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত

হয়, সেই ফল তাহারা অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব? এই জন্যই বলি, ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্ম বটে, পৃথিবীকে আমরা এ ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিতে পারিও না চাহিও না কিন্তু অবস্থা ও সাধনা বিশেষের গুণে ইহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য পৃথিবী ভারতবর্ষেরই নিকটে ঋণী। আমি যদি উদারতাপূর্ব্বক বলি, খৃষ্টধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্ম আছে, মুসলমান ধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্ম আছে, তবে উদারতা নামক পরম শ্রুতিমধুর শব্দটার গুণে তাহা কানে খুব ভাল শুনাইতে পারে কিন্তু কথাটা মিথ্যা কথা হয়। সুতরাং সত্যের অনুরোধে মিথ্যা উদারতাকে ত্যাগ করিতে হয়। এই জন্য রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম ঋষিদেরই ব্রাহ্মধর্ম্ম, সমস্ত জগতে ইহাকে প্রচার করিতে হইবে এই জন্য সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষে ইহাকে বিশেষরূপে রোপণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষেরত দারিদ্র্যের অভাব নাই, জীবন্ত ঈশ্বরকে হারাইয়া ভারতবর্ষ ক্রমাগত হীনতার অন্ধকূপে নিমগ্ন হইতেছে, আমাদের পৈতৃক সম্পদ যে ভাণ্ডারে প্রচ্ছন্ন আছে রামমোহন রায় সেই ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন, আমরা কি গৌরবের সহিত মনের সাধে আমাদের দারিদ্র্য-দুঃখ দূর করিতে পারিব! আমাদের দীনহীন জাতিকে এই একমাত্র গৌরব হইতে কোন্ নিষ্ঠুর বঞ্চিত করিতে চাহে? আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ব্রহ্মকে পাইয়া কি আমাদের হৃদয়ের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না? আমাদের ব্রহ্ম কি কেবলমাত্র নীরস দর্শন-শাস্ত্রের ব্রহ্ম? তাহা যদি হইত তবে কি ঋষিরা তাঁহাদের সমস্ত জীবন এই ব্রহ্মেতে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারিতেন, তাঁহাদের সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ এই ব্রহ্মে গিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইত? প্রেমের ঈশ্বর কি বিদেশী ধর্ম্মে আছে, আমাদের ধর্ম্মে নাই? না, তাহা নয়। আমাদের ব্রহ্ম—রসোবৈ সঃ। তিনি রস-স্বরূপ। আমাদের ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। এই আনন্দ সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া আছেন বলিয়াই আমাদের বাঁচিয়া আনন্দ। এই জন্য পুষ্পে আনন্দ, সমীরণে আনন্দ। এই জন্য পুত্রের মুখ দেখিয়া আনন্দ, বন্ধুর মিলনে আনন্দ, নরনারীর প্রেমে আনন্দ; এই জন্যই আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—এই আনন্দকে পাইলে ভয় থাকে না, আনন্দের অবসান থাকে না। এত পাইয়াও কি হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট থাকে? এমন অসীম আনন্দের আকর ঋষিরা আবিষ্কার করিয়াছেন ও আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, [illegible] জন্য অন্যত্র যাইব? ঋষি[illegible]র্জ্জিত, ভারতবর্ষীয়দের উপার্জ্জিত, [illegible] উপার্জ্জিত এই আনন্দ আমরা [illegible] বিতরণ করিব। এই জন্য রামমোহন রায় আমাদিগকে আমাদেরই ব্রাহ্মধর্ম্ম দিয়া গিয়াছেন। আমাদের ব্রহ্ম যেমন নিকট হইতে নিকটতর আত্মা হইতে আত্মীয়তর এমন আর কোন দেশের ঈশ্বর নহেন, রামমোহন রায় ঋষি-প্রদর্শিত পথে সেই আমাদের পরমাত্মীয়ের সন্ধান পাইয়াছেন, আমাদিগকেও সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি যদি স্পর্দ্ধিত হইয়া নূতন পথ অবলম্বন করিতেন তবে আমাদিগকে কতদূরেই ভ্রমণ করিতে হইত—তবে আমাদের হৃদয়ের এমন অসীম পরিতৃপ্তি হইত না, তবে সমস্ত ভারতবাসী বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সেই নূতন পথের

দিকে চাহিয়াও দেখিত না। তিনি যে ক্ষুদ্র অভিমানে অথবা উদারতা প্রভৃতি দুই একটা কথার প্রলোভনে পুরাতনকে পরিত্যাগ করেন নাই, এই তাঁহার প্রধান মহত্ত্ব।

বাস্তবিক, একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় জ্ঞানের কথায় আর ভাবের কথায় একই নিয়ম খাটে না। জ্ঞানের কথাকে ভাষান্তরিত করিলে তাহার তেমন ক্ষতি হয় না, কিন্তু ভাবের কথাকে ভাষা-বিশেষ হইতে উৎপাটিত করিয়া তাহাকে ভাষান্তরে রোপণ করিলে, তাহার স্ফূর্ত্তি থাকে না, তাহার ফুল হয় না, ফল না, সে ক্রমে মরিয়া যায়। আমি ভারতবাসী যখন ঈশ্বরকে দয়াময় বলিয়া ডাকি তখন সেই দয়াময় শব্দ সমস্ত অতীত ও বর্ত্তমান ভারতবাসীর বিরাট হৃদয় হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের আকাঙ্ক্ষা কুড়াইয়া লইয়া কি সুগম্ভীর ধ্বনিতে ঈশ্বরের নিকটে গিয়া উত্থিত হয়। আর অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে যদি Merciful বলিয়া ডাকি তবে Webster's Dictionary-র গোটাকতক শুষ্ক-পত্রের মধ্যে সে শব্দ মর্ম্মর করিয়া উঠে মাত্র। অতএব ভাবের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদারতা খাটে না। আজকালকার অনেক ধর্ম্ম-প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে ইংরাজি "Faith" শব্দকে অনুবাদ করিয়া "বিশ্বাস" নামক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের হৃদয়হীনতা প্রকাশ পায়, প্রকাশ পায় যে হৃদয়ের অভাববশত স্বদেশীয় ভাষার অমূল্য ভাবের ভাণ্ডার তাঁহাদের নিকটে রুদ্ধ রহিয়াছে। বিশ্বাস শব্দের বিশেষ স্থলে বিশেষ প্রয়োগ আছে, কিন্তু ভক্তি শব্দের স্থলে বিশ্বাস শব্দের প্রয়োগ অসহ্য। অলীক উদারতার প্রভাবে স্বদেশীয় ভাবের প্রতি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি জন্মিলে এই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশে যদি সস্তা কাপড় সহজে কিনিতে পাওয়া যায় তবে তাহার উপরে মাস্তুল বসাইয়া সেই জিনিষটাই আর এক আকারে বিলাত হইতে আমদানি করাইলে দেশের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি করা হয়, সর্ব্বসাধারণে কি সে কাপড় সহজে পরিতে পায়? এক হিসাবে বিলাতের পক্ষে উদারতা করা হয় সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাকে প্রকৃত উদারতা বলে না! আমি নিজের গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছি বলিয়া কি সকলে বলিবে আমি হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা বশত পরের সহিত স্বতন্ত্র হইতেছি? স্বগৃহ না থাকিলে আমি পরকে আশ্রয় দিব কি করিয়া? রামমোহন রায় সেই স্বগৃহ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। অথচ স্পষ্ট দেখা গিয়াছে পরের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহাকে অনুদার বলিতে চাও ত বল! উদ্ভিজ্জ ও পশুমাংসের মধ্যে যে জীবনী শক্তি আছে তাহা যে আমরা স্বায়ত্ত করিতে পারি তাহার কারণ আমাদের নিজের জীবন আছে বলিয়া। আমাদের নিজের প্রাণ না থাকিলে আমরা নূতন প্রাণ উপার্জ্জন করিতে পারি না। আমাদের প্রাণ না থাকিলে উদ্ভিজ্জ পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি অন্য প্রাণীরা আমাদিগকে গ্রহণ করিত। এ জগতে মৃত টিকিতে পারে না, জীবিতের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। রামমোহন রায় যদি দেখিতেন আমাদের জীবন নাই তবে পারসীক মৃত দেহের ন্যায় আমাদিগকে মৃত ভবনে ফেলিয়া রাখিতে দিতেন, খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি অন্যান্য জীবিত প্রাণীর উদরস্থ হইতে দিতেন। কিন্তু, তাহা না করিয়া তিনি চিকিৎসা সুরু করিয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন জীবন আমাদের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাকেই তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। আমাদের চেষ্টা হউক আমাদের এই জীবনকে সতেজ করিয়া তুলি তবে আমরা ক্রমে বিদেশীয় সত্য আ-

পনার করিতে পারিব। তাও যে সকল সময়ে সকল অবস্থায় সম্পূর্ণ করিতে পারিব এমন ভরসা নাই। আমাদের জঠরানলেরও যেমন এমন সার্ব্বভৌমিক উদারতা নাই যে সমস্ত খাদ্যকে সমান পরিপাক করিতে পারে আমাদের হৃদয়েরও সেই দশা, কি করা যায় উপায় নাই। এই জন্যই বলি প্রাচীন ঋষিদের উপনিষদের ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া আগে আমাদের দেশে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লই, তাহার পরে সার্ব্বভৌমিকতার দিকে মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। ঈশ্বর যেমন সকলের ঈশ্বর তেমনি তিনি প্রত্যেকের ঈশ্বর, যেমন তিনি জ্ঞানের ঈশ্বর তেমনি তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর, তিনি যেমন সমস্ত জগতের দেবতা তেমনি আমাদের গৃহদেবতা। তাঁহাকে রাজা বলিয়াও দেখিতে পারি, তাঁহাকে পিতা বলিয়াও দেখিতে পারি। কিন্তু পিতা ঈশ্বর আমাদের যত নিকটের, তিনি আমাদের হৃদয়ের যত অভাব মোচন করেন এমন রাজা ঈশ্বর নহেন। তেমনি ব্রহ্ম ভারতবর্ষের গৃহদেবত তিনি ভারতবর্ষের পিতা। তিনি ভারতের হৃদয়ের যত নিকটবর্ত্তী তিনি ভারতের অভাব যত বুঝিবেন এমন আর কেহ নহে। ব্রহ্মই ভারতবর্ষের জাগ্রত দেবতা, জিহোবা গড অথবা আল্লা আমাদের ভাবের সম্পূর্ণ গম্য নহেন। রামমোহন রায় হৃদয়ের উদারতাবশতঃ ইহা বুঝিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি হইলে ভারতের এ মর্ম্মান্তিক অভাব হয় ত তাঁহার চক্ষে পড়িত না। পিতামহ ঋষিরা যে ব্রহ্মকে বহু সাধনা দ্বারা আবাহন করিয়া আমাদের ভারতবাসীর হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আমাদের হীনতা অন্ধকারে যে ব্রহ্মের মূর্ত্তি এতদিন আচ্ছন্ন হইয়া আছে, রামমোহন রায় সেই ব্রহ্মকে আমাদের হৃদয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমরা যদি তাঁহার সেই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করি, তবেই তাঁহার চিরস্থায়ী স্মরণস্তম্ভ পৃথিবীতে স্থাপন করিতে পারিব। আমরা অগ্রে ভারতবর্ষের মন্দিরে সনাতন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিব, অবশেষে এমন হইবে যে পৃথিবীর চারিদিক হইতে ধর্ম্মার্থীরা ভারতবর্ষের তীর্থক্ষেত্রে ব্রহ্ম-দর্শন-লালসায় দলে দলে আগমন করিতে থাকিবে, তখনই রাজা রামমোহন রায়ের জয়। তিনি যে সত্যের পতাকা ধরিয়া, ভারত ভূমিতে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই পুরাতন সত্যের জয়। তখন সেই রামমোহন রায়ের জয়ে ঋষিদের জয়ে সত্যের জয়ে ব্রহ্মের জয়ে আমাদের ভারতবর্ষেরই জয়।

৫৫ ব্রাহ্ম সম্বতে ২৩ মাঘ শুক্রবারে চন্দন নগরে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা হয়।

তদুপলক্ষে

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

আমি আজ শুভ দিনে শুভ ক্ষণে তোমাকে যে উপদেশ দিব, তাহা হৃদয়ে গ্রহণ কর, তাহা চিরজীবন পালন কর; তুমি পাপ হইতে মুক্ত হইবে, তোমার আত্মার উন্নতি হইবে, তোমার সদ্গতি হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মিক ধর্ম্ম, আন্তরিক ধর্ম্ম। আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাই শিক্ষা দেয়। আত্মার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ কর, আত্মার পত্তনভূমি উপলব্ধি কর, দেখিবে আত্মার প্রতিষ্ঠা পরমাত্মা। আত্মা নিরাশ্রয় নয়, পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে—আত্মা শূন্যে নাই,

পরমাত্মাতে অধিষ্ঠান করিতেছে। তিনিই আত্মার পত্তন-ভূমি।

"নাহি ভেবো মনে আছি একা আমি।
অন্তরে আছেন তব অন্তর্যামী॥
তিনিই তোমার সুহৃদ্ আশ্রয়।
পিতা, মাতা, বন্ধু, শরণ অভয়॥
তোমার জীবনে যে কিছু কল্যাণ।
তিনিই তাহার হয়েন নিদান॥"

আত্মার পরিচয় এই—এষহি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ দর্শন করে, স্পর্শ করে, শ্রবণ করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, বোধ করে, কর্ম্ম করে এই যে বিজ্ঞানাত্মা—এই যে জীবাত্মা, এ স্থিতি করিতেছে কোথায়? স পরে অক্ষরে আত্মান সম্প্রতিষ্ঠতে। সে অবিনাশী পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। এই রূপে তুমি যখন জানিলে যে তোমার আত্মা পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, তখন এই বিশ্বাস তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আসিতেছে যে অন্যের আত্মাও পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছে। তুমি যেমন জান তোমার আত্মা আছে—যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, তাহা হইতেও দ্রষ্টা শ্রোতা তোমার আত্মাকে তুমি যেমন স্বীয় জ্ঞান দ্বারা উজ্জ্বল রূপে জীবন্ত রূপে উপলব্ধি করিতেছ, জানিতেছ যদিও শরীর প্রত্যক্ষ-গোচর তথাপি অদৃশ্য আত্মজ্ঞ আত্মা যেমন সত্য, জড় শরীর তেমন সত্য নহে; মৃত্যুকালে এই শরীর এইখানে ফেলিয়া যাইতে হইবে—তেমনি নিঃসংশয়ে তুমি ইহাও উপলব্ধি করিতেছ যে অন্য সকল মনুষ্যেরও আত্মা আছে এবং সেই সকলেরই আত্মা পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত। আবার যেমন জানিতেছ সকল আত্মাই পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত, তেমনি জানিতেছ সমস্ত জড় জগতও সেই [illegible] এক

আত্মাকে জানিলেই জানা যায় যে এই বিশ্ব সংসার পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে। এই এক সত্যে সকল সত্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। যখন আপনার আত্মাতে পরমাত্মাকে জান, যখন আপন আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে স্পর্শ কর, তখন সকল সত্য জানা হয়। তিনি সকলের আশ্রয়—যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে এবং হবৈ তৎ সর্ব্বং পরআত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে। হে সৌম্য যেমন পক্ষীরা বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তেমনি সকলেই পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছে। এই নিগূঢ় তত্ত্ব অহোরাত্র চিন্তা করিবে; তাহা হইলে তোমার জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, ঈশ্বর-প্রেম তোমাতে বিকশিত হইবে, তোমার ধর্ম্মভাব জাগ্রৎ হইবে, তুমি পুণ্য লোকে গমন করিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম—তাহার বী[illegible] এই যে, আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে জানি[illegible] আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিলে সর্ব্বত্রই তাঁহা[illegible] দেখা যায়। আত্মাকে যদি না জান, ত[illegible] সকলই শূন্য। আত্মাই পরমাত্ম-জ্ঞা[illegible] মূল। 'আত্মবিদোবিদুঃ' যাহারা আত্মা জানে, তাহারাই পরমাত্মাকে জানে। আত্ম[illegible] ছাড়িয়া দিলে পরমাত্মাকে কোথায় পাই[illegible] তাঁহাকে স্বর্গ নামক কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থ[illegible] খুঁজিবে? না চন্দ্রে খুঁজিবে, না সূর্য্যে [illegible]জিবে? কিন্তু আত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখি[illegible] বুঝা যায় যে তিনি "বিশ্বংভুবনমাবিবেশ[illegible] এই শরীরের মধ্যে যে শরীরী আত্মা, ত[illegible] অন্তরে যখন শুদ্ধ বুদ্ধ অশরীর পরমাত্ম[illegible] দেখিবে—সেই জ্ঞান-গোচর মহান্ পুরুষ[illegible] দেখিবে, তখন সমুদায় ভাবার্থ তোমার নি[illegible] প্রকাশ হইবে। তোমার চির-জীবনের [illegible] লক্ষ্য হউক, যাহাতে আত্মার সহিত পরমা[illegible] যোগ গাঢ়তর রূপে অনুভব করিতে পা[illegible] মৃত্যুর পরে শরীর পড়িয়া থাকিবে কিন্তু [illegible]

যোগে যুক্ত হইয়া আত্মা পরমাত্মার সহিত অনন্তকাল বিচরণ করিতে থাকিবে। এই আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিলাম—এখন্ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কর।

"১। পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

২। তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩। এক মাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।"

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজের উপরে বিশ্বাস স্থাপন কর। এই বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমি তোমাকে এই উপদেশ দিতেছি যে, তুমি সেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলদাতা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী মঙ্গল-স্বরূপ নিরবয়ব একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাক। অদ্য তোমার এই প্রথম প্রতিজ্ঞা হইবে। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞানুযায়ী আমার উপদেশ এই—পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিবে না। এখনকার সমাজের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা বড়ই কঠিন। এই প্রতিজ্ঞাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। তিনি আমারদের হৃদয়ের ঈশ্বর, তাঁহার স্থানে আর কাহাকে বসাইব? কিন্তু পৌত্তলিকতার মধ্যে আমারদের সমাজ এমনি গ্রথিত যে এই প্রতিজ্ঞা পালনের বাধা চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান। প্রতি গৃহের প্রতিমা শালগ্রাম শিলা—যদি বা ব্রাহ্ম সে পূজার যোগ দিতে না চান, স্বতন্ত্র থাকিতে চান—যদি বা সম্বৎসরের উৎসব দুর্গোৎসব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া তিনি দূরে চলিয়া যান; তথাপি যখন তিনি জাতকর্ম্ম, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠানেই পৌত্তলিকতার যোগ দেখেন, তখন তিনি একেবারে নিরাশায় পতিত হন। বাস্তবিক আমাদের সমাজে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, উৎসবে, পৌত্তলিকতার যেরূপ যোগ, তাহাতে এ ব্রতপালন করা বড়ই কঠিন। পূর্ব্বকার ব্রহ্মবাদীরাও এই বৈদিক পৌত্তলিকতার আড়ম্বরে ও আক্রমণে ঘোর সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা নিষ্ফল কর্ম্মকাণ্ডে উত্যক্ত হইয়া বলিয়া গিয়াছেন—

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়াযজ্ঞরূপাঅষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়োযেঽভিনন্দন্তিমূঢ়াজরামৃত্যুংতে পুনরেবাপিযন্তি।

এই যাগ-যজ্ঞ-সকল অস্থায়ী ও অদৃঢ়, যাহাতে অষ্টাদশ অশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। যে মূঢ়েরা ইহাকে শ্রেয় বলিয়া অনুমোদন করে, তাহারা পুনর্ব্বার জরা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। তাহারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না—তাহাদের মুক্তি হয় না।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

তাঁহাকেই জানিয়া সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করে। মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। অগ্নি বায়ুর পূজা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা করিতে চাহিলেন। কিন্তু সে জন্য তাঁহারদিগকে একেবারে সমাজ পরিত্যাগ করিতে হইল—অরণ্যে যাইতে হইল। যখন দেখিলেন সংসারে ব্রহ্মোপাসনার বাধা, তখন তাঁহারা নিয়ম অবলম্বন করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন—তাঁহারা সন্ন্যাসী হইলেন। কিন্তু আমরা তো তাহা পারিব না। আমারদের

ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহস্থের ধর্ম্ম। আমারদের গৃহকে, সমাজকে এমন করিয়া গঠিত করিতে হইবে; যাহাতে পরিমিত সৃষ্ট বস্তুর স্থলে অকৃত অমৃত ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কেবল মাত্র আত্মার উন্নতি করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারিব না, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া সমাজের উন্নতি করিতে হইবে, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে—সমাজে যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু সাবধান যেন এ চেষ্টাতে আমরা আমারদের সমাজকে নির্ম্মূল করিয়া না ফেলি। সমাজের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যোগ রক্ষা করার এক উপায় আছে এই—গৃহ্যধর্ম্ম সমস্তই যথা সঙ্গত পূর্ব্বক।র বৈদিক নিয়মে রক্ষা করিয়া পরিমিত সৃষ্ট বস্তুর স্থলে অনন্ত পরব্রহ্মের উপাসনা অবলম্বন করা। এই রূপে আমারদের সমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম উভয়কে রক্ষা করা যায়। আমরা ঈশ্বরকে চাই, তাঁহার স্থানে আর কাহাকেও চাই না। তাঁহাকে যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তবেই আমরা সমাজে বিচরণ করিতে পারিব। আমরা হিন্দু সমাজকে ব্রাহ্মসমাজে পরিণত করিব, সমাজ হইতে পরিচ্যুত হইব না। পারি না পারি, এই আমাদের লক্ষ্য। পৌত্তলিকতার রোগে আক্রান্ত হইয়া সমাজের যে অধোগতি হইতেছে, তাহাকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু রোগীর প্রতি যদি এমন ঔষধ প্রয়োগ বা অস্ত্র চালনা করা হয় যে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়া যায়, তবে তাহার আর আরোগ্য কোথায়? তেমনি উপদ্রব করিয়া সমাজকে বিনাশ করা আর চিকিৎসা নহে। হিন্দু সমাজকে ত্যাগ করিলে কি ফল হইল?—রোগীকে ফেলিয়া গেলে তাহার আর কি উপকার করা হইল? সমাজের রোগ নষ্ট করিতে গিয়া সমাজকে নষ্ট করা আসুরিক চিকিৎসা। অতএব প্রাণপণে আমারদের পরিবারে, আমারদের সমাজে, আমরা ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিব। আমারদের সমাজকে আমরা আপনারা উন্নত করিব। আপনার নির্ভর ছাড়িয়া আর কাহারো সাহায্যে ইহার উন্নতি হইবে না। রাজনিয়মের সাহায্যে অথবা অন্য উপায়ে আমারদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। আমারদের এমনি দুর্দ্দশা যে সমাজ উচ্ছিন্ন যাইতেছে, ঈশ্বরের সিংহাসন কোথায় রাখিব? সকলই তো গিয়াছে, সামাজিক স্বাধীনতাও কি রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে? বলিতে হইবে, তোমরা আইন কর, আমরা বিবাহ করি। তোমরা আইন কর, আমারদের উপনয়ন হউক—তোমারদের আইন অনুসারে আমরা গৃহধর্ম্ম পালন করি। ঈশ্বরের সাহায্যে ও আমারদের যত্নে অবশ্যই কালে আমরা সমাজের উন্নতি সাধন করিতে পারিব। যাহাতে হিন্দু সমাজকে আমরা ব্রাহ্মসমাজে পরিণত করিতে পারি, আমরা সেই চেষ্টা করিব। যদি সমস্ত ভারতবর্ষে না পারি ত বঙ্গদেশে, যদি বঙ্গদেশে না পারি তবে একটি পরিবারেও যদি আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়, তাহা হইলেও আমারদের যত্ন সার্থক হইবে। আমরা দুর্ব্বল, আমারদের লক্ষ্য যদি মহান্ হয়, তবে সে লক্ষ্য যতটুকু সিদ্ধ হয় তাহা হইতেই মঙ্গল প্রসূত হইয়া থাকে।

তৃতীয় প্রতিজ্ঞা "রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।" প্রতিদিন নিয়মিত অন্ন যদি না খাও, তবে শরীর সুস্থ থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের উপাসনা আত্মার অন্ন। প্রতিদিন নিয়মিত তাঁহার উপাসনা না করিলে কি করিয়া তাহার স্বাস্থ্য থাকিবে। আমারদের দেশে

ত্রিসন্ধ্যা পূজার প্রথা প্রচলিত, কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম হইয়া কি প্রতিদিন একবারও তাঁহার উপাসনা করিতে পারিব না? তিনি আমার দিগকে এত দিয়াছেন—আমারদের ধন জন মান, সুখ সম্পদ, সমস্তই তাঁহার প্রসাদে, ইহার জন্য প্রতিদিন তাঁহার নিকটে একবার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা, ইহা কি সহজেই হয় না? আমারদের মনের বেদনা আর কাহাকেই জানাইব? আমারদের মনের কথা যাহা এক জনকে বলা যায়, তাহা আর এক জনকে বলা যায় না—যাহা স্ত্রীকে বলা যায়, তাহা কন্যাকে বলা যায় না; যাহা বন্ধুকে বলা যায়, তাহা পুত্রকে বলা যায় না; যাহা মাতাকে বলা যায়, তাহা পিতাকে বলা যায় না; কিন্তু তাঁহাকে সকল কথাই বলা যায়, তিনি আমারদের সকল কথাই শুনেন। তিনি আমাদের পিতা মাতা সুহৃদ্ সকলই। তবে তাঁহাকে প্রতিদিন আমারদের হৃদয়ের সুখ দুঃখ কৃতজ্ঞতা জানান কি এতই কষ্টের বিষয়। প্রতিজ্ঞাতে আছে—"প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।" পরব্রহ্মেতে আত্মাকে সমাধান করার কথা কেন ব্যবহৃত হইয়াছে? ইহারই জন্য যে, কোন বিশেষ পদ্ধতির উপরে নিতান্ত নির্ভর করিবে না। ওঁ বা গায়ত্রী বা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালী বা অন্য কোন হৃদয়গ্রাহী রচনা, যাহাতে তোমার তৃপ্তি হয়, যাহা অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মেতে তুমি আত্মা সমাধান করিতে পার, তাহাই করিবে। আত্মার এই অন্নপান অবহেলা করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে—আত্মঘাতী হইবে

> প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং
> ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ।

অতএব আত্মা ও পরমাত্মার যোগের কথা যে বলিয়াছি প্রতিদিন অপ্রমাদে একবার করিয়া সেই যোগে যুক্ত হইবে। আমারদের মনে যত বিচিত্র ভাবের উদয় হয়, সেই ভাবেই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পারি। প্রেমে আমরা তাঁহাকে দেখি, তিনি আমাদের সখা; বিপদের সময় তিনি আমারদের বিপদের কাণ্ডারী, সুখ দুঃখে তিনি আমারদের সুহৃদ্। পাপে পতিত হইলে তিনি আমারদের পতিত-পাবন। মুক্তির ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি আমারদের মুক্তি-দাতা। যখন আমারদের হৃদয়ে এত বিচিত্র ভাব রহিয়াছে, তখন আমারদের উপাসনার উপকরণের অভাব কি? আমারদের বিল্বপত্র, পুষ্প চন্দন, আহরণ করিতে হইবে না। রোগে শোকে বিপদে, সুখে দুঃখে, সাংসারিক [illegible], [illegible] নির্জ্জনে, অনবরত তাঁহাকে ডাকিবার আমারদের অধিকার আছে। যে হৃদয়ে ঈশ্বরের আসন নাই সে হৃদয় শূন্য, যে পরিবারে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা নাই সে পরিবারের কল্যাণ হয় না। যে দেশে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন না হয় সে দেশ [illegible] অরণ্যসমান। যে হৃদয়ে ঈশ্বর বিরাজ করেন সে হৃদয় সর্ব্বদা প্রফুল্ল, যে পরিবারে তিনি বিরাজ করেন সে পরিবার [illegible], যে দেশে তাঁহার জয়-ধ্বনি হয় [illegible] ধন্য। এই জন্য এই তৃতীয় প্রতিজ্ঞাতে আছে যে "রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।" রোগ বা বিপদের সময়ে উপাসনা না করার কথা কেন আছে? রোগ বিপদের সময় [illegible] তো আরো ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হয়; কিন্তু পাছে কোন সময়ে রোগে মূর্চ্ছাপন্ন ও কোন গুরুতর বিপদে একেবারে অবসন্ন হইয়া এই ব্রত পালনে অক্ষম হও এই ভয়ে এই প্রতিজ্ঞায় রোগ বিপদের দিবসে উপাসনা বারণের কথা আছে।

চতুর্থ প্রতিজ্ঞানুযায়ী—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিবে। সত্য কথা কহিবে, সত্য ব্যবহার করিবে, ক্ষমা অভ্যাস করিবে, ন্যায়পথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে, বিনয়ী হইবে, নম্র হইবে, গুরুজনকে ভক্তি করিবে, সকলকে আত্মবৎ দেখিবে।

মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ পরদ্রব্যাণি লোষ্ট্রবৎ,
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সপশ্যতি।

পঞ্চম প্রতিজ্ঞানুযায়ী—পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে সচেষ্ট হইবে। মদ্যপান করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, পরনিন্দা করিবে না, পরুষ বাক্য কহিবে না, অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিবে না, ব্রতভঙ্গ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইবে না, যাহা অন্যকে বলিতে লজ্জা হয় এমন কর্ম্ম করিবে না।

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষআত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।

এই সকল উপায়ের দ্বারা যে বিদ্বান্ ধর্ম্ম রক্ষার্থে যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হয়।

৬। যদি মোহ বশতঃ কখন কোন পাপাচরণ কর, তবে তাহার জন্য অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইবে।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্ম সমাজে দান করিবে। ব্রাহ্ম সমাজে কেবল অর্থ দান করিয়া ক্ষান্ত হইবে না। কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত থাকিবে। শত শত বাধা পাইয়াও ইহাতে শিথিল-প্রযত্ন হইবে না।

পত্র

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! এই মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শ্রীপ্রমথনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতায় দুই একটি স্থল ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিলক্ষিত হইল। তাহা অনুপেক্ষণীয় বোধে মীমাংসার জন্য আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইলে কৃতার্থ হইব।

১। তিনি প্রতিমাপূজা ও নিরীশ্বর সংসারের সেবা এক শ্রেণীর মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। প্রতিমা-পূজকেরা আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোন কালেই অবিশ্বাস করেন না। অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহার পূর্ণ স্বরূপ কল্পনা করিতে না পারিয়া তাঁহাতে শরীরের ধর্ম্ম আরোপ করেন। এ প্রকার করা অন্যায় বা পাপ কার্য্য বলিয়া কখনই পরিগণিত হইতে পারে না। "নিরীশ্বর সংসারের সেবকেরা" অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক বিশ্বাসের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোরপাপে লিপ্ত হয়েন, মানসিক গভীর অভাবের প্রতি অবহেলা করিয়া মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হন। সাকার উপাসনা শ্রেয়ের কুটিল পথ বলিয়া কখনই উক্ত হইতে পারে না। অবশ্য যাঁহারা ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়াও প্রতিমাপূজায় আসক্ত হন, যাঁহারা তাঁহার নিরাকার ও পূর্ণভাব কল্পনা করিতে সমর্থ হইলেও প্রতিমাপূজা হইতে বিরত হন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

২। "মনুষ্যেরা সরল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যাইয়া জড়ে ও প্রতিমাতে ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া সত্যের বিপক্ষে মিথ্যার কল্পনা সমুত্থান করে"। ইহা ভ্রান্তি-মূলক। পৌত্তলিকতা বা জড়বাদ কপটস্বভাব ব্যক্তি-দিগের ধর্ম্ম নহে। নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস মনুষ্যের সরল বা স্বাভাবিক বিশ্বাস নহে। জগতের কারণ-স্বরূপ পরমাত্মার বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ। কিন্তু সেই বিশ্বাস হইতে আমরা তাঁহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হই না। সৃষ্টিকৌশলে তাঁহার অসীম জ্ঞান প্রেম ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া জ্ঞান-প্রভাবে কল্পনাবলে তাঁহার নিরাকার পূর্ণ স্বরূপ কল্পনা করি। কেহবা অজ্ঞানতাবশতঃ জড়ে বা প্রতিমাতে তাঁহাকে কল্পনা করে। পূর্ণব্রহ্মকে কল্পনা করা তাহারদের সাধ্যের অতীত। ইহাকে সত্যের বিপক্ষে মিথ্যার কল্পনা বলে না। ধর্ম্ম বা ঈশ্বর বিষয়ক কল্পনা জ্ঞান বিজ্ঞান-সাপেক্ষ। জড় জীব বা আধ্যাত্ম জগতের নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছে।

৩। প্রতিমাপূজক ও জড়বাদীদিগকে প্রকাশ্য-ভাবে নিন্দা করা আদি সমাজের প্রকৃতির বহির্ভূত। ইহার ব্যভিচার দেখিলে আমরা যারপর নাই ক্ষুব্ধ হই।

শ্রীঅশোকনাথ চট্টোপাধ্যায়।
বেহালা।

উত্তর।

যদ্বাচা নভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২৯ শ্লোক।

কেহ কেহ বা জল বায়ু, অগ্নি শিলা, পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতার উপাসনা করে, কেহ মনঃকল্পিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তির উপাসনা করে; কত লোকে অসামান্য ক্ষমতাপন্ন মনুষ্য-বিশেষকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে; কিন্তু ইহার কিছুই ব্রহ্ম নহে। ইহাদের উপাসনায় ব্রহ্মের উপাসনা হয় না। ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মের এই প্রাণগত বিশ্বাস ও ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উপদেশ।

যদি ধাতু পাষাণে খড় মৃত্তিকায় গড়া ঈশ্বরের প্রতিমার পূজা করিয়া ঈশ্বরের পূজা সিদ্ধ না হইল, যদি এ খড় মাটির পুতুল আমাদের প্রাণের প্রাণ সেই ঈশ্বর না হইলেন; তবে নাস্তিকের হৃদয় ও পুতুল পূজকের হৃদয় এই উভয়কেই মোহান্ধকারাবৃত এক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে কি না? মনে কর দুইটি লোক সাগরে মুক্তা তুলিতে গেল। এক জন বহু অনুসন্ধানের পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, না ভাই, সাগরে মুক্তা নাই। আর এক জন কাচ দ্বারা একটি কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিয়া আনিয়া বলিল, এই মুক্তা পাইয়াছি। যিনি মুক্তা চিনেন না, তিনি কাচকে মুক্তা বলিয়া তাঁহার বাক্সের গুপ্ত প্রকোষ্ঠে তুলিয়া রাখিতে পারেন; কিন্তু এক জন মুক্তাবিৎ এই প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কখনো জোহরি বলিবেন না। অতএব "অপ্রতিম ব্রহ্মের প্রতিমা করিয়া পূজা করা এবং নিরীশ্বর সংসারের সেবা করা একই কথা।" ইহা ব্রহ্মজ্ঞ সাধকদিগের প্রাণের কথা।

শ্রীযুক্ত অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন—"প্রতিমা পূজকেরা আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোন কালেই অবিশ্বাস করে না। অজ্ঞানতা বশতঃ তাহার পূর্ণ স্বরূপ কল্পনা করিতে না পারিয়া তাঁহাতে শরীরের ধর্ম্ম আরোপ করেন।" কিন্তু আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ যে ঈশ্বর তিনি পূর্ণ ঈশ্বর, তিনি কাল্পনিক নহেন। যে ব্যক্তির আপনার জ্ঞানের উপর নিষ্ঠা হইয়াছে, তিনি কখনো সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরকে কল্পনা করিতে পারেন না। ঈশ্বরকে অন্তবৎ অপূর্ণ বলাই কল্পনা। ঈশ্বরকে পূর্ণ বলিয়া জানা কল্পনার কার্য্য নহে। ইহা জ্ঞানের সিদ্ধান্ত, ইহাই আত্মার প্রত্যয় স্থল—ইহাই আত্মপ্রত্যয়। যদি এই আত্মপ্রত্যয় অবলম্বন করিয়া আমরা তাঁহার সত্য-স্বরূপে অবস্থিতি করিতে না পারি তবে, সে আত্মপ্রত্যয় কথার কথা। যেখানে আমরা সৃষ্টি-কৌশলে তাহার অসীম জ্ঞান প্রেম ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া জ্ঞান-প্রভাবে তাঁহার নিরাকার পূর্ণস্বরূপ নিঃসংশয়-রূপে জানি, সেখানে তিনি বলিয়াছেন "কল্পনা বলে তাঁহার নিরাকার পূর্ণস্বরূপ কল্পনা করি।" কি আশ্চর্য্য! তিনি নিরাকার পূর্ণব্রহ্মকে কল্পনা করেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞেরা পূর্ণ স্বরূপকে কল্পনা করিতে পারেন না। মনের কল্পনা ভ্রান্তি মূলক। যাঁহারা ঈশ্বরকে মনে কল্পনা করেন, তাঁহারাই ভ্রান্ত হইয়া জল্পনা করিতে থাকেন। কল্পনাতে বাড়ী গড়া যায়, কল্পনাতে ভাঙ্গা যায়। আজ আমার একপ্রকার কল্পনা হইতে পারে, কাল আবার অন্য প্রকার কল্পনা হইতে পারে। কল্পনার কিছুই স্থিরতা নাই, যেহেতু কল্পনার ভূমি চঞ্চল মন। মনোদর্পণে 'রজতগিরিনিভং' মহাদেবকে দেখিলাম, আবার "রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং" ব্রহ্মাকে দেখিলাম, আবার শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে দেখিলাম; কিন্তু কল্পনা শূন্য দিব্যজ্ঞানে যে সত্যং শিবং সুন্দরং ব্রহ্ম প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহার কখনো পরিবর্ত্তন হয় না, তাহার কখনো অপলাপ হয় না।—অসীম যুগযুগান্তে তাঁহার একই বেশ। তিনি এক সত্য সনাতন। যদি পাপ হইতে পরিত্রাণ চাও, যদি মুক্তির ইচ্ছুক হও, তবে সরল হৃদয়ে, প্রেম ভক্তি ভরে, পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা কর—মুক্তি-প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

LONDON

JANUARY 24. 1885.

The Theistic Church London.

Dear Sir,

At a Meeting of the trustees of the Church held on the 19th Instant the following resolution was proposed and carried unanimously. Viz.

"That the most cordial thanks of the Trustees are due and are hereby offered to the Adi-Brahmo-Somaj of India for their very generous contribution of £ 50 towards the purchase fund of the new Church and the Trustees regret that they are not in a position to make a more Substantial proof of their appreciation of such liberality"

I have much pleasure in forwarding

the resolution and with best wishes for the spread of Theism in India beg to remain.

Yours truly
William Pain
Trustee Hon. Secy.

Revd.. Raj Narain Bose.

আয় ব্যয়।

পৌষ ও মাঘ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৫।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১১৪১।৶৩
পূর্ব্বকার স্থিত	২৮৬১॥/৩
সমষ্টি	৪০০৩ ৶৬
ব্যয়	৯৬৮৸৶৬
স্থিত	৩০৩৪ /০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ২৮২৸৵৯

দান প্রাপ্তি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০০
শ্রীযুক্ত বাবু রামসুন্দর রায় কেতুপাড়া পাবনা ৭২
" " জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০
" " প্যারীমোহন রায় ১০
" " রাজকৃষ্ণ আঢ্য ২
" " হরকুমার সরকার বোয়ালিয়া ৬
" " চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত পাণ্ডুয়া ৪
" " কাশীনাথ দত্ত ২
" " সিংহদাস মল্লিক ২
" " বিহারীলাল সেন ২
" " গোকুলকৃষ্ণ সিংহ হুগলী ২
" " অম্বিকাচরণ মৈত্রেয় ২
" পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ১
" বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ১
" " পতিতপাবন মিত্র ১
" " শশিভূষণ মিত্র ১
" " রামলাল ঘোষাল ১
" " দীননাথ অধোস্তা ১
" " গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী ১
" " ক্ষেত্রমোহন ধর ১
" " বনমালী চন্দ্র ১
" " মহানন্দ মুখোপাধ্যায় ১
পরলোক গত বাবু ভূতনাথ বসু ১
শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমোহিনী ৫
" শরৎকুমারী দেবী ৪
" ভবতারিণী ১
" বসন্তকুমারী ১

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রায় রমণীমোহন চৌধুরী বাহাদুর ভুষভাণ্ডার ৫
" বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত পাণ্ডুয়া ১

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ৪

দানাধারে দান প্রাপ্তি ৩২৸৵৯

২৮২৸৵৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৩৮॥৵০
পুস্তকালয় ...	১২২ ৵৬
যন্ত্রালয়	২৩৪৲
গচ্ছিত ...	২২১৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	২৯৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	৯০৲
দাতব্য	২৪৲
সমষ্টি	১১৪১।৶৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৮৮৸৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.. ...	১৬৮৸০
পুস্তকালয়	৮৭॥/৯
যন্ত্রালয়	২৩৪৸৶৬
গচ্ছিত	৫৮।৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১১৮। ৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	৯৭৲
দাতব্য	২২
সমষ্টি ...	৯৬৮৸৶৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

একাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

১৮০৬ শক।

কলিকাতা।

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্বৎ ১৯৪১। কলিগতাব্দ ৪৯৮৫। ১ চৈত্র শুক্রবার।

মূল্য ৪ চারি টাকা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একাদশ কল্পের প্রথম ভাগের সূচীপত্র

র একাদশ কল্পের প্রথম ভাগের সূচীপ